ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যা

[কলিকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের
বি. এ. ও বি. কম. কোর্সের জন্য লিখিত]

অধ্যাপক প্রশান্তকুমার রায়, এম এ.

অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা,
ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

এবং

অধ্যাপক বিশ্বনাথ ঘোষ, এম.এ.

অধ্যাপক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটী ; প্রাক্তন অধ্যাপক,
বাগনান কলেজ, হাওড়া বিধানচন্দ্র কলেজ. রিষড়া
ও কামারপুকুর কলেজ, কামারপুকুর।

দি বুক এক্সচেঞ্জ

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

২১৭, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬

প্রকাশক :
শ্রীধীরেন্দ্রমোহন রায়
দি বুক এক্সচেঞ্জ
২১৭, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ, ১৯৬০

মূল্য—আট টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীসাধন কুমার রায়
বিচিত্রা প্রিন্টার্স
৬।১এ, বৃন্দাবন মল্লিক লেন
কলিকাতা—৯

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ভাষায় পঠন পাঠনের অনুমতিদান করিয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য ইংরাজী ভাষায় উন্নতমানের যত সুলিখিত পাঠ্যপুস্তক রহিয়াছে বাংলা ভাষায় তাহা নাই। বাংলা ভাষায় ভারতীয় অর্থনীতির পঠনপাঠনে ছাত্রছাত্রিগণ উপকৃত হইবে এই উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচনা করা হইয়াছে।

দ্রুত গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে বুক এক্সচেঞ্জের কার্যাধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রমোহন রায়ের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

প্রশান্তকুমার রায়
বিশ্বনাথ ঘোষ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ অতি দ্রুত নিঃশেষিত হওয়ায় পরিবর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বাণিজ্যব্যাংকের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সমেত সকল নূতন বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণটি ছাত্রছাত্রীদের অধিকতর উপযোগী হইবে এ ভরসা রাখি। বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনারত অধ্যাপকবৃন্দ সহযোগিতা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

দি বুক এক্সচেঞ্জের কার্যাধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রমোহন রায়ের নিরলস প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে এতো সত্বর গ্রন্থটির নূতন সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না। শ্রীসাধনকুমার রায় এবং শ্রীমতী দেবিকা ঘোষ প্রুফ দেখার কাজে সহযোগিতা করিয়া আমাদের পরিশ্রমভার লাঘব করিয়াছেন। গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি পাইলেও ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া প্রকাশক দাম পূর্ববৎ রাখিয়াছেন।

প্রশান্তকুমার রায়
বিশ্বনাথ ঘোষ

Other books by Prof. Biswanath Ghosh.

A Short History of Economic Thought.

[For M. A. Students]

2. Essays in Applied Economics [For Hons. Students]

(In the Press)

3. অর্থনীতির ভূমিকা

[For B. Com. students]

4. আধুনিক অর্থনীতির রূপরেখা

[For B. A. Students]

5. অর্থনীতি ও পৌরনীতির ভূমিকা

[For P. U. Students]

6. পৌরনীতি ও অর্থনীতির পরিচয়

[For H. S. Students]

পৌরনীতি ও অর্থনীতির পরিচয়

[For S. F. Students]

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় অর্থনীতির প্রকৃতি ও পরিধি (Nature and Scope of Indian Economics) : অর্ধোন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ভারত : অর্ধোন্নতির কারণসমূহ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপথ : উন্নয়নী মূলধনের উৎস : হ্যারড-ডোমার উন্নয়ন মডেল : উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায় পৃষ্ঠা ১—১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ (Natural Resources and Environment) : মৌসুমী বায়ু ও ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : ভারতের মৃত্তিকা : ভারতের জলসেচ ব্যবস্থা : ভূমিক্ষয় : কৃষিজ সম্পদ : কৃষি উৎপাদন : ও কৃষিনীতি : পরিকল্পনাধীন সময়ে কৃষি উৎপাদন : চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষিকর্মসূচী : দামনীতি ও তৃতীয় পরিকল্পনা : চতুর্থ পরিকল্পনায় দামনীতি : শক্তি সম্পদ : খনিজ সম্পদ : বনসম্পদ ও সরকারের বননীতি : মৎস্য চাষ পৃষ্ঠা ১৭—৫৭

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক সংগঠন ও ইহার অর্থনৈতিক প্রভাব (Social Systems in India and its economic implications) : জাতিভেদ প্রথা : একান্নবর্তী পরিবার প্রথা : উত্তরাধিকার আইন : বিবাহ প্রথা : ধর্ম পৃষ্ঠা ৫৭—৬০

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় জনসংখ্যার আলোচনা (Studies of Indian Population) : জনসংখ্যা আলোচনার গুরুত্ব : ভারতীয় জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য : জনসংখ্যা বৃদ্ধি : জনসংখ্যার সমস্যা—ভারতে কি জনাধিক্য ঘটিয়াছে ? : জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন : জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং সরকারী নীতি পৃষ্ঠা ৬১—৭৬

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয় আয় (National Income) : জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা ও পরিমাপ পদ্ধতি : জাতীয় আয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা : ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা : ভারতে জাতীয় আয়ের পরিমাপ ও বৈশিষ্ট্য পৃষ্ঠা ৭৭—৮৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা (Subdivision and Fragmentation of Holdings): আর্থিক জোতের ধারণা: ভূদান যজ্ঞ: সমবায় চাষ: সমবায় গ্রাম পরিচালনা: কৃষি-পদ্ধতির যন্ত্রিকরণ: কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা: সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণসেবা: পঞ্চায়েতিরাজ ও তৃতীয় পরিকল্পনা

পৃষ্ঠা ৮৫—১১০

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা (Land Tenure Systems in India): জোতের উর্ধসীমা নির্ধারণ: পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার—জমিদারী রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আইন ১৯৫৩ ও পশ্চিমবংগ ভূমিসংস্কার আইন ১৯৫৬: পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ভূমি-সংস্কার নীতি পৃষ্ঠা ১১০—১১৮

অষ্টম অধ্যায়

ভারতীয় কৃষিমজুর সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা (Agricultural Labour in India: A General Survey): কৃষিশ্রমিক ও তৃতীয় পরিকল্পনা

পৃষ্ঠা ১১৮—১২৬

নবম অধ্যায়

কৃষি-মূলধন (Agricultural Finance): কৃষিঋণ: গ্রাম্যঋণের উৎস: সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ: সুপারিশগুলির কার্যে রূপায়ণ: কৃষি পুনঃ অর্থসরবরাহ্ কর্পোরেশন: জমিবন্ধকী-ব্যাংক পৃষ্ঠা ১২৬—১৩৯

দশম অধ্যায়

খাদ্য সমস্যা (Food Problem): খাদ্য সমস্যার প্রকৃতি: খাদ্য ঘাটতির কারণ: খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ: খাদ্য উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন: খাদ্য পরিকল্পনা—মেহেতা কমিটির রিপোর্ট: ডেবর কমিটির রিপোর্ট পৃষ্ঠা ১৩০—১৪৭

একাদশ অধ্যায়

ভারতে সমবায় আন্দোলন (Co-operative Movement in India): ভারতে সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: বর্তমান অবস্থা: সমবায়ের গঠন: সমবায় ব্যাংক ব্যবস্থা: কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক: রাজ্য সমবায় ব্যাংক: বহুউদ্দেশ্য সাধক সমবায় সমিতি: সমবায় আন্দোলনের মূল্যায়ন: সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ: নির্দেশিত প্রতিবিধান: রাজ্য ও সমবায় আন্দোলন: পরিকল্পনাধীন সময়ে সমবায় আন্দোলন: সেবা সমবায় সমিতি পৃষ্ঠা ১৪৮—১৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প (Cottage and Small Scale industries) : ভূমিকা : সংজ্ঞা : ভারতীয় শিল্প-কাঠামোয় কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমস্যা ও তাহাদের প্রতিবিধান : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান : শিল্প-তালুক পৃষ্ঠা ১৬৫—১৮০

দ্বিতীয় অধ্যায়

কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প (Some Large Scale Industries) : পাটশিল্প : বস্ত্রশিল্প : লৌহ ও ইস্পাতশিল্প : চিনিশিল্প : কাগজশিল্প : কয়লাশিল্প : চা-শিল্প পৃষ্ঠা ১৮০—১৯৭

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্পসংক্রান্ত সমস্যা ও নীতি (Industrial Problems and Policy) : শিল্পগত অবস্থান : শিল্পের আধুনিকীকরণ : ভারতীয় শিল্পে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা : ভারতের শুল্কনীতি : নূতন শুল্কনীতি ১৯৪৯-৫০ : সরকারের শিল্পনীতি : শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন : নূতন শিল্পনীতি ১৯৫৬ : নূতন শিল্পনীতির বিচার : শিল্পের জাতীয়করণের নীতি পৃষ্ঠা ১৯৮—২১৯

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের শিল্প-শ্রমিক (Industrial Labour in India) : ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য : ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতা : শ্রমদক্ষতা উন্নয়নের পন্থাসমূহ : ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন : ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের অসুবিধা : প্রতিবিধানাবলী : ট্রেড ইউনিয়ন আইন : শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ ও শিল্পবিরোধের কারণসমূহ : শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়সমূহ : মিঃ গিরির দৃষ্টিভংগী ও শিল্পবিরোধ আইন : শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যান্য ব্যবস্থা : শ্রমিকদিগের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা : বেকার সমস্যা : নিয়োগ-বিনিময়-কেন্দ্র : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও নিয়োগ : সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ : লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা : শিল্প-শ্রমিকের গৃহসমস্যা : পরিকল্পিত অর্থনীতিতে শ্রমনীতি পৃষ্ঠা ২১৯—২৬০

পঞ্চম অধ্যায়

বৈদেশিক মূলধন (Foreign Capital) : ভারতে বৈদেশিক মূলধন সংক্রান্ত সাধারণ আলোচনা : বৈদেশিক মূলধনের স্বপক্ষে যুক্তি : বৈদেশিক মূলধনের বিপক্ষে যুক্তি : বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি পৃষ্ঠা ২৬ ৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেসরকারী শিল্প পরিচালনা এবং মূলধন সরবরাহ (Industrial Management and Finance in the Private Sector) : ম্যানেজিং এজেণ্টদের কার্যাবলী : ম্যানেজিং এজেন্সির ত্রুটি : ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার সংস্কার : ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার ভবিষ্যৎ পৃষ্ঠা ২৬৭—২৭৩

সপ্তম অধ্যায়

শিল্প-মূলধন (Industrial Finance) : বে-সরকারী শিল্পের মূলধন : ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন : রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন : জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড : শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন : জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন : পুন: অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন : ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া : ভারতীয় শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক পৃষ্ঠা ২৭৩—২৮৪

অষ্টম অধ্যায়

পরিবহন (Transport) : ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা : রেলপথ : রেলপথের আয় ব্যয় : রাস্তা পরিবহন : রেল ও রাস্তা পরিবহণের প্রতিযোগিতা ও সমন্বয় : ভারতীয় বিমানপথ : জলপথ পরিবহণ—জাহাজ শিল্প পৃষ্ঠা ২৮৫—২৯৭

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ভারতের ব্যাংকব্যবস্থা (Indian Banking System) : ভারতীয় টাকার বাজার ও তাহার বৈশিষ্ট্য : দেশীয় ব্যাংকার : ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক : রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী : ভারতের যৌথপুঁজি ব্যাংক : বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক : ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক : ভারতীয় টাকার বাজারের উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ : রিজার্ভ ব্যাংক ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ : রিজার্ভ ব্যাংকের কাজের মূল্যায়ন : বিল বাজার পরিকল্পনা : আমানত বীমা কর্পোরেশন : বাণিজ্য ব্যাংকের জাতীয়-করণ : ব্যাংক-আইন : ভারতীয়-ব্যাংক ব্যবস্থার ত্রুটি পৃষ্ঠা ৩০১—৩৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুদ্রা, বিনিময় ও মূল্যস্তর (Currency, Exchange and Prices) : মুদ্রাব্যবস্থার বিবর্তন : বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থা : ষ্টার্লিং পাওনা : মুদ্রামান হ্রাস—১৯৪৯ : মুদ্রামান হ্রাসের ফলাফল : মুদ্রামান হ্রাস—জুন, ১৯৬৬ : ফলাফল : ভারতের মূল্যস্তর ও বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি : যুদ্ধকালীন মূল্যের গতি : যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যের গতি : প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যস্তরের গতি : দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যস্তরের গতি : তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যস্তরের গতি পৃষ্ঠা ৩৩২—৩৫৪

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (Foreign Trade of India) : ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য : তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণ : রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন লিমিটেড : রপ্তানী ঝুঁকিবীমা কর্পোরেশন লিমিটেড : রপ্তানী ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন : ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ও বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট : আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উদ্বৃত্তের বর্তমান অবস্থা—আমদানীর আধিক্য ও রপ্তানী সম্প্রসারণের অভাব : রপ্তানী সম্প্রসারণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ : আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও ভারত : ইউরোপীয় সাধারণ বাজার ও ভারত পৃষ্ঠা ৩৫৫—৩৭৪

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় কর-ব্যবস্থা—ইহার ত্রুটি ও প্রতিকার (Indian Tax Structure : its defects and measures for improvement) : কর-ব্যবস্থা উন্নয়নের সুপারিশ : কর-অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্ট : কর-সংস্কার সম্পর্কে ডাঃ ক্যালডরের প্রস্তাব : আয়কর : ব্যক্তিগত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা : সম্পত্তিকর : মূলধন লাভ কর : দানকর : সম্পদকর : ব্যয়কর : বাণিজ্যশুল্ক : কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক : বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনা : বাৎসরিক আমানত পরিকল্পনা : বিক্রয় কর : রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয় : ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থা : ফিনান্স কমিশন : প্রথম ফিনান্স কমিশন : দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন : তৃতীয় ফিনান্স কমিশন : চতুর্থ ফিনান্স কমিশন : ভারতের সরকারী ঋণ -৪১২

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning) : পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা : পরিকল্পনার মূল উপাদান : পরিকল্পনার প্রকারভেদ : পরিকল্পনার টেকনিক : মিশ্র অর্থনীতি : ঘাটতিব্যয় : ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা : স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ

পৃষ্ঠা ৪১৫—৪৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (India's First and Second Five Year Plans) : প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : উদ্দেশ্য : ব্যয়বরাদ্দ : সংগ্রহ : উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা : প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল : দ্বিতীয় বার্ষিক পরিকল্পনা : উদ্দেশ্য : ব্যয়বরাদ্দ : অর্থসংগ্রহ : উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা : দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনর্বিচার : প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা :

ষষ্ঠ অধ্যায়

জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা (Subdivision and Fragmentation of Holdings) : আর্থিক জোতের ধারণা : ভূদান যজ্ঞ : সমবায় চাষ : সমবায় গ্রাম পরিচালনা : কৃষি-পদ্ধতির যন্ত্রিকরণ : কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা : সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণসেবা : পঞ্চায়েতিরাজ ও তৃতীয় পরিকল্পনা
পৃষ্ঠা ৮৫—১১০

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা (Land Tenure Systems in India) : জোতের উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ : পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার—জমিদারী রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আইন ১৯৫৩ ও পশ্চিমবংগ ভূমিসংস্কার আইন ১৯৫৬ : পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ভূমি-সংস্কার নীতি
পৃষ্ঠা ১১০—১১৮

অষ্টম অধ্যায়

ভারতীয় কৃষিমজুর সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা (Agricultural Labour in India : A General Survey) : কৃষিশ্রমিক ও তৃতীয় পরিকল্পনা
পৃষ্ঠা ১১৮—১২৬

নবম অধ্যায়

কৃষি-মূলধন (Agricultural Finance) : কৃষিঋণ : গ্রাম্যঋণের উৎস : সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ : সুপারিশগুলির কার্যে রূপায়ণ : কৃষি পুনঃ অর্থসরবরাহ্ কর্পোরেশন : জমিবন্ধকী-ব্যাংক
পৃষ্ঠা ১২৬—১৩৯

দশম অধ্যায়

খাদ্য সমস্যা (Food Problem) : খাদ্য সমস্যার প্রকৃতি : খাদ্য ঘাটতির কারণ : খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ : খাদ্য উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন : খাদ্য পরিকল্পনা—মেহেতা কমিটির রিপোর্ট : ভেবর কমিটির রিপোর্ট
পৃষ্ঠা ১৪০—১৪৭

একাদশ অধ্যায়

ভারতে সমবায় আন্দোলন (Co-operative Movement in India) : ভারতে সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : বর্তমান অবস্থা : সমবায়ের গঠন : সমবায় ব্যাংক ব্যবস্থা : কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক : রাজ্য সমবায় ব্যাংক : বহুউদ্দেশ্য সাধক সমবায় সমিতি : সমবায় আন্দোলনের মূল্যায়ন : সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ : নির্দেশিত প্রতিবিধান : রাজ্য ও সমবায় আন্দোলন : পরিকল্পনাধীন সময়ে সমবায় আন্দোলন : সেবা সমবায় সমিতি
পৃষ্ঠা ১৪৮—১৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প (Cottage and Small Scale industries) : ভূমিকা : সংজ্ঞা : ভারতীয় শিল্প-কাঠামোয় কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমস্যা ও তাহাদের প্রতিবিধান : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান : শিল্প-তালুক পৃষ্ঠা ১৬৫—১৮০

দ্বিতীয় অধ্যায়

কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প (Some Large Scale Industries) : পাটশিল্প : বস্ত্রশিল্প : লৌহ ও ইস্পাতশিল্প : চিনিশিল্প : কাগজশিল্প : কয়লাশিল্প : চা-শিল্প পৃষ্ঠা ১৮০—১৯৭

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্পসংক্রান্ত সমস্যা ও নীতি (Industrial Problems and Policy) : শিল্পগত অবস্থান : শিল্পের আধুনিকীকরণ : ভারতীয় শিল্পে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা : ভারতের শুল্কনীতি : নূতন শুল্কনীতি ১৯৪৯-৫০ : সরকারের শিল্পনীতি : শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন : নূতন শিল্পনীতি ১৯৫৬ : নূতন শিল্পনীতির বিচার : শিল্পের জাতীয়করণের নীতি পৃষ্ঠা ১৯৮—২১৯

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের শিল্প-শ্রমিক (Industrial Labour in India) : ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য : ভারতীয় শ্রমিমের দক্ষতা : শ্রমদক্ষতা উন্নয়নের পন্থাসমূহ : ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন : ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের অসুবিধা : প্রতিবিধানাবলী : ট্রেড ইউনিয়ন আইন : শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ ও শিল্পবিরোধের কারণসমূহ : শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়সমূহ : মিঃ গিরির দৃষ্টিভংগী ও শিল্পবিরোধ আইন : শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যান্য ব্যবস্থা : শ্রমিকদিগের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা : বেকার সমস্যা : নিয়োগ-বিনিময়-কেন্দ্র : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও নিয়োগ : সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ : লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা : শিল্প-শ্রমিকের গৃহসমস্যা : পরিকল্পিত অর্থনীতিতে শ্রমনীতি পৃষ্ঠা ২১৯—২৬০

পঞ্চম অধ্যায়

বৈদেশিক মূলধন (Foreign Capital) : ভারতে বৈদেশিক মূলধন সংক্রান্ত সাধারণ আলোচনা : বৈদেশিক মূলধনের স্বপক্ষে যুক্তি : বৈদেশিক মূলধনের বিপক্ষে যুক্তি : বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি পৃষ্ঠা ২৬০—৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা (Subdivision and Fragmentation of Holdings) : আর্থিক জোতের ধারণা : ভূদান যজ্ঞ : সমবায় চাষ : সমবায় গ্রাম পরিচালনা : কৃষি-পদ্ধতির যন্ত্রিকরণ : কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা : সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণসেবা : পঞ্চায়েতিরাজ ও তৃতীয় পরিকল্পনা
পৃষ্ঠা ৮৫ – ১১০

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা (Land Tenure Systems in India) : জোতের ঊর্ধসীমা নির্ধারণ : পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার—জমিদারী রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আইন ১৯৫৩ ও পশ্চিমবংগ ভূমিসংস্কার আইন ১৯৫৬ : পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ভূমি-সংস্কার নীতি
পৃষ্ঠা ১১০—১১৮

অষ্টম অধ্যায়

ভারতীয় কৃষিমজুর সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা (Agricultural Labour in India : A General Survey) : কৃষিশ্রমিক ও তৃতীয় পরিকল্পনা
পৃষ্ঠা ১১৮—১২৬

নবম অধ্যায়

কৃষি-মূলধন (Agricultural Finance) : কৃষিঋণ : গ্রাম্যঋণের উৎস : সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ : সুপারিশগুলির কার্যে রূপায়ণ : কৃষি পুনঃ অর্থসরবরাহ্ কর্পোরেশন : জমিবন্ধকী-ব্যাংক
পৃষ্ঠা ১২৬—১৩৯

দশম অধ্যায়

খাদ্য সমস্যা (Food Problem) : খাদ্য সমস্যার প্রকৃতি : খাদ্যঘাটতির কারণ : খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ : খাদ্য উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন : খাদ্য পরিকল্পনা—মেহেতা কমিটির রিপোর্ট : ডেবর কমিটির রিপোর্ট
পৃষ্ঠা ১৪০– ১৪৭

একাদশ অধ্যায়

ভারতে সমবায় আন্দোলন (Co-operative Movement in India) : ভারতে সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : বর্তমান অবস্থা : সমবায়ের গঠন : সমবায় ব্যাংক ব্যবস্থা : কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক : রাজ্য সমবায় ব্যাংক : বহুউদ্দেশ্য সাধক সমবায় সমিতি : সমবায় আন্দোলনের মূল্যায়ন : সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ : নির্দেশিত প্রতিবিধান : রাজ্য ও সমবায় আন্দোলন : পরিকল্পনাধীন সময়ে সমবায় আন্দোলন : সেবা সমবায় সমিতি
পৃষ্ঠা ১৪৮– ১৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প (Cottage and Small Scale industries) : ভূমিকা : সংজ্ঞা : ভারতীয় শিল্প-কাঠামোয় কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমস্যা ও তাহাদের প্রতিবিধান : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান : শিল্প-তালুক পৃষ্ঠা ১৬৫—১৮০

দ্বিতীয় অধ্যায়

কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প (Some Large Scale Industries) : পাটশিল্প : বস্ত্রশিল্প : লৌহ ও ইস্পাতশিল্প : চিনিশিল্প : কাগজশিল্প : কয়লাশিল্প : চা-শিল্প পৃষ্ঠা ১৮০—১৯৭

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্পসংক্রান্ত সমস্যা ও নীতি (Industrial Problems and Policy) : শিল্পগত অবস্থান : শিল্পের আধুনিকীকরণ : ভারতীয় শিল্পে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা : ভারতের শুল্কনীতি : নূতন শুল্কনীতি ১৯৪৯-৫০ : সরকারের শিল্পনীতি : শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন : নূতন শিল্পনীতি ১৯৫৬ : নূতন শিল্পনীতির বিচার : শিল্পের জাতীয়করণের নীতি পৃষ্ঠা ১৯৮—২১৯

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের শিল্প-শ্রমিক (Industrial Labour in India) : ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য : ভারতীয় শ্রমিমের দক্ষতা : শ্রমদক্ষতা উন্নয়নের পন্থাসমূহ : ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন : ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের অসুবিধা : প্রতিবিধানাবলী : ট্রেড ইউনিয়ন আইন : শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ ও শিল্পবিরোধের কারণসমূহ : শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়সমূহ : মিঃ গিরির দৃষ্টিভংগী ও শিল্পবিরোধ আইন : শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যান্য ব্যবস্থা : শ্রমিকদিগের সামাজিক নিরা' ব্যবস্থা : বেকার সমস্যা : নিয়োগ-বিনিময়-কেন্দ্র : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও নিয়োগ সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ : লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা : শিল্প-শ্রমিকের গৃহসমস্যা : পরিকল্পিত অর্থনীতিতে শ্রমনীতি পৃষ্ঠা ২১৯—২৬০

পঞ্চম অধ্যায়

বৈদেশিক মূলধন (Foreign Capital) : ভারতে বৈদেশিক মূলধন সংক্রান্ত ়ারণ আলোচনা : বৈদেশিক মূলধনের স্বপক্ষে যুক্তি : বৈদেশিক মূলধনের বিপক্ষে যুক্তি : বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি পৃষ্ঠা ২৬০—২৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা (Subdivision and Fragmentation of Holdings) : আর্থিক জোতের ধারণা : ভূদান যজ্ঞ : সমবায় চাষ : সমবায় গ্রাম পরিচালনা : কৃষি-পদ্ধতির যন্ত্রিকরণ : কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা : সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণসেবা : পঞ্চায়েতিরাজ ও তৃতীয় পরিকল্পনা
পৃষ্ঠা ৮৫—১১০

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা (Land Tenure Systems in India) : জোতের উর্ধসীমা নির্ধারণ : পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার—জমিদারী রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আইন ১৯৫৩ ও পশ্চিমবংগ ভূমিসংস্কার আইন ১৯৫৬ : পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ভূমি-সংস্কার নীতি
পৃষ্ঠা ১১০—১১৮

অষ্টম অধ্যায়

ভারতীয় কৃষিমজুর সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা (Agricultural Labour in India : A General Survey) : কৃষিশ্রমিক ও তৃতীয় পরিকল্পনা
পৃষ্ঠা ১১৮—১২৬

নবম অধ্যায়

কৃষি-মূলধন (Agricultural Finance) : কৃষিঋণ : গ্রাম্যঋণের উৎস : সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ : সুপারিশগুলির কার্যে রূপায়ণ : কৃষি পুনঃ অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন : জমিবন্ধকী-ব্যাংক
পৃষ্ঠা ১২৬—১৩৯

দশম অধ্যায়

খাদ্য সমস্যা (Food Problem) : খাদ্য সমস্যার প্রকৃতি : খাদ্যঘাটতির কারণ : খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ : খাদ্য উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন : খাদ্য পরিকল্পনা—মেহেতা কমিটির রিপোর্ট : ডেবর কমিটির রিপোর্ট
পৃষ্ঠা ১৩০—১৪৭

একাদশ অধ্যায়

ভারতে সমবায় আন্দোলন (Co-operative Movement in India) : ভারতে সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : বর্তমান অবস্থা : সমবায়ের গঠন : সমবায় ব্যাংক ব্যবস্থা : কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক : রাজ্য সমবায় ব্যাংক : বহুউদ্দেশ্য সাধক সমবায় সমিতি : সমবায় আন্দোলনের মূল্যায়ন : সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ : নির্দেশিত প্রতিবিধান : রাজ্য ও সমবায় আন্দোলন : পরিকল্পনাধীন সময়ে সমবায় আন্দোলন : সেবা সমবায় সমিতি
পৃষ্ঠা ১৪৮—১৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প (Cottage and Small Scale industries) : ভূমিকা : সংজ্ঞা : ভারতীয় শিল্প-কাঠামোয় কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমস্যা ও তাহাদের প্রতিবিধান : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান : শিল্প-তালুক পৃষ্ঠা ১৬৫—১৮০

দ্বিতীয় অধ্যায়

কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প (Some Large Scale Industries) : পাটশিল্প : বস্ত্রশিল্প : লৌহ ও ইস্পাতশিল্প : চিনিশিল্প : কাগজশিল্প : কয়লাশিল্প : চা-শিল্প পৃষ্ঠা ১৮০—১৯৭

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্পসংক্রান্ত সমস্যা ও নীতি (Industrial Problems and Policy) : শিল্পগত অবস্থান : শিল্পের আধুনিকীকরণ : ভারতীয় শিল্পে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা : ভারতের শুল্কনীতি : নূতন শুল্কনীতি ১৯৪৯-৫০ : সরকারের শিল্পনীতি : শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন : নূতন শিল্পনীতি ১৯৫৬ : নূতন শিল্পনীতির বিচার : শিল্পের জাতীয়করণের নীতি পৃষ্ঠা ১৯৮—২১৯

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের শিল্প-শ্রমিক (Industrial Labour in India) : ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য : ভারতীয় শ্রমিমের দক্ষতা : শ্রমদক্ষতা উন্নয়নের পন্থাসমূহ : ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন : ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের অসুবিধা : প্রতিবিধানাবলী : ট্রেড ইউনিয়ন আইন : শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ ও শিল্পবিরোধের কারণসমূহ : শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়সমূহ : মিঃ গিরির দৃষ্টিভংগী ও শিল্পবিরোধ আইন : শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যান্য ব্যবস্থা : শ্রমিকদিগের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা : বেকার সমস্যা : নিয়োগ-বিনিময়-কেন্দ্র : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও নিয়োগ : সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ : লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা : শিল্প-শ্রমিকের গৃহসমস্যা : পরিকল্পিত অর্থনীতিতে শ্রমনীতি পৃষ্ঠা ২১৯—২৬০

পঞ্চম অধ্যায়

বৈদেশিক মূলধন (Foreign Capital) : ভারতে বৈদেশিক মূলধন সংক্রান্ত সাধারণ আলোচনা : বৈদেশিক মূলধনের স্বপক্ষে যুক্তি : বৈদেশিক মূলধনের বিপক্ষে যুক্তি : বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি পৃষ্ঠা ২৬০—৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা (Subdivision and Fragmentation of Holdings) : আর্থিক জোতের ধারণা : ভূদান যজ্ঞ : সমবায় চাষ : সমবায় গ্রাম পরিচালনা : কৃষি-পদ্ধতির যন্ত্রিকরণ : কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা : সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণসেবা : পঞ্চায়েতিরাজ ও তৃতীয় পরিকল্পনা পৃষ্ঠা ৮৫–১১০

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা (Land Tenure Systems in India) : জোতের উর্ধসীমা নির্ধারণ : পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার—জমিদারী রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আইন ১৯৫৩ ও পশ্চিমবংগ ভূমিসংস্কার আইন ১৯৫৬ : পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ভূমি-সংস্কার নীতি পৃষ্ঠা ১১০—১১৮

অষ্টম অধ্যায়

ভারতীয় কৃষিমজুর সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা (Agricultural Labour in India : A General Survey) : কৃষিশ্রমিক ও তৃতীয় পরিকল্পনা পৃষ্ঠা ১১৮—১২৬

নবম অধ্যায়

কৃষি-মূলধন (Agricultural Finance) : কৃষিঋণ : গ্রাম্যঋণের উৎস : সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ : সুপারিশগুলির কার্যে রূপায়ণ : কৃষি পুনঃ অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন : জমিবন্ধকী-ব্যাংক পৃষ্ঠা ১২৬—১৩৯

দশম অধ্যায়

খাদ্য সমস্যা (Food Problem) : খাদ্য সমস্যার প্রকৃতি : খাদ্য ঘাটতির কারণ : খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ : খাদ্য উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন : খাদ্য পরিকল্পনা—মেহেতা কমিটির রিপোর্ট : ডেবর কমিটির রিপোর্ট পৃষ্ঠা ১৪০–১৪৭

একাদশ অধ্যায়

ভারতে সমবায় আন্দোলন (Co-operative Movement in India) : ভারতে সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : বর্তমান অবস্থা : সমবায়ের গঠন : সমবায় ব্যাংক ব্যবস্থা : কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক : রাজ্য সমবায় ব্যাংক : বহুউদ্দেশ্য সাধক সমবায় সমিতি : সমবায় আন্দোলনের মূল্যায়ন : সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ : নির্দেশিত প্রতিবিধান : রাজ্য ও সমবায় আন্দোলন : পরিকল্পনাধীন সময়ে সমবায় আন্দোলন : সেবা সমবায় সমিতি পৃষ্ঠা ১৪৮– ১৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প (Cottage and Small Scale industries) : ভূমিকা : সংজ্ঞা : ভারতীয় শিল্প-কাঠামোয় কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমস্যা ও তাহাদের প্রতিবিধান : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান : শিল্প-তালুক পৃষ্ঠা ১৬৫—১৮০

দ্বিতীয় অধ্যায়

কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প (Some Large Scale Industries) : পাটশিল্প : বস্ত্রশিল্প : লৌহ ও ইস্পাতশিল্প : চিনিশিল্প : কাগজশিল্প : কয়লাশিল্প : চা-শিল্প পৃষ্ঠা ১৮০—১৯৭

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্পসংক্রান্ত সমস্যা ও নীতি (Industrial Problems and Policy) : শিল্পগত অবস্থান : শিল্পের আধুনিকীকরণ : ভারতীয় শিল্পে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা : ভারতের শুল্কনীতি : নূতন শুল্কনীতি ১৯৪৯-৫০ : সরকারের শিল্পনীতি : শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন : নূতন শিল্পনীতি ১৯৫৬ : নূতন শিল্পনীতির বিচার : শিল্পের জাতীয়করণের নীতি পৃষ্ঠা ১৯৮—২১৯

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের শিল্প-শ্রমিক (Industrial Labour in India) : ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য : ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতা : শ্রমদক্ষতা উন্নয়নের পন্থাসমূহ : ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন : ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের অসুবিধা : প্রতিবিধানাবলী : ট্রেড ইউনিয়ন আইন : শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ ও শিল্পবিরোধের কারণসমূহ : শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়সমূহ : মিঃ গিরির দৃষ্টিভংগী ও শিল্পবিরোধ আইন : শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যান্য ব্যবস্থা : শ্রমিকদিগের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা : বেকার সমস্যা : নিয়োগ-বিনিময়-কেন্দ্র : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও নিয়োগ সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ : লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা : শিল্প-শ্রমিকের গৃহসমস্যা : পরিকল্পিত অর্থনীতিতে শ্রমনীতি পৃষ্ঠা ২১৯—২৬০

পঞ্চম অধ্যায়

বৈদেশিক মূলধন (Foreign Capital) : ভারতে বৈদেশিক মূলধন সংক্রান্ত সাধারণ আলোচনা : বৈদেশিক মূলধনের স্বপক্ষে যুক্তি : বৈদেশিক মূলধনের বিপক্ষে যুক্তি : বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি পৃষ্ঠা ২৬০—৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা (Subdivision and Fragmentation of Holdings) : আর্থিক জোতের ধারণা : ভূদান যজ্ঞ : সমবায় চাষ : সমবায় গ্রাম দুনা : কৃষি-পদ্ধতির যন্ত্রিকরণ : কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা : সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণসেবা : পঞ্চায়েতিরাজ ও তৃতীয় পরিকল্পনা

পৃষ্ঠা ৮৫— ১১০

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা (Land Tenure Systems in India) : জোতের উর্ধসীমা নির্ধারণ : পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার—জমিদারী রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আইন ১৯৫৩ ও পশ্চিমবংগ ভূমিসংস্কার আইন ১৯৫৬ : পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ভূমি-সংস্কার নীতি

পৃষ্ঠা ১১০—১১৮

অষ্টম অধ্যায়

ভারতীয় কৃষিমজুর সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা (Agricultural Labour in India : A General Survey) : কৃষিশ্রমিক ও তৃতীয় পরিকল্পনা

পৃষ্ঠা ১১৮—১২৬

নবম অধ্যায়

কৃষি-মূলধন (Agricultural Finance) : কৃষিঋণ : গ্রাম্যঋণের উৎস : সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ : সুপারিশগুলির কার্যে রূপায়ণ : কৃষি পুনঃ অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন : জমিবন্ধকী-ব্যাংক

পৃষ্ঠা ১২৬—১৩৯

দশম অধ্যায়

খাদ্য সমস্যা (Food Problem) : খাদ্য সমস্যার প্রকৃতি : খাদ্য ঘাটতির কারণ : খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ : খাদ্য উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন : খাদ্য পরিকল্পনা—মেহেতা কমিটির রিপোর্ট : ভেবর কমিটির রিপোর্ট

পৃষ্ঠা ১৪০— ১৪৭

একাদশ অধ্যায়

ভারতে সমবায় আন্দোলন (Co-operative Movement in India) : ভারতে সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : বর্তমান অবস্থা : সমবায়ের গঠন : সমবায় ব্যাংক ব্যবস্থা : কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক : রাজ্য সমবায় ব্যাংক : বহুউদ্দেশ্য সাধক সমবায় সমিতি : সমবায় আন্দোলনের মূল্যায়ন : সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ : নির্দেশিত প্রতিবিধান : রাজ্য ও সমবায় আন্দোলন : পরিকল্পনাধীন সময়ে সমবায় আন্দোলন : সেবা সমবায় সমিতি

পৃষ্ঠা ১৪৮— ১৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প (Cottage and Small Scale industries) : ভূমিকা : সংজ্ঞা : ভারতীয় শিল্প-কাঠামোয় কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমস্যা ও তাহাদের প্রতিবিধান : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান : শিল্প-তালক পৃষ্ঠা ১৬৫—১৮০

দ্বিতীয় অধ্যায়

কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প (Some Large Scale Industries) : পাটশিল্প : বস্ত্রশিল্প : লৌহ ও ইস্পাতশিল্প : চিনিশিল্প : কাগজশিল্প : কয়লাশিল্প : চা-শিল্প পৃষ্ঠা ১৮০—১৯৭

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্পসংক্রান্ত সমস্যা ও নীতি (Industrial Problems and Policy) : শিল্পগত অবস্থান : শিল্পের আধুনিকীকরণ : ভারতীয় শিল্পে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা : ভারতের শুল্কনীতি : নূতন শুল্কনীতি ১৯৪৯-৫০ : সরকারের শিল্পনীতি : শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন : নূতন শিল্পনীতি ১৯৫৬ : নূতন শিল্পনীতির বিচার : শিল্পের জাতীয়করণের নীতি পৃষ্ঠা ১৯৮—২১৯

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের শিল্প-শ্রমিক (Industrial Labour in India) : ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য : ভারতীয় শ্রমিমের দক্ষতা : শ্রমদক্ষতা উন্নয়নের পন্থাসমূহ : ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন : ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের অসুবিধা : প্রতিবিধানাবলী : ট্রেড ইউনিয়ন আইন : শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ ও শিল্পবিরোধের কারণসমূহ : শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়সমূহ : মিঃ গিরির দৃষ্টিভংগী ও শিল্পবিরোধ আইন : শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যান্য ব্যবস্থা : শ্রমিকদিগের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা : বেকার সমস্যা : নিয়োগ-বিনিময়-কেন্দ্র : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও নিয়োগ : সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ : লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা : শিল্প-শ্রমিকের গৃহসমস্যা : পরিকল্পিত অর্থনীতিতে শ্রমনীতি পৃষ্ঠা ২১৯—২৬০

পঞ্চম অধ্যায়

বৈদেশিক মূলধন (Foreign Capital) : ভারতে বৈদেশিক মূলধন সংক্রান্ত ধারণ আলোচনা : বৈদেশিক মূলধনের স্বপক্ষে যুক্তি : বৈদেশিক মূলধনের বিপক্ষে যুক্তি : বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি পৃষ্ঠা ২৬০—৬৬

অধ্যায়

জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা (Subdivision and Fragmentation of Holdings): আর্থিক জোতের ধারণা: ভূদান যজ্ঞ: সমবায় চাষ: সমবায় গ্রাম পরিচালনা: কৃষি-পদ্ধতির যন্ত্রিকরণ: কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা: সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণসেবা: পঞ্চায়েতিরাজ ও তৃতীয় পরিকল্পনা পৃষ্ঠা ৮৫—১১০

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা (Land Tenure Systems in India): জোতের উর্ধসীমা নির্ধারণ: পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার—জমিদারী রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আইন ১৯৫৩ ও পশ্চিমবংগ ভূমিসংস্কার আইন ১৯৫৬: পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ভূমি-সংস্কার নীতি পৃষ্ঠা ১১০—১১৮

অষ্টম অধ্যায়

ভারতীয় কৃষিমজুর সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা (Agricultural Labour in India: A General Survey): কৃষিশ্রমিক ও তৃতীয় পরিকল্পনা পৃষ্ঠা ১১৮—১২৬

নবম অধ্যায়

কৃষি-মূলধন (Agricultural Finance): কৃষিঋণ: গ্রাম্যঋণের উৎস: সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ: সুপারিশগুলির কার্যে রূপায়ণ: কৃষি পুনঃ অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন: জমিবন্ধকী-ব্যাংক পৃষ্ঠা ১২৬—১৩৯

দশম অধ্যায়

খাদ্য সমস্যা (Food Problem): খাদ্য সমস্যার প্রকৃতি: খাদ্য ঘাটতির কারণ: খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ: খাদ্য উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন: খাদ্য পরিকল্পনা—মেহেতা কমিটির রিপোর্ট: ডেবর কমিটির রিপোর্ট পৃষ্ঠা ১৪০—১৪৭

একাদশ অধ্যায়

ভারতে সমবায় আন্দোলন (Co-operative Movement in India): ভারতে সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: বর্তমান অবস্থা: সমবায়ের গঠন: সমবায় ব্যাংক ব্যবস্থা: কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক: রাজ্য সমবায় ব্যাংক: বহুউদ্দেশ্য সাধক সমবায় সমিতি: সমবায় আন্দোলনের মূল্যায়ন: সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ: নির্দেশিত প্রতিবিধান: রাজ্য ও সমবায় আন্দোলন: পরিকল্পনাধীন সময়ে সমবায় আন্দোলন: সেবা সমবায় সমিতি পৃষ্ঠা ১৪৮—১৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প (Cottage and Small Scale industries) : ভূমিকা : সংজ্ঞা : ভারতীয় শিল্প-কাঠামোয় কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমস্যা ও তাহাদের প্রতিবিধান : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান : শিল্প-তালুক পৃষ্ঠা ১৬৫—১৮০

দ্বিতীয় অধ্যায়

কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প (Some Large Scale Industries) : পাটশিল্প : বস্ত্রশিল্প : লৌহ ও ইস্পাতশিল্প : চিনিশিল্প : কাগজশিল্প : কয়লাশিল্প : চা-শিল্প পৃষ্ঠা ১৮০—১৯৭

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্পসংক্রান্ত সমস্যা ও নীতি (Industrial Problems and Policy) : শিল্পগত অবস্থান : শিল্পের আধুনিকীকরণ : ভারতীয় শিল্পে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা : ভারতের শুল্কনীতি : নূতন শুল্কনীতি ১৯৪৯-৫০ : সরকারের শিল্পনীতি : শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন : নূতন শিল্পনীতি ১৯৫৬ : নূতন শিল্পনীতির বিচার : শিল্পের জাতীয়করণের নীতি পৃষ্ঠা ১৯৮—২১৯

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের শিল্প-শ্রমিক (Industrial Labour in India) : ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য : ভারতীয় শ্রমিমের দক্ষতা : শ্রমদক্ষতা উন্নয়নের পন্থাসমূহ : ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন : ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের অসুবিধা : প্রতিবিধানাবলী : ট্রেড ইউনিয়ন আইন : শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ ও শিল্পবিরোধের কারণসমূহ : শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়সমূহ : মিঃ গিরির দৃষ্টিভংগী ও শিল্পবিরোধ আইন : শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যান্য ব্যবস্থা : শ্রমিকদিগের সামাজিক নিরা· ব্যবস্থা : বেকার সমস্যা : নিয়োগ-বিনিময়-কেন্দ্র : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও নিয়োগ : সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ : লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা : শিল্প-শ্রমিকের গৃহসমস্যা : পরিকল্পিত অর্থনীতিতে শ্রমনীতি পৃষ্ঠা ২১৯—২৬০

পঞ্চম অধ্যায়

বৈদেশিক মূলধন (Foreign Capital) : ভারতে বৈদেশিক মূলধন সংক্রান্ত সাধারণ আলোচনা : বৈদেশিক মূলধনের স্বপক্ষে যুক্তি : বৈদেশিক মূলধনের বিপক্ষে যুক্তি : বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি পৃষ্ঠা ২৬০—৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেসরকারী শিল্প পরিচালনা এবং মূলধন সরবরাহ (**Industrial Management and Finance in the Private Sector**): ম্যানেজিং এজেন্টদের কার্যাবলী : ম্যানেজিং এজেন্সির ত্রুটি : ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার সংস্কার : ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার ভবিষ্যৎ পৃষ্ঠা ২৬৭—২৭৩

সপ্তম অধ্যায়

শিল্প-মূলধন (**Industrial Finance**): বে-সরকারী শিল্পের মূলধন : ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন : রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন : জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড : শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন : জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন : পুনঃ অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন : ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া : ভারতীয় শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক পৃষ্ঠা ২৭৩—২৮৪

অষ্টম অধ্যায়

পরিবহন (**Transport**): ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা : রেলপথ : রেলপথের আয় ব্যয় : রাস্তা পরিবহন : রেল ও রাস্তা পরিবহণের প্রতিযোগিতা ও সমন্বয় : ভারতীয় বিমানপথ : জলপথ পরিবহণ—জাহাজ শিল্প পৃষ্ঠা ২৮৫—২৯৭

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ভারতের ব্যাংকব্যবস্থা (**Indian Banking System**): ভারতীয় টাকার বাজার ও তাহার বৈশিষ্ট্য : দেশীয় ব্যাংকার : ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক : রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী : ভারতের যৌথপুঁজি ব্যাংক : বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক : ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক : ভারতীয় টাকার বাজারের উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ : রিজার্ভ ব্যাংক ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ : রিজার্ভ ব্যাংকের কাজের মূল্যায়ন : বিল বাজার পরিকল্পনা : আমানত বীমা কর্পোরেশন : বাণিজ্য ব্যাংকের জাতীয়করণ : ব্যাংক-আইন : ভারতীয়-ব্যাংক ব্যবস্থার ত্রুটি পৃষ্ঠা ৩০১—৩৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুদ্রা, বিনিময় ও মূল্যস্তর (**Currency, Exchange and Prices**): মুদ্রাব্যবস্থার বিবর্তন : বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থা : ষ্টার্লিং পাওনা : মুদ্রামান হ্রাস—১৯৪৯ : মুদ্রামান হ্রাসের ফলাফল : মুদ্রামান হ্রাস—জুন, ১৯৬৬ : ফলাফল : ভারতের মূল্যস্তর ও বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি : যুদ্ধকালীন মূল্যের গতি : যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যের গতি : প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যস্তরের গতি : দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যস্তরের গতি : তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যস্তরের গতি পৃষ্ঠা ৩৩২—৩৫৪

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (Foreign Trade of India) : ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য : তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণ : রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন লিমিটেড : রপ্তানী ঝুঁকিবীমা কর্পোরেশন লিমিটেড : রপ্তানী ক্রেডিট গ্যারাণ্টি কর্পোরেশন : ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ও বৈদেশিক মুদ্রা সংকট : আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উদ্বৃত্তের বর্তমান অবস্থা—আমদানীর আধিক্য ও রপ্তানী সম্প্রসারণের অভাব : রপ্তানী সম্প্রসারণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ : আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও ভারত : ইউরোপীয় সাধারণ বাজার ও ভারত পৃষ্ঠা ৩৫৫—৩৭৪

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় কর-ব্যবস্থা—ইহার ত্রুটি ও প্রতিকার (Indian Tax Structure : its defects and measures for improvement) : কর-ব্যবস্থা উন্নয়নের সুপারিশ : কর-অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্ট : কর-সংস্কার সম্পর্কে ডাঃ ক্যালডরের প্রস্তাব : আয়কর : ব্যক্তিগত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা : সম্পত্তিকর : মূলধন লাভ কর : দানকর : সম্পদকর : ব্যয়কর : বাণিজ্যশুল্ক : কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক : বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনা : বাৎসরিক আমানত পরিকল্পনা : বিক্রয় কর : রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয় : ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থা : ফিনান্স কমিশন : প্রথম ফিনান্স কমিশন : দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন : তৃতীয় ফিনান্স কমিশন : চতুর্থ ফিনান্স কমিশন : ভারতের সরকারী ঋণ পৃষ্ঠা ৩৭৫—৪১২

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning) : পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা : পরিকল্পনার মূল উপাদান : পরিকল্পনার প্রকারভেদ : পরিকল্পনার টেকনিক : মিশ্র অর্থনীতি : ঘাটতিব্যয় : ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা : স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ

পৃষ্ঠা ৪১৫—৪৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (India's First and Second Five Year Plans) : প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : উদ্দেশ্য : ব্যয়বরাদ্দ : অর্থসংগ্রহ : উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা : প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : উদ্দেশ্য : ব্যয়বরাদ্দ : অর্থসংগ্রহ : উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা : দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনর্বিচার : প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা :

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমালোচনা: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল: পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসর—অগ্রগতি পৃষ্ঠা ৪৩১—৪৫১

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (Third Five Year Plan of India): তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: উদ্দেশ্য: তৃতীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য: ব্যয়বরাদ্দ: অর্থসংস্থান: উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা: সমালোচকের বাঁকাচোখে তৃতীয় পরিকল্পনা: তিনটি পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা পৃষ্ঠা ৪৫২—৪৭৫

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (Fourth Five Year Plan of India): চতুর্থ পরিকল্পনার রূপরেখা: পরিকল্পনার বিস্তারিত আলোচনা: উদ্দেশ্য: রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সম্পর্ক: ব্যয়বরাদ্দ: অর্থসংস্থান: উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা: স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা: শিক্ষা: দামনীতি: কর্মসংস্থান: বৈদেশিক বাণিজ্য: পরিকল্পনার পরিক্রমা: সমালোচকের বাঁকাচোখে চতুর্থ পরিকল্পনা: পৃষ্ঠা ৪৭৬—৪৯৩

পরিশিষ্ট

১। মনোপলি কমিশনের রিপোর্ট পৃষ্ঠা ৪৯৪—৪৯৭

২। তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি পৃষ্ঠা ৪৯৭—৪৯৯

৩। বাণিজ্য ব্যাংকের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পৃষ্ঠা ৫০০—৫০৭

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল,
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে। —রবীন্দ্রনাথ

প্রথম খণ্ড

চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূরে প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
—রবীন্দ্রনাথ

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় অর্থনীতির প্রকৃতি ও পরিধি

(Nature and Scope of Indian Economics)

[**বিষয়বস্তু :** ভারতীয় অর্থনীতির প্রকৃতি ও নামকরণ—অর্ধোন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ভারত—অর্ধোন্নতির কারণসমূহ—অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপথ—উন্নয়ন মূলধনের উৎস—হ্যারোড-ডোমার উন্নয়ন মডেল—অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়]

অর্থনীতিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—বর্ণনামূলক অর্থনীতি, অর্থনৈতিক-তত্ত্ব এবং ফলিত অর্থনীতি। ভারতীয় অর্থনীতি ফলিত অর্থনীতির একটি উদাহরণ। এই শাস্ত্রে অর্থনৈতিকতত্ত্বের আলোকে ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির প্রকৃতি আলোচনা করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, অর্থনীতির মূলসূত্রগুলি ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার উপর প্রয়োগ করিয়া উহার সমাধানের পথ খোঁজা হয়।

উনবিংশ শতকের শেষভাগে বিচারপতি **এম. জি. র‍্যাণাডে** তাঁহার "ভারতীয় অর্থনীতির উপর রচনা" ("Essays on Indian Economics") নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় অর্থনীতি কথাটি ব্যবহার করেন। আপাতদৃষ্টিতে

র‍্যাণাডের রচনা

এই নামকরণ অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে। আমেরিকান অর্থনীতি বা ব্রিটিশ অর্থনীতি বলিয়া কোনো শাস্ত্র নাই, তবে ভারতীয় অর্থনীতি নামে শাস্ত্র থাকিবে কিরূপে? ইহা সত্য যে অর্থনীতির মূলসূত্রগুলি সর্বত্রই এক। কিন্তু বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সমস্যার রূপ বিভিন্ন। পৃথিবীর অপরাপর দেশের, বিশেষ করিয়া ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এই সত্য বুঝাইবার জন্যই র‍্যাণাডে ভারতীয় অর্থনীতি এই শব্দটি ব্যবহার করেন।*

ভারতে ব্যক্তি অপেক্ষা পরিবার এবং প্রথা অনেক বেশী প্রভাবশালী। অর্থের প্রতি ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও উহাই ব্যক্তির একমাত্র অথবা প্রধান কর্মপ্রেরণা

ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

নয়। এদেশে অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে প্রথা এবং রাষ্ট্র সমাজজীবন নিয়ন্ত্রণ করে। শ্রম বা মূলধনের গতিশীলতা আদৌ নাই, মুনাফা এবং মজুরী অস্থিতিস্থাপক এবং অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না। জনসংখ্যা নিজস্ব নিয়মে

---

* মনে রাখা প্রয়োজন, অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে একটি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের জন্ম এবং অগ্রগতি সম্পূর্ণরূপেই ইউরোপে হইয়াছে। বর্তমানে আমেরিকান অর্থনীতিবিদগণের অবদানও উল্লেখ্য। ভারতে অর্থনীতির চর্চা সম্পূর্ণরূপে নূতন। কৌটিল্য বহু পূর্বে তাঁহার পুস্তক "অর্থশাস্ত্র" প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের নাম 'অর্থশাস্ত্র' হইলেও ইহা কোনো অর্থনীতির আলোচনা নয়। ইহা কূটনীতি ও রাজনীতির ব্যাখ্যা।

বাড়িয়া চলে অপরপক্ষে উৎপাদন স্থিতিশীল। যে সকল অনুমান বা প্রকল্পের (assumptions) উপর ভিত্তি করিয়া পাশ্চাত্য অর্থনীতি গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতে তাহার বিপরীত বৈশিষ্ট্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

র্যাণাডে প্রদত্ত ব্যাখ্যার পর বহু যুগ কাটিয়া গিয়াছে। ভারতের বিগতকালের বৈশিষ্ট্যগুলি বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে অথবা তাহাদের প্রভাব ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে। এখন ভারতে ধর্মবোধ অপেক্ষা বস্তুতান্ত্রিকতা অধিকতর প্রভাবশালী, গ্রামকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে সভ্যতা নগরাভিমুখী, প্রথার স্থান ধীরে ধীরে প্রতিযোগিতা গ্রাস করিতেছে এবং পাশ্চাত্য প্রভাব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রসারের ফলে যৌথ পরিবার ও জাতিভেদ-প্রথা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার অনুমানগুলি পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বর্তমানে অনেকে এই শাস্ত্রকে ভারতীয় অর্থনীতি অপেক্ষা "ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা" (Economic Problems of India) এই নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী। এই নামকরণ অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমাদের মনে হয়। এই শাস্ত্রে আমরা শুধুমাত্র ভারতের অতীত এবং বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়াই আলোচনা করি না—ইহার ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক রূপটির প্রতিও ইংগিত দেওয়া হয়। এই শাস্ত্রে আমরা পূর্বতন উদাসীন স্বাতন্ত্র্যনীতি (apathetic laissez faire) হইতে ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতিতে রূপান্তরের মাধ্যমে স্বয়ংনির্ভরশীল হইবার প্রয়াস লইয়া আলোচনা করিব।

যথার্থ নামকরণ

অর্ধোন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ভারত (Characteristics of an underdeveloped economy and India):

পৃথিবীর বিভিন্নদেশগুলির দিকে তাকাইলে দেখিতে পাইব যে সকল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সমান নয়। কতকগুলি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নত অর্থাৎ ইহারা কৃষিশিল্প এবং বাণিজ্যে বহুল পরিমাণ উন্নতি করিয়াছে আবার কতকগুলি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পশ্চাৎপদ। অর্থনীতিবিদের নিকট আজ পৃথিবী দুইটি শিবিরে বিভক্ত—উন্নত এবং অনুন্নত দেশ। উন্নতদেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় বেশী, জীবনযাত্রার মান উন্নত আর অনুন্নত দেশের জনগণের মাথা-পিছু আয় কম, সঞ্চয় কম এবং জীবনযাত্রার মান নিচু। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ লোক অনুন্নত দেশের অধিবাসী। সেই কারণে অর্ধোন্নত দেশের উন্নতির মাধ্যমে পৃথিবীর বৃহত্তর জনসমষ্টির উন্নতি সম্ভবপর।

উন্নত ও অর্ধোন্নত দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে উন্নত দেশেও বেকার সমস্যা থাকিতে পারে কিন্তু তাহার কারণ সক্রিয় চাহিদার অভাব। ঐ সকল দেশে মূলধন দ্রব্যের পরিমাণ উৎপাদনের তুলনায় অনেক বেশী, সুতরাং বেকার সমস্যা সমাধান করার জন্য সক্রিয় চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অপরপক্ষে অর্ধোন্নত দেশে যে বেকার সমস্যা দেখিতে পাওয়া যায়

উন্নত ও অর্ধোন্নত দেশের সমস্যা বিভিন্ন

তাহার কারণ মূলধন-গঠনের অভাব। এই সকল দেশে বেকার সমস্যা সমাধান করিতে হইলে মূলধন-গঠন প্রয়োজন। কি পদ্ধতিতে সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস এবং ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় তাহাই উন্নত দেশের সমস্যা। অপর পক্ষে অর্ধোন্নতদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করিতে হইলে বর্তমান ভোগ হ্রাস ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উন্নত ও অর্ধোন্নত দেশের অর্থনীতির রূপরেখা ও সমস্যা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

অর্ধোন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনার পূর্বে মনে রাখা প্রয়োজন 'অর্ধোন্নত' একটি আপেক্ষিক শব্দ। কোনো একটি দেশকে অর্ধোন্নত বলিলে বুঝিতে হইবে যে কোনো উন্নতদেশের তুলনায় পূর্বকথিত দেশটি পশ্চাৎপদ। ভারতকে অর্ধোন্নত বলিলে বুঝিতে হইবে যে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারত অনেক পিছনে পড়িয়া আছে।

অর্ধোন্নতদেশে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়:

অর্ধোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ: সম্পদের অসম্পূর্ণ ব্যবহার

[১] অর্ধোন্নত দেশের প্রথম বৈশিষ্ট্য **দেশের সম্পদের** অসম্পূর্ণ ব্যবহার। দেশের সকল প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার না হইলে স্বভাবতই দেশটি অনগ্রসর থাকিবে। অনুন্নত দেশ বলিতে দেশে সম্পদের অভাব বুঝায় না—বুঝায় উহার পূর্ণ বিকাশ এবং ব্যবহারের পথে বাধাবিঘ্ন। কোন দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ স্বল্প থাকিতে পারে এবং এই সম্পদ পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইলেও মোট আয় এবং মাথাপিছু আয় অধিক হইবে না। মাথাপিছু আয় কম হইলেও এরূপ দেশকে অর্ধোন্নত দেশ বলা চলিবে না। অর্ধোন্নত দেশ আমরা তাহাকেই বলিব যে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় নাই কিন্তু ভবিষ্যতে উহার পূর্ণ ব্যবহারের অর্থাৎ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা আছে।

মূলধনের স্বল্পতা

[২] অনুন্নত অর্থনীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল **মূলধনের অভাব।** জনসাধারণের আয় কম বলিয়া সঞ্চয় কম এবং যেহেতু মূলধন সঞ্চয় হইতে সৃষ্টি হয় সেই কারণে মূলধন-গঠন বা বিনিয়োগও স্বল্প হয়। সম্প্রতি পরিকল্পনার ফলে আমাদের দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগ হইয়াছে। কিছুকাল আগেও ইহা জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ ছিল। অপরপক্ষে ইংলণ্ডে বিনিয়োগের হার জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ ভাগ। বিনিয়োগের পরিমাণ স্বল্প বলিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারও এতো কম। পরিকল্পনা কমিশনের মতে নিম্ন জীবনযাত্রার মান ও দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যাসমন্বিত অর্ধোন্নত দেশে প্রয়োজনানুরূপ উন্নয়নের জন্য মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ ভাগ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন।[১] সঞ্চয় কম বলিয়া দ্রুত

১ It would appear that in underdeveloped countries with low standards of living and rapidly increasing population, a rate of growth commensurate with needs cannot be achieved until the rate of capital formation comes upto around 20 percent of the national income. First Five Year Plan, page. 14

অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে হইলে এই অনুন্নত দেশগুলি বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

আমাদের দেশে বিনিয়োগের হার পূর্বের তুলনায় কিছু বাড়িয়াছে বটে কিন্তু ইহার মোট অংশ কৃষি এবং ফটকা কারবারে নিয়োজিত থাকায়, বিনিয়োগের অনুপাতে শিল্পপ্রসার হয় নাই। মূলধনের স্বল্পতা প্রকাশ পায় সুদের হারের মাধ্যমে। মূলধনের পরিমাণ কম হইলে সুদের হার স্বভাবতই উচ্চ হইবে। নিখিল ভারত গ্রাম্য ঋণ অনুসন্ধানকারী কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ভারতে সুদের হার ২৫% হইতে ৭০%.; অবশ্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে মূলধনের স্বল্পতা ছাড়াও, মূলধনের গতিশীলতার অভাব, অথবা মূলধন বাজারের অসম্পূর্ণতা (imperfect capital market) প্রভৃতি কারণেও সুদের হার অধিক হইতে পারে।

[৩] অনুন্নত অর্থনীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল **শিল্পের অনগ্রসরতা** এবং **কৃষির** উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা। অন্যভাবে বলা যায় যে মোট উৎপাদনের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের অনুপাত যদি কৃষিদ্রব্যের অনুপাত অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে দেশটিকে অনুন্নত বলিয়া ধরিতে হইবে। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা যদি কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা কম হয় তবে দেশটিকে অনুন্নত বলিতে হইবে। সুতরাং অনুন্নত দেশের কাঠামো কৃষিপ্রধান। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং মাত্র ১০ ভাগ লোক শিল্পে নিযুক্ত। ভারতে জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক আসে কৃষি হইতে এবং মাত্র ৮ ভাগ আসে বৃহদায়তন শিল্প হইতে। শিল্পের সম্যক উন্নতি না হওয়ার দরুণ নগরাঞ্চলের প্রসার ঘটে নাই। অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। ভারতে শতকরা ৮৩ জন লোক গ্রামে এবং শতকরা ১৭ জন লোক নগরাঞ্চলে বাস করে। শহরের তুলনায় গ্রামের জনসংখ্যার আধিক্য শিল্পের অনুন্নতি নির্দেশ করিতেছে।

শিল্পের অনগ্রসরতা এবং কৃষির প্রাধান্য

অবশ্য শিল্পজাত দ্রব্যের অনুপাত অপেক্ষা কৃষিজ উৎপাদনের অনুপাত বেশী হইলেই যে সেই দেশটি অর্ধোন্নত এবং লোকের জীবনযাত্রার মান নিচু হইবে, এরূপ কোনো কথা নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অষ্ট্রেলিয়ায় শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটে নাই, কিন্তু ইহাকে অর্ধোন্নত দেশ বলা সমীচীন হইবে না কারণ ইহার অধিবাসীগণ উচ্চ জীবনযাত্রার মানের অধিকারী। মূলকথা, অর্ধোন্নত দেশে কৃষিব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত ধরনের এবং মূলধনের অভাব থাকায় উহা শ্রম-প্রগাঢ় (labour-intensive) পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এইসব দেশে কৃষিকার্য প্রধানতঃ জীবিকা-নির্বাহের জন্য করা হয়।

[৪] **ছদ্মবেশী বেকারের (disguised unemployment) অস্তিত্ব** অনুন্নত দেশের একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত হয়। 'ছদ্মবেশী বেকার' এই ধারণার স্রষ্টা

হইলেন মিসেস জোয়ান রবিনসন। সেই লোককে ছদ্মবেশী বেকার বলা হইবে যাহার প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য। একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি সহজে বোঝানো যাইতে পারে। ধরা যাক, দুই একর জমি পাঁচজন কৃষক মিলিয়া চাষ করে। শ্রমিকের অনুপাতে জমির পরিমাণ কম এবং (ধরা যাক) ওই জমি তিনজন কৃষক মিলিয়া চাষ করিলেও উৎপাদনের পরিমাণ কম হয় না অর্থাৎ বাড়্তি দুজন লোক অপ্রয়োজনীয়—এই দুইজন ছদ্মবেশী বেকার অর্থাৎ ইহাদের উৎপাদন হইতে সরাইয়া লইলেও মোট উৎপাদন হ্রাস হয় না।

ছদ্মবেশী বেকার

শিল্পের সম্প্রসারণ না হওয়ায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা জমিতে আসিয়া ভিড় করে ফলে জমিতে জনাধিক্যের চাপ পড়ে। ভারতীয় কৃষিতে এইরূপ ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যা খুবই বেশী।

অর্ধোন্নত দেশগুলিকে দুইভাগে ভাগ করিতে পারা যায়; (ক) জনাকীর্ণ অনুন্নত দেশ, যেমন ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি এবং (খ) জনবিরল অনুন্নত দেশ, ব্রেজিল, চিলি ইত্যাদি। ছদ্মবেশী বেকার কেবলমাত্র জনবহুল অর্ধোন্নত দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়—জনবিরল অনুন্নত দেশে উহা নাই।

[৫] **জমি অপেক্ষা জনসংখ্যার অনুপাত কম** হইলে উহাকে-অনুন্নতির লক্ষণ বলিয়া কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ নির্দেশ দিয়াছেন। জমি অপেক্ষা জনসংখ্যার অনুপাত কম হইলে, দেশের সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার হইতে পারে না, সুতরাং মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয় না। জনবিরল অর্ধোন্নত দেশ সম্পর্কে ইহা সত্য হইলেও জনাকীর্ণ অর্ধোন্নত দেশ ইহা ঠিক নয়। জনবহুল অর্ধোন্নত দেশে জমি অপেক্ষা লোক সংখ্যার অনুপাত বেশী বলিয়াই মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয় না; এইসকল দেশে জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা (optimum population) অপেক্ষা অধিক বলিয়াই মাথাপিছু আয় কম।

জমি অপেক্ষা জনসংখ্যার অনুপাত কম

[৬] অর্ধোন্নত দেশে **উৎকট ধনবৈষম্য** দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহার অর্ধাহারের মধ্যে জীবন কাটাইতেছে আর অপরদিকে মুষ্টিমেয় লোক চরম ভোগবিলাসের মধ্যে বাস করিতেছে। ভারতে শতকরা ৬০ ভাগ লোক মোট জাতীয় আয়ের $\frac{1}{3}$ অংশ ভোগ করে আর অপরদিকে জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ ধনীলোক জাতীয় আয়ের $\frac{1}{3}$ অংশ ভোগ করে—বাকী অংশটি ভোগ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ব্যক্তিগত ধনবৈষম্য ছাড়া আঞ্চলিক ধনবৈষম্যও দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া নগর এবং গ্রামাঞ্চলের জনগণের মধ্যে তীব্র আর্থিক বৈষম্য রহিয়াছে।

উৎকট ধনবৈষম্য

[৭] অর্ধোন্নত দেশে **বাণিজ্য ঔপনিবেশিক** (**colonial**) ধরণের হয়। শিল্পের উন্নতি না হওয়ার দরুণ এই দেশগুলি কৃষিজ দ্রব্য এবং কাঁচামাল রপ্তানী এবং শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করে। যেসব কাঁচামাল স্বল্পমূল্যে এদেশ হইতে রপ্তানী হইয়া বিদেশে যায় তাহারই অধিকাংশ আবার নানাবিধ শিল্পদ্রব্যে রূপান্তরিত হইয়া অধিক মূল্যে এদেশে

ঔপনিবেশিক প্রকৃতির বাণিজ্য

আমদানী হয়। এইসকল দেশের বাণিজ্যহার (terms of trade) সাধারণতঃ প্রতিকূল (adverse) হয়।

[৮] অর্ধোন্নত দেশে **কারিগরী দক্ষতার অভাব অতি প্রকট।** দেশের উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধন থাকিলেই চলিবে না, উহাদের ঠিকভাবে উৎপাদন কার্যে নিয়োগ করিবার মতো দক্ষ শ্রমিকও থাকা চাই। যেদেশে লোকের কারিগরী দক্ষতা অধিক সেদেশে উৎপাদনের এবং জাতীয় আয়বৃদ্ধির হারও অধিক। অর্ধোন্নত দেশে অব্যবহৃত জনশক্তির অভাব নাই কিন্তু ইহাদিগকে উৎপাদনে লাগাইবার পথে বিরাট বাধা হইল কারিগরী দক্ষতার অভাব। অর্ধোন্নত দেশে মূলধন-গঠনের চেয়ে কারিগরি-দক্ষতা গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিন্দুমাত্র কম নয়, এমন কি ইহার অভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে।

কারিগরী দক্ষতার অভাব

[৯] অর্ধোন্নত দেশের গ্রামাঞ্চলে একটি বিরাট অংশ রহিয়াছে যেখানে **অর্থের বিশেষ প্রচলন নাই** (Non Monetised Sector) ; এদেশে লোকে সাধারণতঃ জীবনধারণের জন্য কৃষিকার্য করে এবং বাকী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষ-বিনিময়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করে।

অর্থ-বহির্ভূত অঞ্চলের অস্তিত্ব

[১০] **অর্ধোন্নত দেশে কৃষিক্ষেত্র হইতেই সর্বাধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত** (economic surplus) (মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট প্রয়োজনীয় ভোগের পার্থক্যই হইল অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত) **সৃষ্টি হয়।** অর্ধোন্নত দেশে জাতীয় আয়ের অধিক অনুপাত কৃষি হইতে পাওয়া যায় এবং সেই কারণে কৃষিকার্য হইতে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের অংশও অধিক হয়। দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যতই দ্রুত হইতে থাকিবে শিল্পে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ ও অনুপাত ততই বৃদ্ধি ও কৃষির ক্ষেত্রে উহা ততই হ্রাস পাইতে থাকিবে।

কৃষি হইতে সর্বাধিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়

[১১] অর্ধোন্নত দেশের সার্বিক (universal) বৈশিষ্ট্য হইল **মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা।** আমরা তাহাকেই অর্ধোন্নত দেশ বলিব যাহার মাথাপিছু আয় উন্নতদেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় অপেক্ষা কম। দেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় যত কম হইবে সেই দেশটিকে ততই অনুন্নত বলিতে হইবে। মাথাপিছু আয় কম হওয়ার দরুণ লোকে দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট। দারিদ্র্যের পাপচক্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসা অত্যন্ত দুরূহ। মাথাপিছু আয় কম বলিয়াই লোকের সঞ্চয় ক্ষমতা কম হয় এবং ভোগ্যবস্তু ক্রয় করিতেই স্বল্প আয়ের অধিকাংশ ব্যয় হইয়া যায়। উন্নত দেশগুলিতে জনগণের মোট খরচের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় হয় খাদ্যদ্রব্যের উপর কিন্তু ভারতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে জনগণকে মোট আয়ের দুই-তৃতীয়াংশের মতো ব্যয় করিতে হয়। আয় অল্প বলিয়া জীবনধারার মান নিচু এবং সেই কারণে এই সকল দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধি দ্রুতগতিতে হয়।

আর্থিক মানদণ্ড : আয়ের স্বল্পতা

অর্থনৈতিক উন্নতির স্তর বিচার করিয়া পৃথিবীর দেশগুলিকে তিনভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ অতি উন্নত দেশসমূহ (Highly developed mature economies)—যে সকল দেশে মাথাপিছু আয় ১০০০৲ টাকা বা তদপেক্ষা বেশী তাহাদের অতি উন্নত দেশ বলা হয়; যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ফ্রান্স, জার্মানী, ক্যানাডা ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ উন্নত দেশসমূহ (developed economies)—যে সকল দেশে মাথাপিছু আয় ৫০০৲ টাকা হইতে ১০০০৲ টাকা তাহাদের উন্নত দেশ বলা হয়; যেমন ইতালি, সোভিয়েৎ, রাশিয়া ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ অর্ধোন্নত দেশসমূহ (underdeveloped economies)—যে সকল দেশে মাথাপিছু আয় ৫০০৲ টাকা বা তদপেক্ষা কম তাহাদিগকে অর্ধোন্নত বা অনুন্নত দেশ বলা হয়। যেমন ভারত, পাকিস্তান এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ।

অর্ধোন্নতির কারণসমূহ (Causes of Underdevelopment)ঃ অর্ধোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ আমরা আলোচনা করিলাম। স্বভাবতই প্রশ্ন হইতে পারে এই সকল দেশের, বিশেষ করিয়া ভারতের অনুন্নতির কারণ কি? বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনায় মোটামুটিভাবে অনুন্নতির কারণসমূহের একটা আভাষ পাওয়া যায়। অর্ধোন্নত দেশের অনুন্নতির কারণসমূহকে—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

[এক] অর্থনৈতিক কারণ (Economic Factors)ঃ দেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন মূলধন। অর্থনৈতিক কাজ কারবারের দ্বারা যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় উহা পুনরায় উৎপাদনের কাজে বিনিয়োগ করিতে পারিলে দ্রুত উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু দুইটি কারণে ভারতে এই উদ্বৃত্ত দেশের উৎপাদনে বিনিয়োগ হইতে পারে নাই। প্রথমতঃ, সামন্ততান্ত্রিক জমিদার শ্রেণী কৃষকদের শোষণ করিয়া সেই সম্পদ নিজেদের ভোগবিলাসে ব্যয় করিত। জমিদারেরা ভূমিকরের মাধ্যমে কৃষকদের চরম শোষণ করায় কৃষি উন্নয়নের গতি রুদ্ধ হইয়া পড়িল। কৃষি উদ্বৃত্ত (agricultural surplus) মূলধন-গঠন করিতে সক্ষম হইল না। ভারতের অনুন্নতির দ্বিতীয় অর্থনৈতিক কারণ বৃটিশ শোষণ। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ভারতের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগ প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। এই প্রভূত পরিমাণ সম্পদ বিদেশীদের দ্বারা লুণ্ঠিত হইলে সেই দেশ যে অনুন্নতির স্তরে পড়িয়া থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে?

অপ্রয়োজনীয় ব্যয়

বৃটিশ শোষণ

জীবনযাত্রার মান নীচু হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কৃষকের মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমিতে লাগিল এবং ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। কৃষি হইতে বিচ্যুত হইয়া শ্রমিকেরা জীবিকার জন্য কুটির শিল্পে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু ব্রিটিশ-যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটির শিল্প ধ্বংস হইল। শিল্প-কারখানা না থাকায় বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যা নিরুপায় হইয়া পুনরায় কৃষিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কৃষিতে ছদ্মবেশী বেকারের সৃষ্টি হইল।

জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিচু থাকায় শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়িল না। আর বাজারের আয়তন সংকীর্ণ বলিয়া শিল্প-গঠনে দেশীয় উদ্যোক্তরা মোটেই উৎসাহ পাইল না।

অর্ধোন্নত দেশে মাথাপিছু আয় স্বল্প বলিয়া, সঞ্চয়ও কম হয়, সঞ্চয় স্বল্প বলিয়া মূলধন-গঠনের হারও নেহাৎ নগণ্য। স্বল্প পরিমাণ মূলধন-দ্রব্যের দ্বারা উৎপাদন কার্য পরিচালিত হয় বলিয়া উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণও কম হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আয় কম বলিয়া সঞ্চয় কম, সঞ্চয় কম বলিয়া মূলধন-গঠনের হারও কম আর সেই কারণে উৎপাদন তথা আয়ও স্বল্প—ইহাই দারিদ্র্যের পাপচক্র (vicious circle of poverty); অধ্যাপক নার্কস (Nurkse) যথার্থই বলিয়াছেন যে দারিদ্র্যই দারিদ্র্যের কারণ (A country is poor because it is poor.) দারিদ্র্যের পাপচক্র ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে তবেই উন্নতি সম্ভবপর।

[দুই] রাজনৈতিক কারণ (Political Factors) : কাঁচামালের যোগান এবং সুবিস্তৃত বাজার কোনো দেশের শিল্পোন্নতির জন্য এই দুইটি বিষয় বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইউরোপীয় দেশগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার অনগ্রসর দেশগুলিতে ওই দুই বিষয়ের প্রভূত সম্ভাবনা দেখিয়া ইহাদের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করে। এই সকল দেশের শাসন ব্যবস্থা করায়ত্ত করিয়া উহারা শোষণের পথ প্রশস্ত করে। স্বার্থপর বৃটিশ বাণিজ্য নীতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ইংলণ্ডের শিল্প-গঠনে উৎসাহ দিবার জন্য দেশীয় কারিগর ও শিল্পকে নিরুৎসাহ করে। ভারত ইংলণ্ডকে কাঁচামাল যোগান দিতে বাধ্য হয়। অপরপক্ষে নামমাত্র শুল্কে ইংলণ্ডের শিল্পজাত-দ্রব্য ভারতের বাজারে বিক্রয় হইতে লাগিল। ইহা ছাড়াও, প্রতিরোধক শুল্ক দ্বারা ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যগুলির বিদেশে রপ্তানীর সম্ভাবনা বিনষ্ট করা হইল।

প্রতিকূল শিল্প ও বাণিজ্য নীতি

মুঘল সাম্রাজ্যের শেষভাগে ভারতের রাজনৈতিক অরাজকতাই দেশের দ্রুত শিল্পায়ণের প্রতিবন্ধক হইল। নিরাপত্তার অভাবে লোকে মোটেই সঞ্চয়ে আগ্রহী হইল না। সামান্য সঞ্চয়ও সোনা, রূপা, মূল্যবান প্রস্তর ইত্যাদির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল, লোকে নিরাপত্তার অভাবে বিনিয়োগের ঝুঁকি লইতে রাজী হইল না। এই অবস্থায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বৃটিশ রাজশক্তির সহায়তায় ধীরে ধীরে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য করায়ত্ত করিয়া ফেলিল।

[তিন] সামাজিক কারণ (Social Factors) : ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জাতিভেদপ্রথা, একান্নবর্তী পরিবার প্রথা, উত্তরাধিকার প্রথা, বিবাহপ্রথা এবং ধর্মান্ধতা—দেশের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করিয়াছে।

জাতিভেদ প্রথার গুণ অপেক্ষা দোষ অনেক বেশী। মানবতার দিক হইতে এই ব্যবস্থা ঘৃণ্য, সামাজিক দিক হইতে ইহা অসহনীয়, অর্থনৈতিক দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ এবং যুগের দিক হইতে সামঞ্জস্যবিহীন। এই ব্যবস্থায় শ্রমের গতিশীলতা সম্পূর্ণরূপে

ব্যাহত হইয়াছে। জন্মের দ্বারা বৃত্তি নির্ধারিত হইলে ব্যক্তির কর্মদক্ষতা হ্রাস হইতে পারে। একজন ছুতার মিস্ত্রির ছেলে অন্য কোনো পেশা গ্রহণ করিতে পারিবে না, কোনো বৃত্তিতে শ্রমিকের অধিক চাহিদা থাকিলেও অন্য পেশাধারী লোক সেই পেশা গ্রহণ করিতে পারিবে না। জাতিভেদ প্রথার জন্য হিন্দু সমাজে সামাজিক গণতন্ত্রের প্রসার ব্যাহত হইয়াছে. উচ্চজাতির লোক নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে, কায়িক শ্রমের মর্যাদা দিতে শিখে নাই এবং বিভিন্নজাতির মধ্যে সমবায় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হইয়াছে।

জাতিভেদ প্রথা

একান্নবর্তী পরিবার

একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থার প্রধান ক্রটি যে ইহা অলসতা এবং কর্তব্যজ্ঞান হীনতাকে প্রশ্রয় দেয়। পরিবারের দুই একজন প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করিলে বাড়ীর অপর সকল ব্যক্তির কর্মোদ্যম কমিয়া যায়। যাহারা অর্থোপার্জন করে তাহারাও স্বাধীনভাবে সেই অর্থ ব্যয় করিতে পারে না। ফলে কর্মোদ্যোগ ব্যাহত হয়। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ এই একান্নবর্তী পরিবার প্রথা। এই প্রথা থাকার ফলে সন্তান সন্ততিদিগের ভরণপোষণের দায়িত্ব সমানভাবে সকলের এবং সেই কারণে পিতা দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে সন্তানের জন্ম দিয়াছে। এই ব্যবস্থার মারাত্মক ক্রটি যে ইহা মূলধন গঠনকে ব্যাহত করে। প্রত্যেকের উপার্জিত অর্থ সকলের জন্য সমানভাবে ব্যয় হয়, ফলে যাহাদের উপার্জন বেশী তাহাদের আয়ের দ্বারা অসমর্থের ভরণপোষণ হয়, এই কারণে বিশেষ কিছু সঞ্চয় হইতে পারে না এবং মূলধন গঠন হয় না।

উত্তরাধিকার আইন

ভারতের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন অর্থনৈতিক উন্নতির পরিপন্থী। এদেশে উত্তরাধিকার আইন অনুসারে মৃতব্যক্তির সম্পত্তি সকল পুত্রই সমানভাবে পাইয়া থাকে। ভারতীয় উত্তরাধিকার ব্যবস্থার ফল জমির উপর অত্যন্ত ক্ষতিকারক। উত্তরাধিকার আইনের ফলে জমি খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে এবং উন্নত পদ্ধতিতে কৃষিকার্য পরিচালনার পথে বাধার সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া যায় বলিয়া বৃহদায়তন বিনিয়োগ সম্ভবপর হয় না।

বিবাহ

ভারতে অতিরিক্ত হারে জনসংখ্যা বাড়িয়া জনাধিক্য সমস্যা সৃষ্টির পিছনে রহিয়াছে এদেশের বিবাহ প্রথা। ভারতে সকলেই বিবাহ করে; এমন কি যাহারা পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম তাহারাও বিবাহ করে; ফলে জনসংখ্যা অত্যধিক হয়। দ্বিতীয়তঃ ভারতে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। কম বয়সে বিবাহ করার ফলে প্রজনন সময়ের (Fertility Period) দৈর্ঘ্য বাড়িয়া যায় এবং জনসংখ্যা দ্রুতহারে বাড়িতে থাকে।

বিনিয়োগের যথাযথ বণ্টন সহজসাধ্য হয়। ভৌগোলিক পছন্দ বলিতে বুঝায় শিল্পের এরূপ বিন্যাসকরণ যাহাতে অনুন্নত ও উপেক্ষিত অঞ্চলে শিল্পস্থাপনে অগ্রাধিকার দান এবং শিল্পোন্নত অঞ্চলে নূতন শিল্পস্থাপনে বিধিনিষেধ আরোপ করা, আর এইভাবে দেশে সুষম শিল্পোন্নয়ন করা।

নিয়োগ-পছন্দ, সময়-পছন্দ এবং ভৌগোলিক-পছন্দ পর্যালোচনার পর, পরিকল্পনায় যে ধরণের বিনিয়োগের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উদ্বৃত্ত বণ্টন করা প্রয়োজন। যদি দেশটি অসমবৃদ্ধির পরিকল্পনা পদ্ধতি (Planning with unbalanced growth) গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের অধিকাংশ মূল ও ভারীশিল্পের খাতে বিনিয়োগ করিতে হইবে। দ্রুত উন্নয়নকামী অর্ধোন্নত দেশে ইহাই যোগ্য বণ্টন কারণ ইহার ফলে পরবর্তী সম্প্রসারণের উপযুক্ত সঠিক শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হইবে।

উন্নয়ন মূলধনের উৎস (Sources of Developmental Finance) : বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে লাভ, করব্যবস্থা, আভ্যন্তরিণ ঋণ, বৈদেশিক মূলধন এবং ঘাটতি ব্যয় (deficit financing)—এই পাঁচটি হইল মূলধন গঠনের পদ্ধতি।

অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতেই উন্নয়নমূলক অর্থসংগ্রহের উৎসসমূহ আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেশের লুক্কায়িত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবস্থিত হইলেই উহা সংগ্রহ এবং দ্রুত উন্নয়নের জন্য উহা ব্যবহার করিবার সর্বাত্মক প্রয়াস সম্ভবপর।

প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক ঋণ-মূলধনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা যাইতে পারে। অধিকাংশ অনুন্নত দেশ স্বল্প উৎপাদন, স্বল্প মূলধনী যন্ত্রপাতি, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার পাপচক্রের মধ্যে বাস করিতেছে। বৈদেশিক মূলধন প্রারম্ভিক-গতির সূচনা করিতে সক্ষম হইলেও অনুন্নতির পাপচক্র ভেদ করিতে পারে না। বাহির হইতে বিদেশী সাহায্যের মাধ্যমে উন্নয়ন কোনো দেশের উপর চাপাইয়া দেওয়া যায় না। বাহ্যিক শক্তির সাহায্যে অগ্রগতির স্থায়ী বেগ সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়, উন্নয়নের গতিবেগ আসিবে আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

বৈদেশিক মূলধন

বৈদেশিক বিনিয়োগ মূলধন গঠনে সহায়তা করিয়া থাকে। বৈদেশিক মূলধনের সাথে সাথে কারিগরী শিল্পজ্ঞান দেশে আসে, ফলে নৈপুণ্য গঠনও হয়। জাতীয় মূলধন-গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নির্দিষ্ট করিয়া কিছু বলা শক্ত। শিল্পায়নের প্রথম যুগে সুইডেনে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল $\frac{১}{১০}$ ভাগ। এই শতকের প্রথম দুই দশকে ক্যানাডায় বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ ছিল মোট মূলধন গঠনের ৫০ ভাগ। অপরপক্ষে সোভিয়েট রাশিয়া কোনোরূপ বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ না করিয়াই তাহার দেশের উন্নয়ন সাধন করিয়াছে। অবশ্য ইহার দরুণ সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণকে নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। ভারতে আভ্যন্তরীণ মূলধন স্বল্প, দেশের দ্রুত উন্নতিসাধন করিতে হইলে বিদেশ হইতে পর্যাপ্ত মূলধন আমদানী করিতে হইবে। বিদেশী ধন অধিক

পরিমাণে গ্রহণ করিলে দেশের বৈদেশিক নীতির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা থাকে। সম্পূর্ণ সর্তবিহীন না হইলে বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করা উচিত নয়।

আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সংগ্রহের দুইটি পদ্ধতি—করধার্য ও ঋণ গ্রহণ করা। উন্নয়ণের জন্য সঞ্চয় সংগ্রহের সব কয়টি পদ্ধতির প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হইলেও করধার্যের দ্বারা অর্থসংগ্রহ করাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রধান উপায়।

করধার্য

অর্ধোন্নত দেশে অবশ্য করপদ্ধতির কার্যকারিতা খুবই সীমাবদ্ধ। প্রথমতঃ এই সকল দেশে গ্রামের এক বৃহত্তম অংশ প্রত্যক্ষ বিনিময় প্রথার দ্বারা অভাব মিটায় অর্থাৎ এইসব দেশে অর্থ-সম্পর্ক বহির্ভূত অঞ্চল (non-monetised sector) ব্যাপক আর এই অঞ্চল করধার্যের আওতার বাহিরে। দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার মান. অত্যন্ত নিচু, সেই কারণে করের মাধ্যমে অধিক অর্থসংগ্রহ করা দুরূহ কাজ। তৃতীয়তঃ, করধার্যের একটা সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংকুচিত হইবে।

অর্ধোন্নত দেশে জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ কৃষিজীবি কিন্তু কৃষকদের নিকট হইতেও অধিক কর আদায় করা সম্ভবপর নয় কারণ উহাদের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান অতি নিম্নস্তরের। আবার চাকুরীজীবি মধ্যবিত্তশ্রেণীর নিকট হইতেও অধিক কর আদায় করা সম্ভবপর নয় কারণ ইহাদের উপর করভার পূর্ব হইতেই যথেষ্ট উচ্চ। আরও অধিক হারে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপর করধার্য করা হইলে এই শ্রেণীটির প্রসার রুদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে বিলোপ ঘটিবে যাহা কোনোমতেই কাম্য নয়।

যদি সরকার স্বয়ং বিনিয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া উন্নয়ন প্রবর্তন করিতে চায় তাহা হইলে ঘাটতি ব্যয় অপেক্ষা কর আদায় অধিকতর কাম্য। আবার দাম নিয়ন্ত্রণের মত প্রত্যক্ষ পদ্ধতির দ্বারা ভোগ সংকুচিত করা অপেক্ষা করধার্য বাঞ্ছনীয় কারণ পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে ক্রেতার স্বাধীনতা (consumer's sovereignty) ক্ষুণ্ণ হয় কিন্তু কর ব্যবস্থায় উহা অব্যাহত থাকে। ইহা ব্যতীত করের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সামর্থ অনুসারে উন্নয়নের ব্যয়ভার বহন করিতে বাধ্য করা যায়।

কর-ব্যবস্থার সাহায্যে এমনভাবে অর্থসংগ্রহ করিতে হইবে যাহাতে উন্নয়নের উপাদানগুলি সরকারী মালিকানায় আসে আবার বে-সরকারী বিনিয়োগের পথ সংকুচিত না হইয়া প্রশস্ততর হয়। শিল্পে পুনর্বিনিয়োজিত মূলধনের উপর কর অব্যাহতি দিলে বেসরকারী খাতে মূলধন গঠন উৎসাহিত হইবে এবং আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে। কর-ব্যবস্থা এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে ইহা সঞ্চয়ে উৎসাহ সৃষ্টি করে, ধনীদের বিলাসসামগ্রী ও অপ্রয়োজনীয় ভোগকে সংকুচিত করে এবং আয়বৈষম্য হ্রাস করে। দেশে উন্নয়নের ফলে যে আয় বৃদ্ধি পায় করের মাধ্যমে তাহার কিছু অংশ সরাইয়া না লইলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে ; করের সাহায্যে ব্যয়যোগ্য আয়ের (disposable income) পরিমাণ কমাইয়া মুদ্রাস্ফীতি জনিত ফাঁককে (inflationary gap) সংকুচিত করা যায়। প্রত্যক্ষ কর আয়-বৈষম্য দূর

করিতে এবং আদর্শ অনুযায়ী আয় বণ্টন করিতে পারে। অবশ্য শুধু মাত্র প্রত্যক্ষ করের উপর নির্ভর করিলে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করা সম্ভবপর নয় বলিয়া পরোক্ষ করও ধার্য করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ডাঃ ক্যালডর আয়করের পরিবর্তে ব্যয়কর স্থাপনই শ্রেয় বলিয়া মনে করেন কারণ ব্যয়কর স্থাপিত হইলে যথেচ্ছ ব্যয় কমিয়া যাইবে, এই কর স্থাপন করিলে লোকের অতিরিক্ত ব্যয় হ্রাস পাইবে ফলে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাইবে, অপরপক্ষে আয়কর ধার্য করিলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা জন্মিবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

অধ্যাপক **নার্কস** (Nurkse) বলেন অর্থোন্নত দেশে বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ **প্রদর্শন-প্রভাব** (demonstration effect)। উন্নত-দেশের অধিবাসীদের বিলাস সামগ্রীর ব্যবহার দেখিয়া অনুন্নত দেশের লোকের মনে উহা উপভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়, উহার ফলে বিদেশ হইতে ওই সকল বিলাস-সামগ্রী আমদানী করায় বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। বিলাসদ্রব্যের উপর উচ্চহারে করধার্য করিয়া বৈদেশিক মুদ্রার এই অপচয় বন্ধ করা যায়।

আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সংগ্রহের দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল ঋণ গ্রহণ করা। ঋণ গ্রহণ ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং উহা সংগ্রহের পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের উপর। উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ স্বভাবতই স্বল্প হইবে, এইজন্য প্রাথমিক অবস্থায় আভ্যন্তরীণ ঋণ-গ্রহণের মাধ্যমে খুব বেশী পরিমাণ অর্থসংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। অবশ্য সঞ্চয়ের প্রধান দুইটি উৎসের দ্রুত উন্নতির ফলে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ও আশু বৃদ্ধি পাইবে। উদ্যোক্তার মুনাফা হইল সঞ্চয়ের প্রধান উৎস। বে-সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র এরূপভাবে সম্প্রসারিত করিতে হইবে যাহাতে উদ্যোক্তরা অধিক মুনাফা অর্জন করিতে পারে। সমাজের অন্যশ্রেণীর লোক অপেক্ষা উদ্যোক্তাদের সঞ্চায়াকাঙ্ক্ষা অধিক প্রবল। সঞ্চয়ের দ্বিতীয় উৎস হইল কৃষি। উন্নয়নের সঙ্গে কৃষি উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে ইহার গুরুত্বও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এই গ্রামীন সঞ্চয় সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যাপকভাবে গ্রাম্য ব্যাংক স্থাপন করা এবং প্রচার কার্য চালানো প্রয়োজন।

ঋণ গ্রহণ

করধার্য বা ঋণগ্রহণ উভয়েরই মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তির আয়ের একটা অংশ সরাইয়া লওয়া যাহার ফলে ব্যক্তি বর্তমান ভোগ হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে এবং কম পরিমাণ সম্পদ ভোগ্যবস্তু উৎপাদনে এবং অধিক পরিমাণ সম্পদ মূলধনীদ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োজিত হইবে। করধার্যের একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হ্রাস পাইবে। তাই পুরাপুরি করের উপর নির্ভর না করিয়া ঋণগ্রহণ করাও প্রয়োজন হয়। জরুরী অবস্থায় স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয় ছাড়াও বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনার প্রবর্তন করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লর্ড কেন্‌স গ্রেট বৃটেনের জন্য এই বাধ্যতামূলক

বাধ্যতামূলক সঞ্চয়

সঞ্চয় পরিকল্পনার সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যক্তির আয় হইতে একটি নির্দিষ্ট অংশ সরকার বাধ্যতামূলকভাবে কাটিয়া লইবেন এবং যুদ্ধশেষে উহা ফেরত দেওয়া হইবে। ভারতেও ১৯৬৩ সালে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা চালু করা হয়, অবশ্য পরবৎসর উহা উঠাইয়া লওয়া হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে যে লাভ হয় তাহা মূলধন গঠনের একটি উৎস হইলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইহার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ অধিকাংশ অর্ধোন্নত দেশেরই বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল। দ্বিতীয়তঃ এই সকল দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণও অল্প। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রপ্তানী বাণিজ্য ভারতের জাতীয় আয়ের মাত্র ৯ ভাগ। বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে যে লাভ হয় তাহার দ্বারা সরাসরি যে দেশে মূলধন গঠিত হইবে এমন কোনো কথা নাই। বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে লাভকে মূলধন গঠনের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, অন্যথায় দেশে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে।

বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে লাভ

পরিশেষে, উন্নয়নের উদ্দেশ্যে মূলধন গঠনের নূতন এবং সর্বাধুনিক পদ্ধতি হইল ঘাটতি ব্যয়। মোট সরকারী ব্যয় মোট রাজস্ব অপেক্ষা অধিক হইলে বাজেট ঘাটতি হয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারকে ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে অথবা কাগজী নোট ছাপাইয়া অতিরিক্ত ব্যয় মিটাইতে হইবে। ইহাকে ঘাটতি ব্যয় বলে।

ঘাটতি ব্যয়

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে সরকার প্রতি বৎসরই আয়-ব্যয়ে সমতা রক্ষা করিয়া চলিবে। তাঁহাদের মতে বেসরকারী উদ্যোগেই দেশে পূর্ণ নিয়োগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তর বৃদ্ধি করিতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সমাজে পূর্ণ নিয়োগ নাই—সমাজে প্রচুর অব্যবহৃত সম্পদ রহিয়াছে। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের মতানুযায়ী ভোগ ও সঞ্চয় একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে পারে না—কারণ সমাজে পূর্ণ নিয়োগ বিদ্যমান। কিন্তু আধুনিক অপূর্ণনিয়োগ তত্ত্ব অনুসারে ভোগ এবং সঞ্চয় উভয়ই একসঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে পারে। যদি সমাজে পূর্ণনিয়োগ বহাল থাকে তাহা হইলেই শুধু ঘাটতি ব্যয়ের ফলে উৎপাদন, আয়, এবং নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে এবং মূল্যস্তর একই থাকিয়া যাইবে। কেন্‌সের মতে শুধুমাত্র বেসরকারী বিনিয়োগের ফলে পূর্ণ নিয়োগের অবস্থায় পৌছানো যায় না। সুতরাং অব্যবহৃত জনশক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগাইবার জন্য ঘাটতি ব্যয় সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। দেশে ব্যাপকভাবে বেকার সমস্যা দেখা দিলে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে সরকারকে ঘাটতি ব্যয় করিতে হইবে। কর ধার্য অপেক্ষা ঘাটতি ব্যয় শ্রেয় কারণ করের পরিমাণ সীমা ছাড়াইয়া গেলে উৎপাদন ব্যাহত হইতে পারে। অর্ধোন্নত দেশে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অভাব বলিয়া এই সকল দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ঘাটতি ব্যয় অপরিহার্য। কর ও ঋণের মাধ্যমে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয় বলিয়া এই সকল দেশে দ্রুত শিল্প ও কৃষির উন্নতি করিয়া

জাতীয় আয় বাড়াইতে হইলে ঘাটতি বাজেটের পথ অনুসরণ করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

ঘাটতি ব্যয়ের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল মুদ্রাস্ফীতির যুক্তি। একবার ঘাটতি ব্যয়ের অভ্যাস হইয়া গেলে সরকার আর উহা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে না ফলে সরকারী অমিতব্যয়িতা এবং পরিশেষে চরম মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা দেখা দিবে। একটু আধটু মদ্যপানের প্রভাব অসুস্থ শরীরের পক্ষে ভালো হইতে পারে। কিন্তু একবার যদি সংকোচ কাটিয়া যায় তাহা হইলে উহা অভ্যাসে রূপান্তরিত হইয়া মারাত্মক পরিণতি ঘটাইতে পারে। অতি সাবধানতা সহকারে ঘাটতি বাজেট করা প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন যে স্বল্প মুদ্রাস্ফীতি মোটেই অবাঞ্ছনীয় নয়, বরং দেশের উন্নয়নের জন্য উহা প্রয়োজন তিনটি কারণে। প্রথমতঃ, ইহা স্বল্প উৎপাদনশীল কাজ হইতে শ্রমিককে অধিক উৎপাদনশীল কাজে সরাইয়া লইয়া যায়। অধিক উৎপাদনশীল কাজে বেশী মজুরীর সম্ভাবনা থাকিলে শ্রমিক উহা গ্রহণ করিতে উৎসাহিত হইবে। যদি দাম স্থিতিশীল বা নিম্নমুখী হয় তাহা হইলে প্রান্তিক মুনাফা প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা কম হয় এবং অধিক মজুরি দেওয়া সম্ভবপর হয় না। এই জন্য মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ত, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলিকে সফল করিতে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি সহায়তা করিয়া থাকে। কৃষিজ দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করিয়া ইহা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণা যোগায়। তৃতীয়তঃ, মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি করিয়া মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধন গঠনে সহায়তা করে। ডাঃ ক্যালডরের মতানুসারে ভারত ৭৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঘাটতি ব্যয়ভার বহন করিতে পারিবে। প্রথম পরিকল্পনায় ৪২০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১২০০ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫৫০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। মূল্য স্তরের ঊর্ধ্বগতিরোধের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় কোনোরূপ ঘাটতি ব্যয় করা হইবে না বলা হইয়াছে।

হ্যারোড-ডোমার উন্নয়ন মডেল (Harrod-Domar Growth model) :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত করিতে হইলে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে। মূলধন বৃদ্ধির সহিত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘনিষ্টভাবে বিজড়িত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি সম্পর্কে বৃটিশ অর্থনীতিবিদ হ্যারোড ও মার্কিন অর্থনীতিবিদ ডোমার প্রদত্ত মডেলটি হ্যারোড-ডোমার মডেল নামে খ্যাত। মডেলটির সরলরূপ এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

ধরা যাক Y জাতীয় আয় এবং t সময় নির্দেশ করিতেছে। t_{-1} এবং t এই দুইটি সময়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি হইতেছে যথাক্রমে $Y_t - Y_{t-1}$ এবং ইহাকে ΔY দিয়া নির্দেশ করা যাক। আমরা এখন এই অভেদ (identity) পাইতেছি,

$$Y_t - Y_{t-1} = \Delta Y.$$

এখন যদি I_t দিয়া t সময়ে নীট বিনিয়োগ নির্দেশ করা হয় এবং $\frac{C}{O}$ যদি মূলধন-উৎপাদন অনুপাতের হার হয়, তাহা হইলে আমরা পাইতেছি

মডেলটির সরল রূপ

$$\Delta Y = I_t \times \frac{O}{C} \cdots\cdots\cdots\cdots(1)$$

$\frac{O}{C}$ হইল উৎপাদনশীলতার অনুপাত (productivity ratio) এবং ইহা মূলধন-উৎপাদন অনুপাত $\frac{C}{O}$ এর বিপরীত। দুইটি সময়ান্তরে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি নীট বিনিয়োগ I_t এবং উৎপাদনশীলতার হারের সমান।

এখন, এই সমীকরণের উভয় দিককে Y_t দিয়া ভাগ করিলে আমরা পাইব

$$\frac{\Delta Y}{Y_t} = \frac{1}{Y_t} \times I_t \times \frac{O}{C}$$

$$= \frac{I_t}{Y_t} \times \frac{O}{C} \cdots\cdots\cdots(2)$$

এখন $\frac{\Delta Y}{Y_t}$ ইহা দেশের উৎপাদনের গতি নির্ধারণ করিতেছে—ইহাকে G দ্বারা দেখানো যাইতে পারে; তাহা হইলে দ্বিতীয় সমীকরণটিকে আমরা এইভাবে লিখিতে পারি :

$$G = \frac{I_t}{Y_t} \times \frac{O}{C} \cdots\cdots\cdots(3)$$

কিন্তু যেহেতু বিনিয়োগ (I_t) সর্বদাই সেই সময়ের সঞ্চয়ের (S_t) সমান, তাই আমরা তৃতীয় সমীকরণটিতে এইভাবে লিখিতে পারি :

$$G = \frac{S_t}{Y_t} \times \frac{O}{C} \cdots\cdots\cdots(4)$$

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সঞ্চয়-আয়ের অনুপাত $\left(\frac{S_t}{Y_t}\right)$ এবং উৎপাদনশীলতার অনুপাতের $\left(\frac{O}{C}\right)$ উপর নির্ভরশীল। উৎপাদনশীলতার অনুপাত একই থাকিলে, আয়ের তুলনায় সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে।

এই মডেলটি নিম্নলিখিত অনুমানগুলির উপর নির্ভরশীল :

(১) সঞ্চয় আয়ের উপর নির্ভরশীল ;

(২) বিনিয়োগ আয়বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল ;

(৩) মূলধন-উৎপাদন অনুপাত সমান ;

(৪) গড় এবং প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা সমান।

মডেলটি কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে হ্যারোড-ডোমার ফরমূলা যে কোনো পরিকল্পনা পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যায় না। যদি ভারসাম্য পরিকল্পনা পদ্ধতি (Planning with Balanced Growth) গ্রহণ করা হয় তাহা হইলেই শুধু হ্যারোড-ডোমার টেকনিক ব্যবহারযোগ্য ; কিন্তু যদি সমতাহীন পরিকল্পনা পদ্ধতি (Planning with Unbalanced Growth) গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে এই টেকনিক প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয়। ভারসাম্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ভোগ, বিনিয়োগ এবং আয় একই হারে বৃদ্ধি পায়, ফলে সঞ্চয়-আয় অনুপাত এবং মূলধন-উৎপাদন অনুপাত সব সময়ই একরূপ থাকে এবং এই অবস্থায় আমরা এই ফরমূলা প্রয়োগ করিতে পারি।

উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায় (Stages of Growth) : অধ্যাপক রোস্টো (Rostow) অর্থনৈতিক উন্নয়নকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন :

(1) অচলাবস্থা (Stagnant Situation), (2) ঊর্ধ্বগমনের পূর্বাবস্থা (Preconditions to take off), (3) ঊর্ধ্বগমন (Take off), (4) স্বয়ংনির্ভরশীল পর্যায় (Self-sustaining Stage) এবং (5) বৃহদায়তন ভোগ পর্যায় (Stage of Large Scale Mass Consumption).

উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে দেশটি আদিম অবস্থায় থাকে এবং উন্নয়নের কোনোরূপ প্রচেষ্টা নাই। দেশের সরকার কোনোরূপ পরিবর্তনের পক্ষপাতী নন।

উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সবেমাত্র সুরু হইয়াছে। এই পর্যায়ের তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয় ; প্রথমতঃ দেশে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের হার শতকরা ৫ ভাগ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ১০ ভাগ বা কিছু বেশী হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দুই-একটি মূল শিল্পের উন্নয়ন সুরু হইয়াছে এবং তৃতীয়তঃ উন্নয়নের অনুকূল রাজনৈতিক এবং সামাজিক চেতনা ও সংগঠনের সৃষ্টি হইয়াছে।

উন্নয়নের তৃতীয় পর্যায়ে বিনিয়োগের হার এরূপ বৃদ্ধি পায় যে মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এই পর্যায়ে সাধারণতঃ উৎপাদন-কৌশলে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা যায়।

এই পর্যায়ে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় আয়ের শতকরা ১৪ ভাগে আসিয়া দাঁড়ায়। রোস্টর মতে ঊর্ধ্বগমন পর্যায় ১৫ হইতে ২৫ বৎসরকাল স্থায়ী হয়, অবশ্য অর্ধোন্নত দেশ সুচিন্তিত উন্নয়নী কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া এই পর্যায়কে সংক্ষেপ করিতে পারে। ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন বর্তমানে এই পর্যায়ে রহিয়াছে।

১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতে বিনিয়োগের পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা ১৪ ভাগে আসিয়া দাঁড়ায়।

ঊর্ধ্বগমনের পর্যায় হইতে দেশটি ধীরে ধীরে পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ স্বয়ংনির্ভরশীল পর্যায়ে আসিয়া পৌছায়। এই অবস্থায় আসিয়া পৌছিলে দেশটি বৈদেশিক সাহায্য এবং মূলধন ব্যতিরেকেই তাহার উন্নয়নী কর্মসূচীকে রূপায়িত করিতে পারিবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের চরম পর্যায় হইল বৃহদায়তন ভোগ পর্যায়। এই অবস্থায় দেশটির উৎপাদন ক্ষমতা এরূপ বৃদ্ধি পাইবে যে উচ্চ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিতে যে পরিমাণ ভোগ্যবস্তুর প্রয়োজন তাহা দেশেই উৎপাদিত হইবে। উন্নয়নকামী সকল দেশই এই চরম পর্যায় আসিবার জন্য প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ

(Natural Resources and Environment)

[বিষয়বস্তু : মৌসুমীবায় ও ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—ভারতের মৃত্তিকা—ভারতের জলসেচ ব্যবস্থা—জলকর সমস্যা—ভূমিক্ষয়—কৃষিজ সম্পদ—কৃষি উৎপাদন ও কৃষিনীতি—দামনীতি ও তৃতীয় পরিকল্পনা—শক্তিসম্পদ—খনিজ সম্পদ—বনসম্পদ ও সরকারের বননীতি—মৎস্য চাষ]

মৌসুমী বায়ু ও ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (The Monsoons and the Indian Economy) : ভারতে বৃষ্টিপাতের জন্য দায়ী মৌসুমী বায়ু। মৌসিম শব্দের অর্থ ঋতু। ঋতু-পরিবর্তনের সহিত এই বায়ুর গতি পরিবর্তন হয় বলিয়া ইহাকে মৌসুমী বায়ু বলে। এই বায়ু দুই দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহার দুইটি নাম—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু।

দুই ধরণের মৌসুমী বায়ু

জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ভারতের উপর প্রবাহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই বায়ুপ্রবাহই ভারতে বৃষ্টিপাতের প্রধান কারণ। বৎসরে সারা ভারতে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় তাহার $\frac{9}{10}$ ভাগ এই বায়ুপ্রবাহ দ্বারাই হইয়া থাকে এবং ভারতের $\frac{4}{5}$ অংশের উন্নতির কারণও এই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর দুইটি শাখা; ইহার একটি আরব সাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে এবং বোম্বাই, পাঞ্জাব ও মধ্যভারতে বৃষ্টিপাত ঘটায়। অপর শাখাটি বঙ্গোপসাগরের

মৌসুমী বায়ুর গুরুত্ব

উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে এবং আসাম, বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার উপর প্রচুর বারিবর্ষণ করে।

উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু শীতকালে প্রবাহিত হয়। ইহা উত্তর-পূর্ব দিক হইতে আসে কিন্তু ওই অঞ্চল স্থলভূমি বলিয়া উহাতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অতি সামান্য থাকে এবং অতি সামান্যই বৃষ্টিপাত হয়। এই বায়ু অবশ্য বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে এবং মাদ্রাজের উপকূল ও সিংহলে শীতকালে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

মৌসুমী বায়ুর বৈশিষ্ট্য : অনিশ্চয়তা ও অসমবণ্টন

এই মৌসুমী বৃষ্টিপাতের দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, ইহার অনিশ্চয়তা; ঠিক সময়ে যে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইবে ইহার কোনো নিশ্চয়তা নাই—ইহা কখনো দেরীতে আবার কখনো নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই প্রবাহিত হইতে পারে। বৃষ্টিপাত বিলম্বে বা পূর্বে হইলে শস্যের পক্ষে ক্ষতি হইতে পারে। আবার অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি উভয়ই শস্যের পক্ষে হানিকর। দ্বিতীয়তঃ সারাদেশে বৃষ্টিপাতের বণ্টন অসমান। আসাম ও ব্রহ্মদেশে বৃষ্টিপাত খুবই বেশী হয়। আসামের অন্তর্গত চেরাপুঞ্জিতে বৎসরে ৫০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে বৃষ্টিপাত খুবই কম।

বৃষ্টিপাত ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। আজও ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা মৌসুমী বায়ুর খামখেয়ালীর উপর নির্ভরশীল। কৃষির জন্য জলের প্রয়োজন। এই জল সংগ্রহের দুইটি উৎস আছে—জলসেচ এবং বৃষ্টিপাত। কিন্তু ভারতে জলসেচ ব্যবস্থা বিশেষ উন্নত নয়—মোট কর্ষিত জমির ২০ ভাগ মাত্র জল সেচের সুবিধা লাভ করে—বাকী অংশকে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিতে হয়। বৃষ্টিপাত না হইলে ফসল হইবে না, আবার পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হইলে দেশে প্রভূত ফসল উৎপাদিত হইবে এবং কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

ভারতের জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৮ ভাগ আসে কৃষি হইতে। কৃষি-উৎপাদন ব্যাহত হইলে জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে এবং ইহার প্রভাব শিল্প, পরিবহণ, সরকারী বাজেট সকল কিছুর মধ্যেই প্রতিফলিত হইবে।

পরোক্ষ প্রভাব

ভারত পাট, তুলা, চা, তৈলবীজ ইত্যাদি রপ্তানী করে। যদি বৃষ্টিপাত ভালো হয় ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে যদি বৃষ্টিপাত না হয় তাহা হইলে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। বৃষ্টিপাত ভালো হইলে, ভালো ফসল হইবে। কৃষকের আয় বাড়িবে, কৃষকের আয় বাড়ায় তাহারা অধিক পরিমাণ শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। কৃষকের আয় বাড়ায় সে যথাসময়ে ভূমি-রাজস্ব দিবে ফলে সরকারের আয় বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে দেশের সকল স্তরে মৌসুমী বায়ুর পরোক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ভারতের মৃত্তিকা (Soils of India) : ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ এবং এই দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। গুণের তারতম্য অনুসারে ভারতের মৃত্তিকাকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

[এক] পলি মৃত্তিকা (Alluvial Soil) : গাঙ্গেয় সমভূমি এবং গঙ্গা যমুনার অববাহিকা অঞ্চল পলিমৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। নদীর গতিপথে বহুদিন ধরিয়া তলানি সঞ্চিত হইয়া যে মৃত্তিকা গঠিত হয় তাহাকে পলিমৃত্তিকা বলে। দক্ষিণ ভারতের পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাটের উপকূল অঞ্চল এই মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। গাঙ্গেয় ভূমির পলিমাটি হিমালয়ের নানাপ্রকার শিলাচূর্ণের মিশ্রণে সংগঠিত কিন্তু এই মাটিতে নাইট্রেটের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই ধরণের মাটি কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সহজেই ইহাতে চাষ করিতে পারা যায়। ভারতের পলিমাটি গঠিত মোট ভূমির পরিমাণ ৩০০,০০০ বর্গমাইল। এই মৃত্তিকায় ধান, পাট, ভুট্টা, ইক্ষু, কার্পাস, গম ইত্যাদি জন্মায়।

কৃষির উপযোগী

[দুই] কৃষ্ণ মৃত্তিকা (Black Soil) : দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তর-পশ্চিমাংশ কৃষ্ণমৃত্তিকার দ্বারা গঠিত। প্রাচীন আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত লাভার ক্ষয়াবশেষ হইতে এই মৃত্তিকার সৃষ্টি হইয়াছে। তুলা চাষের বিশেষ উপযোগী বলিয়া ইহাকে কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা (Black Cotton Soil) বলিয়াও অভিহিত করা হয়। এই মৃত্তিকা খুবই উর্বর এবং ইহার আর্দ্রতা রক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে। লৌহ ও চুণের ভাগ এই মৃত্তিকায় বেশী।

তুলা চাষের উপযোগী

[তিন] লাল মৃত্তিকা (Red Soil) : দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, মহীশূর, অন্ধ্র এবং বোম্বাইয়ের দক্ষিণাংশে এই মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া উত্তর ভারতের অন্তর্গত কয়েকটি অঞ্চলে যেমন বিহারের সাঁওতাল পরগণা, উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি অঞ্চল এবং পশ্চিমবাংলার বীরভূম দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এই ধরণের মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকায় লৌহের পরিমাণ খুব বেশী থাকায় ইহা দেখিতে লাল হয়। শস্য উৎপাদনের পক্ষে এই মৃত্তিকা বিশেষ উপযোগী নহে।

চাষের পক্ষে অনুপোযোগী

[চার] পাথুরে মাটি (Laterite Soil) : সাধারণতঃ উচ্চভূমি ও মালভূমিতে এই ধরণের মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রখর সূর্যতাপ এবং প্রবল বারিবর্ষণের ফলে এই ধরণের মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। কোথাও কোথাও ইহা দেখিতে লাল হয়। আসাম, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত ও হিমালয়ের উচ্চ অঞ্চলে এই ধরণের মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকায় উদ্ভিদের খাদ্য বিশেষ নাই ফলে ইহা সাধারণতঃ অনুর্বর। বেশীর ভাগ পাথুরে মাটি অঞ্চল সাধারণতঃ চারণভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অনুর্বর

[পাঁচ] মরু মৃত্তিকা (Desert Soil) : এই ধরণের মৃত্তিকা রাজস্থান ও

পূর্ব পাঞ্জাবের কিছু কিছু অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল রাসায়নিক পদার্থ থাকিলে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায় সেগুলির কিছুই এই ধরণের মৃত্তিকায় থাকে না বলিয়া এই মৃত্তিকায় ফসল জন্মায় না। ইহা বালুকাময় এবং অনুর্বর। কৃষির জন্য এই ধরণের মাটি সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত।

চাযের পক্ষে অনুপোযোগী

[ছয়] **উপকূলীয় নোনা মৃত্তিকা (Saline Soil):** অনেক ক্ষেত্রে উপকূলের মৃত্তিকা সমুদ্রের জলে প্লাবিত হয়, ফলে মৃত্তিকায় লবণের ভাগ বাড়িয়া যায়। সুন্দরী, গর্জন, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ এই ধরণের মৃত্তিকায় দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

ভারতের জলসেচ ব্যবস্থা (Irrigation System in India): ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষিকার্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জলের প্রয়োজন। ভারতের মাটি ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত। মৃত্তিকার ক্ষুধা মিটাইবার জন্য সার এবং তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন কিন্তু ভারতে বৃষ্টিপাত নানাদিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমতঃ ভারতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের ফলে কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালেই বৃষ্টিপাত হয়। শীতকাল সাধারণতঃ শুষ্ক থাকে। শীতকালে রবিশস্য উৎপাদন করিতে হইলে বৃষ্টিপাতের অভাব নিবারণের জন্যই কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ভারতের সর্বত্র সমপরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় না। কোনো কোন স্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়; যেমন আসাম, আবার কোনো কোনো স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অতি অল্প; যেমন রাজপুতনায় বৎসরে ৪" বৃষ্টিপাত হয়। তৃতীয়তঃ, ভারতে কোনো কোনো বৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় আবার কোনো কোনো বৎসর বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক কারণে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে ফসল উৎপাদন করা যাইবে না। চতুর্থতঃ, ধান, আখ, পাট প্রভৃতি কতকগুলি ফসলের জন্য নিয়মিত প্রচুর জলের প্রয়োজন। সেই কারণেও কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভারতীয় কৃষিকে প্রাকৃতিক জুয়াখেলার হাত হইতে বাঁচাইয়া উহাকে সম্প্রসারিত এবং সমৃদ্ধতর করিতে হইলে সেচব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ট্রেভেলিয়ান যথার্থই বলিয়াছেন যে ভারতে সেচই সব; জল এখানে জমি অপেক্ষা মূল্যবান। ভারতে মোট আবাদী জমির মাত্র ২০ ভাগ সেচের সুবিধা পাইয়া থাকে।

জলসেচের প্রয়োজনীয়তা

জলসেচ ব্যবস্থার প্রসারে ভারতের কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধা রহিয়াছে। প্রথমতঃ, উত্তর ভারতের নদীগুলি তুষারগলা জলের দ্বারা পরিপুষ্ট, সেই কারণে সারা বৎসরই নদীতে জল থাকে। দ্বিতীয়তঃ, সমভূমি অঞ্চল স্বভাবতঃই ঢালু বলিয়া উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থানে খাল-নালা সহযোগে জলসেচের বহু সুবিধা রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, ভারতের ভূত্বক সাধারণতঃ পলিমাটির দ্বারা গঠিত বলিয়া খাল অথবা কূপ খনন কষ্টকর এবং ব্যয়সাধ্য হয় না।

ভারতে সাধারণতঃ চার উপায়ে জলসেচ করা হইয়া থাকে—কূপ, নলকূপ, পুষ্করিণী এবং খাল।

[এক] কূপ (Wells) : কূপের ব্যবহার ভারতের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যাইলেও, যুক্তপ্রদেশের স্থানে স্থানে, দক্ষিণ-বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে কূপের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী। ভারতের মোট জলসিঞ্চিত জমির ২৫ ভাগ কূপের সাহায্যে জলসিক্ত হইয়া থাকে। কূপের কতকগুলি সুবিধা রহিয়াছে। প্রথমতঃ, কূপ হইতে জলসেচের ব্যবস্থা করা অন্য সকল সেচব্যবস্থা অপেক্ষা অল্প ব্যয়সাধ্য এবং কৃষকের আয়ত্তাধীন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের মাটি কূপ খননের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ভূত্বক অধিকাংশ স্থলেই পলিমাটি গঠিত হওয়ায় এবং অভ্যন্তরে কর্দমস্তর থাকায় অল্প গভীর কূপ খনন করিলেই জল পাওয়া যায়। কিন্তু কূপ ব্যবহারের কতকগুলি অসুবিধাও রহিয়াছে। প্রথমতঃ, গভীর কূপ হইতে জল উত্তোলন বিশেষ পরিশ্রমের ব্যাপার এবং কূপের জলের দ্বারা দূরবর্তী অঞ্চলে জলসেচ করা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়তঃ, বহু স্থানে কূপের জল লবণাক্ত। এই লবণাক্ত জল শস্যের পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকারক। তৃতীয়তঃ, গ্রীষ্মকালে অগভীর কূপগুলি শুকাইয়া যায়, আবার একই কূপ হইতে বেশীদিন ধরিয়া জল তুলিতে থাকিলে কূপের জল কমিয়া যায়। সম্প্রতি সরকারী প্রচেষ্টায় অল্প ব্যয়ে কূপ-খননের ব্যবস্থা করা হইতেছে। কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য ছোট ছোট যন্ত্রচালিত পাম্প সরকার হইতে ন্যায্য মূল্যে কৃষকদিগকে যোগান দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কূপের সুবিধা

অসুবিধা

[দুই] নলকূপ (Tube wells) : অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নলকূপের সাহায্যে জলসেচের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কূপ শুকাইয়া যাইতে পারে কিন্তু নলকূপ হইতে সারা বৎসর নিয়মিত এবং পরিমিত জল সরবরাহের আশা করা যায়। এই ধরণের নলকূপের সংখ্যা যুক্তপ্রদেশেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম পরিকল্পনাকালে ভারতে সেচকার্যের জন্য ২৫০০ নলকূপ ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় ৬ লক্ষ একর এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আরও ৯ লক্ষ একর জমিতে নলকূপের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সারা বৎসর জল পাওয়া যায়

[তিন] পুষ্করিণী (Tanks) : অতি প্রাচীনকাল হইতেই পুষ্করিণীর সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায় বলিয়া নদীর বক্ষে বাঁধ দিয়া পুষ্করিণী তৈয়ারী করা হয়। পরে প্রয়োজনানুসারে ওই জলাশয় হইতে খাল কাটিয়া শস্যক্ষেত্রে সেচন করা হয়। এই ধরণের পুষ্করিণী নির্মাণ করিয়া জলসেচ মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। মাদ্রাজ ও অন্ধ্ররাজ্যে প্রায় ৪০,০০০ পুষ্করিণী রহিয়াছে এবং বর্তমানে ১ কোটি ১০ লক্ষ

একর জমিতে পুষ্করিণীর সাহায্যে জলসেচ হইয়া থাকে। পুষ্করিণীর সাহায্যে জলসেচের দুইটি অসুবিধা রহিয়াছে—প্রথমতঃ গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণীগুলি শুকাইয়া যায় এবং যে বৎসর বৃষ্টিপাত হয় না সেই বৎসর পুষ্করিণীগুলি জলশূন্য থাকে। দ্বিতীয়তঃ, কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই পুষ্করিণীগুলি ভরাট হইয়া ওঠে বলিয়া প্রতি বৎসরেই এগুলিকে সংস্কার করিতে হয়। মোট জলসিঞ্চিত জমির ১০ ভাগ পুষ্করিণীর দ্বারা জলসিঞ্চিত হইয়া থাকে। কূপ, নলকূপ এবং পুষ্করিণী এই তিন প্রকার সেচ পদ্ধতিকে পরিকল্পনা কমিশন অপ্রধান সেচকার্য (minor irrigation works) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

পুষ্করিণীর অসুবিধা

[চার] খাল (Canals) : সব দিক হইতে বিচার করিয়া বলা যায় খালই সেচের শ্রেষ্ঠ উপায়। ১৯৫৬ সালে খালের জল দ্বারা ২ কোটি ৩২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। খাল সাধারণতঃ সরকারী টাকায় কাটা হয়। বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে খাল দ্বারাই জলসেচ হইয়া থাকে। ভারতে তিন ধরনের খাল আছে—প্লাবন খাল (Innundation canal), নিত্যবহ খাল (Perennial canal) এবং সঞ্চিত জলের খাল (Storage canal) ; বর্ষায় নদীতে জলবৃদ্ধি অথবা প্লাবন হওয়ার ফলে যে সকল খালে জল প্রবেশ করে সেগুলিকে প্লাবন খাল বলে। প্লাবন খালের অসুবিধা এই যে শীতকালে নদীর জল কমিয়া গেলে এই সকল খালের জল শুকাইয়া যায় এবং সেই সময় উহাদের সাহায্যে জলসেচ কার্য চলে না। বর্তমানে প্লাবন খালগুলিকে স্থায়ী খালে পরিণত করার চেষ্টা চলিতেছে। যেখানে নদী পর্বত হইতে সমভূমিতে প্রবেশ করে সেই স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া জলের উচ্চতাকে বাড়াইয়া নিত্যবহ খালের সৃষ্টি করা হয়। নদী হইতে খাল কাটিয়া বহুদূরে এই সঞ্চিত জলরাশি লইয়া যাওয়া হয়। বাঁধ হইতে প্রয়োজনমত জল ছাড়িবার ও বন্ধ করিবার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে এবং মূল খালের অনেক শাখা প্রশাখা থাকে। অনেক সময় উপত্যকায় বাঁধ বাঁধিয়া জলকে আটকাইয়া সঞ্চয় করিয়া রাখা হয় এবং পরে প্রয়োজনমত খাল কাটিয়া ওই জল শস্যক্ষেত্রে সেচন করা হয়।

তিন ধরনের খাল: প্লাবন নিত্যবহ ও সঞ্চিত।

দক্ষিণ ভারতে জলসেচ খালের সংখ্যা কম। গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর ব-দ্বীপেই প্রধানতঃ খাল কাটিয়া জলসেচন হয়। কিছুদিন পূর্বে কাবেরী নদীর উচ্চাংশে মেটার নামক স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া তাঞ্জোর ও ত্রিচিনাপল্লীর অংশবিশেষে জলসেচনের সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাদ্রাজের পেরিয়ার খাল উল্লেখযোগ্য। পেরিয়ার পশ্চিম ঘাটের পশ্চিমে প্রবাহিত একটি নদী। এই নদীর পূর্বে কোনো উপকারিতা ছিল না। এখন পশ্চিমঘাট পর্বতের ভিতর দিয়া খাল কাটিয়া এই নদীর জল পশ্চিমঘাটের পূর্বদিকে আনিয়া একটি কৃত্রিম হ্রদে সঞ্চিত করা হয় এবং তাহার দ্বারা ৩০০০ বর্গ মাইল স্থানে জলসেচন হইতেছে।

খালগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—প্রধান (Major) এবং অ-প্রধান (Minor); আবার প্রধান খালগুলি দুই প্রকারের হইতে পারে— উৎপাদনশীল (Productive) এবং দুর্ভিক্ষরোধকারী (Protective)। যে খালগুলি তৈয়ারী হইবার দশ বৎসরের মধ্যে নিয়োজিত মূলধনের সুদ এবং পরিচালন খরচ তুলিতে পারে তাহাকে উৎপাদনশীল খাল বলে। আর যে খালগুলি দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য নির্মিত হইয়াছে এবং যাহাদের নির্মাণ খরচ রাজস্ব হইতে লওয়া হইয়াছে তাহাদের দুর্ভিক্ষরোধ-কারী খাল বলা হয়।

প্রধান ও অপ্রধান খাল

উৎপাদনশীল ও দুর্ভিক্ষ-রোধকারী খাল

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেচ ব্যবস্থা প্রসারে জন্য ৩৪০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৩৮১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মাঝারি ধরণের সেচ ব্যবস্থার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জলসেচ ব্যবস্থার জন্য ৬৬১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় জলসেচ ব্যবস্থা এক-তৃতীয়াংশে বৃদ্ধি করার লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় সেচব্যবস্থার জন্য সরকারী খাতে ৯৬৪ কোটি টাকা ধার্য করা হইয়াছে।

পরিকল্পনায় সেচবাবদ ব্যয়

সেচ পরিকল্পনার কতকগুলি ত্রুটি রহিয়াছে। প্রথমতঃ সেচ কার্যে ব্যয়ের জন্য উচ্চহারে জলকর বসানো হইতেছে। যুক্তি দেখানো হয় যে উচ্চহারে জলকর বসাইলে কৃষক ফসল বাড়াইতে যত্নবান হইবে। কিন্তু এই যুক্তি আংশিক সত্য। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে উৎপাদনের কতখানি অংশ কৃষকের প্রাপ্য সে সম্বন্ধে সরকারের সুস্পষ্ট নীতি থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ সেচ-ব্যবস্থা প্রসারিত করিতে বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ এবং ইঞ্জিনীয়ার লইয়া আসা হইতেছে, ফলে দেশের বহু অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। দেশের মধ্যেই এই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। তৃতীয়তঃ শুধুমাত্র জল সরবরাহ করিলেই চলিবে না, কৃষককে জলের ব্যবহারও শিখাইতে হইবে।

কতকগুলি অসুবিধা

জলকর সমস্যা (Problem of Irrigation Tax): জলসেচ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য সরকারকে তিনটি নীতির যে কোনো একটি মাপকাটি লইয়া জলকর ধার্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ সেচব্যবস্থার ফলে জমির দাম কতখানি বাড়িল সেই হিসাবানুযায়ী জলকর ধার্য করা যায়। দ্বিতীয়তঃ পার্শ্ববর্তী শুষ্ক জমিতে ফসল উৎপাদনের ব্যয় এবং পরিমাণের সহিত জলসিঞ্চিত জমিতে ফসল উৎপাদনের ব্যয় এবং পরিমাণের তুলনামূলক হিসাব করিয়া জলসেচজনিত লাভ বাহির করা যায়। তৃতীয়তঃ, কৃষকের কর দেওয়ার ক্ষমতার (ability to pay taxes) কথা চিন্তা করিয়া জলকর ধার্য করা যায়। আমাদের মনে হয় প্রথম নীতি অনুসারে অথবা প্রথম এবং তৃতীয় এই দুই নীতি মিলিত করিয়া সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে জলকর বসানো প্রয়োজন।

জলকর ধার্যের তিনটি নীতি

ভূমিক্ষয় (Soil Erosion) : সংকীর্ণ অর্থে ভূমি সংরক্ষণ (Soil Conservation) বলিতে ভূমিক্ষয় নিবারণ বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে ভূমি সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় জমিতে সার ব্যবহার, জলসেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা, পাল্টা শস্যের রোপণ করিয়া জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।* ভূমিক্ষয়ের দরুণ ভারতের বিশাল অঞ্চল কৃষিকার্যের অনুপোযোগী হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্যা পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশে গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে।

ভূমি সংরক্ষণ

ভূমিক্ষয় এবং জমির উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাসের বহুপ্রকার কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, বহুদিন ধরিয়া কৃষিকার্য চলিতে থাকিলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়। ভূমির উর্বরতা রক্ষার জন্য সার প্রদান করিয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা মানুষের কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, অরণ্যভূমি এবং উদ্ভিজ্জের যথেচ্ছ ধ্বংস সাধন ভূমিক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ। বৃক্ষ এবং উদ্ভিজ্জ বায়ু এবং বৃষ্টির বেগ ধারণ করে ফলে ভূমির উপরিস্থিত ত্বকটি বায়ুপ্রবাহ বা বৃষ্টিপ্রবাহে নষ্ট হইয়া যায় না। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে উপজাতীয় লোকেরা যে পরিবর্তনকারী চাষ (shifting cultivation) করিয়া থাকে তাহার ফলেও বনভূমির ধ্বংস সাধন হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, অবাধ পশুচারণের ফলে ভূমিক্ষয় ঘটিয়া থাকে। গবাদি পশু লতাগুল্মাদি ধ্বংস করিয়া ফেলে বলিয়া ভূমিভাগের উপরিস্থিত ত্বকটি বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাতের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। চতুর্থতঃ, জমির ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যও ভূমিক্ষয় হইয়া থাকে। কখনো কখনো ঢালু জমিতে ঠিকমত বাঁধ না দিয়াই চাষ করা হয় ফলে বৃষ্টিপাতের দ্বারা উপরের ভূত্বকের উপরিভাগ নীচে ধুইয়া যায়।

ভূমিক্ষয়ের কারণসমূহ

সাধারণতঃ তিন ধরণের ভূমিক্ষয় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, ত্বকক্ষয় (Sheet erosion)—ভূমির রাসায়নিক গুণসমন্বিত উপরের ত্বকটি বৃষ্টির জলে ধুইয়া যাইতে পারে। এই ধরণের ত্বকক্ষয় সামান্য ঢালু জমিতেও হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, বৃষ্টিপাতজনিত খাদক্ষয় (Gully erosion)—বৃষ্টির জল ঢালু জমি দিয়া গড়াইয়া এই ধরণের খাদক্ষয়ের সৃষ্টি করে। বহুদিন ধরিয়া ত্বকক্ষয় অবাধে চলিতে থাকিলে এই ধরণের খাদক্ষয় দেখা দেয়। কখনো কখনো কুলপ্লাবনকারী নদী উভয় তীরের নিকটবর্তী অঞ্চলে এই ধরণের খাদক্ষয় সৃষ্টি করে। তৃতীয়তঃ, বায়ুতাড়িত ভূমিক্ষয় (Wind erosion)—মরু অঞ্চলের বালুকা বায়ুতাড়িত হইয়া পার্শ্ববর্তী এলাকা গ্রাস করিয়া ফেলে। রাজস্থান এবং পাঞ্জাবে এইভাবে রাজপুতনার মরুভূমি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

তিন ধরণের ভূমিক্ষয়

* "Soil conservation in its widest sense includes not only control over erosion but all those measures like correction of soil defects, application of manures and fertilizers, proper crop rotations, irrigation, drainage etc., which aim at maintaining the productivity of the soil at a high level." First Five Year *Plan*.

ভূমিক্ষয় মারাত্মকভাবে ক্ষতিকারক। ইহাকে "অলক্ষিত মৃত্যু" বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ভূমিক্ষয়ের ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হয়। জমি বৃক্ষগুল্মাদিশূন্য হয় এবং জনসাধারণ দারিদ্র্যের কবলে পতিত হয়। ইহার ফলে দেশের অংশ মরুভূমিতে পরিণত হয়। সমগ্র ভারতে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ এবং প্রকৃতি এখনো নির্ধারণ করা হয় নাই ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়। সাম্প্রতিক-কালে সীমানা-বাঁধ, জমিকে উচ্চ সমভূমিতে পরিণত করা, বনমহোৎসব এবং পার্বত্য-অঞ্চলে বৃষ্টির জল নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির দ্বারা ভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ইহার মারাত্মক কুফল

ভূমিক্ষয় নিবারণের প্রধান প্রতিকার হইল বৃক্ষরোপণ। বৃক্ষের শিকড় ভূমিকে রক্ষা করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, অবাধ পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, সমতলভূমিতে এবং ঢালু জমির মধ্যভাগে বাঁধ না দিয়া সীমান্তে বাঁধ বাঁধিয়া জমি চাষ করিলে ভূমিক্ষয় নিবারণে সহায়তা হইবে।

প্রতিকার : বৃক্ষরোপণ

ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন কর্মসূচীর সুপারিশ করিয়াছেন। ইহার মতে, প্রত্যেক রাজ্য প্রয়োজনীয় ভূমিসংরক্ষণ আইন পাশ করিবে। ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা জরিপ করিতে হইবে এবং ভূমি সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

পরিকল্পনা কমিশনের মতে ভূমিক্ষয়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার আয়তন প্রায় ২০০ মিলিয়ন একর জমির মতো। প্রথম পরিকল্পনায় মোট ৭ লক্ষ একর কৃষিজমিতে ভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আটটি গবেষণা ও প্রদর্শন কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল ভূমিসমস্যা লইয়া আলোচনার উদ্দেশ্যে। ইহা ছাড়া মরু সমস্যা লইয়া গবেষণার জন্য যোধপুরে গবেষণা স্টেশন স্থাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২০ লক্ষ একর কৃষিজমিতে ভূমি-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় এক কোটি দশ লক্ষ একর কৃষি-জমিতে ভূমিসংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

পরিকল্পনাধীন সময়ে ভূমিসংরক্ষণের ব্যবস্থা

যোধপুরের রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট মরু অঞ্চল এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যা লইয়া গবেষণা করিতেছে। একলক্ষ একর মরুভূমির জমিতে বন এবং চারণক্ষেত্র সৃষ্টির প্রস্তাব করা হইয়াছে। পার্বত্য এলাকা, পতিত জমি এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বনভূমি বিশেষ সমস্যার কারণ। এইসব অঞ্চলে ভূমিক্ষয় পার্বত্য এলাকা এবং সমভূমির কৃষির পক্ষে ক্ষতিকারক। অতিরিক্ত পশুচারণ, পরিবর্তনকারী চাষ এবং যথেচ্ছভাবে বনভূমির ধ্বংসের ফলে এই অবস্থায় সৃষ্টি হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৫ মিলিয়ন একর জমি জরিপ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যে সকল অঞ্চলে নদী উপত্যকা পরিকল্পনা সুরু করা হইয়াছে—যেমন দামোদর পরিকল্পনা—ওই অঞ্চলের ভূমিক্ষয়ের ফলে বাঁধের আয়ুষ্কাল হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকার ফলে এই পরিকল্পনাগুলিকে সংরক্ষণের জন্য বহু ব্যয় করিতে হইতেছে। নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় ভূমি সংরক্ষণের গুরুত্বের কথা ভাবিয়া প্রতি রাজ্যে একটি করিয়া ভূমি সংরক্ষণ সংগঠন স্থাপন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ভূমি সংরক্ষণ বোর্ড কর্তৃক

দেরাদুন, চণ্ডিগড়, কোটা, ভাসাদ, আগ্রা, বেলারী, উতকামন্দ, চাত্রা এবং যোধপুরে আঞ্চলিক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া উড়িষ্যা এবং অন্ধ্রে একটি করিয়া আরো দুইটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় ভূমিসংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২ কোটি টাকা ব্যয় করেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভূমিসংরক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য ১১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ভূমিসংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য অতিরিক্ত ৩৫০ জন অফিসার, ১৭০০ এ্যাসিষ্টাণ্ট এবং ৯০০০ সাব-এ্যাসিষ্টাণ্টের প্রয়োজন হইবে। এই অতিরিক্ত কর্মচারীদের শিক্ষাদানের জন্য ভূমিসংরক্ষণ সংক্রান্ত শিক্ষালয়েরও সম্প্রসারণ করা হইতেছে।

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব (Importance of agriculture in Indian Economy)

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। ভারত কৃষি প্রধান দেশ। মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ লোকের উপজীবিকা কৃষি।

উপজীবিকা

দ্বিতীয়তঃ কৃষি হইতে ভারতের জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৮ ভাগ পাওয়া যায়। অপরপক্ষে বৃহদায়তন শিল্প হইতে জাতীয় আয়ের মাত্র ৮ শতাংশ এবং ক্ষুদ্র শিল্প হইতে ৯ শতাংশ পাওয়া যায়। ভারতীয় কৃষির উৎপাদনশীলতা অবিশ্বাস্যরকমের স্বল্প। যন্ত্রিকরণ, ভূমিসংস্কার সমবায় কৃষি এবং সেচব্যবস্থার প্রসারের ফলে কৃষির উৎপাদন প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে অর্থাৎ কৃষি হইতে জাতীয় আয়ের অনুপাত বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

জাতীয় আয়

তৃতীয়তঃ, কৃষি খাদ্যশস্যের উৎস। ভারত কৃষি-প্রধান দেশ হইলেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, প্রতি বৎসরই বাহির হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হয়। যে দেশে শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিতে নিযুক্ত, সেই দেশ খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করিতে পারে নাই, ইহা আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। খাদ্য ঘাটতির দুইটি কারণ রহিয়াছে, (১) ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা এবং (২) একর প্রতি উৎপাদনের স্বল্পতা। তৃতীয় পরিকল্পনা ও চতুর্থ পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য খাদ্যে স্বয়ংনির্ভরশীলতা অর্জন করা। চতুর্থ পরিকল্পনায় খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য ১২ কোটি টনে ধার্য করা হইয়াছে। আশা করা যায় ১৯৭১ সালে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিবে।

খাদ্য

শিল্পে কাঁচামালের যোগানদার হিসাবেও কৃষির গুরুত্ব কিছু কম নয়। দেশের শিল্পায়ন পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এইজন্য পৃথিবীর সকল দেশেই শিল্প বিপ্লবের পূর্বে কৃষি বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। পরিশেষে, বাণিজ্যিক শস্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া ভারত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

শিল্পের কাঁচামাল ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন

অন্যান্য অর্ধোন্নত দেশের মতো ভারতেও কৃষি হইতে সর্বাধিক অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়। জাতীয় আয়ের অধিক অনুপাত কৃষি হইতে পাওয়া যায় বলিয়া উহা হইতে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণও অধিক হয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই উদ্বৃত্তের উপর নির্ভরশীল

অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত

কৃষিজ সম্পদ (**Agricultural Resources**) : ভারতে উৎপাদিত কৃষিজ দ্রব্যগুলির আলোচনা করা হইল :

খাদ্যশস্য : ধান (**Rice**) : ধান উৎপাদনে চীনের স্থান প্রথম, ভারত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ জমিতে ধান উৎপাদিত হয় ভারতে মোট ধান উৎপাদিত জমি তাহার এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু বিশ্বের মোট উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ মাত্র ভারত যোগান দেয়। প্রতি হেক্টার জমিতে ভারতে ১২২০ কিলোগ্রাম ধান উৎপাদিত হয় অপরপক্ষে বিশ্বের গড় উৎপাদন হইল ১৬৫০ কিলোগ্রাম। ধানের জন্য উষ্ণ জলবায়ু এবং ধান রোপণের সময় প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। আসাম, পশ্চিমবংগ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই-এ প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপাদিত হয়। ভারতের এক-তৃতীয়াংশ লোকের প্রধান খাদ্য চাল। ১৯৬১-৬২ সালে ভারতের মোট উৎপাদন ছিল ৩৪·১৪ মিলিয়ন টন। প্রচুর উৎপাদন সত্ত্বেও ভারত প্রতি বৎসর বার্মা, থাইল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশ হইতে চাল আমদানী করে।

ভারতে একর প্রতি উৎপাদন কম

বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়

গম (**Wheat**) : গম ভারতের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য। ১৯৬২-৬৩ সালে ১৩ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে গমের চাষ করা হইয়াছিল। গমের বীজ ফুটিবার সময় আর্দ্রতা আবশ্যক কিন্তু পাকিবার সময় উত্তাপের প্রয়োজন। সেই কারণে ভারতের শুষ্ক ও উষ্ণ পশ্চিমাঞ্চলে শীতকালে গম উৎপাদিত হয়। পাঞ্জাব, সংযুক্তপ্রদেশ, বেরার ও বিহারে গম জন্মায়। পৃথিবীর গম উৎপাদক দেশসমূহের মধ্যে জমিচাষের আয়তনের দিক হইতে ভারত তৃতীয় স্থান অধিকার করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। উৎপাদনের পরিমাণের দিক হইতে অবশ্য ভারত ষষ্ঠস্থান অধিকার করে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে একর প্রতি উৎপাদনের হার ভারতে অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম। সেই কারণে ভারতকে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বিপুল পরিমাণ গম আমদানী করিতে হয়।

ভারত তৃতীয় বৃহত্তম উৎপাদক দেশ

যব (**Barley**) : যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের শীতপ্রধান উচ্চভূমিতে ইহা জন্মিয়া থাকে। ১৯৬২-৬৩ সালে ৩·২ মিলিয়ন হেক্টার জমিতে যব উৎপাদিত হইয়াছিল। যব যদিও খাদ্য শস্যের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ইহা প্রধানত বিয়ার এবং মণ্ট প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে ভারত যব বাহিরে রপ্তানী করিত কিন্তু বর্তমানে আমাদের ইহা আমদানী করিতে হয়।

জনার (Jowar), বজরা (Bajra) এবং রাগি (Ragi) : বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজপুতনায় ইহাদের চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের ইহা প্রধান খাদ্য তবে রাগী মহার্ঘ বলিয়া সকলে খাইতে পারে না। ১৯৬২-৬৩ সালে ১০.৪ মিলিয়ন হেক্টার জমিতে জোয়ার এবং ১০.৩ মিলিয়ন হেক্টার জমিতে বজরা উৎপাদিত হয়। এই ধরণের খাদ্যশস্যও ভারতকে বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়।

সাধারণতঃ দরিদ্র জনগণের খাদ্য

ডাল (Pulses) : ছোলা, মটর, মুগ, মুসুর, অড়হর প্রভৃতি ডাল ভারতের সর্বত্র জন্মায়। ডালের মধ্যে ছোলা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং ১৯৬২-৬৩ সালে ৯.৫ মিলিয়ন হেক্টার জমিতে ছোলার চাষ হইয়াছিল এবং অন্যান্য ডালের চাষ হইয়াছিল ১২.৬ মিলিয়ন হেক্টার জমিতে।

বাণিজ্যশস্য : তুলা (Cotton) : ভারতের প্রায় সর্বত্রই কিছু কিছু তুলা জন্মে কিন্তু দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকাটি তুলা উৎপাদনের আদর্শ ক্ষেত্র। ১৯৬২-৬৩ সালে ৭৭০৬ হাজার হেক্টার জমিতে তুলার চাষ হয় এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৫৩ লক্ষ গাঁট। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে ভারত প্রচুর পরিমাণে স্বল্প আঁশযুক্ত তুলা রপ্তানি করিত। কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে প্রধান তুলা উৎপাদক অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভারতকে স্বল্প আঁশযুক্ত ও দীর্ঘ আঁশযুক্ত উভয় প্রকার তুলাই আমদানী করিতে হয়।

পাট (Jute) : পাট আর্দ্র ও দো-আঁশ্‌লা মাটিতে এবং ধান অপেক্ষা উচ্চ-ভূমিতে ভাল জন্মে। পশ্চিমবংগ, বিহার আসাম এবং উড়িষ্যায় পাট জন্মায়। অবিভক্ত বাংলা পাট উৎপাদনে শীর্ষস্থান অধিকার করে। দেশ বিভাগের ফলে মোট পাট উৎপাদিত অংশের এক-তৃতীয়াংশ ভারতের মধ্যে পড়িয়াছে। পাক-ভারত সম্পর্কের অবনতির ফলে ভারত পাট উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে পাটের চাষ বৃদ্ধি করে। ইহার ফলে ১৯৫৯-৬০ সালে ১৭০৭০০০ একর জমিতে পাট চাষ হয় কিন্তু ১৯৭৭ সালে ৮৩৪০০০ একর জমিতে পাটের চাষ হয়। ভারত পাকিস্তান হইতে কিছু পরিমাণ কাঁচা পাট আমদানী করিলেও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীতে ভারতই সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৬২-৬৩ সালে পাট চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৮৭০,০০০ হেক্টার এবং উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬৩১৯০০০ মিলিয়ন টন।

বাংলা পাট উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে

আখ (Sugar-Cane) : ভারত আখ উৎপাদনে পৃথিবীর প্রথম স্থান অধিকার করে। ধানের জমিতেই আখের চাষ ভালো হয়। কিন্তু ইহার জন্য ধানের মতো প্রচুর জলের প্রয়োজন হয় না। ভারতের সর্বত্রই আখের চাষ হয় তবে যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারেই সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে আখ চাষের জমির পরিমাণ ছিল ২.২৯ মিলিয়ন হেকটার এবং চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯৮৮৮০০০ মিলিয়ন টন। ভারতে ১৫৭টির মতো চিনির কারখানা রহিয়াছে।

ভারত আখ উৎপাদনে শীর্ষস্থান অধিকার করে

তৈলবীজ (Oil-Seeds) : সরিষা, তিসি, রেড়ী, চীনাবাদাম, নারিকেল, তিল প্রভৃতি হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে ৬৪২২ হেক্টার পরিমাণ জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছিল। ইহা সাধারণতঃ মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে জন্মায়। ভারত প্রচুর পরিমাণে চীনাবাদম ইউরোপীয় দেশগুলিতে রপ্তানী করিয়া থাকে। ১২২১ হাজার হেক্টার জমিতে তিসি এবং ১০৮৪ হেক্টার জমিতে সরিষা উৎপাদিত হইয়া থাকে।

বাগিচা শস্য (Plantation Crops) : চা (Tea) : চা প্রধানতঃ আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়াতে জন্মায়। যে সকল অঞ্চলে খুব বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু জল জমে না এবং প্রখর সূর্যালোক পাওয়া যায় সেইসব অঞ্চলে চায়ের চাষ হয়। এই কারণে পর্বতের সানুদেশে ভালো চা জন্মায়। আসাম প্রদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচুর উৎকৃষ্ট চা জন্মায়। সমস্ত ভারতে যত চা পাওয়া যায় তার অর্ধেকেরও বেশী জন্মায় আসাম রাজ্যে। ইহা ছাড়া যুক্তপ্রদেশের দেরাদুন অঞ্চলে এবং মাদ্রাজের নীলগিরি পর্বতের সানুদেশে ও ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে কিছু পরিমাণ চা জন্মিয়া থাকে। চায়ের উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

আসামে সর্বাপেক্ষা অধিক চা পাওয়া যায়

কফি (Coffee) : কফি উৎপাদনের জন্য অধিক বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য ইহা পশ্চিমঘাটের পূর্বদিকে পর্বতগাত্রে তিন হাজার ফিট উপরে আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়ায় জন্মায়। মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও নীলগিরিতে কফি উৎপাদিত হয়।

তামাক (Tobacco) : তিন শত বৎসর পূর্বে পর্তুগীজেরা এদেশে ইহা প্রথম আনয়ন করে। ইহা ভারতের সর্বত্রই জন্মায় তবে মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র এবং বিহারেই ইহা অধিক পরিমাণে জন্মায়। ভারত পৃথিবীতে তামাক উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৬১-৬২ সালে ৩৮৩ হাজার হেক্টার পরিমাণ জমিতে তামাকের চাষ হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৪৪ হাজার টন। প্রচুর পরিমাণে তামাক রপ্তানি হয়। ইহা পৃথিবীর ৩০টি দেশে রপ্তানি হয় এবং বৎসরে গড়ে ১৮ কোটি টাকার মতো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

ভারত তৃতীয় স্থান অধিকার করে

রাবার (Rubber) : রবার প্রধানতঃ মাদ্রাজ, মহীশূর এবং কেরালায় উৎপাদিত হয়। ১৪১০০০ হেক্টার পরিমাণ জমিতে রাবারের চাষ হয় এবং বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ২৭০০০ টন। ভারতে রাবার উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য বলিয়া মালয় এবং অন্যান্য দেশ হইতে ভারত প্রচুর পরিমাণে রাবারের আমদানী করে।

বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়

এই সকল প্রধান কৃষিজ দ্রব্য ছাড়াও ভারতে নীল, আফিং, সিনকোনা, মশলা রেশম ইত্যাদি উৎপাদিত হয়।

কৃষি উৎপাদন ও কৃষি নীতি (Agricultural Production and Policy): ভারত কৃষি-প্রধান দেশ। এই দেশের মোট ভূমিভাগের আয়তন ৮১২½ মিলিয়ন একর কিন্তু ইহার অর্ধাংশেরও কম অঞ্চলে কৃষি-কার্য সম্পাদিত হয়। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য কর্ষিত জমির পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট কর্ষিত জমির ৭৮ ভাগ খাদ্যশস্য উৎপাদনে, ১৭ ভাগ বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনে এবং ১·১ ভাগ বাগিচা শস্য ও মশলা উৎপাদনে নিযুক্ত রহিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনা তৈয়ারীর পূর্বে পরিকল্পনা কমিশন প্রধান প্রধান রাজ্যে গত চল্লিশ বৎসরে বিভিন্ন শস্য উৎপাদক অঞ্চলের একটা পর্যালোচনা করেন। এই কমিশন দেখান যে ওই সময়ের মধ্যে যুক্তপ্রদেশ ছাড়া অন্য কোথাও কর্ষিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই। একাধিক ফসল উৎপাদনকারী অঞ্চলের ২০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় উহা নগণ্য। দ্বিতীয়তঃ জলসেচের পরিমাণ ১০ ভাগ বাড়িয়াছে—উহা প্রধানতঃ খালের সম্প্রসারণের ফলেই হইয়াছে। তৃতীয়তঃ পতিত জমির পুনরুদ্ধার কিছু পরিমাণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইয়াছিল।

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক শস্যের প্রকৃতির পর্যালোচনা

পরিকল্পনা কমিশন শস্যের যে গতি প্রকৃতি (crop pattern trends) লইয়া আলোচনা করিয়াছিল তাহা হইতে জানিতে পারি যে (১) খাদ্য শস্যের উৎপাদনে কিছু জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়—ইহার কারণ তুলার উৎপাদন হ্রাস। (২) প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়; অবশ্য যুদ্ধোত্তরকালে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। (৩) তৈলবীজ উৎপাদনে নিযুক্ত জমির পরিমাণ ক্রমশই বাড়িতে থাকে। (৪) দেশ বিভাগের পর পাটের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা আনয়নের জন্য দশ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ বৃদ্ধি পায় এবং (৫) আখের চাষ দশ লক্ষ একর জমিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপরোক্ত আলোচনার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে দুইটি ফসল (double cropping) ফলানোর দরুণ মোট ফসল উৎপাদনকারী জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে কিন্তু নূতন জমি অতি সামান্য পরিমাণেই চাষ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দাম-কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে ফসলের পরিবর্তন হইয়াছে। তৃতীয়তঃ জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তে বাণিজ্যশস্য উৎপাদন অথবা বাণিজ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তে খাদ্যশস্য উৎপাদন কোনো নীতি অনুসরণ করে না।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের পর্যালোচনা।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রিদপ্তর উৎপাদন সম্পর্কে পর্যালোচনা করিয়া বলেন যে গত চল্লিশ বৎসরে কোনো রাজ্যেই সকল প্রকার ফসলের উৎপাদনে অবনতি ঘটে নাই। বাণিজ্যিক ফসলের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিই লক্ষ্যকরা যায়। খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রে কয়েকটি রাজ্যে কর্ষিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় কিন্তু উৎপাদনের গতি সর্বত্র

সমান নয়। ইহাতে আরও বলা হয় যে জমির উর্বরতা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া যে সন্দেহ লোকের মনে আছে তাহাও ভিত্তিহীন।

ইহা সত্যই আশ্চর্যজনক যে ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে খাদ্যের ঘাটতি থাকিতে পারে। খাদ্য ঘাটতির প্রধানতঃ তিনটি কারণঃ (১) ১৯৩৬ সালে বার্মা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, ফলে ১৩ লক্ষ টন খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। (২) জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে খাদ্যের যোগান সেই হারে বাড়িতেছে না। (৩) ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে সাড়ে সাত লক্ষ টন খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। নিউট্রিশান এ্যাডভাইসারী কমিশনের মতে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যহ ১৪ আউন্স খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে ৭.৬ মিলিয়ন টন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করে যাহাতে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি প্রত্যহ ১৪ আউন্স খাদ্য পায়।

খাদ্য ঘাটতির কারণ

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুরুতে খাদ্য দ্রব্য এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদনে দেশে যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। সেইজন্য দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাইবার জন্য আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস পায়। ১৯৭৯-৫০ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৪৬ মিলিয়ন টন কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ৪১.৭ মিলিয়ন টনে আসিয়া দাঁড়ায়। "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলন সত্ত্বেও খাদ্যোৎপাদন হ্রাস পায় নিম্নলিখিত কারণেঃ প্রথমতঃ দেশের নানাস্থানে বন্যা এবং অনাবৃষ্টি কিছু পরিমাণে উৎপাদন হ্রাসের জন্য দায়ী কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বারা এই অবস্থার পুরাপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ কৃষিজ দ্রব্যের উচ্চমূল্যের জন্যও উৎপাদন হ্রাস পায়। ইহা আপাত দৃষ্টিতে দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। সাধারণতঃ দাম বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু কৃষকদের ক্ষেত্রে আয় স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক। ইহার অর্থ কৃষকেরা নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় কামনা করে; যখন দ্রব্যের দাম অধিক তখন কৃষক অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদন করিয়া কাম্য আয় লাভ করিতে পারে কিন্তু যখন দ্রব্যের দাম স্বল্প তখন তাহাকে অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিয়া কাম্য আয় লাভ করিতে হইবে। দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষকেরা উৎপাদন হ্রাস করিতে থাকে। তৃতীয়তঃ খাদ্যোৎপাদন হ্রাসের আর একটি কারণ যে খাদ্যশস্যের জমিতে অধিক পরিমাণে পাট, আখ এবং তুলা উৎপাদন করা হইতেছে।

সরকারের "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলন সুরুতেই বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই কারণ এই আন্দোলনে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় অধিক জোর দেওয়া হইয়াছিল। 'অধিক খাদ্য ফলাও' নীতির কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে ১৯৫১ সালে ফসল উৎপাদনে সন্তোষজনক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলন

উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ হইল প্রাকৃতিক আনুকূল্য, সুসম্বদ্ধ উৎপাদনসূচীর (Integrated Praduction Programme) সাফল্য, জাপানী পদ্ধতিতে ধান চাষ এবং জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

পরিকল্পনাধীন সময়ে কৃষি উৎপাদন: খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, ভারতীয় শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা পূরণ এবং জনগণের মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি—এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য লইয়া প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যদিও দ্রুত শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তথাপি কৃষিকে উপেক্ষা করা হয় নাই। খাদ্যে যতখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব ততখানি লাভ করিবার জন্য প্রচেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। এই সময় ইহা বুঝা যায় যে শুধুমাত্র চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে না—উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে একর প্রতি অধিক ফসল উৎপাদন করিতে হইবে। যদি বর্তমান ভোগের পরিমাণ বজায় রাখিতে হয় তাহা হইলে ভারতের বর্ধিত জনসাধারণের জন্য ৭ কোটি টন খাদ্যের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু মাথাপিছু বর্ধিত ১৮·৩ আউন্স খাদ্য গ্রহণের ভিত্তিতে মোট ৭½ কোটি টন খাদ্য শস্যের প্রয়োজন হইবে। ইহার ভিত্তিতেই দ্বিতীয় পরিকল্পনা ১৯৬০-৬১ সালে ১০ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন লক্ষ্য ধার্য করে। তৃতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং ইহা ছাড়া বাণিজ্যিক ফসল, বিশেষ করিয়া পাট, তুলা ও তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা

ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদন পরিকল্পনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় ২৩৫৬ কোটি টাকা উন্নয়নী ব্যয়ের মধ্যে ১৫·১% (৩৫৭ কোটি টাকা) কৃষি ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয় এবং ২৮·১% (৬৬১ কোটি টাকা) জলসেচ এবং বিদ্যুৎ পরিকল্পনার খাতে বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পসম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইলেও কৃষি-পরিকল্পনাকে উপেক্ষা করা হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ৪৮০০ কোটি টাকা উন্নয়নী ব্যয়ের মধ্যে কৃষি ও সমাজোন্নয়ন বাবদ ১১·৪% (৫৬৭ কোটি টাকা) এবং জলসেচ ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনা বাবদ ১৯% (৯১৩ কোটি টাকা) ব্যয় বরাদ্দ করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার স্বপক্ষে পরিকল্পনা কমিশন দুইটি যুক্তি দেখাইয়াছেন: যে সকল পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই হাতে লওয়া হইয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ করার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং খাদ্য ও শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি না করিতে পারিলে দ্রুত শিল্পায়নও সম্ভবপর হইবে না। ইহা সত্য যে শিল্পের জন্য কাঁচামাল এবং খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন এবং জাপান ও গ্রেটবৃটেন এই দুইটি দ্রব্যের রপ্তানীর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। কিন্তু যদি এই সকল দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ যোগান বৃদ্ধি করিতে

কৃষি অগ্রাধিকারের স্বপক্ষে যুক্তি

পারা যায় তাহা হইলে নিঃসন্দেহে ভারতীয় শিল্পকে সহায়তা করা হইবে। অধিকন্তু দেশের শতকরা ৭০জন লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল সেই কারণে কৃষির উন্নতি হইলে উহাদের আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি-অগ্রাধিকারের বিরুদ্ধে কেউ কেউ সমালোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ভারতীয় অর্থনীতিতে শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উহা সমতাহীন (lopsided); প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে এই সমতাহীনতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি শিল্পোন্নতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত তাহা হইলে ভারতীয় অর্থনীতির এই ত্রুটি সংশোধন হইত এবং ভারতের সুষম উন্নয়ন সম্ভবপর হইত। দ্বিতীয়তঃ, দেশে যে ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতির এক দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইবে ইহা যথার্থ কিন্তু দেশের কৃষিসম্পদের পূর্ণ বিকাশ ঘটিলে যে উহা সম্পূর্ণরূপে দেশীয় শিল্পে ব্যবহৃত হইবে এই নিশ্চয়তা কোথায়? যদি ভারতীয় কৃষি শিল্পে কাঁচামাল যোগান দিতে না পারে তাহা হইলে জাপান এবং যুক্তরাজ্যের মত বাহির হইতে কাঁচামাল আনিয়া শিল্পোন্নতি করা সম্ভবপর। যদি কৃষি এবং শিল্প উভয়েই একই সঙ্গে সম্প্রসারিত হয় তাহা হইলে দেশের সুসম অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর হইবে এবং শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর হইবে।

বিরুদ্ধ সমালোচনা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি-পরিকল্পনার তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়: প্রথমতঃ কৃষি-সংগঠন সম্পূর্ণরূপে রাজ্য সরকারের অধীন রাখা হয়। শিল্পে বেসরকারী উদ্যোগের অবদান রহিয়াছে কিন্তু কৃষিতে বেসরকারী উদ্যোগের কোন স্থান নাই। ইহার কারণ এই ধরণের কাজে মুনাফা অর্জন দীর্ঘকালীন ব্যাপার। অতীতে বেসরকারী উদ্যোগ এই ধরণের পরিকল্পনায় আগ্রহ প্রকাশ করে নাই এবং বেসরকারী উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল না হইয়া পরিকল্পনা কমিশন উপযুক্ত কাজই করিয়াছে। এই পরিকল্পনায় রাজ্য-সরকারগুলিকে জলসেচ এবং বিদ্যুৎ পরিকল্পনা পরিচালনার ভার দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার সমন্বয়সাধন ও প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের ভার গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ, দীর্ঘকালীন পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই ধরণের পরিকল্পনার সম্পূর্ণ উপযোগিতা ১৫ হইতে ২০ বৎসর পরে অনুভব করা যাইবে। দীর্ঘ-কালীন পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও স্বল্পকালীন সময়ে খাদ্যোৎ-পাদন ও কাঁচামালের যোগান বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করা হয়। তৃতীয়তঃ, শুধুমাত্র কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়—গ্রামীন জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

প্রথম পরিকল্পনার ত্রুটি দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সংশোধন করিবার চেষ্টা করা হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে শিল্পের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ইহার ফলে ভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের অসমতা দূর হইবে, জাতীয় আয় দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইবে এবং অধিক নিয়োগের সম্ভাবনার পথ মুক্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনায় মোট ৪৮০০ কোটি টাকা উন্নয়নী ব্যয়ের মধ্যে শিল্প ও খনি খাতে ১৮·৫%, পরিবহন এবং যোগাযোগ

ব্যবস্থার খাতে ২৮.৯%, কৃষি এবং সমাজোন্নয়ন খাতে ১১.৯% এবং জলসেচ ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনা খাতে ১৯% ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। যদিও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ও পরিবহণের খাতে অধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হয় তথাপি কৃষি ও জলসেচ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয় নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, কৃষি পরিকল্পনার তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্যের অব্যাহত যোগান, শিল্পের জন্যে অধিক পরিমাণ কাঁচামাল সরবরাহ এবং অধিক রপ্তানীর জন্য কৃষিজ দ্রব্যের উদ্বৃত্ত সৃষ্টি—এই উদ্দেশ্যগুলির কথা স্মরণ রাখিয়াই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি এবং শিল্পোন্নয়নের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষি-উৎপাদন বিকেন্দ্রীকরণ এবং খাদ্যশস্য অপেক্ষা অন্য ধরণের ফসল (যেমন কাজুবাদাম, নারিকেল, গোলমরিচ, লাক্ষা) উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ, কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কর্ষণযোগ্য যে পরিমাণ ভূমির আয়তন বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে প্রধানতঃ নিকৃষ্ট ধরণের শস্য উৎপাদিত হইবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সহিত নিকৃষ্ট ধরণের ফসলের চাহিদা হ্রাস এবং উৎকৃষ্ট ধরণের ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপ অবস্থায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উৎস হইবে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-পরিকল্পনার উপাদানসমূহ হইল (১) পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ভূমি ব্যবহার করা, (২) স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন লক্ষ্য নির্ধারণ, (৩) উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত সরকারী সাহায্যের যোগাযোগ স্থাপন এবং (৪) উপযুক্ত দামনীতি নির্ধারণ।

কৃষি-পরিকল্পনাকে সফল করিবার পথে বাধা

ভারতের মতো দেশে কৃষি পরিকল্পনাকে সফল করিয়া তুলিবার পথে কতকগুলি বিরাট বাধা রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ভারতীয় কৃষক অশিক্ষিত এবং রক্ষণশীল মনোবৃত্তি সম্পন্ন এবং নূতন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সে মোটেই উৎসাহ বোধ করে না। অতীতে কৃষকের অবস্থার উন্নতি এবং দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য নানারূপ বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু কৃষকের ঔদাসীন্যের দরুণ সে সব প্রয়াস ফলপ্রসূ হয় নাই। কৃষকের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত কৃষির কোনোরূপ উন্নতি সম্ভবপর নয়।* কৃষকের সক্রিয় সহযোগিতা লাভের জন্য তাহার মনে পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে বিশ্বাস এবং চেতনার সৃষ্টি করিতে হইবে এবং বুঝাইতে হইবে যে তাহারই স্বার্থে পরিকল্পনার সাফল্যের প্রয়োজন।

* "Participation of the people in farming and fulfilling programmes and targets constitutes the crux of development in the field of development and for the promotion of social welfare. From every aspect agricultural development turns upon the extent to which the people take up programmes with enthusiasm and are willing to work for them."

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য সকল পরিকল্পনার মতো কৃষি পরিকল্পনার সাফল্যও নির্ভর করে সরকারী কর্মচারীদের সততা এবং যোগ্যতার উপর। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার মতো প্রয়োজনীয় শিক্ষিত, দক্ষ এবং সৎ কর্মচারীর অভাব দেশে যথেষ্টই রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, ভারতের গ্রামীন কাঠামোই কৃষি-পরিকল্পনার অন্তরায়। পরিবহণ ব্যবস্থার অনুন্নতি, জলসেচ ও অন্যান্য অসুবিধা কৃষি-পরিকল্পনার বিশেষ অন্তরায়। এই সকল অসুবিধার আশু প্রতিবিধান কর্তব্য। যদি দীর্ঘকালীন পরিকল্পনায় অধিক মনোযোগ দেওয়া হয় তাহা হইলে স্বল্পকালীন প্রজেক্টগুলি উপেক্ষিত হইবে এবং কৃষকের অবস্থার আশু উন্নতিবিধান সম্ভবপর হইবে না। অবশ্য দীর্ঘকালীন এবং স্বল্পকালীন উভয় ধরণের প্রজেক্টের উপরই সমান গুরুত্ব দেওয়া যায় কিন্তু তাহাতে উন্নয়নের গতি মন্থর হইয়া পড়িবে।

কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির ভিত্তিভূমিতে তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, ভূমি সংরক্ষণ, সারের যোগান, উন্নত বীজ এবং কৃষি-ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে কৃষি উৎপাদনসূচক বৃদ্ধি পাইয়া ১৩৫-এ দাঁড়ায় (ভিত্তি বৎসর = ১৯৪৯-৫০)। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদন শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃদ্ধির হার শতকরা ১৬ ভাগ। তৃতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যে স্বয়ং-নির্ভরশীলতা অর্জন এবং বাণিজ্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কোনো কোনো বিষয়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। সেইজন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকর্মসূচীর পরিধি বিস্তৃত করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিবে উহার কৃষি উৎপাদন লক্ষ্য পূরণের উপর।

তৃতীয় পরিকল্পনায় অর্থ বা অন্য কিছুর অভাব কৃষি উৎপাদন-সূচী পূরণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে দেওয়া হইবে না। সেইজন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থসাহায্য করা হইতেছে এবং উৎপাদন লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হইবে। অধিক পরিমাণে সার সরবরাহ করা হইবে। রাজ্যের কৃষি-সংগঠন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে এবং কৃষি, সমবায়, সমষ্টি-উন্নয়ন এবং জলসেচ বিভাগের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হইতেছে। সমবায় ঋণদান সমিতির মাধ্যমে অধিক পরিমাণ ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং ঋণের সহিত উৎপাদন এবং বিক্রয় ব্যবস্থার সংযোগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। শুধুমাত্র গ্রামীণ স্তরেরই নয়—রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরের কৃষি সংগঠন বিভাগের উন্নতির এবং দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য ১২৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় অপর পক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ওই খাতে ৬৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহা ব্যতীত সমবায় ঋণদান সমিতি হইতে ৫৩০ কোটি টাকা স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী ঋণ এবং ১৫০ কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদী

তৃতীয় পরিকল্পনার কৃষি-কর্মসূচী

ঋণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকর্মসূচীর একটি ত্রুটি যে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের উপর যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত লৌহ ও ইস্পাতের যোগান, গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির প্রদর্শন এবং উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি সব-কিছুরই কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে বিভিন্ন ফসলের সম্ভাব্য উৎপাদনের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে বিভিন্ন ফসলের সম্ভাব্য উৎপাদনের হিসাব

দ্রব্য	একক	ভিত্তি বৎসর উৎপাদন (১৯৬০-৬১)	অতিরিক্ত উৎপাদন লক্ষ্য (১৯৬১-৬৬)	১৯৬৫-৬৬ সালের উৎপাদন	শতকরা বৃদ্ধি
খাদ্যশস্য	মিলিয়ন টন	৭৬·০	২৪·০	১০০·০	৩১·৬
তৈলবীজ	,, ,,	৭·১	২·৭	৯·৮	৩৮·৬
আখ (গুড়)	,, ,,	৮·০	২·০	১০·০	২৫·০
তূলা	মিলিয়ন গাঁট	৫·১	১·৯	৭·০	৩৭·২
নারিকেল	মিলিয়ন নাট	৪৫০০	৭৭৫	৫২৭৫	১৭·২
পাট	মিলিয়ন গাঁট	৪·০	২·২	৬·২	৫৫·০
সুপারি	হাজার টন	৯৩	৭	১০০	৭·৫
কাজু বাদাম	,, ,,	৭৩	৭৭	১৫০	১০৫·৫
গোলমরিচ	,, ,,	২৬	১	২৭	৩·৯
এলাচ	,, ,,	২·২৬	০·৩৬	২·৬২	১৫·৯
লাক্ষা	,, ,,	৫০	১২	৬২	২৪·০
তামাক	,, ,,	৩০০	২৫	৩২৫	৮·৩
চা	মিলিয়ন পাউণ্ড	৭২৫	১৭৫	৯০০	২৪·১
কফি	হাজার টন	৪৮	৩২	৮০	৬৬·৭
রাবার	,, ,,	২৬·৪	১৮·৬	৪৫	৭০·৫

একর প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে ফলন বৃদ্ধির ফলের এই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য কার্যকরী হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় ধানের ক্ষেত্রে ২৭·৫%, গমের ক্ষেত্রে ২০%, তৈলবীজের ক্ষেত্রে ১১%, তূলার ক্ষেত্রে ১৪%; পাটের ক্ষেত্রে ১৬% এবং আখের ক্ষেত্রে ১৮% উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে। উপরে প্রদত্ত হিসাবানুযায়ী কৃষি উৎপাদন সূচী ১৯৬০-৬১ সালে ১৩৫ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৭৬-এ আসিয়া দাঁড়াইবে এবং এই পাঁচ বৎসরে মোট বৃদ্ধির পরিমাণ হইবে শতকরা ৩০ ভাগ। মাথাপিছু খাদ্যের যোগান আশা করা যাইতেছে ১৯৬০-৬১ সালে ১৬ আউন্স হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৭·৫ আউন্সে আসিয়া দাঁড়াইবে এবং মাথাপিছু কাপড়ের যোগান ১৫·৫ গজ হইতে ১৭·২ গজে আসিয়া দাঁড়াইবে। ওই সময়ে মাথাপিছু ভক্ষনীয় তেলের (edible oil) যোগান ০·৪ আউন্স হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ০·৫ আউন্সে আসিয়া দাঁড়াইবে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি-কর্মসূচী (Agricultural Programmes under the Fourth Plan): খাদ্যাভাব চরম আকার ধারণ করায় চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১২ কোটি টনে আসিয়া দাঁড়াইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১০ কোটি টনে ধার্য ছিল। চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির হার হইল ৫'৫৯%—খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার হইল ৫'৯২% এবং অন্যান্য কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার হইল ৫'০১%.

চতুর্থ পরিকল্পনায় কয়েকটি কৃষিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এইরূপ হইবে:

	একক	১৯৬৫-৬৬ সালের উৎপাদন	অতিরিক্ত উৎপাদন চতুর্থ পরিকল্পনা	চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে উৎপাদন
	মিলিয়ন টন			
১। খাদ্যশস্য	" "	৯০'০	৩০'০	১২০'০
২। আখ	" "	১১'০	২'৫	১৩'০
৩। তৈলবীজ	" "	৭'৫	৩'৫	১০'৭
৪। তুলা	মিলিয়ন গাঁট	৬'৩	২'৩	৮'৬
৫। পাট	" "	৬'২	২'৮	৯'০
৬। তামাক	মিলিয়ন টন	৪০০	৭৫	৪৭৫
৭। লাক্ষা	হাজার টন	৩০	২০	৫০

আশা করা যাইতেছে যে একর প্রতি উৎপাদন খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে শতকরা ২৬ ভাগ, তৈলবীজের ক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগ, আখের ক্ষেত্রে শতকরা ১৪ ভাগ, তুলার ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ ভাগ এবং পাটের ক্ষেত্রে শতকরা ১৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

সারের উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি পাইবে। ভূমি সংরক্ষণ এবং উন্নত বীজ উৎপাদনের কর্মসূচী দ্বিগুণ বাড়িবে। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকর্মের উপর জোর দেওয়া হইবে। ভূমি সংস্কার চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নী পরিকল্পনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। উৎপাদন বৃদ্ধির পথে কৃষিকাঠামোর যে ত্রুটি রহিয়াছে তাহা দূর করাই ভূমি সংস্কার নীতির লক্ষ্য হইবে। উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করিয়া কৃষককে ঋণ মঞ্জুর করিতে হইবে।

কৃষি-পরিকল্পনা ছাড়াও অন্যান্য পরিকল্পনা হইতে কৃষি-উৎপাদন সহায়তা পাইবে। সেই কারণে কৃষি বাবদ প্রকৃত ব্যয় অধিক হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে প্রধান ও মাঝারি ধরণের জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর জন্য যে ৯৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে কৃষি কর্মসূচীকে সহায়তা করিবে।

সার কারখানা, ট্রাক্টর নির্মাণ কারখানা ও কীটনাশক ঔষধ উৎপাদন কারখানা নির্মাণের জন্য সরকারী খাতে ২৭৮ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য আনুমানিক ৭০ কোটি টাকা এবং গ্রামীন কর্মসূচীর জন্য ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

দামনীতি ও তৃতীয় পরিকল্পনা (Price Policy for the Third Plan) ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে সরকারের খাদ্য নীতির উদ্দেশ্য ছিল (১) ক্রমেই ভারতকে খাদ্যোৎপাদনের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা ; (২) যতদিন পর্যন্ত চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা থাকিবে ততদিন পর্যন্ত দাম এবং খাদ্যশস্যের বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে যাহাতে জনসাধারণের কষ্ট লাঘব হয় এবং (৩) কৃষক তাহার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাইবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যথার্থই বলা হইয়াছে যে দামের কাঠামোতে খাদ্য-শস্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে এবং দামের কাঠামোকে রক্ষা করিতে হইলে খাদ্যশস্যের দাম স্থির এবং উহাকে দরিদ্র জনগণের আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে হইবে। খাদ্যশস্যের যোগানে সামান্য ঘাটতি দেখা দিলে দাম অধিক হারে বৃদ্ধি পাইবে যাহার ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। যে নীতি অনুসরণ করিলে সকল দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং বিনিয়োগে বাধার সৃষ্টি করিবে তাহা উৎপাদকের পক্ষেও পরিণামে মঙ্গলজনক নয়।

সরকারের খাদ্য নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা বিতর্কের বিষয়। নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে বলা হয় যে দরিদ্র জনগণের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য এবং ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যের যোগান অব্যাহত রাখিবার জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং দরিদ্র জন অশেষ দুঃখকষ্ট হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, কারণ পরিকল্পনা এবং বিনিয়ন্ত্রণ পাশাপাশি চলিতে পারে না। এই যুক্তির ত্রুটি যে নিয়ন্ত্রণই স্বল্পতার অবস্থার সৃষ্টি করে। নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইলে লুক্কায়িত মজুত খাদ্য বাহির হইয়া আসিবে এবং উহার বণ্টনের ফলে অবস্থার উন্নতি ঘটিবে। পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের উপর কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হইলেও খাদ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়। যদি নিয়ন্ত্রণকে দক্ষতার সহিত বলবৎ করা হইত তাহা হইলে অবস্থার উন্নতি হইত। কিন্তু ভারতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত অযোগ্যতার সহিত পরিচালিত হয়। ফলে উহা ভোগকারী, ব্যবসায়ী এবং উৎপাদকের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যতদিন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ চলিতে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত অর্থনৈতিক কাঠামো স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে পারিবে না।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে যুক্তি

নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা

উন্নয়নকামী দেশে দামনীতির দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য থাকা উচিত। প্রথমতঃ, দেখিতে হইবে যে (১) দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের হ্রাস-বৃদ্ধি যেন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার ও লক্ষ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং (২) দরিদ্র জনগণের প্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রীর দাম যেন তাহাদের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া না যায়। দামনীতির এই দুইটি উদ্দেশ্যের উপরই প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হইয়াছিল এবং দামের

দাম নীতির দুইটি উদ্দেশ্য

অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রথম পরিকল্পনায় দামের ঘনঘন উঠানামা লক্ষ্য করা যায় এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে দামের উর্ধ্ব প্রবণতা দেখা গিয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে পাইকারী দাম এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ভার খুবই বেশী ছিল আর সেইজন্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যাহাতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বেশী বৃদ্ধি না পায় এবং দরিদ্র জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত দামনীতি গ্রহণ করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত দামনীতি

তৃতীয় পরিকল্পনায় শেষে বিনিয়োগ ১১% হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৪% হইবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং তদনুপাতে দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি না পাইলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। গত কয়েক বৎসরে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি কিছুটা হইয়াছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ঘাট্‌তি ব্যয় অতি সামান্য পরিমাণে করা হইয়াছে তথাপি কিছু পরিমাণ দামবৃদ্ধি অপরিহার্য। প্রথমতঃ, আজও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের উপর নির্ভরশীল এবং মৌসুমী বায়ু সম্পর্কে সব সময়ই অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ভোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহারা পরিপূর্ণরূপে সাফল্যলাভ করিতে নাও পারে এবং তাহার ফলে অতিরিক্ত চাহিদা বাজারে দামবৃদ্ধিতে সহায়তা করিতে পারে। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন সেকটারের মধ্যে উন্নয়ন হারের যে সমতা স্থির করা হইয়াছে বাস্তবে তাহা কার্যকরী নাও হইতে পারে। উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সময়গত ব্যবধান (lags) থাকিতে পারে। সেই কারণে তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে দামের উপর, বিশেষ করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে এবং অবস্থা যাহাতে চরমে না উঠিতে পারে তাহার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

আর্থিক উন্নয়নের সহিত কিছু পরিমাণ দাম বৃদ্ধি অনস্বীকার্য। বর্তমান বিনিয়োগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে কিছুকাল পরে এবং কিছু কিছু বিনিয়োগ ক্ষেত্র আছে যেখানে অনেক দেরীতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। নূতন কার্যে জনশক্তির ব্যবহার করিতে হইলে অতিরিক্ত আর্থিক পুরস্কার দিতে হইবে ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। অবশ্য অব্যবহৃত সম্পদ উৎপাদনে ব্যবহারের ফলে এবং দ্রুত ফলপ্রসূ বিনিয়োগে মূলধন লগ্নী করিলে (যেমন কৃষি) দামের উর্ধ্বগতি রোধ হইবে। মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যই রোধ করিতে হইবে কারণ ইহা সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহারের উপযোগী নয়। ইহা আপেক্ষিক দামে বিকৃতি ঘটায় এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সম্পদের যে সকল ব্যবহারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় সেখান হইতে সম্পদ অন্য ব্যবহারে চলিয়া যায়।

দামবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী

ফিস্‌ক্যাল এবং আর্থিক পদ্ধতি দামনীতি সফল করিবার প্রধান উপায়। ফিস্‌ক্যাল পদ্ধতির সাহায্যে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা বাজার হইতে সরাইয়া লইতে হইবে এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতা আনিতে হইবে। সরকারী পরিচালনাধীন শিল্পের দামনীতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে তাহারা

ফিসক্যাল ও আর্থিক পদ্ধতির সহায়তা

অতি দক্ষতার সহিত ব্যবসা চালাইবে যাহাতে মুনাফা অর্জন করিতে পারে এবং তাহাদের দামনীতি এরূপ হইবে যাহাতে বিনিয়োগকারা তাহার মূলধনের যথাযোগ্য প্রতিদান পায়।

আর্থিক পদ্ধতি এবং ফিস্‌ক্যাল পদ্ধতি পারস্পরিক সহযোগিতার সহিত অগ্রসর হইবে। আর্থিক পদ্ধতির উদ্দেশ্য হইবে ব্যাংক সৃষ্ট অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করা এবং ফাট্‌কাবাজীর উদ্দেশ্যে ব্যাংক যাহাতে ব্যবসায়ীদের কোনোরূপ ঋণ না দেয় তাহা লক্ষ্য রাখা। শুধুমাত্র আর্থিক পদ্ধতি ও ফিসক্যাল পদ্ধতির দ্বারা বিভিন্ন দামের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক স্থির করা অথবা নিম্ন আয় সম্পন্ন ব্যক্তির কষ্টের লাঘব করা সম্ভবপর নাও হইতে পারে। সেইজন্য প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনও হইতে পারে। জীবনধারণের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম মোটামুটি স্থির রাখিতে হইবে এবং বিলাস দ্রব্য বা আরামপ্রদ দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের বৃদ্ধি সহ্য করিতে হইবে।

প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ

উপযুক্ত দাম-নীতি নির্ধারণে বাণিজ্যসংক্রান্ত নীতিরও (commercial policy) একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে। আভ্যন্তরীণ ঘাট্‌তি পূরণে ইহা সহায়ক। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য রপ্তানী বৃদ্ধি করার প্রয়োজন ভারতের সর্বদাই রহিয়াছে। ইহার দরুণ আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য কিছু-পরিমাণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি মানিয়া লইতেই হইবে।

ইস্পাত, সিমেণ্ট, চিনি, তুলা, কয়লা, পাট, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি দ্রব্যসমূহের দাম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরকারের থাকিবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য আইন (Essential Commodities Act) এবং শিল্প সম্প্রসারণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন (Industrial Development and Regulation Act) অনুসারে বহু দ্রব্যের দাম ও বণ্টন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

আমাদের দেশে নিম্ন আয়ের জনগণ খাদ্যদ্রব্যের উপর তাহাদের আয়ের বৃহত্তর অংশ ব্যয় করে বলিয়া খাদ্যের দাম স্থির রাখা অত্যাবশ্যক। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে এই ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অথবা পরিপূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণ কোনোটাই সম্ভবপর নয়। দুইটি লক্ষ্য মনে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমতঃ কৃষক তাহার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাইবে। কৃষক অন্ততঃ এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকিবে যে তাহার উৎপাদিত দ্রব্যের দাম ন্যায়সঙ্গত সর্বনিম্ন দামের নীচে নামিবে না। অপরপক্ষে ভোগকারীর স্বার্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য তাহাকে যেন অধিক দাম না দিতে হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনায় দামনীতি (Price Policy for the Fourth Plan): দামনীতির দুইটি মূল লক্ষ্যের কথা চতুর্থ পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে কৃষকগণ যেন তাহাদের কৃষিউৎপাদনের জন্য উপযুক্ত দাম পায়। ইহা উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হইবে। অপরদিকে বস্ত্র, তৈল প্রভৃতির দাম যেন স্থিতিশীল থাকে। অনুরূপভাবে শিল্পে ব্যবহৃত একাধিক ব্যবহার সম্পন্ন কাঁচামালের

দাম যাহাতে স্থিতিশীল থাকে তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দাম স্থিতিশীল রাখিবার জন্য স্টেটট্রেডিং এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দিবে। আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখিবার জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় কোনোরূপ ঘাটতি ব্যয় করা হইবে না।

অবশ্য সরকারী নীতি কিছু পরিমাণে স্ববিরোধী এবং সামঞ্জস্যহীন। ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেটে সরকারী আয়-ব্যয়ে সমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে করের হার ও রেল-ভাড়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার ফলে স্বাভাবিক নীতিতেই মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে।

উপসংহারে বলিতে পারা যায় যে দামের অনমনীয়তা উন্নয়নের সহিত সামঞ্জস্যহীন এবং কিছু দাম অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। সরকার সমবায়ের মাধ্যমে ফসল কেনাবেচা করিবেন যাহাতে বাঞ্ছিত দাম বাজারে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মজুতদারী ও মুনাফা-শিকার প্রভৃতি সমাজবিরোধী কাজগুলি সম্প্রসারিত না হইতে পারে।

শক্তি সম্পদ (Power Resources): শক্তি সম্পদ বলিতে কয়লা, পেট্রোলিয়াম, জলবিদ্যুৎ এবং আণবিক শক্তিকে বুঝায়।

কয়লা (Coal): কয়লা একটি প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ। ইহা বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের অন্যতম উৎস। ভারতে প্রধান কয়লা উৎপাদক অঞ্চলগুলি রহিয়াছে পশ্চিম বাংলা এবং বিহারে। এই দুইটি রাজ্যই শতকরা ৮২ ভাগ কয়লার যোগান দেয়। অপর কয়লা উৎপাদক অঞ্চলগুলি রহিয়াছে মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, হায়দরাবাদ এবং আসামে। ভারতে মোট কলিয়ারির সংখ্যা ১০০০। অনুমান করা হইয়াছে যে ২০,০০০ মিলিয়ন টন কয়লা রক্ষিত আছে এবং ইহার মধ্যে ৫০০০ মিলিয়ন টন উৎকৃষ্ট কয়লা। অবশ্য কোক কয়লার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম · মাত্র ২০০০ টনের মতো। মোট কয়লার পরিমাণ শিল্পায়নের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হইলেও কোক কয়লার পরিমাণ সন্তোষজনক নয়। সুতরাং ভবিষ্যতে ওই জাতীয় কয়লা সংরক্ষণের উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রধান উৎপাদক অঞ্চল

১৯৫১ সালে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ ছিল ৩৪ মিলিয়ন টন। ১৯৫৫ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮ মিলিয়ন টন। রেল সর্বাপেক্ষা বেশী কয়লা ব্যবহার করে—মোট উৎপাদনের ৩১ ভাগ। মোট ধাতু নিষ্কাষক কয়লার ৪০ ভাগ রেল, ২১ ভাগ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, ১৩ ভাগ রপ্তানী এবং বাকী অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়। লৌহ ও ইস্পাতশিল্প ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে ধাতু নিষ্কাষক কয়লার ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়। কয়লা ব্যবহারের পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য রেলপথ যথাসম্ভব ব্যবস্থা (যথা দ্রুত বৈদ্যুতিকরণ ইত্যাদি) গ্রহণ করিতেছে।

রেল সর্বাপেক্ষা বেশী কয়লা ব্যবহার করে

কোক কয়লা সংরক্ষণের প্রয়োজনে পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন (১) ধাতু নিষ্কাষক কয়লা উৎপাদন বর্তমান হারে স্থির থাকিবে কিন্তু যেসব খনি বৃহৎ মূলধন ব্যতিরেকে খুলিবার চেষ্টা করিতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে। নূতন খনি খোলা চলিবে না। (২) স্টোইং, ব্লেণ্ডিং

কোক কয়লা সংরক্ষণ

এবং ধৌতকরণ আইন দ্বারা বলবৎ করিতে হইবে। (৩) যে সব কাজে কোক কয়লার ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় নয়, সেখানে কোক কয়লার পরিবর্তে অন্য কয়লা ব্যবহার করিতে হইবে। (৪) লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে যে পরিমাণ কোক কয়লার প্রয়োজন তদতিরিক্ত কোক কয়লা উত্তোলন করা হইলে উহা রপ্তানী করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে হইবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা: ভারতে ১০০টির মতো কয়লা খনি অঞ্চল রহিয়াছে—এইসব খনি অঞ্চলগুলি পরিমাপ করিতে এবং উহাদের সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে। ভারতীয় কয়লার একটি বৈজ্ঞানিক শ্রেণীকরণ করিতে হইবে। এই শ্রেণীবিভাজন বিভিন্ন শিল্পে কয়লা বণ্টনে সহায়তা করিবে। ইহার ফলে নির্দিষ্ট গ্রেডের কয়লা কেনাবেচা করা সহজসাধ্য হইবে।

বর্তমানে রেলপথে ৯০ ভাগ কয়লা পরিবাহিত হয়। নাব্য জলপথ নাই বলিয়া কয়লার টন প্রতি পরিবহন ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। কয়লা ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে নিকটবর্তী কয়লাখনি অঞ্চল হইতে ক্রেতাদের উহা সরবরাহ করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে রেওয়া, হায়দরাবাদ, আসাম ও মধ্যপ্রদেশের কোরব্যা কয়লা খনির উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত, দক্ষিণ আর্কটে যে বিস্তীর্ণ লিগনাইট কয়লা ভূগর্ভে রহিয়াছে উহা উত্তোলনের জন্য পরিকল্পনা করা হইয়াছে। নিয়াভেলি লিগনাইট পরিকল্পনায় লিগনাইট কয়লার উৎপাদন ৩.৫ মিলিয়ন টন হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৪.৮ মিলিয়ন টন করিতে হইবে। মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার যন্ত্রিকরণ, ভবিষ্যৎ খনির পরিকল্পনা, ফুরণগত মজুরি এবং উৎপাদনের সহিত বোনাসের পরিকল্পনা বিবেচনা করিতেছেন।

পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে উচ্চস্তরের কোক কয়লা সংরক্ষণের জন্য আইন পাশ করা প্রয়োজন এবং কয়লা শিল্পের সমস্যা লইয়া আলোচনা করিবার জন্য কোল বোর্ড গঠন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে Coal Mines Act পাশ করা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার একটি কোল বোর্ড গঠন করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে বলা হইয়াছে যে সকল নূতন কয়লাখনি পাবলিক সেক্টরে খোলা হইবে। কোল ওয়াসারিজ কমিটি (Coal Washeries Committee) সুপারিশ করিয়াছেন যে সকল ধাতু নিষ্কাষক কয়লা ধৌতকরণ করিতে হইবে। প্রাইভেট সেকটারের অধীনে জামাদোবা, পশ্চিম বোকারো এবং লড্‌না কলিয়ারীতে একটি করিয়া মোট তিনটি ধৌতাগার রহিয়াছে এবং ইহারা টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী এবং ইণ্ডিয়ান লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানীকে ধৌত কয়লা যোগান দেয়। কারগালিতে ২.২ মিলিয়ন টন কয়লা ধৌত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ধৌতাগার স্থাপন করা হইয়াছে। দুর্গাপুরে আর একটি ধৌতাগার স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ধৌতাগার নির্মাণের জন্য ৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

কোল বোর্ড

ধৌতাগার

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালে ৯৭ মিলিয়ন টন কয়লার প্রয়োজন হইবে। প্রয়োজন অধিক বলিয়া নূতন খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের প্রয়োজন হইবে। ইহার জন্য. প্রভূত মূলধন বিনিয়োগ করিতে হইবে। ১৯৭০-৭১ সালে ১৬০ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষমাত্রা ধার্য আছে।

কয়লার প্রয়োজন

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে কয়লার প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়া বলিতে হয় যে কোক কয়লার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অল্প—২৪০০ মিলিয়ন টন মাত্র। অপরপক্ষে, লৌহ আকরিকের পরিমাণ অনেক বেশী। সেই কারণে এমন একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাহাতে কোক কয়লার ব্যবহার হ্রাস ও ইহার সংরক্ষণ সম্ভবপর হয়। ১৯৫২ সালে ধাতু নিষ্কাশক এবং কোক কয়লার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে Coal Mines (Conservation and Safety) Act পাশ করা হইয়াছে।

খনিজ তৈল (Mineral Oil) : প্রকৃতিদত্ত শক্তিসম্পদের মধ্যে কয়লার পরই খনিজ তৈলের স্থান। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে খনিজ তৈল ও উহার উপজাত সামগ্রীর ব্যবহারের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু পেট্রোলিয়াম ব্যবহারের পরিমাণ ৬৬৪ গ্যালন আর ভারতে উহা মাত্র ৪ গ্যালন। ভারতে খনিজ তৈল ব্যবহারের পরিমাণ অতি সামান্য হইলেও আভ্যন্তরীণ উৎপাদন মোট চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত অল্প। ভারতে খনিজ তৈলের উৎপাদন পৃথিবীর মোট উৎপাদনের এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। বর্তমানে আসামের ডিগবয় খনি অঞ্চল হইতেই শুধুমাত্র খনিজ তৈল আহরণ করা হয়। ডিগবয় হইতে বৎসরে ৪ লক্ষ টন অপরিশ্রুত (crude) তৈল পাওয়া যায়—ইহা দেশের মোট চাহিদার ৬% মাত্র। বাকী আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টন খনিজ তৈল আমদানী করিতে হয়। ভারতে তৈলের ঘাটতি পূরণের তিনটি উপায় রহিয়াছে।

আভ্যন্তরীণ উৎপাদন নগণ্য

প্রথমতঃ, জার্মানীর মতো ভারতেও নিম্নস্তরের কয়লা হইতে সিন্থেটিক পেট্রোল তৈয়ারীর জন্য কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে। অবশ্য ইহার জন্য প্রয়োজন বহু মূল্যবান যন্ত্র এবং সুদক্ষ কারিগর। দ্বিতীয় উপায় হইল গুড়, আলু ইত্যাদি হইতে শক্তি সুরাসার (power alcohol) উৎপাদন করিবার জন্য কারখানা স্থাপন করা। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে তৈল উৎপাদনের প্রয়াস ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে এবং বর্তমানে শতকরা ২৫ ভাগ গুড় শক্তি সুরাসার তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হইতেছে।

ঘাটতি পূরণের তিনটি উপায়

তৃতীয় পদ্ধতি হইল ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য চালাইয়া নূতন তৈলখনি অঞ্চল আবিষ্কার করা। আসামের নাহারকটিয়া ও মোরাণে নূতন তৈলখনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। নূতন দুইটি খনি অঞ্চল হইতে যে তৈল পাওয়া যাইবে, আশা করা যায় তাহার ফলে আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতেই দেশের চাহিদার শতকরা ৩০ ভাগ মিটানো যাইবে। গুজরাটের কাম্বে অঞ্চলেও তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

১৯৫৮ সালে ভারতীয় খনিজ তৈল শিল্পে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৪৪ কোটি টাকা। উহার মধ্যে বিদেশী মূলধনে পরিমাণ ছিল ২১৪ কোটি টাকার মতো। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খনিজ তৈলের জন্য ২৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ হইল ১১৫ কোটি টাকা।

বিদেশী মূলধনের প্রাধান্য

খনিজ তৈল পরিশোধনের জন্য আসামের ডিগবয় অঞ্চলে আসাম অয়েল কোম্পানীর একটি তৈল শোধনাগার (oil refinery) ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় বোম্বাইএর ট্রম্বেতে দুইটি তৈল শোধনাগার স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশাখাপত্তমে আর একটি তৈল শোধনাগার স্থাপন করা হয়। এইগুলি সবই বেসরকারী প্রচেষ্টায় গঠিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী প্রচেষ্টায় আসামের নূনমাটি এবং বিহারের বারাউনিতে দুইটি শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে।

শোধনাগার

তৃতীয় পরিকল্পনায় খনিজ তৈলের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত বিধিব্যবস্থার নির্দেশ রহিয়াছে। (১) অয়েল ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক আসামের লীজ অঞ্চলে অনুসন্ধান চালাইতে হইবে। (২) অয়েল এবং ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন কর্তৃক তৈল খনি অঞ্চল আবিষ্কার করিবার জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। (৩) গৌহাটি ও বারাউনিতে যে দুইটি শোধনাগার নির্মাণকার্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে স্বরু হইয়াছে তাহাদের নির্মাণকার্য সমাধা করিতে এবং গুজরাটে একটি নূতন শোধনাগার স্থাপন করিতে হইবে। (৪) পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য স্থানান্তরের জন্য পাইপ লাইন স্থাপন করিতে হইবে। (৫) সরকারী উদ্যোগে গঠিত শোধনাগার হইতে পরিশ্রুত তৈল বণ্টনের জন্য সরকারী এজেন্সি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

চতুর্থ পরিকল্পনায় পেট্রোলিয়ম শোধনের লক্ষমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে ২০ মিলিয়ন টন।

জলবিদ্যুৎ (Hydro-electricity): শক্তির উৎস হিসাবে বিদ্যুতের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান যুগ-জীবনের বহুপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যুতের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, টেলিফোন ইত্যাদির প্রচলন বিদ্যুতই সম্ভবপর করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যুৎ, বিশেষ করিয়া জলবিদ্যুৎ সুলভ শক্তির উৎস বলিয়া শিল্পোন্নয়নের জন্য উহা একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। কতকগুলি শিল্প রহিয়াছে যাহাদের উন্নয়ন সুলভ শক্তির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এই কারণেই সোভিয়েট রাশিয়ার প্রথম দিককার কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপরই প্রধানতঃ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল।

ভারতে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে।

প্রথমতঃ, ভারতে খনিজ তৈল সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম, সেইকারণে উহা কোনোদিনই শক্তির উৎস হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিতে পারিবে না। তাহা ছাড়া উহা জলবিদ্যুতের মতো সুলভও নয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের সর্বত্র কয়লা পাওয়া যায় না। কয়লা দেশের পূর্বাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থাকায় সারা দেশের সুসম শিল্পায়নের পক্ষে ইহা একটি বাধাস্বরূপ। দূরবর্তী পশ্চিমাঞ্চলে রেলপথে কয়লা লইয়া যাওয়ায় কয়লার দাম অনেক বাড়িয়া যায়। অথচ দেশের প্রায় সর্বত্র নদনদী আছে। তৃতীয়তঃ, কৃষির দিক হইতেও জলবিদ্যুতের উৎপাদন প্রয়োজনীয়। সস্তায় বিদ্যুৎ পাওয়া যাইলে সস্তায় কৃত্রিম সার উৎপাদন করিয়া কৃষককে সরবরাহ করা যাইবে। জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা সমন্বিত বিভিন্ন বহুমুখীণ পরিকল্পনা সুলভ শক্তি সরবরাহ করিবে। চতুর্থতঃ, সুলভ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের বিকাশে সহায়তা করিবে। জাপান ও সুইজারল্যাণ্ডে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নতির মূল কারণও হইতেছে সুলভ জলবিদ্যুতের যোগান। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সুলভ জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করিলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাইবে। পঞ্চমতঃ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচও সবাপেক্ষা কম। কয়লা দ্বারা এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যয় হয় ৩ পয়সা, ডিজেল তেলে ২৫ পয়সা আর জলবিদ্যুৎ দ্বারা মাত্র ২ পয়সা।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা

অপরাপরশক্তি অপেক্ষা জলবিদ্যুতের সুবিধা

ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু বর্তমান উৎপাদন পর্যাপ্ত নয়। ১৮৯৭ সালে প্রথম দার্জিলিং-এ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং উহার পর ১৯০২ সালে মহীশূর রাজ্যে জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ইহার পর প্রায় সকল সকল রাজ্যেই কিছু জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। টাটার প্রচেষ্টায় বোম্বাই-এ লোনাভালা, অন্ধ্র ভেলী এবং নীলামূলা—এই তিনটি বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং ইহারা রেলপথ এবং বোম্বাই-এর শিল্প-কারখানায় সুলভে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করিয়া থাকে। মহীশূরে শিবসমুদ্রমে অবস্থিত কাবেরী নদী পরিকল্পনা হইতে কোলার স্বর্ণখনি, মহীশূর, বাঙ্গালোর, এবং আরও দুইশত শহর ও গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইয়া থাকে। মাদ্রাজে, পাইকারা জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা মেটুর বাঁধ পরিকল্পনা এবং পাপনাশম জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা—এই তিনটি জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা রহিয়াছে। পাঞ্জাবে মান্দী জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনায় ১১৮০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। উত্তরপ্রদেশে গঙ্গাখাল জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা হইতে ১৪টি জেলার ৯৩টি শহরে সুলভে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে তিনটি জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা রহিয়াছে।

বর্তমান উৎপাদন অপর্যাপ্ত

উল্লিখিত উন্নতি সত্বেও ভারতের যে সম্ভাবা জলশক্তি রহিয়াছে তাহার অতি ক্ষুদ্র শতাংশ ব্যবহার করা হইয়াছে। সেই কারণে মাথাপিছু বৈদ্যুতিক শক্তিভোগের

পরিমাণও অত্যন্ত কম। ভারতে মাথাপিছু বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপাদন মাত্র ৩৯ কিলোওয়াট, অপরপক্ষে উহা ক্যানাডায় ৩৮৩৬ কিলোওয়াট, যুক্তরাষ্ট্রে ২৮৮০ কিলোওয়াট, সুইডেনে ২৪০০ কিলোওয়াট এবং যুক্তরাজ্যে উহা ৮৩২ কিলোওয়াট। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে সবই নগরাঞ্চলে। মোট উৎপাদিত শক্তির ৪০ ভাগ কলিকাতা এবং বোম্বাই ভোগ করে এবং ২০ হাজার বা তদূর্ধ জনসংখ্যাসমন্বিত নগরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রাম্য এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নগণ্য এবং প্রতি সাতটি গ্রামের মধ্যে দুইটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত প্রায় ২২৯৮৫টি গ্রাম ও নগরে বৈদ্যুতিকরণ করা হইয়াছিল।

মাথাপিছু ভোগ অতি অল্প

সাম্প্রতিককালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকার অধিক পরিমাণে দৃষ্টি দিয়াছেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে অতিরিক্ত ১'৪৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হইবে। পরিকল্পনাগুলির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

পাঞ্জাবে ভাকরা-নাঙ্গল পরিকল্পনা একটি উল্লেখযোগ্য জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা এবং ইহার উৎপাদন ক্ষমতা হইবে ৬০৪০০০ কিলোওয়াট। ইহার ফলে পাঞ্জাবের ৬৭টি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ৬৭ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা হইল দামোদর বাঁধ পরিকল্পনা, ইহার ফলে ৩০০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে। উড়িষ্যায় হিরাকুণ্ড বাঁধ পরিকল্পনার ফলে মহানদীতে বাঁধ দিয়া ১২৩০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে। বিহারের কোশী পরিকল্পনায় ১৮ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভবপর হইবে। অন্ধ্র এবং মহীশূর সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফল হইল তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা। উত্তরপ্রদেশে পিপরি বাঁধ এবং শক্তি পরিকল্পনায় রিহান্দ নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া ২৩০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ওই রাজ্যেই যমুনা জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার ফলে ৫০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভবপর হইবে। বোম্বাই-এ কনা জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনায় ২৫০,০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দামোদর পরিকল্পনা

এই সকল বৃহৎ পরিকল্পনা ব্যতীত, রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অনেক ছোট ছোট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে বিদ্যুৎ সরবরাহ আইন পাশ করেন। এই আইনানুসারে রাষ্ট্র বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল যথাক্রমে ২'৩০ মিলিয়ন কিলোওয়াট, ৩'৪২ মিলিয়ন কিলোওয়াট এবং ৫'৭০ মিলিয়ন কিলোওয়াট। ১৯৭৫-৭৬ সালে দেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাণ হইবে ৩৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১০১৭ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১০৮৯ কোটী টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ৯৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

আণবিক শক্তি (Atomic Power) ঃ সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত পরমাণু শক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক অফুরন্ত উৎস। আণবিক শক্তির মধ্যেই আগামীকালের অফুরন্ত বিদ্যুৎশক্তির সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। কয়লা বা খনিজ তৈল অফুরন্ত নয়—উহার পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। সেই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আজ জলশক্তি এবং আণবিক শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষ মনোযোগী। যে অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায় না এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী নদনদী নাই সেই সকল অঞ্চলে আণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত। আণবিকশক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়াম ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে।

আণবিকশক্তির সুবিধা

বোম্বাই-এর নিকট তারাপুরে আণবিকশক্তি উৎপাদনের প্রাথমিক কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় আণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য ৫১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং ৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য আছে।

খনিজ সম্পদ (Mineral Resources) ঃ দেশের সম্পদ নির্ভর করে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের উপর। খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ এবং শক্তিসম্পদ এই তিন ধরণের সম্পদ অর্থনৈতিক আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ভারতের খনিজ সম্পদগুলিকে তাহাদের বাণিজ্যিক গুরুত্ব হিসাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—কতকগুলি খনিজ পদার্থ প্রয়োজনাতিরিক্ত বলিয়া রপ্তানী করা হয়। কতকগুলিতে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কতকগুলি খনিজ দ্রব্য প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প বলিয়া আমদানী করা হয়। নিম্নে উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদগুলি বর্ণনা করা হইল।

লৌহ আকরিক (Iron Ore) ঃ আধুনিকযুগে লৌহের গুরুত্ব এত বেশী যে ইহাকে 'লৌহ যুগ' বলিয়া বর্ণনা করিলে অত্যুক্তি করা হয় না। যন্ত্রপাতি, কলকব্জা এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের বহুপ্রকার সামগ্রী লৌহ নির্মিত। আকরিক লৌহে ভারত বিশেষ সমৃদ্ধ। ভূতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে ভারতে এক হাজার কোটি টন আকরিক লৌহ ভূগর্ভে সঞ্চিত রহিয়াছে। সারা বিশ্বের মোট সঞ্চিত লৌহ আকরিকের এক-চতুর্থাংশ ভারতে রহিয়াছে। ভারতীয় লৌহ অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। ইহাদের মধ্যে ৫৫ ভাগ হইতে ৭০ ভাগের মত লৌহ পাওয়া যায়। ভারতের লৌহ অঞ্চলগুলি মাদ্রাজের সালেম অঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশের চান্দা অঞ্চলে, পশ্চিমবাংলার রাণীগঞ্জ অঞ্চলে এবং উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ অঞ্চলে ও ছোট-নাগপুরের মানভূম অঞ্চলে বিস্তৃত রহিয়াছে। লৌহ খনির নিকট পাথুরিয়া কয়লা ও

সঞ্চিত লৌহের পরিমাণ

পাথুরিয়া চূণ সহজপ্রাপ্য না হইলে খনিজ ধাতু গলাইয়া ব্যবহারোপযোগী লৌহদ্রব্য প্রস্তুত করা দুঃসাধ্য। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যায় এই তিন দ্রব্য সহজ প্রাপ্য বলিয়া বরাকরের নিকট বার্ণপুর ও হীরাপুর এবং বিহারের জামসেদপুরে লৌহকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। লৌহ ও ইস্পাতশিল্প ভারতের বৃহত্তম সুগঠিত শিল্প। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দুই কোটি টন লৌহ আকরিকের প্রয়োজন হইবে এবং ইহার মধ্যে এক কোটি টন লৌহ আকরিক রপ্তানী হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় লৌহ আকরিকের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৫৭ মিলিয়ন টনে ধার্য করা হইয়াছে।

ম্যাংগানিজ (Manganese) : ম্যাংগানিজ উত্তোলনে প্রথম স্থান অধিকার করে রাশিয়া, দ্বিতীয় স্থান ভারত। ইস্পাত ও কাচ প্রস্তুত করিতে এবং চীনামাটির বাসন প্রভৃতি মসৃণ করিতে ম্যাংগানিজের প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া ইহা রাসায়নিক শিল্পে এবং ড্রাই ব্যাটারী নির্মাণ করিতে ইহার প্রয়োজন হয়। মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, বিহার, বোম্বাই ও মহীশূর রাজ্যে ম্যাংগানিজ পাওয়া যায়। ভারতে ভূগর্ভে সঞ্চিত ম্যাংগানিজ আকরের পরিমাণ ১৮ কোটি টন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বর্তমানে বাৎসরিক গড় উৎপাদন ১২ হইতে ১৩ লক্ষ টন। বর্তমানে অধিকাংশ উত্তোলিত ম্যাংগানিজ রপ্তানী না হইয়া শিল্পে ব্যবহৃত হইতেছে।

ভারত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে

অভ্র (Mica) : অভ্র উৎপাদনে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট অভ্র পাত উৎপাদনের ৭৫ ভাগ ভারতে উত্তোলিত হয়। ইহা একটি অ-ধাতব খনিজ (non-metalic mineral) পদার্থ। বিহারের অন্তর্গত হাজারিবাগ ও গয়া অঞ্চলে এবং মাদ্রাজের নেলোর অঞ্চলে বহুবিস্তৃত অভ্রখনি রহিয়াছে। ইহা ছাড়া মাদ্রাজ ও রাজস্থানেও অভ্র পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বিদ্যুৎ-শিল্পেই অভ্র ব্যবহৃত হয়। যে সকল শিল্পে অভ্রের ব্যবহার হয় ভারতে তাহাদের সেরূপ উন্নতি হয় নাই বলিয়া অধিকাংশ অভ্রই রপ্তানী হইয়া যায়। ১৯৬১ সালে অভ্রের উৎপাদন ছিল ২৮০০০ টন।

অধিকাংশই রপ্তানী হয়

তাম্র (Copper) : বিহারের সিংভূম অঞ্চলে তাম্র উত্তোলিত হয়। সামান্য পরিমাণে আসাম, পশ্চিমবংগ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর এবং রাজস্থানেও তাম্র পাওয়া যায় কিন্তু ইহাদের কোনো বাণিজ্যিক গুরুত্ব নাই। ভারতে তাম্রের বাৎসরিক উৎপাদন হইল ৮০০০ টন কিন্তু মোট প্রয়োজন ২৬০০০ টনের মতো। রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক শিল্পে, জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ও নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী নির্মাণে তাম্রের ব্যবহার হইয়া থাকে।

স্বর্ণ (Gold) : পৃথিবীতে যত স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহার ১/১০৫ অংশ ভারতে উৎপন্ন হয়। ১৯৩৬ সালে স্বর্ণ উৎপাদনে ভারতের স্থান ছিল চতুর্দশ। ভারতের প্রায় সমস্ত স্বর্ণ মহীশূরের অন্তর্গত কোলার স্বর্ণখনি হইতে পাওয়া যায়। ১৯৬১ সালে ভারত ৪৮৬৮ কিলোগ্রাম স্বর্ণ উৎপাদন করে।

বক্সাইট (Bauxite) : এ্যালুমিনিয়াম তৈয়ারীর কাজে বক্সাইটের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন যানবাহনের বডি নির্মাণে, এবং নানাবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্মাণে বক্সাইটের প্রয়োজন হয়। বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমঘাট অঞ্চলে বক্সাইট উৎপাদিত হয়। সঞ্চিত বক্সাইটের পরিমাণ ২৫ কোটি টনের মত হইলেও উচ্চশ্রেণীর বক্সাইটের পরিমাণ খুবই কম। ১৯৬১ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৭৬০০০ টন। এতকাল পর্যন্ত সুলভ বিদ্যুৎশক্তির অভাব এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ ছিল। অবশ্য বিদ্যুৎশক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সেই বাধা ক্রমশই দূর হইতেছে।

লবণ (Salt) : মাদ্রাজ, বোম্বাই, উড়িষ্যা এবং কেরলে সমুদ্রের জল শুকাইয়া এবং সম্বর হ্রদের লোনা জল শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। হিমালয় প্রদেশের মাণ্ডিতে লবণের খনি রহিয়াছে।

জিপসাম (Gypsum) : সিমেণ্ট ও রাসায়নিক সার প্রস্তুত করিতে জিপসামের প্রয়োজন হয়। জিপসামের মধ্যে গন্ধক থাকে। রাজস্থানে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জিপসাম পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যেও কিছু পরিমাণে জিপসাম পাওয়া যায়। ভারতে সঞ্চিত জিপসামের পরিমাণ ১০০ কোটি টনের মত।

চূণাপাথর (Limestone) : লৌহ গলাইবার কাজে, সিমেণ্ট উৎপাদনে এবং ঘরবাড়ী নির্মাণে চূণাপাথরের প্রয়োজন হয়। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ইত্যাদি অঞ্চলে চূণাপাথর পাওয়া যায়।

ইউরেনিয়াম (Uranium) : আণবিক শক্তি উৎপাদন হিসাবে ইউরেনিয়ামের গুরুত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে কেরলে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার উৎপাদনবৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

ক্রোমাইট (Chromite) : লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে যে সকল লৌহ খাদ (ferro alloy) ব্যবহৃত হয় ক্রোমাইট তাহার অন্যতম। ইহা রং করা (dying) এবং কেলিকো প্রিন্টিং ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। ক্রোমাইট হইতে ক্রোমিয়াম পাওয়া যায়। ইহা মহীশূর, বিহার এবং উড়িষ্যা অঞ্চলে পাওয়া যায়। ১৯৬১ সালে ৪৬০০০ টন ক্রোমাইট উৎপাদিত হইয়াছিল।

ইলমেনাইট (Ilmenite) : বর্তমানে ভারত প্রধান ইলমেনাইট উৎপাদক দেশ। ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে সমুদ্র তটভূমির বালুকারাশিতে ইলমেনাইট পাওয়া যায়। ভারত প্রচুর পরিমাণে ইলমেনাইট রপ্তানি করিয়া থাকে। বাৎসরিক উৎপাদন হার হইল ১৭৪০০০ টন।

এই সকল খনিজ পদার্থ ছাড়াও ভারত কিছুপরিমাণে ম্যাগনেসাইট, কিনাইট, মোনাজিট, রৌপ্য, সিসক, সালফার, টিন, দস্তা প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া থাকে।

বনসম্পদ ও সরকারের বননীতি (Forest Resources and Forest Policy of the Government of India).

অরণ্য দেশের একটি মূলবান প্রাকৃতিক সম্পদ। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে সুদূর প্রভাব বিস্তারকারী একটি মূল্যবান সম্পদ এই অরণ্যভূমি। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা অরণ্যকেন্দ্রিক ছিল এবং তখন ভারতভূমির অধিকাংশ অরণ্যে আবৃত ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অরণ্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবানুযায়ী ভারতের বনভূমির পরিমাণ হইল মোট জমির শতকরা ২২ ভাগ ইহার মধ্যে ৪ ভাগ অনুৎপাদনশীল, কারণ উহা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত।

ভারতীয় বনভূমির নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি উল্লেখযোগ্য :

সমস্যা

[এক] আয়তনের স্বল্পতা : ভারতে ২.৭৪ লক্ষ বর্গমাইল অরণ্যাবৃত অর্থাৎ মোট ভূমিভাগের ২২ ভাগ বন। অপরপক্ষে রাশিয়ার মোট স্থলভাগের ৪০ ভাগ এবং আমেরিকার মোট স্থলভাগের ৩৩ ভাগ বন। ওই সকলদেশ বনভূমির আরও সম্প্রসারণ চাহিতেছে। ভারতে বনভূমির আয়তন শুধু অল্পই নয়, ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উহা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। বনভূমির স্বল্পতার আরও একটি কারণ যে বৃটিশযুগে ইহার প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা দেখান হইয়াছে। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে যথেচ্ছভাবে বনভূমি নষ্ট করা হইয়াছে।

[দুই] অসমবন্টন : বনভূমির দ্বিতীয় সমস্যা হইল ইহা বিভিন্নরাজ্যে অসমানভাবে বন্টিত ; কোনো কোনো রাজ্যে বনভূমি প্রয়োজনের তুলনায় বেশী বলিয়া মনে হয় আবার কোনোকোনো রাজ্যে উহার পরিমাণ বিপজ্জনকভাবে কম। রাজস্থানে বনভূমির স্বল্পতার জন্যই মরুভূমি দ্রুত সম্প্রসারিত হইতেছে।

[তিন] স্বল্প উৎপাদনশীলতা : ভারতের বন হইতে কাঠ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খুবই কম পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতের প্রতি একর বন হইতে বৎসরে ২.৫ কিউবিক ফুট কাঠ পাওয়া যায়, অপরপক্ষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি একর বন হইতে ১৮.২ কিউবিক ফুট কাঠ পাওয়া যায়। ভারতের মোট বনভূমির শতকরা ৭ ভাগ অনুৎপাদনশীল কারণ ইহারা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত।

[চার] যানবাহনের অসুবিধা : ভারতের যেসব অঞ্চলে নিবিড় বনভূমি আছে তাহার একাংশ যানবাহনের অভাবে দুর্গম। ওইসব অঞ্চলে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি করিতে পারিলে অধিক পরিমাণে কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে।

উচ্চতা ও উত্তাপ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ

বৃষ্টিপাত, ভূমিভাগের উচ্চতা এবং উত্তাপের তারতম্য অনুসারে ভারতের বনভূমিকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। (১) বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৮০"র অধিক হইলে সেই সকল স্থানে চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি দেখিতে পাওয়া যায় ; (২) যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০" হইতে ৮০" সেই সকল স্থানে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) যে সকল অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০" হইতে ৪০" পরিমাণ, সেই সকল স্থানে তৃণ ও গুল্মভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) যে সব অঞ্চলে ২০"র কম বৃষ্টিপাত সেই সকল স্থানে ছোট ছোট কাঁটা গাছ জন্মায়। (৫) সমুদ্রের উপকূলে ও নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে

জলাভূমির অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অঞ্চলে তাল, নারিকেল ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মায়।

সরকার কর্তৃক শ্রেণীকরণ

ভারত সরকার বনভূমিকে তিনভাগে ভাগ করিয়াছে। প্রথমতঃ, সংরক্ষিত বন (Reserve forest)—জনসাধারণ এই বন ব্যবহার করিতে পারে না, ইহা সরকারী তত্ত্বাবধানে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, আশ্রিত বন (Protected forest) এই বন সাধারণে ব্যবহার করিতে পারে কিন্তু ইহার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা থাকে সরকারের হাতে। তৃতীয়তঃ, সাধারণ বন (Public forest)—এই বন সকলেরই ব্যবহারযোগ্য।

সুবিধা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

বনভূমি হইতে দুইশ্রেণীর সুবিধা পাওয়া যায়—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। বনভূমির প্রত্যক্ষ সুবিধা পাওয়া যায় বনজ দ্রব্যসামগ্রী হইতে। ঘরবাড়ী তৈয়ারীর কাঠ, রেলপথের কাঠ, বাঁশ, কাগজ প্রভৃতি শিল্পের কাঁচা মাল বন হইতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া চন্দন, রজন, লাক্ষা, হরীতকী, ধুনা প্রভৃতি উপজাত দ্রব্যাদি বন হইতে পাওয়া যায়। গো মহিষাদির চারণক্ষেত্র হিসাবে এবং গবাদি পশুর খাদ্যের যোগানদার হিসাবে বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। বন হইতে, খেজুর, তাল, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি উপাদেয় ফল আহরণ করা হয়। পরিশেষে বনজশিল্পে কাঠুরিয়া, মিস্ত্রী, পত্রগুল্ম সংগ্রহকারী প্রভৃতি বহুলোক নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা অর্জন করে। বনভূমি হইতে সরকারেরও বেশ কিছু আয় হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে বনভূমি হইতে সরকারের আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৬½ কোটি টাকা। ভারতে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার লোক বন ও বনসংক্রান্ত কাজ হইতে জীবিকার সংস্থান করে।

বনভূমির প্রত্যক্ষ সুবিধা অপেক্ষা পরোক্ষ সুবিধা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বনভূমির প্রভাবে আবহাওয়ার চরমভাব নষ্ট হয় এবং উহা আর্দ্র থাকে। বায়ুর আর্দ্রতা বৃদ্ধির অনুকূল বলিয়া বনভূমি অধিক বৃষ্টিপাত ঘটায়। ইহা ছাড়া বৃক্ষলতার শিকড়ে মাটির বন্ধন দৃঢ় হয় বলিয়া বনভূমি ভূমিক্ষয় (Soil erosion) নিবারণ করে, মরুভূমির প্রসার রোধ করে এবং বন্যার বেগ প্রতিহত করে।

সরকারের বননীতি

পূর্বেই দেখিয়াছি যে বর্তমানে ভারতে মোট ভূমিভাগের ২২ ভাগ মাত্র বনাঞ্চল, এবং উহা অসমভাবে বণ্টিত। বিশেষজ্ঞদিগের মত হইতেছে যে দেশের সুসম উন্নতির জন্য অন্ততঃ মোট জমির এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। ১৯৫২ সালে পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শানুযায়ী ভারত সরকার যে বননীতি গ্রহণ করেন তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল দুইটি—বনসম্পদের স্থায়ী উন্নতি বিধানের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং ক্রমবর্ধমান কাঠের চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থা করা। সরকার তাহার বননীতিকে কার্যকরী করার জন্য নিম্নলিখিত পরিকল্পনা অনুসারে কর্মসূচী গ্রহণ করিবেন :

(১) ভারতে বনভূমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম, উহা বাড়াইয়া মোট জমির শতকরা ৩৩ ভাগ অংশকে বনভূমিতে পরিণত করিতে হইবে।

(২) পার্বত্য-অঞ্চলে অর্থাৎ হিমালয়ের উচ্চভূমিতে, দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে এবং অন্য উচ্চভূমি অঞ্চলে ৬০ ভাগ বন থাকিবে এবং অন্যান্য সমভূমি অঞ্চলে ২০ ভাগ বন্ থাকিবে। সমভূমিতে জনসংখ্যা বেশী এবং কৃষির বিস্তারও অধিক বলিয়া সমভূমি অঞ্চলে অরণ্য বিস্তারের সুযোগ কম।

(৩) যে সকল বন যুদ্ধের সময় বিনষ্ট হইয়াছিল সেগুলিকে সুপরিকল্পিত উপায়ে পুনরুদ্ধার করা হইতেছে। সমান পরিমাণ নূতন বন সৃষ্টি না করিয়া পুরাতন বনভূমি নষ্ট করা চলিবে না।

(৪) দুর্গম অরণ্যের মধ্যে যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হইতেছে।

(৫) গ্রামাঞ্চলের মধ্যে জ্বালানি কাঠের যোগানের জন্য নিকটবর্তী অঞ্চলে বনভূমি সৃষ্টি করিতে হইবে।

(৬) জমিদারীপ্রথার বিলোপ সাধন করা হইয়াছে এবং জমিদারের অধীনস্থ বনগুলিকে রাষ্ট্রের অধীনে আনা হইয়াছে এবং সরকারী প্রচেষ্টায় উহাদের উন্নয়নের চেষ্টা চলিতেছে।

(৭) বনজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের উপায় আবিষ্কারের জন্য এবং বৃক্ষ রোপণ প্রণালীর উন্নয়নের জন্য দেরাদুনে ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গবেষণা চলিতেছে।

(৮) বন্য প্রাণীসমূহ সংরক্ষণ করিতে হইবে। ভারতে বনসংরক্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। কীটের আক্রমণে বহু বৃক্ষ চারা-অবস্থাতেই বিনষ্ট হইয়া যায়। কীটের আক্রমণ হইতে চারাগাছগুলিকে রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। দাবানলও বনভূমির প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। দাবানল নিবারণের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পশ্চিম ভারতের মরুভূমি দ্রুতগতিতে পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছে। এই মরুভূমির গতিরোধ করিবার জন্য একটি সুবৃহৎ অরণ্যবলয়ের সৃষ্টি করা হইয়াছে। বন্যা ও মৃত্তিকাক্ষয়ের জন্য নানাস্থানে ক্ষতি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা রোধ করিবার জন্য নদী উপত্যকা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বনমহোৎসব

বৃক্ষরোপণকে একটি প্রয়োজনীয় জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করিবার জন্য শ্রী কে. এম. মুন্সী ১৯৫০ সালে বৃক্ষরোপণ বা বনমহৎসব অভিযান শুরু করেন। বর্তমানে ইহাকে বার্ষিক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

পরিকল্পনায় বরাদ্দ ব্যয়

প্রথম পরিকল্পনাকালে বনভূমি উন্নয়নের জন্য ৯·৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই সময় ·৫ হাজার একর উষর ভূমিকে বনভূমিতে পরিণত করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বনভূমি উন্নয়নের জন্য ২০·৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই পরিকল্পনাকালে ৪ লক্ষ একর নষ্ট বনভূমিকে পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে এবং প্রায় ৫ হাজার মাইল বনপথ নির্মাণ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বনভূমি উন্নয়নের জন্য মোট ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ

করা হইয়াছে। এই সময়ে শিল্প ও জালানির প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করা হইবে, ১৫ হাজার মাইল বনপথ নির্মিত হইবে, তিনটি আঞ্চলিক অরণ্য সংক্রান্ত গবেষণাগার স্থাপন, অরণ্য সংক্রান্ত শিক্ষার সম্প্রসারণ, প্রভৃতি হইবে।

মৎস্য চাষ (Fisheries): মৎস্য প্রোটিন, ভিটামিন এবং ধাতব লবণযুক্ত একটি উপাদেয় খাদ্য। ১৯৫১ সালে ইহা হইতে জাতীয় আয়ের ১০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছিল এবং দশলক্ষ ব্যক্তি মৎস্যচাষে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।

গুরুত্ব

ভারতের মাথাপিছু বাৎসরিক মৎস্য ভোজনের পরিমাণ মাত্র ৩·৪ পাউণ্ড, অপর পক্ষে উহার পরিমাণ সিংহল, বার্মা এবং জাপানে যথাক্রমে ১৬ পাউণ্ড, ৭০ পাউণ্ড এবং ৯০ পাউণ্ড। অবশ্য ভারতের জনসংখ্যার বেশ কিছু সংখ্যক লোক মাছ খান না। এই সংখ্যা হিসাব হইতে বাদ দিলে মাথাপিছু মৎস্য ভোজনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪·২৪ পাউণ্ড। বিভিন্নরাজ্যে মাথাপিছু মৎস্য ভোজনের পরিমাণ বিভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গে ইহা ১৩ পাউণ্ড, মাদ্রাজে ১২ পাউণ্ড, বোম্বাইএ ৭ পাউণ্ড, আসামে ৬ পাউণ্ড, উড়িষ্যায় ৫ পাউণ্ড এবং পাঞ্জাবে উহা ০·৮ পাউণ্ড। একটি পূর্ণবয়স্ক লোকের সুষম খাদ্যের জন্য বৎসরে ৩০ পাউণ্ড মাছ এবং মাংসের প্রয়োজন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে প্রয়োজনের তুলনায় মাছের যোগান কতো কম।

মাথাপিছু মৎস্যভোজন অতিঅল্প

প্রথম পরিকল্পনায় মৎস্যচাষ বৃদ্ধির জন্য ৫০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই সময় মাছের যোগানের পরিমাণ ছিল দশ লক্ষ টন, ইহার মধ্যে ৭০ ভাগ সামুদ্রিক মৎস্য এবং ৩০ ভাগ আভ্যন্তরীণ মৎস্য। মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন এবং পশ্চিম বাংলা এই তিনটি রাজ্যেই মাছের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক।

মৎস্য উৎপাদনের নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব একটি বিরাট অসুবিধা। পরিসংখ্যাণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। সামুদ্রিক মৎস্যের ক্ষেত্রে দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—প্রথমতঃ, এক বছর ও পরবর্তী বছরে ধৃত মৎসের পরিমাণে বিরাট তারতম্য, এবং দ্বিতীয়তঃ ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের পরিমাণ।

আভ্যন্তরীণ মৎস্য যোগান দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতেছে নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য: (১) বদ্ধ জলাশয়ে কচুরিপানা ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধির ফলে উহা মজিয়া যাওয়া (২) পুষ্করিণী বিল ইত্যাদির অবহেলা (৩) নদী খাল-বিল ইত্যাদি পলিমাটি পড়িয়া ভরাট হইয়া যাইতেছে (৪) অত্যধিক পরিমাণে মাছ ধরা এবং চারা মাছ বিনষ্ট করা (৫) নদীতে বাঁধ বাঁধার ফলে মাছের চলাচল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় উহাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

মৎস্য যোগান হ্রাসের কারণ

আভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ উন্নয়নের জন্য অত্যধিক মাছ ধরা এবং চারা মাছ বিনষ্ট করার উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন। এতোদিন পর্যন্ত অধিকাংশ মাছের ভেড়ী ছিল ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে। কিন্তু জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের

সঙ্গে উহারা রাজ্য সরকারের আয়ত্তে আসিয়াছে। আভ্যন্তরীণ মাছের ভেড়ী সর্বত্র পরিব্যাপ্ত বলিয়া উহাদের উন্নতির জন্য প্রয়োজন সম্প্রসারণ সংগঠন।

ভারতের সুদীর্ঘ উপকূল রেখায় সামুদ্রিক মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের প্রভূত সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু এই সুদীর্ঘ অঞ্চলের অধিকাংশই অনুন্নত অবস্থায় রহিয়াছে।

জলযানের সংখ্যাবৃদ্ধি

সামুদ্রিক মৎস্যচাষ বাড়াইবার জন্য জলযানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ৭০,০০০ এর মতো দেশীয় নৌকা মৎস্য ধরার কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে—কিন্তু এগুলি তীরভূমি হইতে মাত্র কয়েকমাইল দূর পর্যন্ত যাইতে পারে বলিয়া উৎপাদন কম হয়। এইসব নৌকাগুলিকে যন্ত্রিকরণ করিতে পারিলে ধীবরেরা সমুদ্রে বহুদূর পর্যন্ত যাইতে পারিবে এবং অধিক পরিমাণ মৎস্য ধরা সম্ভবপর হইবে। দ্রুত পরিবহন, শিক্ষণের ব্যবস্থা, সুদক্ষ বিক্রয়ব্যবস্থা, প্রভৃতি মৎস্য ব্যবসায়ে উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ। প্রথম পরিকল্পনায় ৯টি বরফ কারখানা এবং কোল্ড স্টোরেজের ব্যবস্থা করা হয়। এইগুলি মাদ্রাজ, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ এবং সৌরাষ্ট্রে স্থাপন করা হয়। আশা করা হইয়াছে যে প্রথম পরিকল্পনায় মৎস্য উৎপাদন ১০ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ লক্ষ টন হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মৎস্য চাষ বৃদ্ধির জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মৎস্য উৎপাদন শতকরা ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হয়। মৎস্য চাষ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে চারভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) মৎস্য ধরিবার পদ্ধতির উন্নয়ন (খ) গভীর সমুদ্র মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ (গ) মৎস্য ধরিবার বন্দরের উন্নয়ণ এবং (ঘ) মৎস্য পরিবহণ, ষ্টোরেজ ও বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন।

তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে সরকারী নীতির উদ্দেশ্য হইল উৎপাদনবৃদ্ধি, ধীবরদিগের অবস্থার উন্নতিবিধান এবং রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার। তৃতীয় পরিকল্পনায় মৎস্য শিল্প উন্নয়নের জন্য ২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। মৎস্য উৎপাদন ১৪ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৮ লক্ষ টন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক সংগঠন ও ইহার অর্থনৈতিক প্রভাব

(Social Systems in India and its economic implications)

[**বিষয়বস্তু :** সামাজিক সংগঠনসমূহ—জাতিভেদ প্রথা—একান্নবর্তী পরিবার প্রথা—উত্তরাধিকার আইন—বিবাহ প্রথা—ধর্ম]

সামাজিক সংগঠন এবং প্রথাসমূহ জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। আমরা চারিটি বিশেষ প্রভাবশালী সামাজিক সংগঠন লইয়া আলোচনা করিব যথা, জাতিভেদ প্রথা, একান্নবর্তী পরিবার প্রথা, উত্তরাধিকার প্রথা এবং বিবাহ প্রথা।

জাতিভেদ প্রথা (Caste system) : হিন্দুদের সমাজজীবনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হইল জাতিভেদ প্রথা। ইহা অতি প্রাচীন প্রথা কিন্তু ঠিক কোন সময়ে ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল বলা বড় কঠিন। বৈদিক যুগে মূলতঃ বৃত্তি অনুসারে সমাজকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যাহারা শিক্ষাদীক্ষা ও পূজা-অর্চনার কাজ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল তাহারা ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত হইল। যাহারা দেশরক্ষা ও শাসনকার্য পরিচালনা একচেটিয়া করিয়া লইল তাহারা ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হইল। কৃষি কর্ম এবং ব্যবসায় বাণিজ্য যাহারা জীবিকার জন্য বাছিয়া লইল তাহারা বৈশ্য নামে পরিচিত হইল। যাহারা এই তিন বর্ণের সেবাকার্যে লিপ্ত থাকিত তাহারা শূদ্র নামে পরিচিত হইল।

চারিটি শ্রেণী

অস্পৃশ্যতা

প্রথম প্রথম এই সকল ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে সামাজিক আদান প্রদানের কোনোরূপ বাধা ছিল না—এক কর্ম পরিবর্তন করিয়া নূতন কর্মানুসারে জাতি পরিবর্তন সম্পূর্ণ সম্ভব ও সহজ ছিল। কিন্তু কালক্রমে জাতিভেদ প্রথা কঠোর এবং জটিল রূপ ধারণ করিল এবং জন্মের ভিত্তিতে জাতি গড়িয়া উঠিল। এই জাতিভেদ প্রথাকে অবলম্বন করিয়া অস্পৃশ্যতা নামক বিরাট পাপ সমাজ শরীরে অনুপ্রবেশ করিল।

এই জাতিভেদ প্রথার গুণ ও দোষ উভয়ই আছে। জাতিভেদ প্রথা সরল শ্রমবিভাগের সৃষ্টি করিয়া অর্থনৈতিক জীবনের অগ্রগতি সম্ভবপর করিয়াছিল।

জাতিভেদ প্রথার গুণ

দ্বিতীয়তঃ, পেশা শিক্ষা অত্যন্ত সহজ ছিল। শিশুর পক্ষে পৈত্রিক পেশা আয়ত্ব করা যত সহজ, অন্য কোনো পেশা আয়ত্ব করা তত সহজ নয়। বংশ পরম্পরায় একই ধরণের বৃত্তি চলিতে থাকিলে পরিবারের ছেলে-মেয়েরা সহজেই পেশা শিখিতে পারিবে। ইহার ফলে শিক্ষানবীশ করিবার জন্য পৃথক করিয়া সময় ও অর্থ ব্যয় হয় না। পেশা নির্বাচন করাও একটি দুরূহ ব্যাপার। জাতিভেদ প্রথায় এই ধরণের কোনো সমস্যার সৃষ্টি হইত না কারণ জন্মের দ্বারাই লোকের বৃত্তি স্থিরীকৃত হইত। জাতিভেদ প্রথার স্বপক্ষে ওকালতি করিয়া আরও

বলা হয় যে জাতিভেদ প্রথা শ্রমিক সংঘের অভাব পূর্ণ করিয়াছিল। একই জাতির ব্যক্তিগণ পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন অনুভব করিয়া পারস্পরিক মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিত।

ত্রুটি

কিন্তু জন্মগত জাতিভেদ প্রথার দোষত্রুটি গুণ অপেক্ষা অনেক বেশী এবং এই ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। মানবতার দিক হইতে এই ব্যবস্থা ঘৃণ্য, সামাজিক দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ এবং যুগের অগ্রগতির দিক হইতে সামঞ্জস্যবিহীন।

এই ব্যবস্থায় শ্রমের গতিশীলতা সম্পূর্ণ ব্যাহত হইয়াছে। জন্মের দ্বারা বৃত্তি নির্ধারিত হইলে লোকের কর্মদক্ষতা হ্রাস পাইতে পারে। একজন ছুতার মিস্ত্রির ছেলে অন্য কোনো পেশা গ্রহণ করিতে পারিবে না, কোনো বৃত্তিতে শ্রমিকের চাহিদা বেশী থাকিলেও অন্য পেশাধারী লোক সেই পেশা গ্রহণ করিতে পারিত না। জাতিভেদ প্রথার জন্য সমাজের উচ্চজাতির লোকেরা নীচজাতির লোকদিগকে ঘৃণা করে, কায়িক পরিশ্রমের মর্যাদা দিতে শিখেনা এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমবায় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির পথ বন্ধ করিয়াছে।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে শিক্ষার প্রসার, অসবর্ণ বিবাহ, সহভোজন এবং প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারকদিগের অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন, সংবিধানগত ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ প্রচেষ্টায় জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ক্রমশই কমিয়া আসিয়াছে।

একান্নবর্তী পরিবার প্রথা (**Joint Family System**)**:** ভারতীয় সমাজ জীবনের একটি উল্লেখযোগ বৈশিষ্ট্য হইল একান্নবর্তী পরিবার প্রথা। পাশ্চাত্ত্য দেশে এই ধরণের একান্নবর্তী পরিবার দেখিতে পাওয়া যায় না। সেখানে পরিবার সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রী এবং নাবালক পুত্রকন্যা লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু ভারতে পরিবার স্বামী-স্ত্রী, পুত্রকন্যা ছাড়াও পিতৃপুরুষ হইতে সৃষ্ট সকল লোক একত্র খায় ও বাস করে। ইহাকেই একান্নবর্তী পরিবার বলে। যৌথ সম্পত্তি, যৌথ সংসার পরিচালনা এবং যৌথ ধর্মাচরণসমূহ হইল একান্নবর্তী পরিবারের বৈশিষ্ট্য। একান্নবর্তী পরিবারে একজন প্রধান থাকেন, তাহাকে 'কর্তা' বলা হয়। সকলে তাহাদের উপার্জিত অর্থ কর্তার হাতে তুলিয়া দেন এবং কর্তা সংসার পরিচালনা করেন। পরিবারের সুখ দুঃখের অংশ সকলেই সমানভাবে গ্রহণ করে।

একান্নবর্তী পরিবারের বৈশিষ্ট্য

এই প্রথার গুণ

সমাজতান্ত্রিকতার উচ্চ আদর্শে একান্নবর্তী পরিবার গঠিত। এই ব্যবস্থায় মানুষ আনুগত্য, পারস্পরিক সহযোগিতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণগুলি আয়ত্ব করিতে শেখে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়। কোনো একজন লোক বেকার হইয়া পড়িলে বা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার স্ত্রী-পুত্রকে অসহায় অবস্থায় পড়িতে হয় না। এই ব্যবস্থায় জমি খণ্ডিকরণ রোধ করা যায়। তৃতীয়তঃ, বেশী লোক একত্র বসবাস করায়

বৃহদায়তন ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। একসঙ্গে অনেক লোক বাস করিলে পরিচালনার ব্যয় কম হয় এবং মাথাপিছু ব্যয় ক্ষুদ্র পরিবার অপেক্ষা অনেক কম হয়।

এই ব্যবস্থার এই সব গুণ থাকিলেও কতকগুলি মারাত্মক দোষ রহিয়াছে, এবং সেইজন্য ইহা ক্রমশ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহা অলসতা এবং কর্তব্যজ্ঞানহীনতাকে প্রশ্রয় দেয়। পরিবারের দুই একজন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় অর্থ রোজগার করিলে বাড়ীর অপর সকল ব্যক্তির কর্মোদ্যম কমিয়া যায় এবং তাহারা কোনো প্রকার কাজকর্ম না করিয়া অলস জীবনযাপন করিতে চায়। ইহার ফলে হিংসা, দ্বেষ, কলহ প্রভৃতি অশান্তির সৃষ্টি হয়। যাহারা অর্থ উপার্জন করে তাহাদেরও সেই অর্থ স্বাধীনভাবে খরচ করিবার অধিকার থাকে না, ফলে কর্মোদ্যোগ ব্যাহত এবং অর্থনৈতিক প্রগতি রুদ্ধ হয়। একান্নবর্তী পরিবারের দায়িত্ব সকলের উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু আমরা জানি সকলের উপর দায়িত্ব থাকার অর্থ কাহারো উপর দায়িত্ব না থাকা। এই ব্যবস্থা কিছু পরিমাণে শ্রমিকের গতিশীলতা কমাইয়াছে। সাধারণতঃ একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত ব্যক্তি পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরবর্তী অঞ্চলে চাকুরী করিতে যাইতে চাহে না। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ এই একান্নবর্তী পরিবার প্রথা। এই প্রথা থাকার ফলে সন্তান সন্ততিদিগের ভরণপোষণের দায়িত্ব সমানভাবে সকলের এবং সেই কারণে পিতা দায়িত্বহীনভাবে সন্তানের জন্ম দেয়। এই ব্যবস্থার মারাত্মক ত্রুটি যে ইহা মূলধন গঠনকে ব্যাহত করে। প্রত্যেকের উপার্জিত অর্থ সকলের জন্য সমানভাবে ব্যয় হয়, ফলে যাহাদের উপার্জন বেশী তাহাদেরই আয়ের দ্বারা অসমর্থের ভরণপোষণ হয় আর সেই কারণে বিশেষ কিছু সঞ্চয় হইতে পারে না এবং মূলধন গঠন হয় না। বর্তমানে পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সংঘাতে এই ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

দোষত্রুটি

উত্তরাধিকার আইন (Laws of Inheritance) : ভারতের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন অর্থনৈতিক উন্নতির পরিপন্থী। পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত প্রথা অনুসারে মৃতব্যক্তির জ্যেষ্ঠপুত্রই পিতার সকল স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হয়। কিন্তু ভারতের উত্তরাধিকার আইন অনুসারে মৃতব্যক্তির সম্পত্তি সকল পুত্রই সমানভাবে পাইয়া থাকে। হিন্দুদের মধ্যে দুই ধরণের উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত আছে—দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা। দায়ভাগ আইনানুসারে সম্পত্তির অধিকারী যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন সম্পত্তিতে পুত্রের কোনো অধিকার থাকিবে না। পিতার মৃত্যুর পর সকল পুত্রই পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশীদার হিসাবে গণ্য হইবে। মিতাক্ষরা আইনানুসারে পিতার জীবৎকালে পুত্রগণ সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হন। দায়ভাগ নীতি পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতের অপরাপর অঞ্চলে মিতাক্ষরা নীতি প্রচলিত ছিল। বর্তমানে হিন্দু কোড আইন প্রচলিত হওয়ার পর পিতার সম্পত্তিতে সকল পুত্রের সহিত কন্যারও সমান অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। পিতা স্বেচ্ছায় যদি কোনো পুত্র অথবা কন্যাকে তাঁহার

দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা

সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া যান, তাহা হইলে শুধু সেই বঞ্চিত সন্তান সম্পত্তির অংশ পায় না। মুসলমান উত্তরাধিকার আইনানুসারে সকল পুত্রকন্যা এবং মৃতব্যক্তির স্ত্রী সকলেই সম্পত্তির অধিকারী হয়।

এই ব্যবস্থা নীতির দিক হইতে বিচার করিলে যুক্তিসম্মত বলিয়া বোধ হয়। তাহা ছাড়া সম্পত্তি খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত হওয়ার দরুণ সকলেই সম্পত্তির সামান্য অংশ পায়, ফলে কাজের স্পৃহা কমে না। এই ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি যে জমির উপর ইহার ফল অত্যন্ত ক্ষতিকারক। উত্তরাধিকার আইনের ফলে জমি খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে এবং উন্নত পদ্ধতিতে কৃষিকার্য পরিচালনার পথে বাধার সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া যায় বলিয়া বৃহদায়তন বিনিয়োগ সম্ভবপর হয় না।

বিবাহ প্রথা (Institution of Marriage) : ভারতে অতিরিক্ত হারে জনসংখ্যা বাড়িয়া যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পিছনে রহিয়াছে এ দেশের বিবাহ প্রথা। ভারতে সকলেই বিবাহ করে। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় ভারতে অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা নগণ্য। এদেশে পরিবার পালনের উপযুক্ত না হইয়াই লোকে বিবাহ করে—এমন কি ভিখারীরা পর্যন্ত বিবাহ করিতে ইতস্ততঃ করে না। ভারতে অবিবাহিত নরনারীর কোনো সম্মান নাই—প্রাচীন ধর্মের অনুশাসনের চাপে পড়িয়া অনিচ্ছুক লোকও বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। ভারতের বিবাহ প্রথার আর একটি বৈশিষ্ট্য বাল্য বিবাহ। কম বয়সে বিবাহ করার ফলে প্রজনন সময়ের (fertility period) দৈর্ঘ্য বাড়িয়া যায় এবং জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়িতে থাকে। সাম্প্রতিককালে শিক্ষাবিস্তারের ফলে বাল্যবিবাহ নগরাঞ্চলে কমিয়া গিয়াছে এবং জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত কোনো যুবক সাধারণতঃ বিবাহ করিতে চায় না।

সার্বিক বিবাহ

ধর্ম (Religion) : ভারতের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ ধর্ম। বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম মানুষের পার্থিব প্রয়োজনকে তুচ্ছ করিয়া আধ্যাত্মিক মোক্ষকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে। ইহা বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাকে অস্বীকার এবং অভাব সংকোচ করিতে শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু অভাব হইতেই চাহিদার সৃষ্টি হয় আর সেই চাহিদা মিটাইবার জন্য নিত্যনূতন শিল্প গড়িয়া উঠে। এই কারণে ভারতের সনাতন ধর্ম শিল্পায়নের পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়াছিল। ধর্মের অনুশাসনই মধ্যযুগে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া জলপথে বাণিজ্যের কোনো প্রসার হয় নাই। জীবন সম্পর্কে ইহার দৃষ্টিভংগী নেতিবাচক, অদৃষ্টপন্থী এবং দুঃখবাদী।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় জনসংখ্যার আলোচনা
(Studies of Indian Population)

[বিষয়বস্তু : জনসংখ্যা আলোচনার গুরুত্ব—ভারতীয় জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য—জনসংখ্যা বৃদ্ধি -জনাধিক্য সমস্যা—জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন—জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং সরকারি নীতি]

জনসংখ্যা আলোচনার গুরুত্ব (Importance of Population Study) : জাতীয় আয় উৎপাদনের চারিটি উৎপাদনের মধ্যে শ্রম হইল একটি মৌলিক উপাদান। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ হইতেই উৎপাদনকার্য সম্পন্ন হয় না। মানুষের শ্রম ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা যায় না। অর্থনীতিতে শ্রম বলিতে শুধুমাত্র কায়িক শ্রম বুঝায় না, মানসিক শ্রমও ইহার অন্তর্ভুক্ত। কোনো দেশের শ্রমের যোগান উহার জনসংখ্যার পরিমাণ ও দক্ষতার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

জনসংখ্যার পরিমাণ সম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য লোকগণনার প্রথা প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত। জনসংখ্যার অধ্যয়ন তিনটি কারণে বিশেষ প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, প্রাচীন গ্রীস ও রোমে প্রধানতঃ করধার্য করিবার জন্য এবং সামরিক প্রয়োজনে লোকসংখ্যার হিসাব রাখা হইত। বর্তমানকালে লোকগণনার অন্য বৃহত্তর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য থাকিলেও এই দুই উদ্দেশ্য উহার অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ, শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সেই কারণে বর্তমান দিনে আদমসুমারীর লক্ষ্য শুধুমাত্র মাথা গণনা নয়—জনসংখ্যার স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত, জনঘনত্ব, গ্রাম ও শহরের মধ্যে আপেক্ষিক জনবণ্টন, উপজীবিকা প্রভৃতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করা।

তৃতীয়ত, দেশটি জনাকীর্ণ না জনবিরল তাহা বুঝিবার জন্য জনসংখ্যা আলোচনা করা প্রয়োজন। জনসংখ্যা চরম কাম্য (optimum) হইলেই মাথাপিছু আয় সর্বাধিক এবং জীবনযাত্রার মান সর্বোন্নত হইবে। উপযুক্ত অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে জনসংখ্যাকে চরমকাম্য আকারে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, বর্তমানে সকল উন্নতিকামী দেশসমূহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে জনসংখ্যা আলোচনার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করা হয়।

ভারতীয় জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (Features of Indian Population) :

[এক] **জনসংখ্যার আয়তন (Size of Population) :** ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ৪৩ কোটি ৯২ লক্ষ (ইহার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যা ধরা হয় নাই) ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটির মতো। পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার ১৫ ভাগ লোক ভারতে বাস করে। জনসংখ্যার আয়তনের দিক হইতে চীন প্রথম এবং ভারত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ভারতে জনসংখ্যার বাৎসরিক বৃদ্ধির হার শতকরা ৫·১ ভাগ। ভারতীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে উত্তর প্রদেশেই সর্বাপেক্ষা জনবহুল—ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭ জন লোক এই রাজ্যে বাস করে। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিহার।

ভারতের মোট জনসংখ্যা

ভারতে প্রতিবৎসর ৭০ হইতে ৭৫ লক্ষ করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ১৯২১ সাল পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদির দরুণ জনসংখ্যা বিশেষ বাড়ে নাই। (১৮৯১ সালে জনসংখ্যা ছিল ২৩ কোটি ৫৯ লক্ষ,—১৯২১ সালে অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর পরে উহা বাড়িয়া মাত্র ২৪ কোটি ৮২ লক্ষ হয়) অপরপক্ষে খাদ্যের উৎপাদনও যথেষ্ট বাড়িয়াছে, সেইজন্য জনসংখ্যা ও খাদ্য সরবরাহের মধ্যে অসমতা দেখা দেয় নাই। কিন্তু ১৯২১ সালের পর হইতে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়াছে (১৯২১ সালে জনসংখ্যা ২৪ কোটি ৮২ লক্ষ, ১৯৩১ সালে ২৭ কোটি ৫৫ লক্ষ, ১৯৪১ সালে ৩১ কোটি ২৮ লক্ষ, ১৯৫১ সালে ৩৫ কোটি ৬৯ লক্ষ, ১৯৬১ সালে ৪৩ কোটি ৯২ লক্ষ) অপরপক্ষে খাদ্যোৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া বাড়িতে পারে নাই। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী রিপোর্টে ১৯২১ সালকে "বৃহৎ বিভাজক" (The Great Divide) বলা হইয়াছে দুইটি কারণে—(i) এই সময় পর্যন্ত জনসংখ্যা দ্রুতহারে বাড়ে নাই কিন্তু এই সময়ের পর হইতেই ইহা দ্রুতগতিতে বাড়িয়াছে ; (ii) এই সময় পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাল মিলাইয়া কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে কিন্তু এই সময়ের পর হইতে কৃষিজমির তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়িয়া গিয়াছে ফলে খাদ্যের যোগানে ঘাটতি দেখা দিয়াছে।

[দুই] **জনঘনত্ব (Density of Population) :** জনঘনত্ব বলিতে বুঝায় প্রতি বর্গ মাইলে গড় লোকবসতির পরিমাণ। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতের প্রতি বর্গমাইলে ৩৮৪ জন লোক বাস করে। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ইহার পরিমাণ ছিল ৩১৬ ; ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জনঘনত্ব বিভিন্ন প্রকার। কেরলে প্রতি বর্গমাইলে ১১২৫, পশ্চিম বাংলায় ১০৩০, দিল্লীতে ৪৬১৪ এবং আন্দামানে ১০ জন লোক বাস করে। আন্দামানে জন-ঘনত্ব সর্বনিম্ন—প্রতিবর্গ মাইলে মাত্র ১০ জন লোক।

প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা

ইংলণ্ডে প্রতি বর্গমাইলে ৭০০ জন, জাপানে প্রতি বর্গমাইলে ৫৮৯ জন এবং জার্মানীতে প্রতি বর্গমাইলে ৪৫০ জন লোক বাস করে। শিল্প প্রধান দেশে জনঘনত্ব

সমৃদ্ধিরই পরিচায়ক, কারণ শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া বহুলোক জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশে অধিক জনঘনত্ব সমস্যার সৃষ্টি করে। জনঘনত্ব অধিক হইলে কম জমিতে অধিক সংখ্যক কৃষক চাষ করে, ফলে কৃষকের মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম হয় এবং ছদ্মবেশী বেকারের সৃষ্টি হয়।

ভারতের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক লোক বাস করে এক চতুর্থাংশের কম অংশে। গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে জনবসতি ঘন তাহার কারণ কৃষিকার্যের সুযোগ-সুবিধা, বারিপাতের প্রাচুর্য, শিল্পের প্রসার, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, জমির উর্বরতা ইত্যাদি।

অসম জনবণ্টন

অপরপক্ষে রাজস্থান আসাম, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে জনঘনত্ব কম তাহার কারণ কৃষিকার্যের অসুবিধা, শিল্পের অনুন্নতি, পরিবহন ব্যবস্থার অসুবিধা প্রভৃতি।

সর্দার পাণিক্করের মতে ভারতের অসম জনবণ্টনই ভারতের জনসংখ্যার সমস্যার কারণ যদি জনবহুল অঞ্চল হইতে জনবিরল অঞ্চলে জনসংখ্যাকে সরাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে জনাধিক্য সমস্যা থাকিবে না।

[তিন] গ্রাম ও শহরের জনবণ্টন (Rural and urban population): ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী শতকরা ১৭ জন লোক শহরে এবং ৮৩ জন লোক গ্রামে বাস করে অর্থাৎ ভারতে প্রতি ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন লোক গ্রামে ও একজন লোক নগরাঞ্চলে বাস করে। ১৯৬১ সালের আদমসুমারীতে গ্রাম ও শহরের এই জনবণ্টনে বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখা যায় নাই। যদিও এখনও পর্যন্ত

শহরের জনসংখ্যার অনুপাত বাড়িতেছে

অধিক লোক গ্রামে বাস করে তথাপি গ্রামের তুলনায় শহরের জনসংখ্যার অনুপাত ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯২১ সালে ১১% লোক শহরে বাস করিত, ১৯৪১ সালে ১৪% লোক এবং ১৯৫১ সালে উহা ১৭% এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯২১ সাল হইতে ১৯৫১ সাল এই ত্রিশ বৎসরে গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে ৭০% শহরাঞ্চলের জনসংখ্যার ১২০% বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ১৯৪১ সালে একলক্ষ জনসমন্বিত শহরের সংখ্যা ছিল ৫৮, ১৯৫১ সালে উহা বাড়িয়া ৭৫ হয়।

[চার] বয়স অনুযায়ী জনসংখ্যার গঠন (Age Composition): বয়সের দিক হইতে জনসংখ্যার গঠন বিচার করিলে দেখা যাইবে ইহার আকার পিরামিডের মতো অর্থাৎ শিশুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী এবং যতই উর্ধ্বে উঠা যাইবে ততই উহা পিরামিডের মতো সরু হইতে থাকিবে অর্থাৎ অধিক বয়স্ক লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হইবে। ভারতের মোট জনসংখ্যার তুলনায় শিশুর অনুপাত অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ১ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকা হইল মোট জনসংখ্যার ৩৮·৩ ভাগ, ১৫ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণ হইল মোট জনসংখ্যার ৫৩·৪ ভাগ এবং ৫৫ ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক নরনারী হইল মোট জনসংখ্যার ৮·৩ ভাগ।

১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতে পুরুষেরা পড়ে ৩২·৪৫ বৎসর এবং

স্ত্রীলোকেরা ৩১.৬৬ বৎসর বাঁচে। ১৯৪১ সালে উহা ছিল যথাক্রমে ৩৬.৯১ এবং ২৬.৫৬। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে এদেশে গড় আয়ু বাড়িতেছে কিন্তু এখনো ইহা অন্যান্য পাশ্চত্য দেশের তুলনায় খুবই অল্প। আমেরিকায় পুরুষেরা গড়ে ৬৫ বৎসর এবং স্ত্রীলোকেরা ৭০ বৎসর বাঁচে।

ভারতে গড় আয় স্বল্প

[পাঁচ] স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত (Sex Ratio) : ভারতে স্ত্রীলোকের অনুপাতে পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী। ১৯৬১ সালের হিসাবানুযায়ী প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল ৯৪০; ১৯৫১ সালের হিসাবে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল ৯৪৬; ভারতে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা ক্রমশই কমিয়া গুরুতর সমস্যার আকার ধারণ করিতেছে। ভারতে মোট পুরুষ অপেক্ষা নারী ৯৮ লক্ষ কম। উড়িষ্যা, মাদ্রাজ প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য ছাড়া আর সকল রাজ্যেই স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা কম।

ভারতে নারীর সংখ্যা কম

[ছয়] উপজীবিকা (Occupation): বর্তমানে ভারতে শতকরা ৬৯.৮ জন লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত আছে অর্থাৎ প্রতি দশজনের মধ্যে প্রায় সাত জন লোক কৃষিজীবি। শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ১০.৫ ভাগ। শিল্পের অনগ্রসরতার জন্য কৃষিতে অধিক সংখ্যক লোকের চাপ পড়িয়াছে এবং ইহার একটি বৃহৎ অংশ ছদ্মবেশী বেকার। পশ্চিমবঙ্গ এবং বোম্বাই এই দুইটি শিল্পোন্নত রাজ্য; কিন্তু এই দুই রাজ্যেও কৃষিজীবির সংখ্যা অ-কৃষিজীবি অপেক্ষা অধিক। ব্যবসা বাণিজ্য এবং পরিবহণে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ১৭ ভাগ আর বাকী অংশ অপরাপর জীবিকায় নিযুক্ত আছে।

কৃষি প্রধান উপজীবিকা

১৯৫১ সালে সাক্ষর লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ১৬.১ ভাগ, ১৯৬১ সালে বৃদ্ধি পাইয়া উহা হইয়াছে ২৩.৭ ভাগ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি (Growth of population) : ভারতে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে—বৎসরে ৭০ লক্ষ করিয়া। ১৯৫১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি ৬৭ লক্ষ, ১৯৬১ সালে উহা বাড়িয়া ৪৪ কোটির কাছাকাছি গিয়া দাঁড়ায়। ভারতে জনসংখ্যা বৎসরে ২.৫ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি চারটি সর্তের উপর নির্ভরশীল—(১) জন্মহার (birth rate) (২) মৃত্যুহার (death rate), (৩) সন্তানউৎপাদনশীল স্ত্রীলোকের সংখ্যা (woman of fertility age group) এবং (৪) দেশান্তর গমনাগমণের উপর।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সর্ত

ভারতে জন্মহার খুবই বেশী—এদেশে প্রতি হাজারে ৪০ জন করিয়া জন্মগ্রহণ করে। এত অধিক জন্মহারের প্রধান কারণ ভারতে সকলেই বিবাহ করে। পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম ব্যক্তি, এমন কি ভিখারীরা পর্যন্ত বিবাহ করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে ইতস্তত করে না। আমেরিকা বা ইউরোপে মোট জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ অবিবাহিত থাকিয়া যায় কিন্তু ভারতে

জন্মহার অধিক

অবিবাহিত নরনারীর সংখ্যা বিরল। দ্বিতীয়তঃ, সমাজে অবিবাহিত স্ত্রীপুরুষের কোনোরূপ সম্মান নাই। হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে পুত্র না হইলে মানুষকে পুন্নাম নরকে যাইতে হয়। অবিবাহিত নরনারীকে লোকে সন্দেহের চোখে দেখে সেই কারণে অনিচ্ছুক নরনারীও বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। তৃতীয়তঃ, ভারতে অল্পবয়সে বিবাহ হয়। একটি মেয়ে সাধারণতঃ ১৫ হইতে ৪০ বৎসর পর্যন্ত সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। কম বয়সে বিবাহ হইলে সন্তান প্রজননের অধিক সময় (longer span of the reproductive age) পাওয়া যায়, ফলে বেশী সন্তান হয়। স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স বাড়াইবা দিবার জন্য সার্দা আইন পাশ করা হইয়াছিল কিন্তু উহা কার্যকরী হয় নাই। চতুর্থতঃ, জনগণের দারিদ্র্য এবং জীবনযাত্রার নিম্নমানই অধিক জন্মহারের কারণ। পশ্চিম ইউরোপে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই তথাপি সেখানে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পাইবার কারণ উন্নত জীবনযাত্রার মান। পঞ্চমতঃ, দেশের উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়া, যৌথ পরিবার প্রথা, বহুবিবাহ, নিয়তি-নির্ভরশীল জীবনদর্শন (fatelastic philosophy of life), জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা, কুসংস্কার প্রভৃতি কারণও জন্মহারকে উচ্চ রাখিয়াছে।

মৃত্যুহারও অধিক

ভারতে জন্মহার যেমন উচ্চ, **মৃত্যুহারও** তেমন উচ্চ—বৎসরে প্রতি হাজারে ২৭টি করিয়া মারা যায়। ভারতে শিশুমৃত্যুর হার সর্বাধিক। প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে এক বছরের মধ্যেই ২০০টি মারা যায় অপরপক্ষে ইংলণ্ডে এই মৃত্যুর হার মাত্র ৬৫। দারিদ্র্য, উন্নত প্রণালীর চিকিৎসার অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অশিক্ষা উপযুক্ত ধাত্রীর অভাব প্রভৃতি কারণের জন্য মৃত্যুহার এতো অধিক। ইহা সুখের বিষয় যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতির ফলে মৃত্যুহার ধীরে ধীরে কমিতেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি নির্ধারণে **সন্তানোৎপাদনশীল স্ত্রীলোকের সংখ্যার ভূমিকা** বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল দেশে এই সংখ্যার স্ত্রীলোকের অনুপাত কম সেই সকল দেশে জনসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে আর যে সকল দেশে ইহাদের সংখ্যা অধিক সেই সকল দেশে জনসংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ যে সন্তানোৎপাদনশীল স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শুধুমাত্র জন্মহার ও মৃত্যুহারের উপর নির্ভর করে না—ইহা নীট প্রজনন (Net Reproduction rate) হারের উপর নির্ভরশীল। অধ্যাপক কুজিন্স্কি (Kuczinski) এই ধারণার স্রষ্টা। ১০০০ স্ত্রীলোক সন্তান-উৎপাদনশীল বয়সে (১৫—৪০) কত স্ত্রী-সন্তানের জন্ম দেয় তাহা দেখিতে হইবে। ইহা হইতে যে সকল স্ত্রীলোক সন্তান-উৎপাদনশীল বয়সে পৌঁছিবার পূর্বেই মারা যায় তাহাদের ও যাহারা সারা জীবন কুমারী থাকিয়া যায় তাহাদের সংখ্যা বাদ দিতে হইবে। ইহার পর যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে তাহাই নীট প্রজনন হার। যদি দেখা যায় যে ১০০০ স্ত্রীলোক ১০০০ স্ত্রী-সন্তানের জন্ম দেয় তাহা হইলে নীট

নীট প্রজনন হার

প্রজনন হার হইবে $\frac{১০০০}{১০০০}$=১ ; এই হার এক হইলে জনসংখ্যার আয়তন একই থাকিয়া যাইবে, এই হার এক-এর কম হইলে জনসংখ্যা কমিবে এবং এক-অপেক্ষা বেশী হইলে জনসংখ্যা বাড়িবে। কিংস্‌লে ডেভিসের (Kingsley Davis) এক হিসাব অনুযায়ী ভারতে নীট প্রজনন হার ১·৩০ অর্থাৎ প্রতি ১০০০ স্ত্রীলোক সন্তান-উৎপাদনশীল বয়স পার হইয়া ১৩০০ স্ত্রীলোক বা ভাবী মাতার সৃষ্টি করিতেছে।

পরিশেষে, **দেশান্তর গমনাগমনের** দ্বারাও জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। অন্যদেশ হইতে নূতন লোক আসিয়া বসতি স্থাপন করিলে জনসংখ্যা বাড়িয়া যায়। আমেরিকা অথবা অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পর ইউরোপ হইতে ঐ সকল দেশে লোক যাইয়া সহসা উহাদের জনসংখ্যা বাড়াইয়া তোলে। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান হইতে এক কোটিরও অধিক আশ্রয়প্রার্থী ভারতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দেশের জনসংখ্যা বাড়িয়া যায়। অবশ্য সাধারণ অবস্থায় কোনো দেশই এই ধরণের অনুপ্রবেশ অনুমোদন করিবে না।

দেশান্তর গমনাগমন

জনসংখ্যার সমস্যা—ভারতে কি জনাধিক্য ঘটিয়াছে (Population Problem : Is India Overpopulated ?) :—ভারত একটি অর্ধোন্নত দেশ। কেন ভারত অনুন্নত এ সম্পর্কে দুইটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ প্রচলিত আছে। একদল লোক বলেন যে দুইশত বৎসর ধরিয়া ভারতে বিদেশী শাসন ও শোষণের ফলে দেশের এই দুরবস্থা। বিদেশীগণ নিজের স্বার্থে যথেচ্ছভাবে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট করিয়াছে, কাঁচামাল ক্রয় করিয়া দেশের শিল্পোন্নতিতে বাধা দিয়াছে এবং ভারতকে তাহার শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের বাজারে পরিণত করিয়াছে। রক্তহীন মানুষের মতো আজ সারাদেশ হৃতসর্বস্ব, রিক্ত এবং দুর্দশাগ্রস্ত।

দুইটি বিরোধী মতবাদ

আর একদল লোক আছেন যাঁহাদের মতানুসারে আমাদের দারিদ্র্যের কারণ জনাধিক্য। জনসংখ্যা অধিক বলিয়াই লোকের মাথাপিছু আয় কম এবং জীবন যাত্রার মান নিচু—এই জনাধিক্যই যে কোনো অর্থ-নৈতিক উন্নতির প্রতিবন্ধক। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব জনাধিক্য আমাদের দারিদ্র্যের কারণ কিনা এবং আদৌ ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা।

আলোচনার প্রারম্ভে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে জনাধিক্য সমস্যা শুধু মাত্র দেশের ভৌগোলিক আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে চলিবে না। কারণ তাহা হইলে ইংলণ্ডে বহু পূর্বেই জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইত। বৃহদায়তন দেশেও যদি আর্থিক সম্পদের পরিমাণ অল্প হয় তাহা হইলে অল্প জনসংখ্যাও অতিরিক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। আবার ক্ষুদ্রায়তন দেশে যদি আর্থিক সম্পদের পরিমাণ অধিক হয় তাহা হইলে অধিক জনসংখ্যাও অতিরিক্ত বলিয়া মনে হইবে না।

ম্যালথসীয় জনসংখ্যাতত্ত্ব এবং চরম কাম্য (Optimum Theory of Population) জনসংখ্যাতত্ত্বে জনাধিক্যের যে মানদণ্ড আছে তাহার আলোকে আমরা ভারতীয় জনসংখ্যার সমস্যা আলোচনা করিব।

ম্যালথাস তত্ত্বের মূল বক্তব্য হইল যে প্রত্যেক দেশে খাদ্য সরবরাহের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক তাহার কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক প্রগতিতে আর খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি পায় পাটিগণিতিক প্রগতিতে। কৃষিকার্য ক্রমবর্ধমান বিধির অধীন বলিয়া খাদ্যসরবরাহ এই মন্থরগতিতে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্যসরবরাহকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। প্রতি পঁচিশ বৎসর অন্তর জনসংখ্যার দ্বিগুণ হইবার প্রবণতা আছে। জনসংখ্যা দেশের খাদ্য সরবরাহকে অতিক্রম করিয়া গেলে দেশে জনাধিক্য দেখা দিবে। এই অবস্থায় দেশে অন্নসংকট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি দেখা দিবে অর্থাৎ প্রকৃতি অগ্রসর হইয়া জনাধিক্যের চাপ কমাইয়া পুনরায় খাদ্যের যোগান ও জনসংখ্যার মধ্যে অস্থায়ী ভারসাম্যের সৃষ্টি করিবে। ম্যালথাসের মতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনাহার-মৃত্যু হইল জনাধিক্যের লক্ষণ।

ম্যালথাস তত্ত্ব

আধুনিক অর্থনীতিবিদেরা জনসংখ্যার সমস্যাকে জাতীয় আয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া থাকেন। দেশে যে পরিমাণ মূলধনও প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে তাহাদের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসংখ্যা থাকা প্রয়োজন। এই নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসংখ্যাকে চরমকাম্য জনসংখ্যা (optimum population) বলা হয় কারণ ওই জনসংখ্যার দ্বারাই জাতীয় আয় সর্বাধিক এবং উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন হয়। জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইলে মাথাপিছু আয় কমিয়া যাইবে এবং দেশে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। আবার কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম জনসংখ্যা থাকিলে দেশটিকে জনবিরল (under populated) বলিতে হইবে এবং এই অবস্থায় মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হইবে না।

চরম কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে। এই দিক হইতেই বিচার করিয়া ডাঃ রাধাকমল মুখার্জী, ডাঃ জ্ঞানচাঁদ প্রভৃতি প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদগণ ভারতকে জনাকীর্ণ দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ডাঃ রাধাকমল মুখার্জী তাঁহার Food Planning For Four Hundred Millions গ্রন্থে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে ১৯৩৯ সালেও দেশের খাদ্যোৎপাদন হইতে শতকরা ৮৮ জনের খাদ্যের যোগান সম্ভবপর হইত। মোট উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য সকল লোকের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টন করিয়া দিলেও শতকরা ১২ জন লোক অভুক্ত থাকিয়া যায়। ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ৪৪ কোটির মত এবং সর্বনিম্ন ১৪০০ ক্যালোরি খাদ্যমূল্য হিসাবে মাত্র ৩০ কোটি লোককে খাওয়ানো যাইতে পারে অর্থাৎ ১৪ কোটি লোক অনাহারে এবং অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইবে। ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় হইতেই অর্থনীতিবিদগণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে ভারতে খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে এবং নিয়মিতভাবে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে না পারিলে খাদ্যের যোগানে

ভারতে জনাধিক্য

ঘাটতি দেখা দিবে। খাদ্যশস্য অনুসন্ধানকারী কমিটির মতানুসারে খাদ্যঘাটতি মিটাইবার জন্য পরিকল্পনাকালে ২০ হইতে ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য প্রতি বৎসর আমদানী করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে পৃথিবীর শতকরা ১৫ ভাগ লোক বাস করে কিন্তু ভারত পৃথিবীর মোট ভূমিভাগের ৭ ভাগ মাত্র। সুতরাং আপেক্ষিক অর্থে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণও ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। ১৯২১ সালে ইহা ছিল ১১১ সেণ্ট, ১৯৫১ সালে ইহা কমিয়া ৮৪ সেণ্টে দাঁড়াইয়াছে। ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে খাদ্য যোগানের তুলনায় ভারতের জনসংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে অর্থাৎ দেশে জনাধিক্য দেখা দিয়াছে।

চতুর্থতঃ, কর্ষণযোগ্য জমির তুলনায় জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়িতেছে। ১৯২৩ হইতে ১৯৫১ সাল এই ত্রিশ বৎসরে জনসংখ্যা বাড়িয়াছে ৪৪% হারে কিন্তু কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে মাত্র ৫% হারে। আর এই সময়ের মধ্যে কৃষি পদ্ধতির (technique of cultivation) বিশেষ উন্নতি হয় নাই, অর্থাৎ জমির উৎপাদন বাড়ে নাই।

অপরপক্ষে যাঁহারা চরমকাম্য জনসংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাসী, তাঁহাদের মতানুসারে ভারতে জনাধিক্য ঘটে নাই। তাঁহাদের যুক্তিগুলি নিম্নলিখিতরূপ :—

ভিন্ন মতবাদ

প্রথমতঃ, ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক পাশ্চাত্ত্য দেশ অপেক্ষা খুব বেশী নয়। আমাদের দেশে বর্তমানে বৎসরে ২.৫% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই হার যথাক্রমে ২.৩, ২.৫, ০.৪ এবং ১.৭; ভারতে মৃত্যুহার অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক উচ্চ। দ্বিতীয়তঃ ভারতে প্রতি বর্গমাইলে ৩৮৭ জন করিয়া লোক বাস করে অপরপক্ষে ইংলণ্ডে প্রতি বর্গমাইলে ৭০০ জন, জাপানে প্রতি বর্গমাইলে ৫৭৯ জন এবং জার্মানীতে প্রতি বর্গমাইলে ৭৫০ জন লোক বাস করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভারতে জনঘনত্ব ইংলণ্ড, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি দেশ অপেক্ষা কম। তৃতীয়তঃ আমাদের মাথাপিছু আয় ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। লর্ড কার্জনের হিসাবানুযায়ী ১৯০০ সালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ৩০ টাকা, ১৯৫৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৮৭ টাকা হইয়াছে। চতুর্থতঃ ডাঃ পি জে টমাসের হিসাবানুসারে ১৯০০ সাল হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদন জনসংখ্যা অপেক্ষা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে। পঞ্চমত, জনাধিক্য একটি আপেক্ষিক শব্দ। ভারতে যে পরিমাণ অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে তাহার পূর্ণ ব্যবহার হইলে বর্তমান জনসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী জনসংখ্যাকে খাওয়ানো যাইতে পারিবে। ষষ্ঠতঃ, ইহা সত্য যে অনুন্নত দেশে কৃষিতে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক নিযুক্ত থাকে কিন্তু ওই উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা দেশের ভবিষ্যৎ মূলধন-গঠনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। পরিশেষে ইহারা এই

যুক্তিও দেখান যে ভারতীয় জনসমস্যা সংখ্যার সমস্যা নয়—ইহা সুদক্ষ উৎপাদন ও সমবণ্টনের সমস্যা। উৎপাদন পদ্ধতিকে উন্নততর রূপদান করিতে পারিলে এবং ধনবণ্টনের অসাম্য কমাইতে পারিলে আমাদের জনসংখ্যা সমস্যার তীব্রতা থাকিবে না।

কিন্তু এই সকল যুক্তি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্যান্য পাশ্চাত্ত্যদেশ অপেক্ষা কম ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও বলিতে হয় ভারতের বর্তমান জনসংখ্যার পরিমাণ এতই অধিক যে বৃদ্ধির হার সামান্য হইলেও মোট বৃদ্ধি খুবই বেশী—৭০ লক্ষ। পাশ্চাত্ত্যের উন্নতদেশের সহিত ভারতের মতো অর্ধোন্নত দেশের তুলনা করাই অর্থহীন কারণ ওই সকল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ণের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষা অনেক বেশী। দ্বিতীয়তঃ, ইহা সত্য যে শিল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব ভারত অপেক্ষা অনেক বেশী কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে শিল্পের উন্নতি হওয়ার জন্যই এই সকল দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক—কিন্তু ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং এই দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী হইলে, জমির উপর অধিক চাপ পড়িবে, মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমিবে এবং কৃষিতে ছদ্মবেশী বেকারের সৃষ্টি হইবে। তৃতীয়তঃ, মাথাপিছু আয় বাড়িয়াছে কিন্তু উহা আর্থিক আয়ের (Money income) হিসাব, প্রকৃত আয়ও অবশ্য সামান্য পরিমাণ বাড়িয়াছে। কিন্তু জনসংখ্যা যদি দ্রুতহারে না বাড়িত তাহা হইলে প্রকৃত আয় অনেক বেশী বাড়িত। চতুর্থতঃ অব্যবহৃত সম্ভাব্য (potential) প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় বর্তমান জনসংখ্যা যে অতিরিক্ত ইহা অনস্বীকার্য।

জনসংখ্যাতত্ত্ববিশারদ ডাঃ চন্দ্রশেখরের হিসাবানুযায়ী ১৯৯৯ সালে ভারতের জনসংখ্যা ১০০ কোটি হইয়া ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে। বৃটিশ বৈজ্ঞানিক জুলিয়ান হাক্সলের মতে ভারত যদি জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে। আচার্য কৃপালনী রসিকতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে ভারতে শুধুমাত্র একটি শিল্পেরই উন্নতি হইতেছে, উহা হইল সন্তানোৎপাদন—প্রত্যেক গৃহই এক একটি কারখানাবিশেষ।

মিরডাল প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ চরম কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাসী নন, তাঁহাদের মতে চরম কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্ব বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্ক বিরহিত একটি অবাস্তব ধারণামাত্র। অপরপক্ষে ম্যালথুসীয় তত্ত্বও পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ ইউরোপে ম্যালথাসের ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছিল। তথাপি বহু অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে পৃথিবীর জনসংখ্যা যে হারে বাড়িতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্যাভাব দেখা দিবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্যদপ্তর ঘোষণা করিয়াছে যে ১৯৪০ সালের তুলনায় বর্তমান পৃথিবীতে মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। ইউরোপের উন্নতদেশে ম্যালথ্যাস আজ মৃত বলিয়া গণ্য হইলেও ম্যালথাসের প্রেতচ্ছায়া ভারতকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

অধিক জনসংখ্যা অকাম্য

উপসংহারে বলিতে পারি ভারতের বর্তমান জনসংখ্যাকে অতিরিক্ত না বলিলেও ইহা অপেক্ষা অধিক জনসংখ্যা কোনোমতেই কাম্য নয়—জনসংখ্যা আর অধিক বৃদ্ধি পাইলে আমাদের বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। এইজন্য খাদ্যশস্য অনুসন্ধানকারী কমিটি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিয়াছেন।

জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ণ (Population and Economic Growth): জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ণের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ণের উপর জনসংখ্যার প্রভাব রহিয়াছে, আবার জনসংখ্যার উপর অর্থনৈতিক উন্নয়ণ প্রভাব বিস্তার করে। খৃষ্টের জন্মের পর হইতে ১৭৫০ সাল পর্যন্ত প্রতি শতাব্দীতে বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়িয়াছে ৬% হারে। ১৭৫০ সালের পর হইতে প্রতি দশ বৎসরে জনসংখ্যা ৬·৪% হারে বাড়িয়াছে। প্রাক্-শিল্প বিপ্লবের পূর্বে জনসংখ্যা ধীরগতিতে বাড়িয়াছে তাহার কারণ তখন জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই উচ্চ ছিল। ১৭৫০ সাল অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের পর হইতে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যায় তাহার কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মৃত্যুহার কমিয়া যায় কিন্তু জন্মহার একই থাকে। কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে যদি কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ না বাড়ে তাহা হইলে কম জমিতে অধিকসংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত হয় অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান বিধির কার্য সুরু হয় এবং জীবনযাত্রার মান নিচু হইতে থাকে। নূতন উদ্ভাবনীশক্তির (innovation) মাধ্যমে ক্রমহ্রাসমান বিধির গতিরোধ করা যায়।

কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মোট চাহিদার পরিমাণ বাড়িবে। চাহিদা বাড়িলে অধিক উৎপাদন এবং অধিক শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে। চাহিদা বাড়িলে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান বাড়িবে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি একদিকে যেমন বর্ধিত চাহিদার সৃষ্টি করিবে তেমনি অন্যদিকে উহা শ্রমের যোগান বৃদ্ধি করিবে। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভবপর হইবে ও তজ্জনিত ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যাইবে। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে শ্রমবিভাগের অধিক প্রসার ঘটে, শ্রমিকের উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের কথা বলা হইল তাহা অবশ্য নির্ভর করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া মূলধন দ্রব্য বৃদ্ধির উপর। কিন্তু যেখানে মূলধন দ্রব্য অল্প, সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে। এরূপক্ষেত্রে জনসংখ্যা বেশী হইলে ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় বাড়িয়া যাইবে এবং কম পরিমাণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হইবে।

যে দেশে জনসংখ্যা অপেক্ষা জমির পরিমাণ বেশী সে দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে ভোগ্যদ্রব্যের বাজার বৃদ্ধি পায়, কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, শ্রমবিভাগ অধিকতর প্রসারিত হয় এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় ও দেশের সম্প্রসারণ ঘটে। জমির তুলনায় জনসংখ্যা বেশী হইলে জনবৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ণের গতিকে রুদ্ধ করিয়া দেয়। চরমকাম্য জনসংখ্যার বেশী লোকসংখ্যা হইলেই মাথাপিছু আয়

কমিতে থাকিবে। আয় কম হওয়ায় সঞ্চয় এবং মূলধন গঠনের পরিমাণ কম হইবে অর্থাৎ দেশের উন্নয়ণের গতি অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবে।

জনসংখ্যা মূলধনদ্রব্যের তুলনায় কম হইলে, শ্রমিকের চাহিদা এবং মজুরী বাড়িয়া যাইবে, ফলে উদ্যোক্তার লাভ কম হইবে। উদ্যোক্তা বেশী লাভ করিবার জন্য নূতন নূতন উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কার (innovation) করিবে এবং এইভাবে তাহার লাভ বাড়িয়া যাইবে। আমেরিকার উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অপেক্ষাকৃত কম জনসংখ্যা।

নূতন দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়ণের গতিকে ত্বরান্বিত করে; বাহির হইতে লোক আসায় এই সকল নূতন দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং উহার সাথে সাথে উন্নয়ণও হইতে থাকে কারণ বিদেশীরা নিজেদের সাথে দক্ষতা এবং কিছু পরিমাণ মূলধন লইয়াই আসে। দেশে যদি বিস্তীর্ণ চাষযোগ্য জমি থাকে তাহা হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়ণকে দ্রুততর করিয়া তুলিবে। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ণ এইভাবে হইয়াছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ণকে প্রভাবিত করে, তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়ণও জনসংখ্যার উপর নানারূপ প্রভাব বিস্তার করে।

কুজনেট্স্কী, প্রভৃতি অর্থনীতিবিদগণের ধারণা যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ণের সাথে সাথে জনসংখ্যাবৃদ্ধি হ্রাস পায়। উন্নয়ণের ফলে, মাথাপিছু আয় এবং জীবন-যাত্রার মান বাড়িয়া যায় এবং উহার ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি হ্রাস পায়। কিন্তু সকল অবস্থায় ইহা সত্য নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ণ বেশ কিছুটা অগ্রসর হইবার পরই জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমিতে থাকে—ওই স্তর না আসা পর্যন্ত জনসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে বাড়িবে। ডাঃ নবগোপাল দাস এই মতের সমর্থক। ভারতেও আগামী কয়েক বৎসর জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িবে। কারণ-স্বরূপ বলা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভাবে মৃত্যুহার কমিয়া যাইবে কিন্তু জন্মহার বিশেষ কমিবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ণের প্রাথমিক স্তর চলিয়া যাইবার পরই জন্মহার কমিতে থাকিবে। জনসংখ্যাবৃদ্ধি হইলে গ্রামের লোকেরা জীবিকা অন্বেষণের জন্য শহরে আসিয়া উপস্থিত হইবে, ফলে পরিবার হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে হইবে, যুগ-প্রাচীন সংস্কারের বন্ধন শিথিলতর হইবে, নূতন রুচিবোধের সৃষ্টি হইবে, স্ত্রীশিক্ষা এবং স্বাধীনতা প্রসারলাভ করিবে ফলে জন্মহার কমিবে।

কুজনেট্স্কীর মতবাদ

ডাঃ নবগোপাল দাসের মতবাদ

সুতরাং বলা যায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়ণের প্রাথমিক পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু পরবর্তী স্তরে উহা হ্রাস পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক উন্নয়ণের ফলে বিভিন্নপ্রকার উপজীবিকার মধ্যে জনসমষ্টির পুনর্বিন্যাস হইবে। অধ্যাপক কলিনক্লার্ক জীবিকাসমূহকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রাথমিক উপজীবিকা (Primary occupations) অর্থাৎ কৃষি, মৎস্য

চাষ ইত্যাদি; মাধ্যমিক উপজীবিকা (Secondary occupations) অর্থাৎ শিল্প এবং তৃতীয় স্তরের উপজীবিকা (Tertiary occupations) যেমন ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিক্ষকতা, পরিবহন ইত্যাদি। দেশটি সম্প্রসারিত হইতে থাকিলে উহার জনগণের জীবিকানির্বাহের কাঠামোর পরিবর্তন হইতে থাকিবে। অনুন্নত দেশে অধিকাংশ লোক প্রাথমিক স্তরের উপজীবিকায় নিযুক্ত থাকে, দেশের উন্নতির সাথে সাথে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণী উপজীবিকার লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকে। উন্নতিকামী দেশে শিল্পসমূহের মধ্যে আবার প্রথমে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য হাল্কা শিল্পের ও তৎপরে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনকারী ভারীশিল্পের প্রসার ঘটে।

উপজীবিকার পুনর্বিন্যাস

ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা অগ্রগতির পথে এক বিরাট বাধা স্বরূপ। জনসংখ্যা অধিক হওয়ায় খাদ্য সমস্যা তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে, ভারত খাদ্যে স্বয়ং-নির্ভরশীল নয় সেইজন্য প্রতি বৎসর ১০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়। ইহার ফলে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতেই মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হইয়া যাইতেছে। খাদ্য আমদানী করিতে না হইলে ওই টাকায় মূলধনদ্রব্য ক্রয় করা সম্ভবপর হইত। আবার দেখা যায় অগ্রগতির ফলে যে বাড়্‌তি আয় হইতেছে উহা বাড়্‌তি জনগণের খাদ্যসংগ্রহে ব্যয় হওয়ায় সঞ্চয় তথা মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে না।

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক উন্নয়ণের ফলে লোকের মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে শিক্ষা, কারিগরী জ্ঞান এবং শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ উন্নয়ণের ফলে জনসংখ্যায় গুণগত (qualitative) মানোন্নয়ণ সাধিত হয়।

চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক উন্নয়ণের ফলে গ্রাম ও নগরাঞ্চলের জনসংখ্যার পুনর্বিন্যাস হয়। শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহণ, শিক্ষা ইত্যাদির প্রসারের ফলে গ্রাম হইতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় লোক নগরাঞ্চলে উপজীবিকার সন্ধানে আসিতে থাকে ফলে গ্রামের জনসংখ্যা হ্রাস পাইতে ও শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ভারতের মতো অনুন্নতদেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধি নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। কৃষিতে প্রায় শতকরা ৭০ জন লোক নিযুক্ত রহিয়াছে, ইহাদের একটি বিশেষ অংশ ছদ্মবেশী বেকার। দেশের উন্নতি করিতে হইলে দ্রুত শিল্পায়ণ আশু কর্তব্য। অধিক জনসংখ্যা ছদ্মবেশী বেকারের কারণ। জনসংখ্যার চাপেই ভারত তাহার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ণে যত্নবান। নার্কসের মতে অনুন্নত দেশের ছদ্মবেশী বেকার মূলধন গঠনের সহায়ক। কিছু পরিমাণ জনসংখ্যাকে কৃষি হইতে সরাইয়া আনিয়া মূলধনদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করিলে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পাইবে না। অধ্যাপক নার্কসের যুক্তি এইরূপ: ছদ্মবেশী বেকারত্ব বলিতে কিছু পরিমাণ প্রচ্ছন্ন সঞ্চয়শক্তিও বুঝায়। জমিতে নিযুক্ত অনুৎপাদনশীল উদ্বৃত্ত শ্রমিকগণ উৎপাদনশীল শ্রমিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়। উৎপাদনশীল শ্রমিকগণ প্রচ্ছন্ন সঞ্চয় করিতেছে—তাহারা যাহা ভোগ করে তাহা অপেক্ষা অনেক

বেশী উৎপাদন করে। যদি উৎপাদনশীল কৃষকগণ তাহাদের উপর নির্ভরকারী অনুৎপাদনশীল কৃষকগণকে মূলধনদ্রব্য গঠনের কাজে পাঠায় এবং পূর্বের মতো তাহাদের প্রতিপালন করে তাহা হইলে তাহাদের প্রচ্ছন্ন সঞ্চয় (virtual saving) যথার্থ সঞ্চয়ে (effective saving) পরিণত হইবে।

জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং সরকারী নীতি (Population Planning and Government Policy) :—ভারতে জনসংখ্যা প্রতি বৎসর ৭০ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। ফিসক্যাল কমিশন এবং পরিকল্পনা কমিশনের মতে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অতি ভয়াবহ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তর হিসাবে আগামী কয়েক বৎসর জনসংখ্যা দ্রুত হারে—বর্তমান হার অপেক্ষাও অধিক হারে—বাড়িতে থাকিবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবার যে সম্ভাবনা দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাহা বাস্তব রূপায়িত হইবে না। অতি দ্রুত হারে জনসংখ্যা বাড়িতে থাকিলে জনসাধারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো ফলই ভোগ করিতে পারিবে না। উন্নয়নের সকল প্রয়াসই বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্য সংগ্রহে আবদ্ধ থাকিবে ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে না। এই কারণে জনসংখ্যা পরিকল্পনার প্রয়োজন। দ্রুত জনবৃদ্ধি যাহাতে উন্নয়নের গতি রুদ্ধ করিতে না পারে তাহার জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অকাম্য

অনেকে যুক্তি দেখান যে দ্রুত জনবৃদ্ধি ইউরোপে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নাই। সেখানে কোনো সক্রিয় জনসংখ্যা হ্রাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই তথাপি জনসংখ্যা বৃদ্ধি আপনা আপনিই কালক্রমে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু ইউরোপের অবস্থার সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা যুক্তিযুক্ত নয়। ইউরোপে যখন শিল্পবিপ্লব ঘটে তখন ওখানকার মোট জনসংখ্যার পরিমাণ খুবই অল্প ছিল। তাই শতকরা বৃদ্ধির হার অধিক হইলেও মোট বৃদ্ধির পরিমাণ খুব বেশী নয়। দ্বিতীয়তঃ ওখানে যে হারে জনসংখ্যা বাড়িয়াছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন তদপেক্ষা অনেক অধিক হারে হইয়াছে।

ইউরোপের উদাহরণ

খ্যাতনামা বৃটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার জুলিয়ান হাক্সলের মতে ভারতের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত না হইলে উহা ভয়াবহ সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে। দ্রুত জনবৃদ্ধি হইলে উন্নয়নের কোনো প্রভাবই দেশে দেখা যাইবে না। পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারত জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির প্রয়াসী, সেই কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যয়কে, পুরাপুরি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতেও, লাভজনক বিনিয়োগ বলিয়া গণ্য করা চলে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পাইতেছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ করিয়া মৃত্যু নিয়ন্ত্রণের সহিত ভারসাম্য আনিতে হইবে নতুবা বিপর্যয় ঘটিবে।

বৃটিশযুগে ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টাই করা হয় নাই। ১৯৪৯ সালে জাতীয় আয় কমিটি (National Income Committee) এবং ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর রিপোর্টে প্রথম জনসংখ্যার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি আছে। প্রথম, পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে অপরিণামদর্শী মাতৃত্বকে (improvident maternity) পরিহার করা। এই কথাটি প্রথম ১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে ব্যবহার করা হয়। তিন বা ততোধিক সন্তানবতী মাতার পুনরায় মাতৃত্ব লাভকে অপরিণামদর্শী মাতৃত্ব বলা হইয়াছে। ইহাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলা হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের তিনটি পদ্ধতি

দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী-পুরুষের, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দেওয়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটি উপায়। একটি স্ত্রীলোক সাধারণতঃ ১৫ হইতে ৪০ বৎসর পর্যন্ত সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে সন্তান প্রজননের কম সময় (shorter span of reproduction age) পাওয়া যায় ফলে কম সংখ্যক সন্তান হয়।

তৃতীয়তঃ, চরমপন্থীরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী। যেমন তিনটির অধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পিতার উপর কর ধার্যকরা, নারীপুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি তাহারা সমর্থন করেন।

পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব তিনদিক হইতে বিচার করা যায়—(১) মাতার স্বাস্থ্য, (২) নিয়ন্ত্রিত পরিবারের সুবিধা এবং (৩) দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা।

পরিবার পরিকল্পনা

পরিবার পরিকল্পনা স্বয়ং কোনো উদ্দেশ্য নয়—ইহা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। পাশ্চাত্য দেশে পরিবার পরিকল্পনার বিশেষ গুরুত্ব নাই কারণ ক্ষুদ্র পরিবারই তাহাদের আদর্শ ও তাহাদের জীবনদর্শনের সহিত সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। তাহারা "বেবি" অপেক্ষা "বেবি কারই" (baby car) অধিক পছন্দ করে। জাতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে পরিকল্পনা দুইটি কারণে প্রয়োজন (১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা এবং (২) জীবন যাত্রার মান উন্নত করা।

বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু জন্মহার অতি উচ্চ থাকায় জনসংখ্যা দ্রুতহারে (২.৫%) বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমান জনবৃদ্ধির হার বজায় থাকিলে আগামী ৩০ বৎসরের মধ্যে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইবে। জাতীয় জীবনযাত্রার মানের কোনরূপ উন্নতি না করিয়া কেবলমাত্র বর্তমান জীবনধারণের মান বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় আয়ের শতকরা ৯ ভাগ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইবে। "জনসংখ্যা বিস্ফোরণের" (Population Explosion) ভয়াবহ পরিণতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব আজ অনস্বীকার্য।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর চারিটি দিক রহিয়াছে—

(১) গর্ভ নিয়ন্ত্রণ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ (Conception Control or Birth Control)

(২) বন্ধ্যা দম্পতির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, (Treatment of Sterility Cases)

(৩) বিবাহ পরামর্শ পর্ষৎ (Marriage Councelling)

(৪) যৌন শিক্ষা (Sex Education)

ভারতে এখনো পর্যন্ত গর্ভ নিয়ন্ত্রণ অবৈধ, কিন্তু জাপান ও অন্যান্য দেশে গর্ভ নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ বৈধ এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হয়। পরিবার পরিকল্পনার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়টি আমাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুইজারল্যাণ্ড ও অন্যান্য উন্নতদেশে যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় উহা অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

প্রথম পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পবার জন্য মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এই সময় পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল মাতার স্বাস্থ্য রক্ষা করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার জন্য প্রায় ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাহাকে সম্প্রসারণ কর্মসূচী (Extension Programme) বলা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার পরিবার পরিকল্পনা খাতে প্রথমে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, পরে উহাকে বাড়াইয়া ৫০ কোটি টাকা করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনাকে ব্যাপক গণ-আন্দোলনে পরিণত করিবার কার্যসূচী (Mass programme of people's Movement) গ্রহণ করা হইয়াছে। ভারতে যে ৯৮ মিলিয়ন দম্পতি আছে এই সময় তাহাদের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পরিবার পরিকল্পনার জন্য ৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে, উহা নিঃশেষিত হইলে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ আরও ১৪৪ কোটি টাকা পাইবে। চতুর্থপরিকল্পনায় জন্মহার প্রতি হাজারে ৪০ হইতে হ্রাস করিয়া ২৫ করিতে হইবে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য লুপ ব্যবহারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক (মাতা), দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহা পরিবারকেন্দ্রিক (স্বামী ও স্ত্রী) হয়, তৃতীয় পরিকল্পনায় উহা গ্রামকেন্দ্রিক (Community) এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় উহা দেশব্যাপী এক ব্যাপক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করিবে।

পরিবার পরিকল্পনার [illegible]

পরিবার পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে ব্যাপক প্রচার আবশ্যক। জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কুসংস্কার দূরিকরণ, বৃহৎ পরিবারের অসুবিধা এবং পরিবার পরিকল্পনায় সর্বাধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করিবার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্যের প্রয়োজন। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ জনপ্রিয় করিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে প্রদান করিতে হইবে। অধিক সংখ্যায় সর্বত্র, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ২৫০০ পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব ছিল। অবশ্য কার্যতঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১৮০০ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি দীর্ঘকালীন ব্যবস্থা। স্বল্পকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ইহার বিশেষ উপযোগিতা নাই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা দ্রুততর হারে অর্থনৈতিক উন্নয়নই হইল স্বল্পকালীন ব্যবস্থা।

স্বল্পকালীন ব্যবস্থা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটি মারাত্মক কুফল যে ইহা জাতির ভবিষ্যৎ গুণগত অবনতি ঘটাইতে পারে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সকল উচ্চশিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অবহিত আছেন ফলে তাঁহারা পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে সন্তান সন্ততির সংখ্যা কমাইবেন। অশিক্ষিত এবং নির্বোধ জনসাধারণ পরিবার পরিকল্পনার উপযোগিতা বোঝে না বলিয়া তাহারা সন্তানোৎপাদন কমাইবে না, ফলে ভবিষ্যতে মোট সংখ্যার শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান জনসংখ্যার অনুপাত কমিয়া যাইবে, এবং এই কারণে দেশের সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক অগ্রগতি প্রতিহত হইবে।

ডাঃ জ্ঞানচাঁদ পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব অস্বীকার না করিলেও ইহার মাধ্যমে জনসমস্যার কোনো স্থষ্ঠু সমাধান হইবে না বলিয়াই তিনি মনে করেন। বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো বর্তমান জনসংখ্যার দারিদ্র্য দূর করিতেই অক্ষম সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়নের আশা করা বৃথা। তাঁহার মতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং উৎপাদন-সম্পর্ক পরিবর্তনের দ্বারাই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

ডাঃ জ্ঞানচাঁদের মতবাদ

সর্দার পানিকরের মতে ভারতের জনসমস্যা অসম ভৌগলিক বণ্টনজনিত সমস্যা; তাঁহার মতে জনবহুল অঞ্চল হইতে জনবিরল অঞ্চলে জনসংখ্যার পূনর্বিন্যাস করিলে জনসংখ্যার সমস্যা আর থাকিবে না। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ জনসংখ্যার পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে জনসংখ্যার সমস্যা সমাধান করা যাইবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় না এইভাবে সমস্যার সমাধান করা যাইবে। যে সব অঞ্চলে লোক-বসতি বিরল সেই সব অঞ্চলে হয় কৃষি নতুবা শিল্পের উন্নতির মাধ্যমে অধিক জনসংখ্যাকে আকৃষ্ট করিতে হইবে। জলসেচের প্রসার, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষির উন্নতি করা যায় বটে কিন্তু কৃষি অতি অল্প পরিমাণ লোককে আকৃষ্ট এবং পোষণ করিতে পারিবে ফলে জনাকীর্ণ অঞ্চলের সমস্যার তীব্রতা বিশেষ হ্রাস পাইবে না। অপরপক্ষে, শিল্পবাণিজ্যের প্রসার, ভৌগোলিক অবস্থান এবং পরিবহন ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত হয় সেই কারণে যথেচ্ছ শিল্প প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভবপর নয়।

সর্দার পানিকরের মতবাদ

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয় আয়

(National Income)

[বিষয়বস্তু : জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা ও পরিমাপ পদ্ধতি—জাতীয় আয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা —ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা—ভারতে জাতীয় আয়ের হিসাব ও বৈশিষ্ট্য]

সকল অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য হইতেছে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি এবং সমবণ্টনের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি জাতীয় আয়ের ক্রমবৃদ্ধির উপর যথোচিত লক্ষ্য রাখিয়াছিল। কোনো দেশের অর্থনৈতিক আলোচনা বস্তুতঃ সেই দেশের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি এবং উহার সমবণ্টনের আলোচনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। অর্ধোন্নত দেশের অনগ্রসরতার রূপটি তাহার জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা পড়ে।

জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা ও পরিমাপ পদ্ধতি (Definition and Measurement of National Income) : দেশের সকল লোক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ অর্থোপার্জন করে তাহাদের সমষ্টিই হইল জাতীয় আয়। ডাঃ মার্শালের সংজ্ঞানুসারে দেশের শ্রম ও মূলধন প্রাকৃতিক সম্পদে প্রযুক্ত হইয়া নির্দিষ্ট বৎসরে যে পরিমাণ দ্রব্যসমষ্টি এবং অবস্তুগত সেবার সৃষ্টি করে তাহাদের অর্থমূল্যের সমষ্টিই হইল জাতীয় আয়। কোনো নির্দিষ্ট বৎসরে প্রত্যেক দেশেই খাদ্যশস্য, বস্ত্র, গৃহ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই সকল দ্রব্যের অর্থমূল্য যোগ করিলে মোট জাতীয় উৎপাদনের (G. N. P.) পরিমাণ জানিতে পারা যায়। মোট জাতীয় আয় হইতে অপচয়জনিত খরচ বাদ দিলে যাহা থাকিবে তাহাকে নীট জাতীয় উৎপাদন (N. N. P.) বলে। ধরা যাক একটি মেশিনের মূল্য ১০,০০০ টাকা এবং দশ বৎসর চালু থাকিবে এবং ঐ মেশিন হইতে বৎসরে দুই হাজার টাকা আয় হয়। এখন মালিককে প্রতি বৎসর এক হাজার টাকা আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে। দশ বৎসর পরে দশ হাজার টাকা জমিবে এবং দশ বৎসর পরে মেশিনটি অকেজো হইয়া পড়িলে আবার একটি নূতন মেসিন ক্রয় করিতে হইবে, সুতরাং মেশিনটি হইতে নীট বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ হইবে এক হাজার টাকা।

জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার তিনটি পদ্ধতি আছে : উৎপাদন পদ্ধতি (Output Method), আয় পদ্ধতি (Income Method) এবং ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতি (Consumption and Savings Method).

[এক] উৎপাদন পদ্ধতি : উৎপাদন পদ্ধতিতে দেশে মোট উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার হিসাব করা হয়। সকল দেশেই নানাপ্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়—ধান, গম, তুলা ইত্যাদি। এই সকল অসম জাতীয় দ্রব্যের যোগ কি ভাবে সম্ভবপর? আমরা দ্রব্যগুলিকে যোগ করিব না—নির্দিষ্ট সময়ে যে সকল দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয়, চলতি

বাজারদরে তাহাদের অর্থমূল্যের পরিমাপ করিতে হইবে। এই অর্থমূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন (G. N. P.) বলে। উৎপাদনের জন্য মূলধন প্রয়োজন হয়। মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ (depreciation) কিছু টাকা সরাইয়া রাখা প্রয়োজন তাহা না হইলে ভবিষ্যতে একদিন উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। মোট জাতীয় আয় হইতে ক্ষয়ক্ষতিবাবদ প্রয়োজনীয় টাকা সরাইয়া রাখিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই হইল নীট জাতীয় উৎপাদন (N.N.P.) ; জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ করিবার সময় একটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে—একই দ্রব্য যেন দুইবার গণনা করা না হয়। এই কারণে জাতীয় উৎপাদন হিসাবের সময় সম্পূর্ণ উৎপাদন দ্রব্যের (final products) অর্থমূল্যই ধরিতে হইবে। কাঁচামালের অর্থমূল্য ধরা হইবে না, কারণ সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যেই উহা রহিয়া গিয়াছে। যেমন রুটীর দামের মধ্যেই ময়দার দাম রহিয়া গিয়াছে। একটি রুটির দামের সহিত যদি ময়দার দাম পৃথকভাবে যোগ দেওয়া হয় তাহা হইলে ময়দার দাম দুইবার গণনা করায় ভুল হইবে। জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার সময় মাধ্যমিক বস্তুগুলির (intermediate goods) মূল্য বাদ দিয়া কেবল মাত্র সম্পূর্ণ দ্রব্যের মূল্যগুলিই পরিমাপ করিতে হইবে। এই পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ দ্রব্য পদ্ধতি (final products method) বলে।

যখন জাতীয় উৎপাদনের হিসাব বাজার দরে করা হয় তখন তাহার মধ্যে পরোক্ষ করও থাকিয়া যায়। উৎপাদন মূল্যে নীট জাতীয় আয় পাইতে হইলে উৎপাদন শুল্ক (excise duty) বাদ দিতে হইবে। পরোক্ষ কর বাদ দিবার পর যে জাতীয় আয় পাওয়া যায় তাহাই হইতেছে দেশের সামগ্রিক খাজনা, মজুরি, সুদ এবং মুনাফার আয়ের সমষ্টি।

পরিশেষে ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অনেক সময় দ্রব্য ও সেবামূলক কাজ অর্থের বিনিময়ে কেনাবেচা হয় না। যখন উৎপাদক উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় না করিয়া নিজেই ভোগ করে, সেই ক্ষেত্রে সেই সকল দ্রব্যের বাজারদরে যে অর্থমূল্য হইবে তাহা জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি কাজ আছে যেমন জননীর অথবা স্ত্রীর সেবা ইত্যাদি—যাহার অর্থমূল্য নির্ণয় করা কঠিন বলিয়া আমরা ইহাদিগকে জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করিব না।

[দুই] **আয় পদ্ধতি :** এই পদ্ধতি অনুসারে নির্দিষ্ট বৎসরে দেশের লোক উৎপাদন কর্মে অংশ গ্রহণ করিয়া যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে তাহাদের সমষ্টির দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। কতকগুলি লোক দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে, যেমন ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠনের মালিকেরা পায় খাজনা, মজুরী, সুদ এবং মুনাফা। আবার কতকগুলি লোক পেশাগত উপজীবিকার বিনিময়ে টাকা রোজগার করে, যেমন উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক ইত্যাদি। এই দুই প্রকার আয়ের সমষ্টিই জাতীয় আয়। কোন যৌথ মূলধনী কোম্পানী তাহার মুনাফার কোনো অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ না করিয়া রিজার্ভ রাখিয়া দিলে তাহা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। সরকারী সম্পত্তি হইতে যে

আয় হয় তাহাও জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ব্যতীত কতকগুলি জিনিষকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে যাহা মালিকের নিকট আয় হিসাবে দেখা দেয় নাই ; মালিক নিজের বাড়ীতে বসবাস করিলে তাহা হইতে যে ভাড়া পাওয়া যাইতে পারিত তাহা জাতীয় আয়ের ভিতর ধরিতে হইবে।

আয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার সময় হস্তান্তর পাওনাকে (transfer payments) জাতীয় আয়ের ভিতর ধরা হইবে না। সরকার উদ্বাস্তুদিগকে অথবা বেকারদিগকে যে অর্থ সাহায্য করে তাহা জাতীয় আয়ের মধ্যে গণ্য করা হইবেনা কারণ উহা কোনো উৎপাদন কার্য হইতে উদ্ভূত হয় নাই, আয় একজনের নিকট হইতে অপর একজনের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে মাত্র, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় নাই। সেই আয়কেই শুধুমাত্র গণনা করা হইবে যাহা কোনো উৎপাদন কার্য হইতে সৃষ্ট।

[তিন] ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতি : জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার তৃতীয় পদ্ধতি হইল ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতি। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ আয় সৃষ্টি হয় তাহার একাংশ ভোগ্যবস্তু ক্রয় করিতে ব্যয় হয় এবং অপরাংশ সঞ্চয় করা হয়। সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করিয়া মূলধন বৃদ্ধি করা হয়। সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট বৎসরে দেশের সমস্ত লোকের ভোগ্যবস্তু এবং সেবা ক্রয় করিতে যে পরিমাণ অর্থের ব্যয় হয় তাহার সহিত যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইয়া মূলধন বৃদ্ধি করে তাহা যোগ করিলে জাতীয় ব্যয় তথা জাতীয় আয়ের (জাতীয় আয় ও ব্যয় সমান) হিসাব পাওয়া যাইবে। জাতীয় আয় হিসাব করিবার সময় বৈদেশিক বাণিজ্যের কথাও মনে রাখিতে হইবে। যখনই বিদেশ হইতে কোনো আয় হইতেছে অর্থাৎ-আমদানী মূল্য অপেক্ষা রপ্তানী মূল্য বেশী হইতেছে তাহাকে মোট জাতীয় আয়ের সহিত যোগ করিতে হইবে। আবার যখন ব্যয় বেশী হইতেছে অর্থাৎ রপ্তানী মূল্য অপেক্ষা আমদানী-মূল্য বেশী হইতেছে, তখন ঐ পরিমাণ টাকা দেশের মোট বাৎসরিক আয় হইতে বাদ দিতে হইবে।

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা (Importance of National Income Analysis) : বিভিন্নদিক হইতে জাতীয় আয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অধ্যাপক স্যামুয়েলসন বলেন যে জাতীয় আয় বিশ্লেষণের দ্বারা দেশটি কেমনভাবে মন্দা হইতে তেজীর দিকে অগ্রসর হইতেছে, কেমনভাবে তাহার অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করিতেছে এবং তুলনামূলক ভাবে দুই দেশের জীবনযাত্রার মান বুঝিতে পারা যায়। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য জাতীয় আয় বিশ্লেষণের প্রয়োজন রহিয়াছে।

জাতীয় কল্যাণ

(১) জাতীয় আয়ের দ্বারা জাতীয় কল্যাণ (National Welfare) পরিমাপ করা যায়। জাতির আয় বাড়িলে ধরিতে হইবে যে অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জাতীয় আয় কমিলে উহা অর্থনৈতিক কল্যাণ হ্রাসের নিদর্শন রূপে গণ্য হইবে। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে এমন অনেক কাজ আছে (দেশরক্ষা খাতে ব্যয়) যাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে না।

(২) জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু গড আয়ের হিসাব হইতে আমরা জনগণের জীবনযাত্রার মান বুঝিতে পারি। ব্যক্তির জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে তাহার আয়ের উপর। যে ব্যক্তির আয় কম সে অনেক প্রকার পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত থাকে। আর যে ব্যক্তির আয় বেশী তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও বেশী। কোনো ব্যক্তির আয় বাড়িলে যেমন তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ জাতীয় আয় বাড়িলে দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নতি সম্ভবপর হয়।

জীবনযাত্রার মান

(৩) দেশটির অর্থনৈতিক অগ্রগতি হইতেছে কিনা অথবা উহা কাম্য পথে চলিতেছে কিনা ইহা বুঝিতে হইলে জাতীয় আয়ের আলোচনা প্রয়োজন। জাতীয় আয়, মূল্যস্তর, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি আলোচনা করিয়া দেশের অর্থনৈতিক প্রসারের গতি বুঝিতে পারা যায়।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি

(৪) দুইটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা তাহাদের জাতীয় আয়ের হিসাব হইতেই পাওয়া যায়। ভারত দরিদ্র দেশ, এখানে মাথাপিছু আয় (১৯৬০-৬১ সালের হিসাবানুযায়ী) ২৯২ টাকা আর আমেরিকা উন্নত দেশ, সেখানে মাথাপিছু আয় ৯৭৩০ টাকা। অবশ্য দুইটি দেশের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে কেবলমাত্র মাথাপিছু আয় বিশ্লেষণ করিলেই চলিবেনা, দুইটি দেশের মূল্যস্তরের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দুইটি দেশের তুলনামূলক বিচারে জাতীয় আয় কতখানি সহায়তা করে এ বিষয়ে অধ্যাপক বাওলে প্রভৃতি অর্থনীতিবিদগণ সন্দেহ প্রকাশ করেন।

তুলনামূলক আলোচনা

(৫) অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জাতীয় আয় পরিসংখ্যানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা আর সরকার বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। উৎপাদনের হার, সঞ্চয়ের পরিমাণ ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়াই সরকার তাহার অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন। জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতে আমরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে উৎপাদনের পরিমাণ ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, আয়-ব্যয়ের ধরণ ও সমাজের সাধারণ রূপ জানিতে পারি।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

(৬) ভারতের মতো যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যে জাতীয় আয়ের হিসাব অন্য আর এককারণে প্রয়োজন। এই পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিয়াই কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে অনুদান (Grants in Aids) মঞ্জুর করে।

ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা (Difficulties of National Income Calculation in India) : ভারতের মতো অর্ধোন্নত দেশে জাতীয় আয় পরিমাপের নানারূপ অসুবিধা আছে। ভারতের মতো বিরাট দেশে জাতীয় আয়ের সঠিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা শাসনবিভাগের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়াই ভারতীয় পরিসংখ্যান রচনা করা হয়। বাওলে যে বলিয়াছেন ভারতীয় পরিসংখ্যান

পরিমাপের অসুবিধা

অসম্পূর্ণ, অসম্বদ্ধ, এবং বিভ্রান্তিকর তাহা যথার্থই সত্য। জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধাগুলিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়—ধারণাগত অসুবিধা (Conceptual difficulties) এবং তথ্যগত অসুবিধা (Statistical difficulties)।

[এক] অর্থবহির্ভূত ক্ষেত্র : প্রথম ধারণাগত অসুবিধা হইল যে উৎপাদনের একটি বিরাট অংশ বাজারেই আসে না। জাতীয় আয় পরিমাপের সময় আমরা ধরিয়া লই যে দেশে উৎপাদিত সকল দ্রব্যই অর্থের বিনিময়ে বিক্রীত হয়। কিন্তু ভারতে উৎপাদনের একটি বিরাট অংশ বাজারে বিক্রয় হয় না—উৎপাদক হয় নিজেই উহা ভোগ করে নতুবা অপর উৎপাদকের দ্রব্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বিনিময় করে। জাতীয় অর্থনীতিতে এই অর্থ-বহির্ভূত ক্ষেত্র (non-monetised) থাকায় প্রকৃত আয় গণনায় নানা জটিলতা দেখা দেয়। ভারতে কৃষকেরা সাধারণতঃ জীবন ধারণের জন্য কৃষিকার্য (subsistence farming করিয়া থাকে এবং সেই কারণে বাজারে বিনিময়যোগ্য উদ্বৃত্ত প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই শূন্য। এই অসুবিধা থাকার জন্য জাতীয়আয়কমিটি জাতীয় অর্থ নৈতিক কাঠামোকে আর্থিক ও অর্থ-বহির্ভূত (monetary and non-monetary) এই দুই ভাগ করিয়া জাতীয় আয় নির্ধারণের পরামর্শ দিয়াছে।

অর্থ-বহির্ভূত ক্ষেত্র

[দুই] পরিমাণ ও গুণগত অসুবিধা : বহুসংখ্যক ভারতীয় কৃষক তাহাদের উৎপাদনের গুণগত ও পরিমাণগত মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ। পাশ্চাত্য দেশসমূহে উৎপাদকগণ তাহাদের উৎপাদনের হিসাব রাখেন, সুতরাং সহজেই ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ নৈতিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় কৃষক অজ্ঞ এবং তাহারা তাহাদের উৎপাদনের হিসাব রাখে না এবং গুণগত সঠিক মানও জানে না। সুতরাং কৃষি উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করিতে বহুপরিমাণে আন্দাজের আশ্রয় লওয়া হয়।

গুণ ও পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞতা

[তিন] অর্থ নৈতিক শ্রেণীবিভাগের অভাব : অর্থ নৈতিক কার্যের শ্রেণীবিভাগ না থাকায় জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা কঠিন। ভারতীয় অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা পারিবারিক ভিত্তিতে গঠিত এবং একই ব্যক্তি বিভিন্ন ধরণের কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, একই ব্যক্তি জমি চাষ করে, মাছ ধরে এবং অপর সময় মজুর খাটিয়া থাকে। একই লোক বিভিন্ন কাজ করায় শ্রেণীবিভাগ করার অসুবিধা হয়।

অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগ নাই

[চার] দামের তারতম্য : কৃষক যে দামে তাহার ফসল বিক্রয় করে সেই দাম ভারতের মতো বিরাট দেশের সকল স্থানেই সমান থাকে না এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে একই দ্রব্যের দামের তীব্র উঠানামা হইয়া থাকে। এই সকল কারণে ফসলের আর্থিক মূল্য হিসাব করার অসুবিধা রহিয়াছে।

দামের তারতম্য

[পাঁচ] কৃষি ও শিল্প অসংগঠিত : ভারতে কৃষি ও শিল্প এখনো অসংগঠিত এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনের হিসাবও নির্ভরযোগ্য নয়।

অসংগঠিত কৃষি ও শিল্প

এই সকল ধারণাগত অসুবিধা ছাড়াও আরও কতকগুলি তথ্যগত অসুবিধা রহিয়াছে।

[এক] পরিসংখ্যানের অভাব : ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের একটি বিশেষ অসুবিধা হইল নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অসুবিধা। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো পরিসংখ্যানই নাই। যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহা সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য নয় আর এই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় আয়ের যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে তাহা কখনোই ত্রুটি-বিমুক্ত হইতে পারে না। তথ্যের আঞ্চলিক পার্থক্য এতো বেশী যে একটি অঞ্চলের তথ্য পাইলে তাহা হইতে Random Sample পদ্ধতিতে সারা দেশের হিসাব পাওয়া বেশ দুরূহ।

[দুই] পরিসংখ্যান সংগ্রহের অসুবিধা : পরিসংখ্যান সংগ্রহ করাও একটি দুরূহ কাজ। নিরক্ষরতা ব্যাপক হওয়ায় পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিতে জনসাধারণ সরকারের সহিত সহযোগিতা করে না। পরিসংখ্যান সংগ্রহকে তাহারা সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকে।

[তিন] সাধারণ মানদণ্ডের অভাব : কোন্ ধরণের দ্রব্য এবং কাজকে হিসাবের মধ্যে ধরা হইবে ইহা লইয়া মতভেদ আছে এবং ভারতের মতো বিরাট দেশে কার্যাবলীর সাধারণ মানদণ্ড (common denominations) খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন।

সাধারণ মানদণ্ডের অভাব

ভারতে জাতীয় আয়ের পরিমাপ ও বৈশিষ্ট্য (Estimates of National Income of India and its Features) : ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার জাতীয় আয় কমিটি (National Income Committee) গঠন করেন এবং এই কমিটি ১৯৫৪ সালে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেন। ইহার বহুপূর্বে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় জাতীয় আয় পরিমাপ করা হইয়াছে। সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব করেন দাদাভাই নৌরজী। তাঁহার হিসাবানুযায়ী ১৮৬৮ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ২০ টাকা; লর্ড কার্জনের হিসাবানুসারে ১৯০০ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৩০ টাকা; ওয়াদিয়া এবং যোশীর হিসাবানুযায়ী ১৯১৩ সালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৪ টাকা ৫ আনা। ফিণ্ডলে সিরাসের হিসাবানুসারে ১৯১১ সালে ৪৯ টাকা, ১৯২১ সালে ১০৭ টাকা, এবং ১৯২২ সালে ১১৬ টাকা মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ১৯২৯ সালে ছিল ১১৬ টাকা। ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও-এর হিসাবানুসারে ১৯৩১ সালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ৬৫ টাকা। ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্টের হিসাবানুসারে ১৯৪৯-৫০ সালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ২৪১ টাকা।

জাতীয় আয়ের হিসাব

ধারাবাহিকভাবে জাতীয় আয়ের হিসাব তৈয়ারীর জন্য ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে জাতীয় আয় ইউনিট (National Income Unit) গঠন করেন এবং ইহাকে নির্দেশ দিবার জন্য জাতীয় আয় কমিটি নিয়োগ করা হয়। অধ্যাপক মহলানবীস গাডগিল, ভি. কে. আর. ভি. রাও, সাইমন কুজনেট্‌স প্রভৃতি প্রখ্যাত অর্থনীতি এবং পরিসংখ্যানবিদগণকে লইয়া এই কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ১৯৫১ সালে প্রথম ও ১৯৬৪ সালে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। ইহার পর হইতে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠন (Central Statistical Organisation) নিয়মিতভাবে জাতীয় আয়ের হিসাব প্রকাশ করিতেছেন।

জাতীয় আয় কমিটির হিসাবানুসারে ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যস্তর অনুযায়ী ভারতের মোট জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় নিম্নলিখিতরূপ :—

বৎসর	জাতীয় আয়	মাথাপিছু আয়
১৯৪৮-৪৯	৮,৬৫০ কোটি টাকা	২৭৬.৯ টাকা
১৯৪৯-৫০	৮,৮২০ ” ”	২৪৮.৬ ”
১৯৫০-৫১	৮,৮৮৫ ” ”	২৪৬.৩ ”
১৯৫১-৫২	৯,১০০ ” ”	২৫০.১ ”
১৯৫২-৫৩	৯,৪৬০ ” ”	২৫৬.৬ ”
১৯৫৩-৫৪	১০,০৩১ ” ”	২৬৮.৭ ”
১৯৫৪-৫৫	১০,২৮০ ” ”	২৭১ ৯ ”
১৯৫৫-৫৬	১০,৪৮০ ” ”	২৭৩.৬ ”
১৯৫৬-৫৭	১১,০১০ ” ”	২৮৭.০ ”
১৯৫ -৫৮	১০,৮৯০ ” ”	২৬৭.৩ ”
১৯৫৮-৫৯	১১,৬৫০ ” ”	২৮০.১ ”
১৯৫৯-৬০	১১,৮৬০ ” ”	২৭৯.২ ”
১৯৬০-৬১	১২,৭৫০ ” ”	২৯৩.৭ ”
১৯৬১-৬২	১৩,০২০ ” ”	২৯৩.৪

উপরিলিখিত পরিসংখ্যান হইতে দেখা যাইতেছে জাতীয় আয় ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় আয় বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায় তার কারণ কৃষি উৎপাদনের স্বল্পতা। ১৯৭৮-৭৯ সালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ২৪৬.৯ টাকা, উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬১-৬২ সালে ২৯৩.১ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

জাতীয় আয় কমিটির হিসাব হইতে আমরা ভারতের জাতীয় আয়ের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাই।

[**এক**] ভারত একটি সম্প্রসারণশীল দেশ (Expanding economy): ভারতের জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় নিয়মিতভাবেই বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার পর জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় যথাক্রমে ১৮·৪ এবং ১১ ভাগ বাড়ে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২০ ভাগ। তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় যথাক্রমে শতকরা ২৫ ভাগ এবং ১৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

জাতীয় আয় বাড়িয়াছে

[**দুই**] অন্যান্য উন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় ভারতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ অত্যন্ত কম। উপরে প্রদত্ত আয়ের পরিসংখ্যান হইতে দেখা যাইতেছে যে ১৯৬১-৬২ সালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ২৯৩·৪ টাকা অর্থাৎ মাসিক ২৪ টাকা ৪২ পয়সা। আজকালকার এই দুঃসহ মুদ্রাস্ফীতির দিনে ২৪ টাকা ৪২ পয়সায় কোনো মানুষের পক্ষে সুস্থ সবল এবং সংস্কৃতিবান জীবনযাপন করা প্রায় অসম্ভব। আর ঐ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ছিল ৯৭৩০ টাকা। ইহা হইতেই উপলব্ধি করা যায় ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামো কত অনুন্নত এবং দুর্বল। অবশ্য আমাদের দেশের সুসংবদ্ধ ক্ষেত্র হইতে মাথাপিছু মাসিক আয়ের পরিমাণ ২৪ টাকা ৪২ পয়সা অপেক্ষা বেশী।

মাথাপিছু আয় তুলনামূলকভাবে কম

[**তিন**] বিভিন্নপ্রকার অর্থনৈতিক কর্ম হইতে উদ্ভূত আয়ের পরিমাণ হইতে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর অসমতা (lopsided nature) বুঝিতে পারা যায়। মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৮ ভাগ আসে কৃষি হইতে। শিল্প (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প একত্রে) হইতে আসে শতকরা ১৭ ভাগ—বৃহৎ শিল্প হইতে ৮ ভাগ এবং ক্ষুদ্র শিল্প হইতে ৯ ভাগ। অপরপক্ষে যুক্তরাজ্যের (U. K) জাতীয় আয়ের শতকরা ৫৪ ভাগ আসে শিল্প হইতে। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে দ্রুত শিল্পায়ণের ফলে আশা করা যাইতেছে যে ভারতে মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রের অনুপাত ক্রমশই বাড়িয়া যাইবে।

কৃষির প্রাধান্য ও শিল্পের অনগ্রসরতা

[**চার**] মাথাপিছু আয়ের দ্বারা বা মোট জাতীয় আয়ের দ্বারা সঠিকভাবে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা বোঝা যাইবে না। কারণ উহা গড় হিসাব মাত্র। উহা জানিতে হইলে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বন্টিত হইতেছে তাহা দেখিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি ভারতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ অত্যন্ত কম। ওই সামান্য আয়ও আবার সমানভাবে বন্টিত নয়। গ্রাম ও নগরের অধিবাসীর মধ্যে এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য না কমিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। শতকরা ৬০ ভাগ লোক জাতীয় আয়ের মাত্র এক তৃতীয়াংশ ভোগ করে, অপরদিকে জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ ধনীলোক জাতীয় আয়ের এক তৃতীয়াংশ ভোগ, আর বাকী এক তৃতীয়াংশ মধ্যবিত্তশ্রেণী ভোগ, করে। ক্রমবর্ধমান ধনবৈষম্য দূর করিবার জন্য রাষ্ট্র সাম্প্রতিককালে তাহার বিভিন্ন অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছে—জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন, মৃত্যুকর, সম্পদকর, ব্যয়কর ধার্য এবং পুরাতন আয়কর ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি।

অসম আয়বণ্টন

[পাঁচ] জাতীয় আয় কমিটি বলিয়াছেন যে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশী হইয়াছে। ১৯৪৯-৫৩ সালে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন ২০% এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন ১৩% হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বে-সরকারী উৎপাদন বৃদ্ধির হার কম হওয়ার কারণ সরকারের প্রতিকূল শিল্পনীতি।

[ছয়] জাতীয় আয়ের শতকরা ৫৩ ভাগ খাদ্যবস্তু ক্রয় করিতে ব্যয় হইয়া যায়। গ্রামে মোট ব্যয়ের ৬৭ ভাগ খাদ্যবস্তু ক্রয় করিতে ব্যয় হয় এবং কাপড় জামায় ব্যয় হয় ১০ ভাগ। আয় অল্প বলিয়াই জীবন-ধারণের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করিতেই আয়ের বৃহত্তর অংশ ব্যয় হইয়া যায়।

আয়ের অধিক অংশ খাদ্যের উপর ব্যয় হয়

[সাত] জাতীয় আয় সৃষ্টির দিক হইতে ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। মোট দেশীয় উৎপাদনের শতকরা ৬৫·৮ ভাগ আসে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হইতে আর মাত্র ১০·৭ ভাগ আসে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে।

ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

[আট] সরকারের আয় প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা পরোক্ষ কর হইতে অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে মোট কর আদায়ের ৭৬ ভাগ পরোক্ষ কর হইতে পাওয়া যাইত। ইহার অর্থ সরকার পরোক্ষ করের উপর অধিক নির্ভরশীল অর্থাৎ ভারতের কর ব্যবস্থা অধোগতিশীল (regressive).

পরোক্ষকরের প্রাধান্য

ষষ্ঠ অধ্যায়

জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা

(Subdivision and Fragmentation of Holdings)

[বিষয়বস্তু : জমি খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার কারণ ও প্রতিকার—আর্থিক জোতের ধারণা—ভূ-দানযজ্ঞ—সমবায় চাষ—সমবায় গ্রাম পরিচালনা—কৃষিপদ্ধতির যন্ত্রিকরণ—কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা—সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা—পঞ্চায়েতিরাজ ও তৃতীয় পরিকল্পনা]

জমি খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার কারণ ও প্রতিকার : (Causes and remedies of Subdivision and fragmentation of holdings). জমি খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতা ভারতীয় জমির এক বৃহত্তম সমস্যা। জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, ফলে উৎপাদনের পরিমাণ কম হয় এবং কৃষক দারিদ্র্য প্রপীড়িত থাকিতে বাধ্য হয়। ভারতীয় কৃষকের মাথাপিছু জমির পরিমাণ হাস্যকর রকমের স্বল্প এবং

পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার আইনসূত্রে জমির আয়তন ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। সমস্যাটি দ্বিবিধ: প্রথমতঃ মাথাপিছু জোতের আয়তন কম এবং দ্বিতীয়তঃ ওই স্বল্প জমিও একত্র নাই—গ্রামের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই জোতের আয়তন সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ১৯৫১ সালের পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে নিম্নলিখিত কয়েকটি রাজ্যে গড় জোতের আয়তন এইরূপ ছিল: বোম্বাই ১৩.৩ একর, পাঞ্জাব ১০ একর, মহীশূর ৬.২ একর, উড়িষ্যা ৪.৯ একর, আসাম ৪.৮ একর, মাদ্রাজ ৪.৫ একর, পশ্চিমবংগ ৪.৪ একর এবং যুক্তপ্রদেশ ১.৫ একর। সর্বভারতীয় হিসাবের ভিত্তিতে বলা হয় যে গড়ে কৃষকের ২ একরের কম জমি আছে। চাষের জোতের আয়তন ইহা অপেক্ষাও কম, কারণ জমির মালিকানা হিসাবে কৃষকের হাতে যে পরিমাণ জমি আছে অসম্বদ্ধতার দরুণ জোতের আয়তন আরো অনেক কম।

ক্ষুদ্রায়তন জোত

অপরপক্ষে অন্যান্য দেশে গড় জোতের আয়তন অনেক বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জোতের গড় আয়তন ১৪০ একর, যুক্তরাজ্যে ২৭ একর, জার্মানীতে ২১ একর এবং ফ্রান্সে ১৬ একর। সাম্প্রতিক এক জাতীয় স্যাম্পাল সার্ভের হিসাবানুযায়ী গ্রামের শতকরা ২২টি কৃষিপরিবারের কোনো নিজস্ব জমি নাই, শতকরা ২৫টি কৃষিপরিবারের এক একর অপেক্ষাও কম জমি আছে। অপর ২৭% পরিবারের ৫ একর অপেক্ষা কম জমি আছে। ইহারাই গ্রামীণ পরিবারের তিন-চতুর্থাংশ এবং গ্রামের ১৮ ভাগ জমি ইহাদের মালিকানায় রহিয়াছে। অপর ১৩% পরিবার ৫ হইতে ১০ একর জমি ভোগ করে এবং অবশিষ্ট ১৮% পরিবার ১০ একর বা তদপেক্ষা অধিক জমি ভোগ করে।

জমির খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতার কারণ হিসাবে প্রধানত উত্তরাধিকার আইন এবং জমির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপের কথা উল্লেখ করা হয়। ভারতের হিন্দু এবং মুসলমান উত্তরাধিকার আইন কৃষিজমিকে খণ্ডিকৃত করিয়া ক্রমশই উহার আয়তন কমাইয়া আনিতেছে। কৃষকের মৃত্যু হইলে তাহার জমি পুত্রদিগের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হয় ফলে একটি কৃষিজমি ভাঙ্গিয়া বহু অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। জমি খণ্ডিকরণ ব্যাপারে উত্তরাধিকার আইনকে সহায়তা করিয়াছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবল চাপ। জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে সেই হারে শিল্পায়ণ হইলে বাড়্‌তি লোক জমি ছাড়িয়া শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে পারিত। শিল্পোন্নতির অভাবে লোককে বাধ্য হইয়া জীবিকার জন্য জমিতেই আশ্রয় লইতে হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, দারিদ্র্য এবং ঋণের চাপে কৃষক কখনো কখনো জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। অভাবের দরুণ কৃষক মহাজনকে জমি মর্টগেজ দিয়াছে বা বিক্রয় করিয়াছে, ফলে তাহার জোতের আয়তন কমিয়া গিয়াছে। তৃতীয়তঃ, যতদিন একান্নবর্তী পরিবার প্রথা চালু ছিল ততদিন কৃষিজমিকে বিভক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয় নাই কিন্তু যৌথ পরিবারের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি জমি বণ্টনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার কারণ

জমির উর্বরতার তারতম্যের জন্য এবং বিভিন্নস্থানে অবস্থিত জমির সমান অংশ সকলে দাবী করার ফলেই অসম্বদ্ধতার সৃষ্টি হইয়াছে।

জমির অসম্বদ্ধতা ও খণ্ডিকরণের ফলে কৃষি মুনাফাহীন হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ খণ্ড এবং বিক্ষিপ্ত জমিগুলি চাষ করা লাভজনক নয়। জমি চাষ করিতে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয় তাহা পূরণ করিয়া জমির উৎপাদিত ফসল হইতে কৃষক যদি তাহার জীবিকা অর্জন করিতে না পারে তাহাকে মুনাফাহীন জোত বলে। জমির

খণ্ডিকরণের ফল

পরিমাণ এতোই অল্প যে উৎপাদনের উপাদানের সর্বনিম্ন ইউনিটের — অর্থাৎ একজন শ্রমিক, একজোড়া বলদ এবং একটি লাঙ্গলের—পূর্ণ ব্যবহার সম্ভবপর হয় না। অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদানের অপচয় হওয়ার ফলে উৎপাদন খরচ বাড়িয়া যায়। উৎপাদনের যে দুইপ্রকার ব্যয়- পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং স্থির ব্যয়—তাহা উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধির সহিত কমিতে থাকে কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ কম হওয়ার দরুণ একর প্রতি উভয়প্রকার ব্যয় বেশী হয় ফলে উৎপাদন-ব্যয় অধিক হয়।

জমি খণ্ড এবং বিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে জমির উন্নতিসাধন করা এবং জমিতে আধুনিক ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় না। জমি মাঠের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত এবং ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হওয়ার ফলে কৃষককে বৃথা সময় ও শ্রম নষ্ট করিয়া জমির একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে হয়। আল

আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় না

এবং বেড়া দিতে প্রচুর পরিমাণ জমি নষ্ট হয়। জমি বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া থাকে বলিয়া পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য অপরের জমির উপর দিয়া যাতায়াতের ফলে নানারূপ বিবাদ বিসংবাদ এবং মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়। পরিশেষে, জোতের আয়তন ক্ষুদ্র হওয়ার জন্যে মালিক ঋণ করিবার সময় সামান্য পরিমাণ জামিন দিতে সক্ষম হয়। সেইজন্য টাকা ধার করিলে তাহাদের উচ্চহারে সুদ দিতে হয়।

জমি খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতার যে একেবারেই কোনো সুফল নাই একথা বলা চলে না। কয়েকজনের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত না হইয়া অনেকের মধ্যে সম্পত্তির বিকেন্দ্রিকরণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই ব্যবস্থায় সাম্য-নীতি লক্ষিত হয়। ডাঃ রাধাকমল মুখার্জীর মতে, ইহা একপ্রকার স্বাভাবিক বীমা ব্যবস্থা (Natural Insurance), জমি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া থাকে বলিয়া একই ধরণের ফসল

সুফল

উৎপাদিত না হইয়া বিভিন্ন ধরণের ফসল উৎপাদিত হয়, ঝুঁকি ছড়াইয়া রাখা এবং পাল্‌টি শস্য উৎপাদনের (rotation of crops) সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু অসুবিধার তুলনায় সুবিধা নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। জমি খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতার বিলোপসাধন করিতে না পারিলে কৃষির সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করা অসম্ভব।

কৃষিজমির খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতা সমস্যার সমাধানের জন্য দুইপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ খণ্ড এবং অসম্বদ্ধ জমিগুলির

প্রতিবিধান

সংহতি সাধন করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ জমির ভবিষ্যৎ খণ্ডিকরণ রোধ করিতে হইবে।

জমির সংহতিসাধন প্রধানতঃ দুইটি উপায়ে করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়তঃ বাধ্যতামূলকভাবে আইন পাশ করিয়া। সমবায়ের মাধ্যমে জমির সংহতিসাধনের প্রচেষ্টা বৃটিশ যুগ হইতেই সুরু হয়। ১৯২১ সালে মিঃ ক্যালভার্ট সমবায় সমিতির মাধ্যমে পাঞ্জাবে খণ্ড এবং বিক্ষিপ্ত জমির একত্রিকরণের প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু সমবায় পদ্ধতিতে জমির একত্রিকরণ অত্যন্ত ধীরগতিতে অগ্রসর হওয়ার ফলে ১৯২৮ সালে প্রথমে মধ্যপ্রদেশে এবং ১৯৩৭ সালে পাঞ্জাবে আংশিক বাধ্যতামূলকভাবে জমির একত্রিকরণ করা হয়। যদি জোতদারের ২/৩ অংশ, যাহারা অন্ততঃ ৩/৪ অংশ জমির মালিক—জমির একত্রিকরণ চাহেন তবে অবশিষ্ট সংখ্যালঘুদের জমি একত্রিকরণ করিতে বাধ্য করা যাইবে। ১৯৪৭ সালে বোম্বাই সরকার Prevention and Consolidation of Holdings Act, 1947 পাশ করেন এবং এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া যুক্তপ্রদেশ, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্য অনুরূপ আইন পাশ করে। ইহার পর প্রথম পরিকল্পনায় জোতের একত্রিকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া রাজ্যসমূহকে একত্রিকরণের কাজে অগ্রসর হইতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

সমবায় ও আইন

জমির যাহাতে আরও খণ্ডিকরণ না হয় সেই জন্য বোম্বাই, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে জোতের সর্বনিম্ন, আয়তন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে যৌথচাষ গড়িয়া তোলা যাইতে পারে অথবা গ্রামের কৃষকদের মধ্যে স্বেচ্ছায় পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জমিখণ্ডগুলি অদল বদল করিয়া প্রত্যেকেই যাহাতে কৃষিকার্যের উপযুক্ত পরিমাণ জমি পায় সেই ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে উত্তরাধিকার আইন না পাল্টাইলে অথবা দ্রুত শিল্পায়ন না হইলে নূতন জমি খণ্ডিকরণ রোধ করা যাইবে না।

সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক বা আংশিক স্বেচ্ছামূলক জমি একত্রিকরণ অত্যন্ত ধীর গতিতে অগ্রসর হওয়ায় অনেকে শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মতো জমির জাতীয়করণ দ্বারা যৌথকৃষি ব্যবস্থা (Collective Farming) প্রবর্তন করা যাইতে পারে। জমি এবং সম্পত্তির মালিকানার প্রতি মানুষের মনে এরূপ গভীর আকর্ষণ রহিয়াছে যে ইহার ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে। সেইজন্য ক্ষুদ্র জমিতে কৃষকের মালিকানা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৃহদায়তন কৃষিকার্য সম্পাদনার কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। সমবায় কৃষিপদ্ধতি (Co-operative farming) এবং সমবায় গ্রাম পরিচালনা (Co-operative Village Management) পদ্ধতিতে কৃষিকার্য পরিচালনা করিলে বৃহদায়তন কৃষি-পদ্ধতির সুবিধা পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ একর জোতকে একত্রিকরণ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩ কোটি একর জোতের একত্রিকরণ করা হইয়াছে। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশে জমি একত্রিকরণ অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে।

আর্থিক জোতের ধারণা (Concept of Economic Holding): জমির খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতা দূরিকরণের সহিত আর্থিক জোতের ধারণা বিজড়িত। অর্থনীতিবিদেরা খণ্ড এবং অসম্বদ্ধ জোতগুলিকে একত্র করিয়া আর্থিক জোতে পরিণত করার সুপারিশ করিয়া থাকেন। আর্থিক জোত বলিতে কি বুঝায় এ সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ইহা দুইদিক হইতে বিচার করা যাইতে পারে—কৃষকের জীবনযাত্রার দিক হইতে অথবা উৎপাদনব্যয়ের দিক হইতে। কৃষকের জীবনযাত্রার দৃষ্টিকোণ হইতে আর্থিক জোতের বিচার করিয়াছেন কিটিঞ্জ (Keatinge), ডাঃ ম্যান (Dr Mann) এবং অধ্যাপক স্টান্‌লি জেভন্স (Prof. Stanley Jevons).

আর্থিক জোত

কিটিঞ্জের মতে যে জোত হইতে ফসল উৎপাদন করিয়া কৃষক সকল প্রয়োজনীয় খরচ মিটাইয়া মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে তাহাই আর্থিক জোত। ডাঃ ম্যানের মতে সেই জোতকে আর্থিক জোত বলা হইবে যাহা হইতে গড আয়তনের একটি কৃষক পরিবার জীবনযাত্রার নিম্নতম মান বজায় রাখিতে পারে। অধ্যাপক জেভন্সের মতে আর্থিক জোত এমনই জোত যাহার সাহায্যে কৃষক উন্নত জীবনযাত্রার মান লাভ করিতে পারিবে।

উৎপাদনব্যয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে সেই জোতকেই আর্থিক জোত বলা হইবে যাহাতে উৎপাদনব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হয়। কৃষির উন্নতি এক বিশেষ স্তরে উপনীত হইবার পরই উৎপাদন ব্যয়ের দৃষ্টি হইতে আর্থিক জোতের আয়তন নির্ধারণ করা চলে কিন্তু ভারত এখনো সেই পর্যায়ে উপনীত হয় নাই।

মনে রাখা প্রয়োজন যে আর্থিক জোত বলিতে কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের জোত বুঝায় না। স্থান, কাল, মৃত্তিকার উর্বরতা, জলবায়ু, কৃষি-পদ্ধতি এবং কৃষিপরিবারের আয়তন অনুসারে আর্থিক জোতের আয়তন বিভিন্ন হইবে।

পরিকল্পনা কমিশন পারিবারিক জোত (Family Holding) নামে একটি নূতন ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে; যে পরিমাণ জমি চাষ করিয়া বাৎসরিক নীট ১২০০ টাকা (পরিবারের শ্রমের পাওনা ইহার অন্তর্ভুক্ত) পাওয়া যায় এবং একটি লাঙল ও এক-জোড়া বলদের পূর্ণ ব্যবহার হয় তাহাই পারিবারিক জোত। বর্তমানে অবশ্য পারিবারিক জোত এবং আর্থিক জোত কথা দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

ভু-দান যজ্ঞ (The Bhoodan Yagna): ভারতের ভূমিসংস্কারের ব্যাপারে ভূ-দান আন্দোলনের একটি ভূমিকা রহিয়াছে। ভূদান আন্দোলনের প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধীশিষ্য আচার্য বিনোবা-ভাবে। ইহার উদ্দেশ্য হইল ভারতীয় কৃষিব্যবস্থায় সত্যাগ্রহ পদ্ধতিতে নিঃশব্দ কিন্তু বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করা। ১৯৫১ সালে হায়দারাবাদের অন্তর্গত তেলেঙ্গনায় যখন কম্যুনিষ্টপার্টির প্ররোচনায় গণআন্দোলন সুরু হয় তখন আচার্য বিনোবা ভাবে সেখানে উপস্থিত হন। কয়েকজন কৃষক তাঁহাকে বলে যে তাহাদের কাজ করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে কিন্তু

বিনোবা ভাবে

ভূমিহীন বলিয়া কিছু করিবার উপায় নাই। এই কথা শুনিয়া সেখানকার এক জমিদার ১০০ একর জমি দান করিবার সিদ্ধান্ত জানায়। বিনোবা ভাবের মনে হইল অনেকেরই প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত জমি আছে এবং চাহিলেই কিছু পাওয়া যাইবে। এই ভাবেই ভূদান আন্দোলনের সুরু হইল।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ মানুষের উপজীবিকা হইল কৃষি। আর এই বিরাট কৃষিনির্ভরশীল জনসংখ্যার প্রায় পাঁচ কোটি হইল ভূমিহীন কৃষক। কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ভারতের মোট গ্রাম্য পরিবারের শতকরা ৩০ ভাগ হইল কৃষি-শ্রমিক পরিবার এবং ইহার অর্ধেক সম্পূর্ণরূপে ভূমিহীন। ভূমিহীন কৃষকের সমস্যা ভারতের এক বৃহত্তম কৃষি-সমস্যা। ভারতের ভূমিহীন কৃষকেরা যাহাতে ভূমি পায় এবং গ্রামাঞ্চলে আর্থিক বৈষম্য হ্রাস পায় এই মহান উদ্দেশ্যে আচার্য বিনোবাভাবে ভূদান আন্দোলন সুরু করেন। বিনোবাজীর মতে জমি কাহারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় এবং এই জন্য জমিদান ঠিক ভিক্ষাদানের পর্যায়ে পড়ে না। তাঁহার ভাষায় "In a just and equitable society, land must belong to all." ভূদান আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ভূ-স্বামীর শুভবুদ্ধির নিকট আবেদন করিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহাকে তাঁহার এক ষষ্ঠাংশ জমি দান করিতে আহ্বান করা এবং এইভাবে লব্ধ জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া। ভূদান আন্দোলনের দ্বারা বিনোবা ভাবে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসনীতিকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করিয়াছেন। জমিদার যদি অতিরিক্ত জমি দান করেন এবং কৃষক শ্রমদান করে তাহা হইলে উভয়ের সহযোগিতায় এবং বিনা সংঘাত সংঘর্ষে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া সাম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা যাইবে। ন্যায় এবং নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে জমির উপর সকলের সমানাধিকার। এই ন্যায় সাম্যভাবাদর্শপূর্ণ সমাজ দুই ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারা যায়। প্রথমতঃ আইন পাশ করিয়া জোতের ঊর্ধসীমা নির্ধারণ করিয়া ভূস্বামীকে বাড়্তি জমি দিতে বাধ্য করা অথবা ভূস্বামীর মনে ভূমিহীন কৃষকের প্রতি সহানুভূতির সঞ্চার করিয়া তাহাকে বাড়্তি জমি স্বেচ্ছায় দান করিতে প্রণোদিত করা। ভূদানের সুবিধা এই যে, এই ভাবে জমি লইলে ভূ-স্বামীর মনে বিদ্বেষ অথবা অসন্তোষ দেখা দেয় না। কিন্তু আইন পাশ করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে জমি লইলে ভূ-স্বামীদিগের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ এবং বিরোধিতা দেখা দিবে।

ভূদান যজ্ঞের উদ্দেশ্য

আচার্য বিনোবাভাবের হিসাবানুযায়ী ভারতে ৫ কোটি ভূমিহীন কৃষক রহিয়াছে। প্রথমে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য খুব উচ্চাকাংখী ছিল না। প্রত্যেক ভূমিহীন কৃষকের জন্য এক একর হিসাবে মোট পাঁচ কোটি একর জমি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি এই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভারতে মোটামুটি ৩০ কোটি একর জমি চাষ হয় এবং ভূস্বামীগণ তাঁহাদের জমির ⅙ অংশ দান করিলে ৫ কোটি একর জমি পাওয়া যাইবে।

প্রথমে কৃষিক্ষেত্রে এই আন্দোলন সুরু হইলেও বর্তমানে অকৃষিগত ক্ষেত্রেও ইহা সম্প্রসারিত হইয়াছে। অ-কৃষিগত ক্ষেত্রে এই আন্দোলন সম্পত্তি দান, বুদ্ধিদান, গৃহদান, জীবনদান প্রভৃতি রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

অ-কৃষিগত ক্ষেত্রে

ভূদান আন্দোলন অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামদানের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। গ্রামদানের অর্থ সমগ্র গ্রাম সমাজকে দান করিয়া দেওয়া। গ্রামদানের ফলে সমবায় পদ্ধতিতে গ্রাম পরিচালনা অধিকতর সহজসাধ্য হইবে। এই কারণে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রাম দান আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়।

ভূদান আন্দোলন প্রাথমিক অবস্থায় যতখানি আশাপ্রদ বলিয়া মনে করা হইয়াছিল ততখানি সফল হয় নাই। প্রথমতঃ দেখা গেল যে দান করা জমি আইননির্দিষ্ট সর্বোচ্চ জোতের বাড়তি পরিমাণ। জোতের ঊর্ধসীমা নির্ধারিত হওয়ার ফলে যতখানি জমি সরকারকে দিতে হইবে ভূস্বামীগণ ঠিক ততটুকু পরিমাণই জমি দান করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বিহার অঞ্চলে দেখা গিয়াছে দানকরা অধিকাংশ জমি পাথুরে অথবা কৃষির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপোযোগী। সবচেয়ে বড় কথা ভূদান যজ্ঞের যে মহান আদর্শ—গ্রামাঞ্চলে ধনবৈষম্য হ্রাস করা তাহা বাস্তবে পরিণত হয় নাই। অনেকে চাষের আযোগ্য জমি দান করিয়া আচার্য বিনোবা ভাবেকে প্রতারিত করিয়াছে। এই সকল জমিকে চাসের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন এবং কৃষককে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ কিছু অর্থ দিতে হইবে। তাই আচার্য ভাবে অর্থসংগ্রহে মনোযোগ দিয়াছেন। ভূদান আন্দোলন সরকারী ভূমিনীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া সরকারও অর্থ সাহায্য করিতেছেন। ভূদানের সুবিধার জন্য বিভিন্নরাজ্যে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শিল্পপতিরা মনে করিতেছেন যে বিনোবাভাবের এই আন্দোলন দেশে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব কমাইবে এবং সেইকারণে তাঁহারাও এই আন্দোলনকে সহায়তা করিতেছেন। ভূদান যজ্ঞ শুধুমাত্র ভারতেই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিন্তানায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

সাফল্য আশাপ্রদ নয়

১৯৬০ সাল পর্যন্ত ৭৭ লক্ষ একর জমি সংগৃহীত হয় এবং উহার মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ একর জমি বিলিকরা হইয়াছে। ভূমি সংগ্রহের লক্ষ্যের তুলনায় আজ পর্যন্ত অতি অল্পই জমি সংগৃহীত হইয়াছে এবং আদৌ নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ হইবে কিনা এ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়াছে।

শুধুমাত্র ভূমি গ্রহণের দ্বারাই এই আন্দোলন সফল হইবে না। উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ইহা ন্যায্যভাবে বণ্টিত না হইলে ইহার আসল উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে না। বিনোবাভাবের আদর্শে দীক্ষিত কর্মী পাঠাইয়া প্রাপ্ত জমি উপযুক্ত মানদণ্ড অনুসারে বিলিবণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভূদান আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিচিত্র এবং অভিনব আন্দোলন। ইহার আদর্শ বৈপ্লবিক কিন্তু কর্মপন্থা অহিংস। বিনা রক্তপাতে বিনা সংঘাত সংঘর্ষে যে একটা দেশব্যাপী সমাজ বিপ্লব সম্ভবপর হইতে পারে এই ধারণাই অভূতপূর্ব।

সমবায় চাষ (Co-operative Farming) : উন্নত প্রণালীতে জমি চাষ করার উদ্দেশ্য হইল সর্বনিম্ন খরচে সর্বাধিক ফসল উৎপাদন করা। ইহার জন্য সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার প্রয়োজন আর প্রয়োজন সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে জমি চাষ করা। দুঃখের বিষয় ভারতে একর প্রতি উৎপাদন অত্যন্ত অল্প এবং তাহার প্রধান কারণ জমির খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতা। জোতের আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারিলে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভবপর হইবে। জোতের আয়তন বৃদ্ধি করিবার দুইটি উপায় রহিয়াছে—প্রথমতঃ দেশের সমস্ত জমিকে জাতীয়করণ করিয়া বৃহদায়তন কৃষিকর্মের উপযুক্ত জোতের ইউনিট নির্ধারণ করা। কিন্তু ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ এবং এইভাবে জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা এখনো সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয় উপায় হইল সমবায় পদ্ধতিতে জমি চাষ করা।

জমি চাষ করিবার সাধারণতঃ পাঁচটি পদ্ধতি আছে। প্রথমতঃ **ব্যক্তিগত চাষ (Individual Farming) :** এই পদ্ধতিতে কৃষক নিজে জমিচাষ করে তাহার নিজস্ব মূলধন লইয়া। কৃষক নিজেই কৃষির সকল প্রকার কাজ দেখাশুনা করিয়া থাকে। এই ধরণের চাষই ভারতে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার একটি ত্রুটি হইল যে ব্যক্তিগত ভাবে কৃষকের নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ কম ফলে সর্বাধুনিক প্রণালীতে জমি চাষ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

জমি চাষের পাঁচটি পদ্ধতি

দ্বিতীয়তঃ **যৌথ মূলধনী চাষ (Corporate Farming) :** এই ব্যবস্থায় চাষের উদ্দেশ্যে একটি কর্পোরেশন বা যৌথমূলধনী কোম্পানী গঠন করা হয়। ইহার সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকে এবং মূলধনের অংশ অনুসারে মুনাফা সভ্যদের ভিতর বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় এবং পরিচালনার জন্য একটি পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) থাকে। এই ধরণের চাষের জন্য প্রচুর জমি এবং প্রভূত মূলধনের প্রয়োজন হয়। এই ধরণের কৃষি-পদ্ধতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং সীমাবদ্ধ আকারে ভারতের বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং মহীশূরে দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহৎ ভূখণ্ডের অভাব এবং মূলধনের স্বল্পতার জন্য এই ধরণের কৃষি-পদ্ধতি ভারতের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

তৃতীয়তঃ **রাষ্ট্রীয় চাষ (State Farming) :** এই প্রণালীতে জমির মালিক হইল রাষ্ট্র এবং বেতনভুক্ত কর্মচারির দ্বারা জমি চাষ করা হয়। এই ধরণের কৃষি পদ্ধতি কৃষকদিগকে উন্নত পদ্ধতিতে জমিচাষ করিতে উৎসাহিত করে।

চতুর্থতঃ **যৌথ চাষ (Collective Farming) :** যৌথচাষ প্রণালীর বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে কৃষকগণের জমি একত্রিকরণ করিয়া উহাকে বিশাল জোতে পরিণত করিয়া কৃষিকার্য করা হয়। এই ব্যবস্থায় যৌথ খামারের উপর কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানা বিনষ্ট হইয়া যায়। এই ব্যবস্থায় জমির মালিক হইবে রাষ্ট্র অথবা যৌথকৃষি সমিতি। একবার যৌথ খামার গঠনে যোগদান করিলে কৃষকেরা আর ইহা পরিত্যাগ করিতে পারে না বা নিজ নিজ জমি ফিরিয়া পায় না। সোভিয়েট

রাশিয়ায় এই ধরণের যৌথ খামার রহিয়াছে। কিন্তু ভারতে এই ধরণের জমিচাষ সম্ভবপর নয়। প্রথমতঃ ভারতে কৃষকদের মধ্যে জমির ক্ষুধা এতো তীব্র এবং ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতি তাহাদের আগ্রহ এত প্রবল যে এই প্রণালী তাহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধান ব্যক্তিগত মালিকানাকে মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকার করায় যৌথ খামার প্রতিষ্ঠায় সংবিধানগত বাধা রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ অন্য ধরণের সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা অব্যাহত থাকিলে ভূমির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করা অন্যায় এবং অযৌক্তিক হইবে।

পঞ্চমতঃ **সমবায় কৃষিপদ্ধতি (Co-operative Farming) :** সমবায় কৃষি-সমিতি এমনই একটি সমিতি যেখানে প্রত্যেক কৃষকের নিজস্ব জমিতে স্বত্ব থাকিবে কিন্তু জমি একত্র করিয়া সমবেতভাবে চাষ করা হইবে। ("A co-operative farming society is a society where each cultivator would ratain his right In his own land, but cultivation operations would be carried on jointly). সমবায় কৃষি-পদ্ধতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে (১) সকল জমি একত্র করিয়া একটি ইউনিটে পরিণত করা হয়, (২) জমির উপর ব্যক্তির স্বত্ব বা মালিকানা অক্ষুন্ন থাকে, (৩) কৃষিকার্য সংযুক্তভাবে পরিচালনা করা হয়, (৪) সভ্যগণ তাহাদের কাজের জন্য পরিশ্রমিক বাবদ টাকা পায় এবং (৫) নীট লাভ সমিতির সভ্যগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

সমবায় কৃষি-পদ্ধতি আবার চারি প্রকারের হয়। প্রথমতঃ সমবায় **সংযুক্ত কৃষি (Co-operative Joint Farming) :** এই প্রণালীতে কয়েকজন কৃষকের ছোট ছোট এবং অসম্বদ্ধ জমি সমবায় সমিতির অধীনে আনিয়া একত্র করিয়া কৃষিকার্য সম্পাদন করা হয়। প্রত্যেক কৃষক তাহার নিজের জমির মালিক হিসাবে উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ পায়, শ্রমিক হিসাবে মজুরি পায় এবং লাভের অংশ পায়।

দ্বিতীয়তঃ **সমবায় উন্নত কৃষি (Co-operative Better Farming) :** এই ধরণের সমবায় পদ্ধতির উদ্দেশ্য হইল কৃষি-পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা। জমির মালিকানা এবং পরিচালনার ভার থাকে কৃষকের। এই ধরণের সমিতিতে যোগদানকারী কৃষকদের জমি একত্র করিয়া চাষ করা হয় না। যোগদানকারী কৃষকদের জমি আলাদা থাকে এবং প্রত্যেক কৃষক নিজের জমি চাষ করে। ইহাকে ঠিক সমবায় কৃষি-সমিতি বলা চলে না। এই ধরণের সমিতি উৎকৃষ্ট বীজ, সার, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সেচব্যবস্থা, বাঁধ নির্মাণ, কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা করিয়া কৃষিউন্নয়নের সহায়তা করে।

তৃতীয়তঃ সমবায় **কৃষক-ভিত্তিক চাষ (Co-operative Tenant Farming) :** এই প্রণালীতে সমবায় সমিতির হাতে যে জমি থাকে তাহা বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া সমবায় সমিতির সভ্য কৃষকদিগকে দেওয়া হয় এবং কৃষক সমবায় সমিতির নির্ধারিত প্রণালীতে জমি চাষ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই

ব্যবস্থায় প্রত্যেক কৃষকই সমিতির অধীনস্থ প্রজা হিসাবে জমি চাষ করিয়া থাকে। সমিতি সভ্যদিগকে প্রয়োজনীয়, ঋণ, বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইহা নিম্নপর্যায়ের কৃষি সমবায় এবং সাধারণতঃ পতিত জমি পুনরুদ্ধার করিয়া সেইখানে কৃষিকার্য প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ অনুকূল।

চতুর্থতঃ **সমবায় যৌথ কৃষি (Co-operative Collective Farming) :** এই পদ্ধতিতে জমি রাষ্ট্রের অথবা সমবায় সমিতির মালিকানায় থাকে, জমিতে কৃষকের স্বত্ব স্বীকার করা হয় না। এই পদ্ধতিতে সমবায় সমিতি কৃষিকার্য পরিচালনা করে এবং মূলধন অংশ যোগানের উপর কোনো ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয় না। সভ্যগণ তাদের কাজের জন্য মজুরি পায় এবং কোনো মুনাফা হইলে মজুরি অনুপাতে বোনাস দেওয়া হয়। সমিতি ছাড়িবার অধিকার সভ্যদের থাকে এবং সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করিলে কৃষক তাহার মূলধন ফেরৎ পাইবে। এই ধরণের সমবায় কৃষির সাফল্যের জন্য কৃষকদের মধ্যে উচ্চ রাজনৈতিক এবং সামাজিক চেতনা থাকা প্রয়োজন। এই ধরণের সমবায় চাষ সোবিয়েত রাশিয়ায় বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে।

ভারতে যদিও সমবায় আন্দোলন অতীতে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, তথাপি সমবায় কৃষি-পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। এই কৃষি-পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। সোবিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, চীন প্রভৃতি দেশে বহু পূর্বেই এই পদ্ধতি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি রিপোর্টে যথার্থই বলা হইয়াছে যে সমবায় কৃষি ব্যবস্থার মধ্যেই কৃষকের জমি, শ্রম এবং মূলধনের সমন্বয় সাধনের আদর্শ সমাধান নিহিত রহিয়াছে (Co-operative farming provides an ideal solution for the pooling of resources of the cultivator in land, labour and capital) :

আদর্শ কৃষি-ব্যবস্থা

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে সমবায়-কৃষিসমিতির সংখ্যা ছিল ১৩৯৭, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩০০০ এর বেশী সমবায় কৃষিসমিতি স্থাপনের নির্দেশ ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩২০০ কৃষি সমবায় সমিতি স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—ইহার ফলে প্রতি জেলায় ১০টি করিয়া কৃষি সমবায় সমিতি স্থাপিত হইবে। কৃষি সমবায় সম্পর্কে মূল্যবান নির্দেশ দিবার উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ফার্মিং এডভাইসারি বোর্ড (National Co-operative Farming Advisory Board) গঠন করা হইয়াছে। ১৯৬৫ সালে ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে চীনের সমবায় কৃষি-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্য ভারত সরকার চীনে প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধি দল চীনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতে সমবায় কৃষি সংগঠন করা বিশেষ কর্তব্য। এই প্রতিনিধিদলের মতে খুব বড় বড় সমিতি গঠন করা উচিত নয় কারণ তাহাতে আমলাতন্ত্র দেখা দিতে পারে।

১৯৫৬ সালের নাগপুর প্রস্তাবে (Nagpur Resolution) আগামী তিন বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেশকে সেবা সমবায় দ্বারা (Service Co-operatives) ভরিয়া ফেলিবার এবং সম্ভবপর হইলে সমবায় যুক্ত সমিতি (Joint Co-operative Farms) স্থাপন করিবার কথা বলা হইয়াছে। ফসল বিক্রয়, সার ও বীজ ক্রয়, জমির উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত সমবায় সমিতিকে সেবা সমবায় বলে। এই সমিতিতে কৃষি উৎপাদনের কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সকলে একত্র কাজ করে। কৃষি উৎপাদনের প্রায় সকল কাজই সমবেতভাবে করা হইলে তাহাকে সমবায় যুক্তচাষ (Co-operative Joint Farming) বলে। আর এক ধরণের সমবায় সমিতির কথা প্রচারিত হইয়াছে, ইহাকে সমবায় গ্রাম পরিচালনা (Co-operative Village Management) বলে। এই ব্যবস্থায় গ্রামের সকল জমির একত্র করিয়া গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উপর উহার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

নাগপুর প্রস্তাব

প্রথম পরিকল্পনায় সমবায় পদ্ধতিতে জমিচাষের উদ্দেশ্যে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ওই খাতে এককোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনাধীন সময়ে ৩২০০ সমবায় কৃষি সমিতি প্রজেক্ট অঞ্চলে গড়িয়া উঠিবে এবং প্রজেক্ট অঞ্চলের বাহিরে আরও ৪০০০ সমবায় কৃষি সমিতি গড়িয়া উঠিবে।

ভারতে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সমাজ গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় কৃষি অপরিহার্য বলা চলে। সমবায় পদ্ধতিতে জমি চাষ করার প্রধান উদ্দেশ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া জীবনধারণ কৃষিকে (Subsistance Farming) লাভজনক কৃষিতে পরিণত করা। প্রথমতঃ এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা অক্ষুন্ন রাখিয়াও বৃহদায়তন কৃষিউৎপাদনের সকল ব্যয় সংকোচনের সুবিধা পাওয়া যায় ফলে একর প্রতি এবং কৃষকের মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। শিল্পের মতো কৃষির ক্ষেত্রেও সুদক্ষ পরিচালনা উৎপাদন বহরের (scale of production) উপর নির্ভর করে। এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতগুলিকে আর্থিক জোতে পরিণত করিয়া বৃহদায়তন চাষ প্রবর্তন করা যাইবে এবং অনাবাদী ও পতিত জমির পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষি যন্ত্রিকরণের অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া উঠিবে। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে দেশে খাদ্য এবং কাঁচামালের ঘাটতি পূরণ হইবে, দেশ কৃষি এবং শিল্পের কাঁচামালের যোগানে স্বয়ংনির্ভরশীল হইতে পারিবে। পরিশেষে এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকের আয় তথা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবে এবং গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে আয় বৈষম্য দূর হইয়া সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে ও ইহার ফলে শ্রেণী সংঘাতের আশংকা কমিয়া যাইবে। উপরন্তু এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক এবং আমাদের জাতীয় সরকারের আর্থিকনীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সমবায় কৃষির গুরুত্ব

মোটকথা, ভূমিসংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ যে জোতের একত্রিকরণ তাহা সমবায় কৃষিপদ্ধতির মাধ্যমেই সম্ভবপর হইবে। জোতের উর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণের ফলে

জোতের আয়তন বৃহৎ হইতে পারিবে না তাই এই সকল ক্ষুদ্র জোতে সমবায়ের মাধ্যমেই বৃহদায়তন কৃষিকার্য চলিতে পারিবে।

এই কৃষিব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও সুফল অনস্বীকার্য হইলেও ইহাকে কার্যকরী করার পথে কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা রহিয়াছে। এই অসুবিধাগুলিকে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক এই তিন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যাইতে পারে। অর্থনৈতিক দিক হইতে বলা যায় যে এই ব্যবস্থা বেকার সমস্যা সৃষ্টি করিবে। সমবায় প্রথায় জমি চাষ করার অর্থ বৈজ্ঞানিক প্রথায় জমি চাষ করা আর ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে কৃষকদের মধ্যে বেকার সমস্যা দেখা দিবে। কৃষি-যন্ত্রিকরণের ফলে বহু কৃষক বেকার হইয়া পড়িবে এবং ইহাদের পুনর্নিয়োগের সমস্যা দেখা দিবে। সমবায় কৃষি চালু করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পকে পুনর্গঠিত করার মধ্য দিয়াই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। ইহা ছাড়া সমবায় কৃষি সমিতি সংগঠন এবং পরিচালনা করিবার জন্য সুদক্ষ এবং সমবায় চেতনাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন, দেশে যাহার বিশেষ অভাব রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পাদিত হইলে উৎপাদিত ফসল সদস্যদের মধ্যে বণ্টনের সমস্যা রহিয়াছে। সকল জমি সমান উর্বরতাসম্পন্ন নয়, সুতরাং জমির আয়তনের অনুপাতে ফসল বণ্টন ন্যায়সঙ্গত হইবে না। তাছাড়া অতীতে সমবায় কৃষি-ঋণ ব্যবস্থাই সফল হয় নাই, সমবায় চাষ সফল হইবে ইহা আশা করিবার ভিত্তি কোথায়? সামাজিক দিক হইতে বলা হয় যে সমবায় চাষের অনুকূল পরিবেশ এখনো গ্রাম-সমাজে সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের কৃষকগণের ভিতর এতবড় বিপ্লব গ্রহণের উপযোগী মনোভাব এখনো গড়িয়া ওঠে নাই। অশিক্ষা, অজ্ঞতা, এবং বঞ্চনার দরুণ কৃষক কোনো নূতন পরিবর্তনকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে বাধ্য। যৌথ পরিবার ও অতীতের গ্রাম্য পঞ্চায়েতির মধ্যে যে ঐক্য এবং সমষ্টিবোধ ছিল পাশ্চাত্ত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সংঘাতে তাহা ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় এই ধরণের পরীক্ষানিরীক্ষা কতদূর সফল হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। ব্যক্তিভিত্তিক কৃষি-প্রথা না থাকিলে লোকের কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা থাকিবে না। ম্যালকমডার্লিং যথার্থই বলিয়াছেন যে সমবায় কৃষি কৃষকগণকে মোটেই উৎসাহিত করেনি এবং এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী সাহায্য লইবার উদ্দেশ্যেই গঠিত হইয়াছে—সমবায় আদর্শের প্রেরণায় নয়।

বাস্তব অসুবিধা

সমবায় কৃষির বিরুদ্ধে এই রাজনৈতিক যুক্তি দেখানো হয় যে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি-কার্যের প্রসারের সুযোগ লইয়া বর্তমান শাসকদল কৃষকদের উপর অন্যায়ভাবে তাহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিবে। সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পরিণামে দেশের কৃষিব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া পড়িবে, এই আশংকাও করা হয়।

ডাঃ অটো সিলার (Dr. Otto Schiller) একজন কৃষি-অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ এবং তাঁহার মতে বর্তমান ক্ষুদ্রায়তন জোত-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখিয়াও বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধালাভ করা যায়।

প্রখ্যাতরাজনীতিবিদ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর মতে এই চাষ ব্যবস্থা অবাস্তব। তাঁহার মতে এই ব্যবস্থায় লাভ যা হইবে ক্ষতি তদপেক্ষা বেশী হইবে। ইহা অনেকটা পারিবারিক জীবনে অংশীদাবী ব্যবস্থা প্রবর্তনের মতো। চাষের ব্যাপারে অংশীদারী ব্যবস্থা চলে না। জমিকে পত্নীর মতো দেখিতে হইবে; সকল ব্যক্তির হাতে নয়—শুধুমাত্র দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতেই তাহাকে তুলিয়া দেওয়া যায়।

যাহা হউক, পরিকল্পনা কমিশন অতি সতর্কতার সহিত এই ব্যবস্থা ভারতে প্রসার করিতে যত্নবান। প্রথমে পতিত ও অনাবাদী জমি, পরে ভূদান হইতে প্রাপ্ত জমি, তাহার পর স্বেচ্ছাপ্রদত্ত জমি, তাহার পর যাহারা উপযুক্তভাবে জমি চাষ করিতে পারে না তাহাদের জমি, পরে গ্রামের সংখ্যাগুরু কৃষক সম্মত থাকিলে বাধ্যতামূলকভাবে সংখ্যালঘু কৃষকের জমি—এইভাবে ধীরে ধীরে সমবায় পঞ্চায়েতের জমির পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিতে হইবে।

সমবায় গ্রাম-পরিচালনা (Co-operative Village Management) ঃ জমি খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা সমস্যার সামগ্রিক সমাধানের উপায় হইতেছে সমবায় গ্রাম পরিচালনাব্যবস্থার প্রবর্তন করা। সমবায় গ্রাম পরিচালনা ধারণার স্রষ্টা হইলেন শ্রীতার্লোক সিং (Mr. Tarlok Singh). তিনি তাঁহার Poverty and Social Change নামক পুস্তকে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করেন। পরিকল্পনা কমিশন অনেক তর্কবিতর্কের পর এই ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তনের নির্দেশ দিয়াছেন।

তার্লোক সিং-এর রচনা

এই ব্যবস্থায় গ্রামের সকল জমি একত্র করিয়া একটি বৃহৎ ইউনিট গঠন করা হয় এবং সকলে একসঙ্গে জমি চাষ করে। এই ব্যবস্থায় গ্রামবাসিগণের জমি একবার একত্র হইলে পুনরায় ইচ্ছা করিলে কৃষক তাহার জমি লইয়া পৃথক হইতে পারিবে না। জমির মালিকগণের দুই-তৃতীয়াংশ অথবা কর্ষিত জমির অর্ধাংশের কৃষকদিগের সম্মতি থাকিলে এই ধরণের সমবায় গ্রাম-পরিচালনা প্রবর্তন করা যাইবে। গ্রামের সকল জমি একত্র করিয়া তাহাতে কৃষিকার্য এবং অন্যান্য কাজকর্ম পরিচালনার ভার থাকিবে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর। এই গ্রাম-পঞ্চায়েত গ্রামবাসীগণের সর্বাধিক মঙ্গল এবং বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পরিচালনা কার্য চালাইবে। গ্রামপঞ্চায়েত শুধুমাত্র জমিচাষের দায়িত্বই গ্রহণ করিতে পারিবে না, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, সেচব্যবস্থার প্রসার, মৎস্যচাষ ইত্যাদি বিষয়ও পরিচালনা করিবে। প্রয়োজনবোধ করিলে গ্রাম পঞ্চায়েত সমগ্র জমিকে কয়েকটি কৃষিজোতে বিভক্ত করিতে পারিবে। জোতের আয়তন, সার সরবরাহ, বীজের যোগান, কৃষিযন্ত্রপাতির যোগান, কৃষির পরিপূরক ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের প্রবর্তন ইত্যাদি সবকিছুই গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যবস্থায় জমির মালিক ও ভূমিহীন কৃষক সকলেই একত্রে কৃষিকর্মে অংশ গ্রহণ করিবে। কৃষকগণ তাহাদের শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক পাইবে আর যাহারা জমির মালিক তাহারা পারিশ্রমিক ছাড়াও নিজ জমির অনুপাতে লভ্যাংশ পাইবে।

সমবায় কৃষির সহিত সমবায় গ্রাম পরিচালনা ব্যবস্থার কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ সমবায় কৃষি একটি আংশিক ব্যবস্থা অপরপক্ষে সমবায় গ্রাম পরিচালনা একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার দ্বারা গ্রামবাসীদের সমগ্র জীবনযাত্রা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। গ্রাম-পঞ্চায়েৎ, সমবায় সমিতি, সমষ্টিউন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতি সকল উন্নয়নী পরিকল্পনা এই ব্যবস্থার অধীন হইবে। দ্বিতীয়তঃ সমবায় চাষের ব্যাপারে কৃষক ইচ্ছা করিলে সমবায় সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া জমি লইয়া আলাদা হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সমবায় গ্রামপরিচালনা ব্যবস্থায়, কৃষকের জমি চিরকালের জন্য একত্রিভূত হইয়া যায়, কৃষক তাহা আর ফিরিয়া পাইতে পারে না। এইখানে এই ব্যবস্থার সহিত যৌথচাষ ব্যবস্থার সাদৃশ্য রহিয়াছে। যৌথখামার গঠনে একবার যোগদান করিলে কৃষক আর তাহার জমি ফিরিয়া পায় না। কিন্তু যৌথখামার ব্যবস্থার সহিত সমবায় গ্রাম পরিচালনা ব্যবস্থার একটি মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। যৌথখামার গঠন করিলে কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানা বিনষ্ট হইয়া যায় কিন্তু এই ব্যবস্থায় কৃষকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না। তৃতীয়তঃ, সমবায় চাষ যত শীঘ্র সম্ভব বাস্তবে রূপায়িত করিবার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে অপরপক্ষে সমবায় গ্রাম পরিচালনা এক ব্যাপক পরিকল্পনা বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন ইহাকে অতি দ্রুত কার্যে পরিণত করার কথা বলেন নাই। এই ব্যবস্থায় সমষ্টিগত মালিকানার এক বৃহত্তর পটভূমিকায় কৃষি উন্নয়নের কথা বিবেচনা করা হইয়াছে। কায়েমি স্বার্থের সহিত সংঘাতের কথা চিন্তা করিয়াই ইহার আশু কার্যকারিতার উপর জোর না দিয়া ভবিষ্যতের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

সমবায় কৃষি ও সমবায় গ্রাম পরিচালনার পার্থক্য

সমবায় গ্রাম পরিচালনা ব্যবস্থার সহিত যৌথমূলধনী সংগঠনের কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে। যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানে শেয়ার অনুসারে অংশীদারদের মালিকানা স্থির হয় কিন্তু প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সম্পত্তির উপর কাহারো কোনো দাবী থাকে না। সমবায় গ্রাম পরিচালনা ব্যবস্থায়ও কৃষকের মালিকানা নির্দিষ্ট থাকিলেও কোনো নির্দিষ্ট জমিখণ্ডের উপর তাহার মালিকানা স্বীকার করা হয় না।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে এই ব্যবস্থা অবশ্যই কাম্য। এই ব্যবস্থায় সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া সকল সম্পদের ব্যবহার হইতে পারিবে। এই ব্যবস্থার ফলে ছোট ছোট জোতগুলিকে বৃহদায়তন এবং কাম্য জোতে পরিণত করিয়া সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে জমি চাষ করা সম্ভবপর হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে ভূমিহীন কৃষকের কর্মসমস্যার সমাধান হইবে। গ্রাম সমিতির সকল সদস্য সমান মর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া এই ব্যবস্থার ফলে সামাজিক এবং আর্থিক বৈষম্য দূর হইবে। পরিশেষে সমবায় সমিতি ইহার সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিবে ফলে গ্রামে সঞ্চয়ের পথ প্রশস্ত হইবে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি মাত্রই অর্থনৈতিক যুক্তি খাড়া করা যায় যে কৃষিসংগঠন এবং আধুনিক যান্ত্রিকপদ্ধতি

কৃষিব্যবস্থায় প্রয়োগ করিলে পূর্বাপেক্ষা কম কৃষি-শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে ফলে গ্রামে বেকার সমস্যা দেখা দিবে। পরিকল্পনা কমিশন এই ত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বলিয়াই সহসা কিছু না করিয়া ধীর গতিতে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়াছে।

কৃষি-পদ্ধতির যন্ত্রিকরণ (Mechanisation of Agriculture) : ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি উহার উৎপাদনের স্বল্পতা। সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি দেশে একর প্রতি উৎপাদন ভারতের তুলনায় অনেক বেশী। কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণ অল্প বলিয়া ভারতীয় কৃষক দরিদ্র। কৃষকের দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে এবং স্বভাবতই কৃষির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের প্রশ্ন উঠিবে। কৃষিকে যন্ত্রিকরণ করার অর্থ হইল কৃষিকে আধুনিকীকরণ করা। উন্নত দেশে দেখা গিয়াছে যে কৃষিকার্যে আধুনিকধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে ফসলের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতে কৃষিযন্ত্রিকরণের ফলে উত্তমরূপে ভূমি কর্ষিত হইবে, ফসলের পরিমাণ বাড়িবে, কৃষকের দারিদ্র্য দূর হইবে এবং দেশে খাদ্যসমস্যা থাকিবে না। ইহা ছাড়াও কৃষিযন্ত্রিকরণের আর একটি বড় যুক্তি রহিয়াছে। ভারতের কৃষককে আজ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিয়া কৃষির দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ; উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার উপায় হইতেছে কৃষিকে যন্ত্রিকরণ করা।

যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা

কৃষিযন্ত্রিকরণ বলিতে আমরা দুইটি বিষয় বুঝি—প্রথমতঃ মান্ধাতা আমলের পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে আধুনিক, উন্নত এবং যুগোপযোগী যন্ত্রপাতির ব্যবহার আর দ্বিতীয়তঃ পশুশক্তি বা মানুষীশক্তির পরিবর্তে শ্রমসাধ্য কাজে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার। যন্ত্রশক্তির সাহায্যে কৃষিকাজ চালাইলে বলদ, মহিষ প্রভৃতি কৃষির জন্য ব্যবহৃত পশুর আর কোনো প্রয়োজন হইবে না। প্রাচীন কাঠের লাঙ্গল ও বলদের পরিবর্তে ট্রাক্টর ব্যবহার করা, বীজ বপন ও সার দেওয়ার কাজ একসঙ্গে করার জন্য কম্বাইন ড্রিল (Combine Drill) ব্যবহার করা, ফসল কাটা এবং খোসা ছাড়াইবার জন্য হারভেষ্টার থ্রেসার (Harvester thresher) ব্যবহার—কৃষি যন্ত্রিকরণ বলিতে এই সকল এবং আরও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বোঝায়।

যন্ত্রিকরণের অর্থ

কৃষিযন্ত্রিকরণ পূর্ণ বা আংশিক হইতে পারে। যখন যাবতীয় কৃষি সংক্রান্ত কাজ যন্ত্রের সাহায্যে করা হয় তাহাকে পূর্ণ যন্ত্রিকরণ বলে আর যখন সকল প্রকার কৃষিকার্যে যন্ত্রের ব্যবহার না হইয়া কয়েকটি কাজে যন্ত্রের প্রয়োগ করা হয় তাহাকে আংশিক যন্ত্রিকরণ বলে। ক্যানাডা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং সোবিয়েত রাশিয়ায় শ্রমের স্বল্পতার দরুণ পূর্ণ কৃষি যন্ত্রিকরণ করা হইয়াছে।

কৃষিপদ্ধতির যন্ত্রিকরণে কতকগুলি অন্তরায় রহিয়াছে। প্রথমতঃ ভারতীয় কৃষকদের কৃষিজমির আয়তন অতি ক্ষুদ্র আবার তাহাও একত্র না থাকিয়া ইতঃস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া আছে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে ট্রাক্টর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্ভব নয়, বৃহদায়তন জোতেই যান্ত্রিকপদ্ধতিতে উৎপাদন সম্ভবপর।

যন্ত্রিকরণের অন্তরায়

দ্বিতীয়তঃ কৃষিকার্যে আধুনিক ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে বর্তমানের তুলনায় কম শ্রমিক প্রয়োজন হইবে ফলে বিরাট সংখ্যক কৃষক বেকার হইয়া পড়িবে। বহুপূর্বে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন যেখানে কাজের তুলনায় হাতের সংখ্যা বেশী সেখানে যন্ত্র অবাঞ্ছনীয়। এই কারণে অনেক অর্থনীতিবিদ বলেন যে বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা না করিয়া ব্যাপকভাবে কৃষিযন্ত্রিকরণ করা অনুচিত।

তৃতীয়তঃ, মূলধনের সমস্যা; ভারতীয় কৃষকের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাহাদের পক্ষে বহু মূল্যবান আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সম্ভবপর নয়। ভারতে অবশ্য বেশ কিছু সমবায় কৃষি-সমিতি রহিয়াছে কিন্তু ইহাদের পক্ষেও প্রয়োজনীয় মূলধন যোগাড় করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

চতুর্থতঃ, ভূ-তত্ত্ববিদেরা এই মতবাদ পোষণ করেন যে ভারতের জমি ভারী ট্রাক্টর দ্বারা চাষের উপযুক্ত নয়। ট্রাক্টর প্রভৃতি ভারী যন্ত্রপাতি পাথুরে ও শক্ত জমি চাষের পক্ষেই সুবিধাজনক। কিন্তু ভারতের মাটি অপেক্ষাকৃত নরম।

পঞ্চমতঃ, বলা হয় যে ভারতীয় কৃষক অশিক্ষিত এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কোনো জ্ঞানই তাহাদের নাই, ফলে ট্রাক্টর ইত্যাদি যন্ত্রপাতি তাহারা ব্যবহার করিতে পারিবে না; তাহা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে যন্ত্রপাতি মেরামতির কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই।

ষষ্ঠতঃ, সেচব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শক্তি সরবরাহের প্রসার কৃষিযন্ত্রিকরণের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু ভারতে প্রয়োজনের তুলনায় সেচব্যবস্থার বিশেষ প্রসার ঘটে নাই এবং বিদ্যুৎশক্তি ও খনিজ তৈলের অভাব যন্ত্রিকরণের বিশেষ অন্তরায়।

পরিশেষে এই যুক্তিও দেখানো হয়, যে, কৃষির জন্য যে সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেগুলি আমাদের দেশে তৈয়ারী হয় না, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। দেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য কষ্টার্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যয় না করিয়া কৃষি-যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়া অপচয় করার কোনো যুক্তি নাই।

কৃষি যন্ত্রিকরণের বিপক্ষে এই সকল যুক্তি অকাট্য নয় এবং ইহাদের বিরুদ্ধে ও যন্ত্রিকরণের স্বপক্ষেও নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করা যায়।

প্রথমতঃ, ক্ষুদ্রায়তন জমিখণ্ডে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের যে অসুবিধা তাহা দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল সমবায় কৃষিপদ্ধতি। বর্তমানে সমবায় আন্দোলন প্রসারে সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায় আন্দোলন প্রসারের জন্য ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সরকারী সাহায্য এবং সমবায় সমিতির প্রসারের মাধ্যমে মূলধন সমস্যার সমাধান হইবে।

যন্ত্রিকরণের স্বপক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, কৃষি যন্ত্রিকরণের সাথে সাথে কুটিরশিল্প এবং বৃহৎ যন্ত্রশিল্প গড়িয়া তুলিতে পারিলে কৃষিযন্ত্রিকরণের ফলে যে বেকার সমস্যা দেখা দিবে তাহা দূর হইয়া যাইবে। কুটিরশিল্প সম্প্রসারণের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ৩০ কোটি টাকা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৮০ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ২৬৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য সরকারী খাতে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ হইল ৩৭০ কোটি টাকা।

তৃতীয়তঃ, ভারতের কৃষিজমির উপযোগী অপেক্ষাকৃত কম ওজনের ট্রাক্টর প্রভৃতি প্রস্তত করাইয়া ব্যবহার করিলে জমি নরম বলিয়া যে সকল অসুবিধা আছে তাহা দূর হইয়া যাইবে।

চতুর্থতঃ, ভারতীয় কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখাইতে হইবে। তাহারাই একদিন এই সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারিবে। ইহা সত্য যে যান্ত্রিকশিক্ষা দিতে সময় লাগিবে কিন্তু ইহার ফলে ভবিষ্যতে একদিন কৃষক এই সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারিবে।

পঞ্চমতঃ, গ্রামাঞ্চলে ট্রাক্টর প্রভৃতি যন্ত্রপাতি মেরামতির জন্য কারখানা স্থাপন করিতে হইবে। সমষ্টিউন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে যন্ত্রপাতি মেরামতির জন্য কারখানা স্থাপন করা হইতেছে।

প্রথম পরিকল্পনায় ৩০ লক্ষ একর জমিতে কৃষি যন্ত্রিকরণের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরাসরি কৃষি যন্ত্রিকরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই তাহার কারণ, আশংকা ছিল যে ইহা বেকার সমস্যার সৃষ্টি করিবে। তথাপি আমাদের দেশে কৃষি যন্ত্রিকরণ উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হইতেছে। ট্রাক্টর আমদানির সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৭৪ সালে সেণ্ট্রাল ট্রাক্টর অর্গানাইজেশান স্থাপিত হয়। মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় ট্রাক্টর নির্মাণের কাজ সুরু হইয়াছে। ইহা ছাড়া কৃষিকার্যে ইলেকট্রিক মোটর, ডিজেল ইঞ্জিন, প্রভৃতি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। কৃষকদিগকে আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনিতে উৎসাহিত করিবার জন্য অনেক সময় সরকার দীর্ঘকালীন ঋণদান করেন। অনেক সময় ট্রাক্টর ইত্যাদি যন্ত্রপাতি কৃষকগণকে ভাড়া দেওয়া হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় পতিত জমি পুনরুদ্ধার করিয়া সেখানে যন্ত্রিকরণের প্রসার করা হইতেছে।

কৃষিযন্ত্রিকরণ দীর্ঘকালীন কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি অংশ এবং দেশে কৃষি যন্ত্রিকরণের উপযোগী পরিবেশ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে

কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা (Agricultural Marketing)

ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ জন ব্যক্তি কৃষিনির্ভরশীল। কৃষি-পণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থার সহিত ইহাদের ভাগ্য বিশেষভাবে জড়িত। কৃষিপণ্যের বাজার সুগঠিত নয় বলিয়া কৃষক তাহার ফসলের উপযুক্ত দাম পায় না। আর সেই কারণে

তাহার আয় ও জীবনযাত্রার মান নিচু হয়। বিক্রয়ব্যবস্থার উন্নতির সহিত কৃষি এবং কৃষকের যথেষ্ট অর্থ নৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা লুকাইয়া রহিয়াছে।

উৎপাদনই উৎপাদনের চরম উদ্দেশ্য নয়। উৎপাদিত দ্রব্যকে চূড়ান্ত ভোগকারীর হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। পণ্যদ্রব্য বাজারের মারফৎ উৎপাদকের হাত হইতে ভোগকারীর হাতে আসে। বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিয়া দ্রব্যটি ভোগকারীর হাতে আসে ফলে নানাসমস্যার সৃষ্টি হয়। ভালো বাজারের তিনটি প্রয়োজনীয় সর্ত: (১) উৎপাদক তাহার উৎপাদিত দ্রব্যের সর্বোচ্চ দাম পাইবে (২) ক্রেতা উপযুক্ত গুণগত মানের দ্রব্য পাইবে এবং (৩) দ্রব্যটি উৎপাদকের হাত হইতে ক্রেতা তথা ভোগকারীর হাতে যাইতে সর্বনিম্ন ব্যয় হইবে।

ভালোবাজারের সর্ত

শুধুমাত্র কৃষি সংগঠনের উন্নয়ন যথেষ্ট নয়—কৃষিজপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থার উন্নতি না হইলে কৃষি উন্নয়নের ফলে যে বর্ধিত আয় হইবে কৃষক তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। ভারতে কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। কৃষক উপযুক্তস্থানে উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট উপযুক্ত দামে ফসল বিক্রয় করিতে পারে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে কৃষক তাহার পণ্যের ন্যায্য দামের শতকরা ৫০ ভাগও পায় না।

ভারতে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের জন্য চার ধরণের বাজার দেখিতে পাওয়া যায়, হাট, মণ্ডি, মেলা এবং খুচরা বাজার। হাট বা প্রাথমিক বাজার সপ্তাহে সাধারণতঃ একদিন বা দুই দিন করিয়া বসে। এখানে কৃষিপণ্যের পাইকারী এবং খুচরা উভয়বিধ কেনাবেচাই চলে। ভারতে এই ধরণের হাটের সংখ্যা ২১০০০এর মত। কৃষিপণ্যের বৃহৎ পাইকারী বাজার সাধারণতঃ মণ্ডি নামে পরিচিত। ইহারা প্রত্যহ বসে এবং এই সব বাজারে পাইকারী কেনাবেচাই হইয়া থাকে, খুচরা ক্রয়বিক্রয় বিশেষ হয় না। যুক্তপ্রদেশে হাপুর, আগ্রা, মীরাট ইত্যাদি অঞ্চলে এই ধরণের বাজার বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। ভারতে ২৫০০ মণ্ডি রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ মেলা;—ইহা সাধারণতঃ ধর্মীয় অথবা সামাজিক উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক ধরণের মেলা বৎসরে একবারই হয় এবং মেলায় শিল্পদ্রব্য এবং পণ্যদ্রব্য উভয়ই বিক্রয় হইয়া থাকে। মেলা একদিন, কয়েকদিন বা কখনো কখনো এক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ভারতে মেলার সংখ্যা ১৭০০০ এর মতো। পরিশেষে, দৈনন্দিন খুচরা বাজার। প্রত্যেক শহর, নগর এবং বড় বড় গ্রামে বাজার বসিয়া থাকে। বাজার সপ্তাহে রোজই বসিয়া থাকে এবং ক্রেতারা সাধারণতঃ শাকসব্জি, তরকারী, মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে।

চার ধরণের বাজার

মোট উৎপাদিত খাদ্যশস্যের এক-তৃতীয়াংশ বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসে। ইহার কারণ ভারতে ক্ষুদ্রহারে জমি চাষ হয়। কৃষক জীবনধারণের জন্য জমি চাষ করে, উৎপাদিত খাদ্যশস্যের বেশীর ভাগই ভোগ করে, ফলে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ কম হয়। বাণিজ্যিক শস্যের (commercial crops) ক্ষেত্রে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ মোট উৎপাদনের ৯৫ ভাগ।

ভারতের পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ব্যবস্থার প্রথম ত্রুটি যে কৃষক তাহার অধিকাংশ ফসলই গ্রামে বিক্রয় করে। সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে মোট ফসলের ৬৫ ভাগই গ্রামে বিক্রয় হইয়া যায়। মহাজনের ঋণের তাড়নায় কৃষক অল্পদামে গ্রামের বাজারে তাহার ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় ফলে সে তাহার ফসলের ন্যায্য দাম পায় না।

বিক্রয় ব্যবস্থার ত্রুটি

দ্বিতীয়তঃ, পরিবহণের অসুবিধা এবং রাস্তাঘাটের দুরবস্থা। কৃষক সহরের বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিলে উপযুক্ত দাম পাইত কিন্তু গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটের দুরবস্থার জন্য বাহিরের বাজারে ফসল লইয়া যাওয়া কৃষকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

তৃতীয়তঃ, ফড়িয়াদের প্রাধান্য। ফসলের স্বল্পতা এবং দারিদ্র্যের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সামান্য উৎপাদিত দ্রব্য লইয়া কৃষকের পক্ষে দূরবর্তী বাজারে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। ফড়িয়ারা গ্রামে গ্রামে যাইয়া কৃষকদের নিকট হইতে নামেমাত্র দামে ফসল ক্রয় করে এবং বাজারে চড়াদামে বিক্রয় করে। ফসল উৎপাদন করিল কৃষক আর সেই ফসল বিক্রয় করিয়া লাভবান হইল ফড়িয়া। ফড়িয়াদের অস্তিত্বের ফলে প্রাথমিক বিক্রয়দাম এবং শেষবিক্রয়দামের মধ্যে প্রভূত ব্যবধান থাকে। অনেক সময় গ্রামের মহাজনেরা কৃষকের দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে শোষণ করে। মহাজন অনেক সময় কৃষককে অগ্রিম টাকা দেয় এই সর্তে যে কৃষক তাহার মাধ্যমে ফসল বিক্রয় করিবে। ইহার ফলে কৃষক ফসল বিক্রয়ের স্বাধীনতা হইতেও বঞ্চিত হয়।

চতুর্থতঃ, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেতে উৎপাদিত একই ফসলের গুণগত তারতম্য হইতে বাধ্য এবং ইহাকে গুণানুসারে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত না করিয়া বাজারে লইয়া গেলে যথার্থ মূল্য পাওয়া যায় না।

পঞ্চমতঃ, গুদামঘরের অভাব থাকার জন্য কৃষক ফসল ধরিয়া রাখিতে পারে না। ফসল উঠার পর, যখন ফসলের দাম সর্বাপেক্ষা কম থাকে তখনই কৃষক তাহার ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। গুদামঘর এবং ঠাণ্ডাস্থানের (cold storage) অভাবে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করিয়া কৃষক ফসল সর্বাধিক দামে বিক্রয় করিতে পারে না।

ষষ্ঠতঃ, বাজারে বিভিন্ন পরিমাণের ওজন প্রচলিত রহিয়াছে ফলে অজ্ঞ কৃষক সহজেই প্রতারিত হইত। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরিমাণের ওজন এবং বাটখারার কারচুপি থাকার ফলে ব্যাপারীরা সহজেই অজ্ঞ কৃষকদিগকে প্রতারিত করিত।

সপ্তমতঃ, বাজারে বহুপ্রকার আদায় প্রচলিত রহিয়াছে। বাজার কর্তৃপক্ষের লোকেরা বারোয়ারী পূজার চাঁদা ইত্যাদির অজুহাতে কৃষকের ফসলের একটা বড় অংশ আদায় হিসাবে কাটিয়া লয়, ফলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওজনের ঢল্‌তা, গর্দা ইত্যাদি অজুহাতে কৃষকের ফসলের কিছু পরিমাণ বাদ যায়। ইহা ছাড়াও পৌরসংঘ কৃষকের নিকট হইতে চুংগী আদায় করে।

বিভিন্ন অঞ্চলে দামের বিভিন্নতা এবং একই অঞ্চলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দামের তারতম্যের মধ্য দিয়া কৃষিপণ্যের বিক্রয় বাজারের অসম্পূর্ণ এবং অসংলগ্ন চরিত্র প্রতিফলিত হয়।

প্রতিবিধান (Remedies): কৃষিপণ্যের বিক্রয় সমস্যার সমাধানকল্পে যে সকল প্রতিবিধানের উল্লেখ করা হয় তাহাদিগকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—এক, সুনিয়ন্ত্রিত বাজারের (Regulated Markets) প্রসার; দুই, সমবায় বিক্রয়বাজারের প্রসার (Co-operative Marketing Societies) এবং তৃতীয়তঃ অপরাপর ব্যবস্থাসমূহ (Other Measures)।

[এক] কৃষিপণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকার **সুনিয়ন্ত্রিত বাজারের** প্রবর্তন করিয়াছেন। সুনিয়ন্ত্রিত বাজারে নিলামে বা সরাসরি পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করা হয় এবং একটি বাজার কমিটির হাতে বাজার পরিচালনার ভার থাকে। পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে বিক্রেতাদিগের প্রতিনিধি থাকে বলিয়া কৃষকের ঠকিবার কোনো ভয় থাকে না। এই সকল সুনিয়ন্ত্রিত বাজারে বাজার আদায়ের (Market Charges) পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে এবং নানাপ্রকারের আদায় ও ওজন থাকিতে পারে না। কখনো কখনো সুনিয়ন্ত্রিত বাজারের পরিচালনার ভার থাকে সমবায় সমিতির হাতে। দেশের ১৮০০টি গুরুত্বপূর্ণ বাজারের মধ্যে ১০২৩টি বাজারকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়। বাকীগুলিকে তৃতীয় পরিকল্পনায় সুনিয়ন্ত্রিত করিবার কথা আছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ এবং মধ্যপ্রদেশে সুনিয়ন্ত্রিত বাজারের বিশেষ প্রসার হইয়াছে।

[দুই] কৃষিপণ্য বিক্রয়ব্যবস্থাকে সকল ত্রুটিমুক্ত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে **সমবায় বিক্রয় বাজারের** প্রতিষ্ঠা করা। সুনিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার কিছু উন্নতি হইবে কিন্তু বাজারের কাঠামো পরিবর্তন না করিতে পারিলে ফড়িয়ার সংখ্যা এবং পণ্যের দাম কমানো যাইবে না। কৃষিপণ্যের বিক্রয়ের সমগ্র ব্যবস্থাই ফড়িয়াদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া নিয়ন্ত্রিত বাজারে দাম খুব কম হইবে না। ফড়িয়ারা অর্থশালী আর কৃষকগণ ব্যক্তিগতভাবে ফসল বিক্রয় করে বলিয়া তাহারা কখনও দরাদরিতে ফড়িয়াদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। সমবায় সমিতির মাধ্যমে তাহাদের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। কৃষকের পক্ষে তাহার ফসলের ন্যায্যমূল্য পাইবার প্রধান বাধা ফড়িয়া। সুতরাং ফড়িয়ার উচ্ছেদ এবং প্রয়োজনমত কৃষককে ঋণদানের ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন; এই দুইটি কাজই সমবায় বিক্রয় সমিতির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলি সামান্য কমিশন লইয়া কৃষকের ফসল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে, ঋণদান করিয়া মহাজনের শোষণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে এবং কৃষকদিগের পক্ষ হইয়া যৌথভাবে দরকষাকষি করিবে। প্রথম পরিকল্পনায় সুনিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় কিন্তু পরবর্তী দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় বাজার সমিতি স্থাপনের দিকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

[**তিন**] (ক) অপরাপর ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে **গুণগত মান নির্ধারণ ও স্তরবিন্যাস** (quality control and grading) অন্যতম। কৃষক যাহাতে তাহার ফসলের উপযুক্ত দাম পায় তাহার জন্য গুণগত মান নির্ধারণ ও স্তরবিন্যাস করা প্রয়োজন। যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করা হয় তাহাদের ক্ষেত্রে নমুনা পাঠানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্তরবিন্যাসের অভাবে বৈদেশিক বাজারে ভারতের কৃষিপণ্য কমমূল্যে বিক্রীত হয়। স্তরবিন্যাসের ব্যবস্থা হইলে ভারতের কৃষিপণ্যের শতকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগ দাম বৃদ্ধি পাইবে। জাতীয় স্বাস্থ্যের স্বার্থে, খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া দুধ, ঘি এবং তেল-এ স্তরবিন্যাস করা প্রয়োজন। ১৯৩৭ সালে কৃষিপণ্য (মান নির্ধারণ এবং বিক্রয়) আইন [Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act] পাশ করা হয় এবং সরকার অনুমোদিত উচ্চগুণগত মান বিশিষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে AGMARK সীল ব্যবহার করা হয়। আজ পর্যন্ত প্রায় ১৫০টি দ্রব্যের ক্ষেত্রে স্তরবিন্যাস করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে দ্রব্যের মান নির্ধারণ করিবার ভার সমবায় বিক্রয় সমিতির হাতে থাকা ভালো কিন্তু ইহার তদারকের ভার একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের উপর থাকা উচিত, নচেৎ সর্বভারতীয় ঐক্যের অভাব ঘটিবে। অধিক পরিমাণ দ্রব্যেকে গুণগত নিয়ন্ত্রণের আওতায় লইয়া আসিবার জন্য নাগপুরে একটি কেন্দ্রীয় কোয়ালিটি কণ্ট্রোল ল্যাবোরেটারী (Central Quality Control Laboratory) এবং বিভিন্ন অঞ্চলে আরও আটটি আঞ্চলিক কোয়ালিটি কণ্ট্রোল ল্যাবোরেটারী স্থাপন করা হয়।

(খ) **পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি :** ভারতের পল্লী অঞ্চলের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন একটি প্রয়োজনীয় প্রতিবিধান। সস্তা পরিবহন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে পারিলে কৃষকগণ অল্পমূল্যে দালালদের নিকট ফসল বিক্রয় না করিয়া দূরবর্তী বাজারে উপযুক্তদামে ফসল বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে পারিবে। সরকার এ বিষয়ে সচেতন আছেন—প্রথম পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের ২৪ ভাগ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের ২৮ ভাগ এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের ২০ ভাগ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় পরিবহন ও যানবাহন খাতে মোট ৩৬৪০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে।

(গ) ফসল সংরক্ষণের জন্য **গুদামঘর স্থাপন** করিতে হইবে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে গুদামঘর স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় কিন্তু সমবায় সমিতির অর্থে সংকুলান না হইলে সরকারকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে। সারা ভারত কৃষিঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং গুদামঘর বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও সর্বভারতীয় গুদামঘর কর্পোরেশন এবং রাজ্য গুদামঘর কোম্পানীও স্থাপিত হইয়াছে। গুদামঘর ছাড়াও কৃষিপণ্যের সংরক্ষণের জন্য বহু ঠাণ্ডা-ঘরও (Cold storage) স্থাপিত হইয়াছে।

(ঘ) কৃষিজ পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় ব্যাপারে **ওজন ও মাপের নিয়ন্ত্রণ** প্রয়োজন। ওজন ব্যাপারে আইন করিয়া একই ধরনের ওজন ও মাপ সারা দেশে চালু করিতে

হইবে যাহাতে কৃষকের ঠকিবার সম্ভাবনা না থাকে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওজন ও মাপ (Standard Weight and Measure Act, 1956) আইন পাশ করা হয়। ১৯৬০ সালে অক্টোবর মাস হইতে দেশের সর্বত্র মেট্রিক ওজন ও মাপ চালু করা হইয়াছে।

(ঙ) কৃষিপণ্যের বাজারে দালালেরা ফটকাবাজী করিয়া কৃত্রিম উপায়ে দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি করে, ফলে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষিপণ্যের বাজারে **ফটকাবাজী রোধ** করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে সরকার আগাম চুক্তি নিয়ন্ত্রণ (Forward) Contract Regulation Act, 1962) আইন পাশ করেন এবং এই আইনকে কার্যকরী করার জন্য ১৯৫৩ সালে আগাম বাজার কমিশন (Forward Markets Commission, 1953) স্থাপন করা হয়। ৩৯টি কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে আগাম চুক্তি নিষিদ্ধ এবং ১৩টি কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে আগাম চুক্তি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(চ) কৃষকগণ যাহাতে কম সুদে ঋণ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে **সমবায় ঋণদান সমিতি** গঠন করিতে হইবে। কৃষক ঋণ পাইলে মহাজন বা ফড়িয়ার কবলে তাহাকে পড়িতে হইবে না, সে নিজেই কৃষিব্যবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে এবং ফসল ধরিয়া রাখিয়া অধিক দামে বিক্রয় করিতে পারিবে।

(ছ) কৃষক এবং ক্রেতা যাহাতে কৃষিপণ্যের চল্‌তি দাম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে তাহার জন্য বাজার দর সংক্রান্ত সংবাদ সরবরাহের কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। বিভিন্ন বাজারে দামের সমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে **সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা** করিতে হইবে। সরকারের বিক্রয়বিভাগ (Marketing Department), সংবাদপত্র এবং বেতার যন্ত্র মারফৎ দাম সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রচার ব্যবস্থাকে জোরদার করিতে হইবে।

সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (Community Development Project and National Extension Service) :

সমষ্টি উন্নয়ন অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের পরিকল্পনা। ইহা একটি আমেরিকান ধারণা এবং আমেরিকায় গ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য এই ধরণের পরিকল্পনা রহিয়াছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য কর্মসূচী অনুযায়ী ভারতে এই পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হইয়াছে। কমিউনিটি অর্থে সমগ্র গ্রামসমাজকে বুঝানো হইয়াছে।

গ্রামের লোকের দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক অবনতির কারণ নূতন জীবন দর্শন এবং নূতন পদ্ধতির প্রতি তাহাদের ঔদাসীন্য এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার অভাব। সমষ্টি উন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার উদ্দেশ্য জনগণের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করা এবং তাহাদের মনের মধ্যে উচ্চজীবনযাত্রার মানের আকাংখা সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া এবং সেই আকাংখাকে কার্যকরী করার মতো ইচ্ছা ও সংকল্পের সৃষ্টি করা। ৭০ মিলিয়ন গ্রাম্য পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করা এবং তাহাদের মধ্যে

উন্নততর জীবনের জন্য নূতন জ্ঞান এবং নূতন জীবনাদর্শের সৃষ্টি করা মূলতঃ এক মানবিক সমস্যা।*

সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য গ্রামীন সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান করা। গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া পল্লী জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নতিবিধানের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা কাজ করিয়া আসিয়াছে। এই সকল খণ্ড খণ্ড উন্নয়ন কাজগুলিকে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি অখণ্ড রূপ দেওয়া হইয়াছে। গ্রামের অধিবাসীদিগের উন্নয়নের ভার প্রধানতঃ তাহাদের উপরই ন্যস্ত থাকিবে। গ্রামীন জনসাধারণের মধ্যে উন্নততর জীবনযাত্রার মানের আকাংখার সৃষ্টি করিতে হইবে। উপর হইতে উন্নয়ন না চাপাইয়া গ্রামবাসীদের নিজেদের মনে সমষ্টিগত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের আকাংখা সঞ্চারিত করিতে হইবে। সমষ্টিউন্নয়ন পরিকল্পনা গান্ধীজীর গ্রামোন্নয়ন ধারণার সহিত বিজড়িত। বোম্বাই-এর সর্বোদয় পরিকল্পনা ও অপরাপর আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধির বিভিন্ন পরিকল্পনা হইতে সমষ্টিউন্নয়ন পরিকল্পনার মূলনীতি গৃহীত হইয়াছে।

সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার দুইটি মূল লক্ষ্য—(১) গ্রাম্যজীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করা; (২) গ্রামাঞ্চলের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করিতে অর্থাৎ আত্মনির্ভরশীল হইতে শিখিবে।

গ্রামবাসীদিগের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তায় এবং সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামীন জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন এবং মনোভাবের পরিবর্তন করাই হইল সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। পরিকল্পনার কর্মসূচীকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়—(১) শিক্ষা: প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা এবং সমাজ শিক্ষার প্রসার করিতে হইবে। (২) স্বাস্থ্য: জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, প্রসূতি সদন, পানীয় জলের বন্দোবস্ত এবং পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৩) সামাজিক লক্ষ্য: সমবায়ের প্রসার, গৃহনির্মাণ ব্যবস্থার প্রসার, আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা করা এবং সর্বোপরি বিভিন্ন লোকের মধ্যে আত্মীয়তাবোধের সৃষ্টি; (৪) অর্থনৈতিক লক্ষ্য: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট নির্মাণ, ধনবৈষম্য হ্রাস, বেকারত্ব এবং ছদ্মবেকারত্বের অবসান ও কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতি সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা দুইটি ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত—মূল পরিকল্পনা (basic projects) এবং মিশ্র পরিকল্পনা (composite projects)। মূল পরিকল্পনায় প্রধানতঃ কৃষি ও কৃষিসংক্রান্ত অন্যান্য কাজকর্মের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।

* The object is "to bring about a change in the mental outlook of the people and to instil in them an ambition for higher standard of life and the will and the determination to work for such standards. This is essentially a human problem—how to change the outlook of the 70 million families living in the country side; arouse enthusiasm in them for new knowledge and new ways of life and the will to lead a better life."

মিশ্র পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল কৃষি এবং কুটির শিল্পের উন্নতিসাধন করা এবং এমন এক শহর স্থাপন করা যাহাতে গ্রাম ও শহরের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটিবে। এই দুই ধরণের পরিকল্পনা ছাড়াও শিক্ষা পরিকল্পনার (training projects) ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল গ্রামবাসীদিগকে কৃষি ও কুটির শিল্প সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষাদান করা।

৩০০ গ্রাম, দুই লক্ষ জনসংখ্যা এবং ৫০০ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া এক একটি পরিকল্পনা এলাকা (Project area) গঠিত হইবে। পরিকল্পনা এলাকায় কর্ষিত জমির পরিমাণ ১½ লক্ষ একর। প্রত্যেকটি পরিকল্পনা এলাকা একজন করিয়া পরিকল্পনা অফিসারের অধীনে থাকিবে। ৩০০ গ্রাম সমন্বিত পরিকল্পনা এলাকা তিনটি উন্নয়ন ব্লকে (Development Block) বিভক্ত থাকিবে। এক একটি ব্লকে মোট ১০০টি করিয়া গ্রাম থাকিবে এবং প্রত্যেক ব্লকে একজন করিয়া ব্লক উন্নয়ন অফিসার (Block Development Officer) থাকিবেন। ইনি বারো জন বিশেষজ্ঞের সাহায্য লইয়া কাজ করিবেন। প্রতিটি উন্নয়ন ব্লক আবার পাঁচটি করিয়া গ্রাম লইয়া কুড়িটি অংশে বিভক্ত থাকিবে এবং প্রতি পাঁচটির দায়িত্ব থাকিবে একজন করিয়া গ্রাম সেবকের (village-level worker) উপর। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিচালনার জন্য কয়েকটি উপদেষ্টা কমিটি (Advisory Committee) থাকিবে। সমগ্র সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার শীর্ষে একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকিবেন এবং তিনি ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনারের মাধ্যমে কাজ করিবেন।

প্রথম পরিকল্পনায় মোট ৯০ কোটি টাকা সমষ্টি উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হইলেও ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ৪৬ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ২৯৪ কোটি টাকা এবং পঞ্চায়েতের জন্য ২৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। ১৯৫১ সালের ভারত মার্কিন চুক্তি অনুসারে সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা বাবদ ব্যয়ের ১২% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আসে।

৫৫টি উন্নয়ন ব্লক লইয়া ১৯৫২ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ প্রথম স্থুরু হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে ৩৭,০০০০ গ্রাম লইয়া গঠিত ৩১০০ উন্নয়ন ব্লকে সমষ্টি উন্নয়নের পরিকল্পনা সম্প্রসারিত হইয়াছে। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের সারা গ্রামাঞ্চলে এই পরিকল্পনা সম্প্রসারিত হইয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রামের অর্থনৈতিক এবং সমাজ জীবনে রূপান্তর আনিবার চেষ্টা করিয়াছে যে পদ্ধতিতে তাহা হইল সমষ্টি উন্নয়ন এবং যাহার মাধ্যমে তাহা হইল জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (National Extention Service)। "অধিক খাদ্য ফলাও" (Grow more food) কমিটির স্থপারিশের ফলে ১৯৫৩ সালে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার স্থষ্টি হয়। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকায় তিন বৎসরের মধ্যে গ্রামীনজীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান

করা, অপরপক্ষে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার উদ্দেশ্য হইল দশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতের গ্রামাঞ্চলের সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান করা। "অধিক খাদ্য ফলাও" কমিটির মতে তিন বৎসরে গ্রামীন জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। ইহা ব্যতীত কেবলমাত্র নির্দিষ্ট এলাকায় সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী থাকিলে সমগ্র দেশের উন্নতি হইবে না। এজন্য জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা এবং সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এই উভয়কেই এক বৃহত্তর পরিকল্পনার দুইটি দিক হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই দুই পরিকল্পনারই মূল উদ্দেশ্য এক—গ্রাম জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান। জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা এমন এক ধরণের সংগঠন যাহার মাধ্যমে প্রতিটি কৃষকের গৃহে উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে তাহাকে সজাগ করিয়া দেওয়া হইবে। উপদেশ দান ও গ্রামবাসীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি ইহার মূল লক্ষ্য। জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা উৎসাহ সৃষ্টি করিয়া প্রাথমিক কাজ শেষ করিলে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সুরু করা হইবে।

সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা কিরূপ কাজ করিতেছে তাহা লক্ষ্য রাখিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন একটি কার্যক্রম মূল্যায়ন সংগঠন (Programme Evaluation Organisation) নিয়োগ করিয়াছেন এবং ইহা প্রতি বৎসর রিপোর্ট দাখিল করিয়া আসিতেছে। ১৯৫৭ সালে বলবন্তী মেহেতার নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধান দল (Study Team) নিযুক্ত হয়। এই কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি এইরূপ: প্রতি সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতীর সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্রে সামাজিক উন্নয়ন অপেক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। বিদ্যালয় স্থাপন, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ইত্যাদি সামাজিক কার্যাবলীর যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে কিন্তু কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প সংগঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন আশু এবং অধিকতর কাম্য; (২) গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মসূচী প্রণয়ন এবং উহার পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় জনগণের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে অর্থাৎ সমষ্টি উন্নয়নের কার্যাবলীকে মোটামুটিভাবে পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে আনিতে হইবে। (৩) সমবায় প্রথায় উন্নত কৃষিকর্মের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং (৪) বর্তমানের তিন পর্যায় কার্যক্রমের পরিবর্তে ছয় বৎসরের কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত।

পঞ্চায়েতি রাজ ও তৃতীয় পরিকল্পনা (Panchayati Raj under the Third Plan): দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় তিন ধরণের পরিবর্তন সূচিত হয়—(১) পূর্বতন জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমষ্টি উন্নয়নের কাঠামোকে এক সমষ্টিউন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্তিকরণ (২) পঞ্চায়েতি রাজের প্রবর্তন এবং (৩) ব্লককে পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের ইউনিট হিসাবে দেখা।

গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার দায়িত্ব ব্লক পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইহা রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে এবং পঞ্চায়েতের অধীনে থাকিয়া কাজ করিবে। পঞ্চায়েতি রাজের মূল উদ্দেশ্য হইল প্রতি এলাকার জনসাধারণকে

সমগ্র জনগণের স্বার্থে উন্নয়ন সাধন করিতে প্রণোদিত করা। নির্বাচিত প্রতিনিধি পঞ্চায়েতকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যন্ত্র হিসাবে না দেখিয়া জনসেবার নূতন পথ হিসাবে দেখিবে।

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসাধন পঞ্চায়েত রাজের সাফল্যের মানদণ্ড হিসাবে গৃহীত হইবে : (১) তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিউৎপাদনকে জাতীয় অগ্রাধিকার প্রদান (২) গ্রামীন শিল্পের বিকাশ (৩) সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতি (৪) স্থানীয় জনশক্তি ও অন্যান্য সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার ; (৫) শিক্ষা, বিশেষতঃ বয়স্ক শিক্ষার প্রসার (৬) পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, (৭) গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে সাহায্যদান, কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রিকরণ ; (৯) নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সহযোগিতা এবং (১০) গ্রামের জনগণের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ এবং আত্মনির্ভরশীলতা জাগ্রত করা।

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের পূর্বতন বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা

(Land Tenure Systems in India)

বিষয়বস্তু : ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার গুরুত্ব—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত—মহালওয়ারী বন্দোবস্ত—মালগুজারী বন্দোবস্ত—জোতের ঊর্ধসীমা নির্ধারণ—পশ্চিমবংগে ভূমিসংস্কার—পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ভূমি-সংস্কার নীতি]

ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার গুরুত্ব (Importance of Land Tenure Systems) : ভারতে কৃষি-উৎপাদনের স্বল্পতার অন্যতম কারণ প্রতিকূল ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা। ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার উন্নতি কৃষি-উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। সঠিক ভূমিস্বত্বনীতির গুরুত্ব জাতীয় অর্থনীতিতে অপরিসীম। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা যদি কৃষকের মনে জমির ভোগদখল সম্পর্কে নিরাপত্তা ও উৎপাদনে উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে পারে তবে তাহাকে আদর্শ ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা বলিতে হইবে। অপরপক্ষে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহা হইলে কৃষক উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহবোধ করিবে না। ফলে কৃষিজ উৎপাদন সর্বাধিক হইতে পারিবে না। ভারত কৃষি প্রধান দেশ, মোট উৎপাদনের মধ্যে কৃষিজ উৎপাদনের অনুপাত সর্বাধিক বলিয়া এই দেশে উপযুক্ত ভূমিরাজস্ব নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমি সংক্রান্ত রিপোর্টে ভূমিস্বত্বব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ভূমিস্বত্বব্যবস্থা কৃষকের উপর অত্যধিক খাজনা

বা উচ্চ সুদের হার চাপাইয়া তাহার জীবনযাত্রার মান নামাইয়া আনিতে পারে। প্রতিকূল ভূমিরাজস্বনীতি কৃষকের মনে প্রেরণা বা উন্নতির সুযোগ নষ্ট করিয়া দিতে পারে এবং নিরাপত্তার অভাবে ইহা বিনিয়োগে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে।*

ভূমিস্বত্বব্যবস্থার সংস্কারের পূর্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের ভূমিব্যবস্থা চালু ছিল। ভূমিসংস্কার আইন পাশ হওয়ার পূর্বে ভারতে জমিদারী, মহালওয়ারী রায়তওয়ারী এবং মালগুজারী—এই চারিপ্রকার ভূমিব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement): চিরকালের জন্য দেয় খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া জমিদারী ব্যবস্থা **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement)** নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থায় জমিদারদের নিকট হইতে সংগৃহীত রাজস্বের $\frac{10}{11}$ ভাগ সরকারকে দিতে হইবে এবং বাকী অংশটা তাঁহারা পারিশ্রমিক হিসাবে ভোগ করিতেন। জমিদারী ব্যবস্থায় জমিদার হইল জমির মালিক এবং এই মালিকানা চিরস্থায়ী। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়মিতভাবে খাজনা দিতে পারিলে কোনো জমিদারকে উৎখাত করা হইবে না। এই বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদার নির্দিষ্ট দিনে খাজনা দিতে না পারিলে সূর্যাস্ত আইন অনুসারে জমিদারী নিলামে তুলিয়া বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

ভারতে চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা চালু করার পিছনে কর্ণওয়ালিশের কতকগুলি উদ্দেশ্য ছিল (১) আর্থিক উদ্দেশ্য; কোম্পানী জমিদারদিগের নিকট হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাজনা পাইলে শাসনকার্য পরিচালনার খরচ সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারিবে। বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত করিতে হইলে রাজস্বের পরিমাণ জানা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া রাজস্ব ব্যবস্থা অস্থায়ী না হইয়া চিরস্থায়ী হইলে আদায় করাও অপেক্ষাকৃত সহজ; (২) সামাজিক উদ্দেশ্য: জমিদার শ্রেণীর সাহায্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হইবে। কর্ণওয়ালিশ আশা করিয়াছিলেন যে জমিদারগণ সমাজের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া সকলপ্রকার সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টা করিবেন; (৩) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য: কর্ণওয়ালিশ আশা করিয়াছিলেন যে জমিদারশ্রেণী সরকারের বশীভূত এবং রাজভক্ত হইবেন এবং প্রয়োজন হইলে ইঁহারা কোম্পানীকে সাহায্য করিবেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই সকল জমিদারশ্রেণী সত্যসত্যই সরকারকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল।

ইহা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য

* "The Land Tenure system may reduce the standard of living of the peasant by imposing on him exhorbitant rents or high interest rates; it may deny him the incentive or the opportunity to advance and it may check, investment because it offers him no security."

চিরস্থায়ীব্যবস্থার গুণ অপেক্ষা দোষই অধিক। প্রথমতঃ সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমিরাজস্ব চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া রহিল। ফলে জমির উন্নতি এবং দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমিদার লাভবান হইতে লাগিল কিন্তু সরকারের খাজনা বাড়াইবার কোনো উপায় রহিল না। জমিদারদের চেষ্টা ব্যতিরেকেই জমির উন্নতি হইয়াছে—রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে, বাঁধ তৈয়ারী হইয়াছে বা শহর গড়িয়া উঠিয়াছে এবং জমিদার প্রজাদের নিকট হইতে প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহা ছাড়া ফসলের দাম বাড়ায় জমিদার খাজনা বাড়াইবার সুযোগ পাইয়াছে। ১৭৯০ সাল হইতে জমিদারী উচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত রাজস্ব আদায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া মাত্র ৪ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু জমিদারদের আয় ৪ কোটি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৬ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ জমিদারেরা ১২ কোটি টাকা অনুপার্জিত মুনাফা (unearned increment) ভোগ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ জমিদারেরা জমির কোনো উন্নতির চেষ্টা করেন নাই। জমির উন্নতির ভার রায়তদিগের উপর ন্যস্ত রহিল; কিন্তু জমিদারী বন্দোবস্তে জমিতে রায়তের কোনো অধিকার স্বীকার করা হয় না এবং জমিদার তাহার খেয়ালখুসিমত রায়তকে জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারে ফলে রায়তও জমির উন্নতির কোনো চেষ্টা করিল না। জমির অবস্থা ক্রমশই খারাপ হইতে লাগিল। তৃতীয়তঃ, এই ভূমিব্যবস্থার ফলে নগরপ্রবাস জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি হইল। জমিদারেরা গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়া বিলাসবহুল জীবনযাপন আরম্ভ করিল। জমিদারী পরিচালনার সাক্ষাৎভার রহিল নায়েব গোমস্তাদিগের হাতে। জমিদারগণ নগরাঞ্চলে আসার ফলে গ্রামের লোক ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। গ্রাম হইতে আদায়ীকৃত খাজনা শহরে আসিয়া ব্যয় হইতে থাকিলে ইহা পুনরায় গ্রামে বণ্টিত হইবার সুযোগ নষ্ট হইল। গ্রামের টাকা নগরে চলিয়া আসার সাথে সাথে গ্রামগুলি দরিদ্র এবং নিঃস্ব হইতে লাগিল। চতুর্থতঃ চিরস্থায়ী ব্যবস্থার ফলে জমিদার ছাড়া আরও বহুপ্রকার মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হইয়াছে। সমাজ ইহাদের নিকট হইতে কিছু পাইত না কিন্তু ইহারা কৃষকশ্রেণীকে শোষণ করিয়া চলিল। পঞ্চমতঃ এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শিল্পবাণিজ্যে অনগ্রসরতার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। বিত্তবান লোকে ব্যবসা করিয়া ঝুঁকি লওয়া অপেক্ষা জমিদারী কিনিয়া নিরুপদ্রবে এবং অলসভাবে কালকাটানো শ্রেয় বলিয়া মনে করিত। ফলে যে মূলধন শিল্পায়নে বিনিয়োজিত হইয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করিতে পারিত তাহা জমিতে অনুৎপাদনশীল কাজে আবদ্ধ রহিয়া গেল। পরিশেষে জমিদারী ব্যবস্থার স্বপক্ষে বলা হয় যে এই ব্যবস্থার ফলে বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয় কারণ যেখানে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল সেখানেও শক্তিশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই ব্যবস্থার ত্রুটি

রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত (Ryotwari System): এই ব্যবস্থায় জমি সরাসরি কৃষক বা রায়তদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া খাজনা নির্দিষ্ট করা হইত।

এই ব্যবস্থায় রায়ত ও সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল—ইহাদের মধ্যে কোনো মধ্যস্বত্বভোগী নাই। রায়তরা সরাসরি সরকারকে খাজনা দেয় এবং রায়তরা জমি ভোগদখল ও ক্রয়বিক্রয় করিতে পারে। ভূমিরাজস্ব উৎপন্ন শস্যের উপর দেয় হিসাবে ধার্য করা হয়। এই ব্যবস্থায় খাজনা স্থায়ীভাবে স্থিরীকৃত হয় না। সাধারণতঃ ২০ বা ৩০ বৎসর পর পর জমির খাজনার পরিমাণ পুনর্বিবেচনা করা হয়। এই ব্যবস্থার চাষের খরচ বাবদ কৃষকের যে নীট মুনাফা থাকে তাহার ৫০ ভাগ সরকারকে খাজনা হিসাবে দিতে হয়। এই ব্যবস্থায় রায়তকে জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করা হয়, সেই কারণে সে জমির উন্নতি করিতে আগ্রহী থাকে। অবশ্য রায়তদিগের জমি হস্তান্তরের ক্ষমতা থাকায় এই ব্যবস্থায় অনেক গলদ দেখা দেয়। এই ধরণের ভূমি রাজস্বের বন্দোবস্ত মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং বেরারে প্রচলিত ছিল।

মহালওয়ারী বন্দোবস্ত (Mahalwari System) ঃ এই ব্যবস্থা অনুসারে জমি কোনো ব্যক্তিবিশেষের সহিত বন্দোবস্ত না করিয়া একটি বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত মহালের সহিত করা হইত। প্রত্যেক কৃষক ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে রাজস্বের জন্য সরকারের নিকট দায়ী থাকে। সাধারণতঃ লম্বরদার নামক গ্রামের মোড়ল নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব আদায় করিয়া সরকারী তহবিলে জমা দিত। এই ভূমিব্যবস্থায় জমির খাজনা চিরস্থায়ীভাবে স্থির করা হইত না। কিছুকাল পর পর খাজনার পরিমাণ পুনর্বিবেচনা করিয়া হ্রাসবৃদ্ধি করা হইত। এই ধরণের ভূমিব্যবস্থা পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত ছিল।

মালগুজারী বন্দোবস্ত (Malguzari System) ঃ—এই ব্যবস্থায় সরকারের কর্মচারীরা জমি জরিপ করিয়া রায়তদের দেয় খাজনার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেয়। মালগুজার বা কর প্রজারা সেই খাজনা আদায় করিয়া সরকারের নিকট দাখিল করে এবং আদায়ী রাজস্বের পরিমাণের উপর তাহারা কমিশন পায়। ইহা মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত ছিল।

জোতের উর্ধসীমা নির্ধারণ (Fixation of Land Ceiling) ঃ ভারতে বর্তমান ভূমিসংস্কার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হইতেছে জমির মালিকানার উর্ধসীমা নির্ধারণ। ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়ার নির্দেশ পরিকল্পনা কমিশন দেন। ১৯৫৬ সালের এ. আই. সি. সি-র নাগপুর প্রস্তাবনায় জোতের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ আয়তনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ এবং তজ্জন্যে আইন প্রণয়নের কথা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় সকল রাজ্যেই ভূমিস্বত্বব্যবস্থা সংশোধনের সাথে সাথে জোতের উর্ধসীমা নির্ধারণের জন্য আইন পাশ করা হইয়াছে। সর্বোচ্চ জোত অপেক্ষা বেশী জমি থাকিলে রাষ্ট্র তাহা গ্রহণ করিয়া সমবায় সমিতির মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। জোতের উর্ধসীমা নির্ধারণের ফলে জমিতে পুনরায় একচেটিয়া মালিকানা গড়িয়া উঠিতে পারিবে না।

জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের কয়েকটি দিক আছে। প্রথমতঃ বর্তমান জোতের সীমা নির্ধারণ (ceiling on existing holdings) দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যৎ জোতের সীমা নির্ধারণ (ceiling on future holdings) এবং তৃতীয়তঃ জোতের ঊর্ধ্বসীমা পরিবার ভিত্তিক না ব্যক্তিভিত্তিক হইবে তাহা স্থির করা।

জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের তিনটি দিক

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রায় সকল রাজ্যেই জোতের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিয়া আইন পাশ করা হইয়াছে।

ভারতে কৃষিকার্য পারিবারিক ভিত্তিতে চলে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন পারিবারিক ভিত্তিতে জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কোথাও পারিবারিক ভিত্তিতে আবার কোথাও ব্যক্তিগত ভিত্তিতে জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করা হইয়াছে। সুতরাং এই ব্যাপার সর্বভারতীয় একরূপতা নাই।

আর্থিক জোত বা পারিবারিক জোতের তিন হইতে পাঁচগুণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির মালিকানায় থাকিতে পারিবে—পরিকল্পনা কমিশন এইরূপ সুপারিশ করিয়া এই নীতি কার্যকর করার ভার বিভিন্ন রাজ্য সরকারের হস্তে ন্যস্ত করেন। আর্থিক জোতের আয়তন নির্ধারণের জন্য সরকার কুমারাপ্পা কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি বলেন যে আর্থিক জোতের (economic holdings) কোনো নির্দিষ্ট আয়তন নাই, তবে উহাকে দুইটি সর্ত পূরণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ উহা কৃষকের সাধারণ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিতে সহায়তা করিবে এবং দ্বিতীয়তঃ উহা হইতে একজোড়া বলদ সমেত একটি স্বাভাবিক কৃষক পরিবারের নিয়োগের ব্যবস্থা হইতে পারিবে। যাহাদের জোতের পরিমাণ আর্থিক জোত অপেক্ষা পাঁচগুণ বেশী তাহাদিগকে উদ্বৃত্ত জমি রাষ্ট্রকে দিতে হইবে এবং রাষ্ট্র এই জমি ভূমিহীন কৃষক এবং যাহাদের জোতের পরিমাণ আর্থিক জোতের পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র তাহাদের মধ্যে প্রয়োজনানুসারে ভাগ করিয়া দিবে। প্রায় সকল রাজ্যেই জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের জন্য আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। জোতের ঊর্ধ্বসীমা যুক্তপ্রদেশে ৪০ একরে, কেরালায় ১৫ একরে, রাজস্থানে ৩০ একরে, পশ্চিমবঙ্গে ২৫ একরে, মধ্যপ্রদেশে ৩০ একরে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কয়েকটি রাজ্যে আয়ের অংকের উপর ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারিত হইয়াছে। অন্ধ্রে ইহা নীট আয়ের ৫৪০০ টাকায়, মহীশূরে ৪২০০ টাকায় এবং বোম্বাইএ ৩৬০০ টাকায় নির্ধারিত হইয়াছে। জোতের যে ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তদপেক্ষা বেশী জমি থাকিলে তাহা রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়া মালিককে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিবে।

চা, রবার, কফি, ফলের বাগান, বৃহদায়তন সুদক্ষ কৃষিখামার এই আইনের আওতায় পড়িবে না। এরূপক্ষেত্রে জোতের ঊর্ধ্বসীমার আইন প্রয়োগ করিলে জমিগুলি খণ্ডিকৃত হইবে এবং উৎপাদন হ্রাস পাইবে।

জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের ফলে সম্পদের বৈষম্য হ্রাস পাইবে এবং সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সমাজ গঠনের পথ প্রশস্ত হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে সামাজিক এবং

অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতে শতকরা ৫ জন লোক ৩৩ ভাগ জমির মালিক। এই সামাজিক অসাম্য দূর করিবার জন্য জোতের ঊর্ধসীমা নির্ধারণ উপযুক্ত ব্যবস্থা। দ্বিতীয়তঃ জমির ঊর্ধসীমা নিধারণ না করিয়া দিলে পুনরায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফলগুলি দেখা দিবে। জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর প্রাথমিক ধাপ মাত্র। ভূমিসংস্কার ব্যবস্থাকে কার্যকর করিয়া তুলিতে হইলে জোতের ঊর্ধসীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার ফলে আয়ও সম্পদের বৈষম্য দূর হইবে, শোষণের পথ বন্ধ হইবে, কৃষকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হইবে এবং পরিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে অবস্থা এবং সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তৃতীয়তঃ এই ব্যবস্থার ফলে যে বাড্‌তি জমি পাওয়া যাইবে তাহা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার দরুণ গ্রামীণ জীবনে একটা অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিবে। বহু হতভাগ্য কৃষক জমি পাইলে তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে। ইহা সত্য যে এই ব্যবস্থার দ্বারা সকল কৃষকের প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করা সম্ভব নয় তথাপি ইহা কাম্য কারণ ইহা কৃষকের মনে আনন্দ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে এবং তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হইবে। চতুর্থতঃ জোতের ঊর্ধসীমা নির্ধারণের দ্বারা পঞ্চায়েতকে সত্যকার গণতান্ত্রিক সংগঠনে পরিণত করা সম্ভব হইবে। যে কৃষকের প্রভূত পরিমাণ জমি আছে সেই ধনবান কৃষক স্বভাবতই পঞ্চায়েতের উপর অবাঞ্ছিত প্রভাব বৃদ্ধি করিবে। ঊর্ধসীমা নির্দিষ্ট হইলে এই অবস্থার অবসান ঘটিবে। এই ব্যবস্থার ফলে নগর-প্রবাসী জমিদারী শ্রেণীও লোপ পাইবে এবং মধ্যস্বত্বভোগীশ্রেণীর উচ্ছেদ হইবে। পরিশেষে, ইহা বলা হয় যে আমেরিকার মত মূলধনসমৃদ্ধ দেশে বৃহদায়তন কৃষি আদর্শ ব্যবস্থা হইলেও ভারতের মতো শ্রমবহুল এবং মূলধন-স্বল্প দেশের পক্ষে ওই ধরণের কৃষি-ব্যবস্থা অনুকূল নয়।

বিরুদ্ধ যুক্তি

জমির ঊর্ধসীমা নির্ধারণের বিরুদ্ধে অনেক প্রকার যুক্তি দেখানো হয়। প্রথমতঃ এই যুক্তি দেখানো হয় যে জোতের ঊর্ধসীমা নির্ধারণ করিলে ভূমিহীন কৃষকের বিশেষ উপকার হইবে না, অপরপক্ষে ইহা বৃহত্তর সমস্যার সৃষ্টি করিবে। বড় বড় জমিখণ্ড ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট জোতের উদ্ভব হইবে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জমি চাষ করা সম্ভবপর হইবে না। তৃতীতঃ বাড্‌তি জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সমস্যা রহিয়াছে। রাজ্যসরকারগুলির বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেওয়া গুরুতর সমস্যা। চতুর্থতঃ সারাদেশে অন্যান্য আয়ের ক্ষেত্রে আয়ের ঊর্ধসীমা নির্ধারিত হইল না অথচ ভূমির ক্ষেত্রে উহা আরোপ করার কি যৌক্তিকতা থাকিতে পারে? নীতির দিক হইতে বলিতে পারা যায় যে জমির ঊর্ধসীমা নির্ধারণের সাথে সাথে অপর সকল আয় সৃষ্টিকারী সম্পত্তির উপর সীমানা নির্ধারণ করিতে হইবে। পঞ্চমতঃ জোতের ঊর্ধসীমা বাঁধিয়া দেওয়ার অর্থ হইল ভূ-স্বামীর আয় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া। যদি মূল্যস্তর বাড়িয়া যায় তাহা হইলে জোতদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণ করিবার দায়িত্ব যদি সরকার গ্রহণ করে তাহা হইলে এই নীতির বিরুদ্ধে আমাদের

কিছু বলিবার নাই। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে সরকার মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হইয়াছেন। ষষ্ঠতঃ এই নীতি কৃষির দক্ষতাকে হ্রাস করিয়া দিতে পারে। বৃহদায়তন জোত হইতে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া জোতের ঊর্ধসীমার পরিমাণ কম হইলে উদ্‌যোগী কৃষকেরা আধুনিক পদ্ধতিতে জমি চাষ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া নগরাঞ্চলে চলিয়া আসিবে ফলে গ্রাম এই সকল উদ্যোগী পুরুষদিগকের হারাইবে। সপ্তমতঃ, জোতের ঊর্ধসীমা নির্ধারণ করিলে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ফসলের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে খাদ্যশস্য আসে তাহার বৃহত্তর অংশ যোগান দেয় বড় বড় জোতদারেরা। জমির ঊর্ধসীমা নির্ধারিত হইলে বড় জোত ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে এবং ছোট ছোট জোতদারেরা কম পরিমাণ ফসল বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে। ফলে দেশের খাদ্যসমস্যা বৃদ্ধি পাইবে।

এই সকল অর্থনৈতিক অসুবিধা ছাড়াও আরও কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা রহিয়াছে। যেখানেই জমির ঊর্ধসীমা নির্ধারিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে সেখানেই বেনামী করিয়া জমির মালিকেরা আইন ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিয়াছে ফলে উদ্দেশ্য কতকাংশে ব্যর্থ হইয়াছে।

বাস্তব অসুবিধা

একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে দেশের ভূমি সমস্যার সত্যকার সমাধান বাড়তি জমি পুনর্বণ্টনের মধ্য দিয়া আসিবে না—ইহা আসিবে জমির ছদ্মবেশী বেকার কৃষকদিগকে জমি হইতে অপর উপজীবিকার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে। অবশ্য জোতের ঊর্ধসীমা ভূমিসংস্কার তথা কৃষি-সংস্কারের এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই ব্যবস্থার অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধাই অধিক বলিয়া ইহা কাম্য।

পশ্চিমবংগে ভূমি সংস্কার: পশ্চিমবংগ জমিদারী রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ১৯৫৩ পশ্চিমবংগ ভূমিসংস্কার আইন, ১৯৫৬ (Land Reform in West Bengal: West Bengal Estate Acquisition Act and Land Reform Act 1956):

১৯৫৩ সালে পশ্চিমবংগ জমিদারী রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আইন পাশ করা হয় এবং ১৯৫৫ সাল হইতে ওই আইন কার্যকরী করা হয়। এই আইনের ফলে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবংগে জমিদার ও সর্বপ্রকার মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপসাধন করা হইয়াছে।

জমিদার তথা সকলপ্রকার মধ্যস্বত্বভোগীদিগকে ২৫ একর কৃষিজমি এবং ২০ একর অকৃষিগত জমি রাখিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। জমিদার ও মধ্যস্বত্ব-ভোগিগণ জমি হইতে নীট আয় অনুসারে ক্ষতিপূরণ পাইবেন; ক্ষতিপূরণ নিধারণের ব্যাপারে গতিশীলতার নীতি (principle of progression) অনুসরণ করা হইবে অর্থাৎ নীট আয় যত বেশী হইবে, ক্ষতিপূরণের হারও তত কম হইবে এবং নীট আয় যত কম হইবে, ক্ষতিপূরণের হারও ততই বেশী হইবে।

ক্ষতিপূরণের টাকা আংশিকভাবে নগদ টাকায় এবং আংশিকভাব ২০ বৎসর মেয়াদী সরকারী কাগজে দেওয়া হইবে।

পশ্চিমবংগে জমিদারীপ্রথার বিলোপসাধনের বিরুদ্ধে নানারূপ সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, জমিদারী প্রথার অবসান হইয়াছে কিন্তু জমির পুনর্বণ্টন এবং কৃষকদিগের খাজনার পরিমাণ হ্রাস কোনটিই হয় নাই। সুতরাং জমিদারী বিলোপের মোট ফল দাঁড়াইবে যে জমিদার শ্রেণীর পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বত্বভোগী হইবে সরকার।

দ্বিতীয়তঃ কলিকাতাকে (টালিগঞ্জ সমেত) এই আইনের বাহিরে রাখার কোনো যুক্তি নাই। বলা হইয়াছে যে কয়েকটি লোকের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার তাহাদিগকে গ্রামাঞ্চলে আইনানুসারে যে পরিমাণ ভূমি রাখা যাইতে পারে তাহার উপর ও কলিকাতা ও টালিগঞ্জ এলাকায় যে কোনো পরিমাণ জমি ভোগদখলের সুযোগ দিয়াছেন। এই ব্যবস্থা পশ্চিমবংগ জমি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আইন-বিরোধী।

তৃতীয়তঃ চরমপন্থীগণ ক্ষতিপূরণ দিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ভূম্যধিকারী এবং ভূমিহীন গ্রামবাসীদিগের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য দূর করিবার জন্য এই আইন পাশ করা হইয়াছে সুতরাং ক্ষতিপূরণ দিবার নীতির সার্থকতা কোথায় ?

১৯৫৬ সালে পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন পাশ হয়। ইহার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে ভূমির পুনর্বণ্টন, ভূমির উর্ধসীমা নির্ধারণ এবং রায়তদিগের রাজস্ব হার লাঘব। এই আইনে রায়তদিগকে জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে অর্থাৎ যে কৃষক যে জমি চাষ করিতেছে তাহাকে সেই জমির মালিকানা দেওয়া হইয়াছে। কোনো কৃষক ২৫ একরের বেশী অকৃষিগত জমি রাখিতে পারিবে না। এই আইনে বর্গাদার (ভাগ চাষী) এবং জমির মালিকের মধ্যে উৎপন্ন ফসল বণ্টনের নীতিও নির্ধারিত হইয়াছে। জমির মালিক যদি কৃষিকার্যের ব্যয়ভার বহন করে তাহা হইলে সে উৎপন্ন ফসলের ৬০ ভাগ এবং বর্গাদার ৪০ ভাগ পাইবে, আর যদি জমির মালিক কৃষিকার্যের ব্যয় বহন না করে তাহা হইলে অর্ধেক পরিমাণ ফসল পাইবে।

জমিদারীপ্রথা বিলোপের পর হইতে "খাজনা (rent)" শব্দটির পরিবর্তে "রাজস্ব (revenue)" শব্দটি ব্যবহৃত হইতেছে। এই রাজস্বের হার বিভিন্নভাবে নির্ধারিত হইবে। ইহা প্রধানতঃ জমির উৎপাদিকা শক্তি, জমির বাজারদাম, শস্যের বাজার দাম প্রভৃতি অনুসারে নির্ধারিত হইবে। কোনো ক্ষেত্রেই রাজস্বের পরিমাণ উৎপন্ন ফসলের মোট মূল্যের ⅙ অংশের বেশী হইতে পারিবে না। উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনে ভূমিহীন কৃষক এবং যাহাদের জমি দুই একরের কম তাহাদের দাবীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

পশ্চিমবংগ ভূমিসংস্কার আইনের নানারূপ বিরূপ সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ এই আইন ভূমিসংস্কার অপেক্ষা রাজস্ব সংস্কারের দিকে অধিক মনোযোগ দিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ জমির যে উর্ধসীমা নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহাতে উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ অতি সামান্য হইবে। তৃতীয়তঃ এই আইনের ফলে জমির উপস্বত্ব-

ভোগকারী মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে বেকার সমস্যা দেখা দিবে। ইহাদের জন্য বিকল্প নিয়োগের কোনোরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই।

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ভূমি-সংস্কার নীতি (Land Policy under Planned Economy) ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর উপর যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। ভূমিসংস্কার নীতির দুইটি মূল উদ্দেশ্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পথে যে সকল বাধা রহিয়াছে তাহা দূর করা এবং দ্বিতীয়ত সকলপ্রকার শোষণ ও সামাজিক অসাম্যের অবসান ঘটানো, কৃষকের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা এবং গ্রামের সকল লোকের সমান মর্যাদা ও সুযোগের সৃষ্টি করা।

এই দুই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রধান কর্মসূচী হইল (১) কৃষক এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সকল প্রকার মধ্যস্বত্বভোগীর উচ্ছেদসাধন (২) ভূমিস্বত্বব্যবস্থার সংস্কারসাধন করা। খাজনা হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ, জমিতে কৃষকের অধিকার স্বীকার এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা ভূমিসংস্কার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ; (৩) পরিশেষে জোতের ঊর্ধতন সীমা নির্ধারণের এবং বাড়্তি জমির পুনর্বণ্টন। অধিকাংশ জোতের আয়তন ছোট বলিয়া ঊর্ধসীমা নির্ধারণের ফলে খুব বেশী পরিমাণ জমি পাওয়া যাইবে না। তথাপি প্রগতিশীল সমবায় ভিত্তিক গ্রামীন অর্থনীতি গঠনের জন্য ইহা প্রয়োজন।

কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সাধারণতঃ এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে ঃ প্রথমতঃ, জমির একত্রিসাধন, দ্বিতীয়তঃ সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের প্রসার এবং তৃতীয়তঃ, সমবায় গ্রাম পরিচালনা ব্যবস্থার প্রবর্তন। "জমি কৃষকের" (land to the tiller)—সরকারী ভূমিনীতির ইহাই মূল লক্ষ্য।

অষ্টম অধ্যায়

ভারতীয় কৃষি-মজুর ঃ সাধারণ আলোচনা

(Agricultural Labour in India : A General Survey)

[**বিষয়বস্তু ঃ** ভারতের কৃষি-মজুরের সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য—মজুরী হার—কৃষি শ্রমিক ও তৃতীয় পরিকল্পনা]

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। ১৯২১ সালে কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১৫ লক্ষ। ১৯৩১ সালে কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। কৃষি মজুর অনুসন্ধান কমিটির হিসাবানুসারে ১৯৫০-৫১ সালে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৫০ লক্ষ—ইহার মধ্যে ১ কোটি ৯০ লক্ষ পুরুষ, ১ কোটি ৪০ লক্ষ স্ত্রীলোক এবং ২০ লক্ষ বালক ছিল। ১৯৫৬-৫৭ সালে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ।

কৃষি মজুরের সংখ্যা

১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী কৃষি ৬৯.৮% লোকের প্রধান উপজীবিকা ছিল। ১৯৬১ সালের হিসাবানুযায়ী ১৮.৮৭ কোটি শ্রমিকের মধ্যে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩১৪৮২৩০৫.

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৫ লক্ষ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিগত ৬০-৭০ বৎসরে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রাম্য অর্থনীতিতে সাধারণ অধিকার লোপ, জমি খণ্ডিকরণ, সমবেত উদ্যোগের অব্যবহার, খাজনাদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি, জমির অবাধ বন্ধক ও হস্তান্তর এবং কুটির শিল্পের ধ্বংস এই সকল কারণে ছোট জোতদারদের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে এবং উহার ফলে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে।*

সাধারণভাবে বলা যায় যে ভারতে কৃষি মজুরের মোট সরবরাহ আসে তিনটি উৎস হইতে—(১) ভূমিহীন গ্রাম্য শ্রমিক পরিবার হইতে (২) আংশিক কৃষি পরিবার হইতে এবং (৩) আংশিক কারিগরী পরিবার হইতে। কৃষিশ্রমিক বলিতে আমরা বুঝি যাহারা মাঠে ফসল কাটে এবং ভূমিকর্ষণ করে বা সাধারণ শ্রমিক যাহারা কূপ, পুষ্করিণী খনন করে বা ফসল গোলাজাত করে অথবা দক্ষ শ্রমিক যাহারা ছুতার বা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে।

কৃষি মজুরের শ্রেণী

শ্রম দাস (serf-Jabour) প্রথাও কিছু কিছু অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কোনো শ্রমিক জোতদারের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে শ্রম দ্বারা সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকে। ঋণ হ্রাস হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে এবং সারা জীবনই শ্রমিক জোতদারের নিকট খাটিতে বাধ্য থাকে।

কৃষি-শ্রমিক বলিতে বুঝায় যাহারা মজুরীর পরিবর্তে কৃষিতে নিযুক্ত থাকে। এই ধরণের শ্রমিকের নিজের জমি থাকিতে পারে আবার নাও থাকিতে পারে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে যদি কোনো শ্রমিক বৎসরের অর্ধেকের বেশীদিন কৃষি শ্রমিক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে তাহাকেই কৃষিশ্রমিক বলা হইবে।

ইহার ভিত্তিতে, প্রথম কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান দলের মতে গ্রাম্য পরিবারের ৩০.৪% হইল কৃষিশ্রমিক এবং উহার ৫০% হইল ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক। স্ত্রীলোক এবং বালক মোট কৃষি শ্রমিকের একটি বড় শতাংশ।

কৃষিকার্য প্রধানতঃ কয়েক মাসের কাজ। ফসলের প্রকৃতি অনুযায়ী কাজের সময় স্থির হয়। জলসেচের সুবিধা আছে এরূপ কোনো কোনো স্থানে শ্রমিক বৎসরের নয় মাস পর্যন্ত কাজ করিয়া থাকে আবার কোনো কোনো

* Every circumstance which has weekened the economic position of the small holder has increased the supply of agricultural labourers—loss of common rights in the rural economy, the subdivision of holdings, the disuse of collective enterprise, the multiplication of rent receivers, free mortgaging and transfer of land and the decline of the cottage industries. —Dr. Radhakamal Mukherjee.

স্থানে বৎসরে মাত্র চার মাস কাজ পায়। কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটির মতে কৃষক বৎসরে ২১৬ দিন গড়ে কাজ করে—ইহার মধ্যে ১৮৯ দিন কৃষিকাজ এবং ২৯ দিন অকৃষিগত কাজ করে।

কাজের প্রকৃতি

ভারতীয় কৃষি শ্রমিকের অবস্থা দুর্বিসহ বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ইহারা সারাবৎসর নিয়োগ পায় না, সমাজের নিকট হইতে ন্যায় বিচার পায় না—কৃষিব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা দুর্বলতার উৎস হইল কৃষক। ইহারা কোনোমতে দিন গুজরান করে; যে সব কুটিরে বাস করে সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাসের উপযোগী নয়। ইহারা সমাজের সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশ এবং চিরকাল ধরিয়াই দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া আসিতেছে। যদি কৃষকের আয়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং তাহার অবস্থার উন্নতিবিধান না করা হয় তাহা হইলে কৃষির সকল উন্নতিই অর্থহীন হইয়া দাড়াইবে।

কৃষি শ্রমিকের অবস্থা

কৃষিশ্রমিকের কাজের সময় আইন দ্বারা নির্ধারিত নয়। কাজের সময় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন, বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন, বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। সাধারণতঃ কাজের সময় সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। কখনো কখনো চন্দ্রালোকিত রাত্রেও জলসেচ, শস্যঝাড়া ইত্যাদি কাজগুলি করা হয়। যে সকল কৃষি-মজুর অপরের জমিতে দৈনিক মজুরীতে কাজ করে তাহারা দিনে সাধারণতঃ ৮ ঘণ্টা কাজ করে। ভারতে জোতের আয়তন ক্ষুদ্র এবং অসম্বদ্ধ বলিয়া কাজের সময়ের নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন ব্যাপার। এমন-কি আই. এল. ও. কৃষি-শ্রমের কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ করিয়া কোনো কনভেনসান পাশ করিতে পারে নাই।

কাজের সময়

কৃষিশ্রমিকের কাজের সহিত শিল্পশ্রমিকের কাজের একটি বড় পার্থক্য যে শিল্পশ্রমিক সারাবৎসর কাজ করে কিন্তু কৃষিশ্রমিক ফসলের প্রকৃতি অনুযায়ী বৎসরের কয়েক ঋতুতেই মাত্র কাজ করে। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে পশ্চিমবঙ্গের কোনো গ্রামে কৃষিশ্রমিকেরা সারাবৎসরে মাত্র ২২০ দিন কাজ করে। কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি লক্ষ্য করিয়াছেন যে কৃষি-শ্রমিক অর্ধ বেকারীর অবস্থায় ভুগিতেছে। কৃষিশ্রমিক বড় জোর বৎসরের ছয় মাস কাল কাজ পায় বাকী সময়টায় হস্তশিল্পের কাজ, গরুরগাড়ী চালনা, রাস্তা তৈরী প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে।

অর্ধবেকারী (under employment)

কৃষি মজুরেরা সারাবৎসর কাজ পায় না, এই সমস্যার চেয়েও বড় সমস্যা হইল যে কৃষিকাজ করে তাহার পরিবর্তে যে মজুরি তাহারা পায়—শিল্প শ্রমিকের মজুরীর তুলনায় তাহা অতি অল্প। কৃষিশ্রমিকের মজুরিতে কোনো একরূপতা নাই—ইহা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন, এমন কি একই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন। অনেক অঞ্চলে দেখা যায় যে একই ধরণের কাজের জন্য নিম্নশ্রেণীর বালক ও স্ত্রী-মজুরেরা উচ্চশ্রেণীর বালক ও স্ত্রী-মজুর অপেক্ষা কম মজুরি পায়। কিছু কিছু কাজে, পুরুষের পরিবর্তে স্ত্রী-মজুর নিয়োগ

মজুরি

করা হয় এবং ইহারা পুরুষ অপেক্ষা অধিক দক্ষ হইলেও ইহাদের পুরুষ মজুরের তুলনায় কম মজুরি দেওয়া হয়।

মজুরির হারই শুধু বিভিন্ন নয়—মজুরি দেওয়ার পদ্ধতিও বিভিন্ন। সাধারণতঃ মজুরি টাকার অংকে দেওয়া হইলেও, বহু অঞ্চলে মজুরি হিসাবে টাকার পরিবর্তে সামগ্রী দেওয়ার প্রথা চালু রহিয়াছে। আবার কোথাও কোথাও মজুরির একাংশ টাকায় এবং অপরাংশ দ্রবসামগ্রীর দ্বারা দেওয়া হয়।

কৃষিশ্রমিকদের অতি অল্প মজুরীই তাহাদের জীবনযাত্রার নিচুমানের জন্য দায়ী।

জীবনযাত্রা

কৃষিশ্রমিক মাঠে ছয়মাস কাজ করিয়া যাহা উপার্জন করে তাহার দ্বারা সারা বৎসর জীবনধারণ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। সেই কারণে বৎসরের অপর সময়ে তাহাকে অন্য ধরণের কাজ করিতে হয়।

কৃষি-পরিবারের বাজেট বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় সেখানে ঘাটতি। পারিবারিক বাজেট হইতে আরও দেখা যায় যে শ্রমিকের খাদ্য গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় দিক দিয়াই প্রয়োজনের তুলনায় কম। খাদ্যের ওপরই শ্রমিক সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় করে—তাহার আয়ের ৭০ হইতে ৮৪ ভাগ। দুধ, ঘি, মাংস এই সকল প্রোটিন জাতীয় খাদ্য কদাচিৎ উহারা খাইতে পায়; আয়ের অধিকাংশই খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান বাবদ ব্যয় হইয়া যায় বলিয়া, আরামপ্রদ বা বিলাসদ্রব্য সামগ্রীর উপর ব্যয় করিবার মতো অবশিষ্ট কিছুই থাকে না। কৃষক কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে না ফলে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, উৎসবের সময় বা অসুস্থ হইয়া পাড়লে মহাজনের নিকট হইতে চড়াসুদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হয়। মিসেস হাওয়ার্ড তাঁহার Labour in Agriculture গ্রন্থে যথার্থ ই বলিয়াছেন যে কৃষিশ্রমিকের সমস্যা মজুরি হারের সমস্যা নয়, কাজ পাওয়ার সমস্যা—আদৌ কোনো আয় করিতে পারিবে কিনা তাহাই সমস্যা, কি আয় করিবে তাহা নয় ("The outstanding problem of agricultural workers is not so much rates of wages, as possibility of work, not so much what to earn but whether to earn at all." Mrs. Howard).

ভারতীয় কৃষিশ্রমিকের ঋণের সমস্যা এক বৃহত্তম সমস্যা। কৃষকেরা চিরকালই ঋণগ্রস্ত থাকে। একবার ঋণ করিলে সে ঋণ শোধ করা কৃষকের পক্ষে আর কখনোই সম্ভবপর হয় না। ইহা যথার্থ ই বলা হয় যে ভারতীয় কৃষক ঋণের

কৃষি ঋণ

মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, সারাজীবন ঋণ করিয়া কাটায় এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া মারা যায়। সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির মতানুসারে ভারতীয় কৃষকগণের বৎসরে ৭৫০ কোটি টাকার মত ঋণের প্রয়োজন হয়। কৃষিঋণ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

১৯৪৮ সালে সর্বনিম্ন মজুরী আইন পাশ হয়; এই আইনে কোনো কোনো কৃষি-নিয়োগের জন্য সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু কৃষি-শ্রমিকের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মজুরিমান চালু করা খুবই কঠিন ব্যাপার। দেশের

বিভিন্ন অংশে কৃষিশ্রমিকের মজুরিগত পরিসংখ্যানের অভাব রহিয়াছে। আবার কৃষিকার্যে কাজের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়; কৃষি শ্রমিকের কাজ সাময়িক এবং একই শ্রমিক কৃষিকার্যের বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ করিয়া থাকে। অধিকন্তু মজুরি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকার পরিবর্তে সামগ্রী দ্বারা দেওয়া হয় এবং টাকার অংকে উহাদের মূল্যায়ন করা সব সময় সহজ নয়। সর্বোপরি, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী থাকার ফলে এই আইন কার্যকর করা কঠিন। এই আইন প্রচলন করিতে হইলে উৎপাদনের রেকর্ড থাকা প্রয়োজন কিন্তু অধিকাংশ কৃষকই অজ্ঞ এবং তাহারা তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণগত এবং গুণগত কোনো হিসাবই রাখে না।

কৃষি ও সর্বনিম্ন মজুরি প্রবর্তন

অধিকাংশ রাজ্যেই কৃষিশ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরিহার নির্ধারণ করা হইয়াছে—অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট এলাকাকেই আওতায় আনা হইয়াছে। কেরালা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, দিল্লী এবং ত্রিপুরা—এই রাজ্যগুলির সর্বত্রই কৃষি-শ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরি হার স্থির করা হইয়াছে। অপরপক্ষে, আসাম, অন্ধ্র, বিহার, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, উত্তর প্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশ—এই রাজ্যগুলির নির্ধারিত অঞ্চলেই শুধুমাত্র সর্বনিম্ন মজুরিহার নির্ধারণ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন রাজ্যে সাময়িক পুরুষ-কৃষিশ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরিহার ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এইরূপ ছিল:

অন্ধ্র—Rs. 0·87 হইতে Rs. 2·00; আসাম—Rs. 1·00 হইতে 1·25. (পাঁচ ঘণ্টা কাজের মজুরি); বিহার—মজুরি-হার সামগ্রীর অংকে নির্ধারিত ছিল; কেরালা—Rs. 1·50 হইতে 1·62; উড়িষ্যা—Rs. 0·87 হইতে Rs. 1·00; পাঞ্জাব—Rs. ·75 হইতে Rs. 1·25; পশ্চিমবঙ্গ—Rs. 1·50 হইতে Rs. 2·25. দিল্লী—Rs. 1·50 হইতে Rs. 2·00.

কিছুকাল যাবৎ আই. এল. ও কৃষিশ্রমিকদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিতেছে। বর্তমানে আই. এল. ও. তে একটি স্থায়ী কৃষিকমিটি রহিয়াছে। এই কমিটির সহিত আলোচনায় ভারত সর্বদাই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৪৭ সালে নিউ দিল্লীতে Asian Regional Conference-এ কৃষিতে মজুরি নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন লইয়া আলোচনা হয়। ১৯৫১ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম কনফারেন্সে কৃষিতে মজুরি সমেত ছুটি (Holidays with Pay in Agriculture) লইয়া আলোচনা করা হয়। স্থায়ী কৃষি কমিটি (Permanent Agricultural Committee) এবং আই. এল. ওর (Asian Advisory Committee) কৃষিশ্রমিকের বিভিন্ন সমস্যা লইয়া বহুবার আলোচনায় বসিয়াছে।

আই. এল. ও. এবং কৃষিশ্রমিক

কৃষি-শ্রমিকের অবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক এবং সর্বাঙ্গীন প্রয়াস প্রয়োজন। কৃষির উন্নয়ন, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, কৃষকের বাসস্থানের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিকল্পনা, বয়স্ক শিক্ষার প্রসার, কৃষিঋণের সমাধান, বহুমুখীন সমবায় সমিতি স্থাপন, গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠন ইত্যাদির মধ্যে কৃষকের সমস্যার সমাধান জড়িত আছে।

বিভিন্ন রাজ্যসরকার উল্লিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া কৃষকের মঙ্গলসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। ভূমিহীন-কৃষক এবং যে সকল কৃষকের জমি আর্থিক জোতের আয়তন অপেক্ষা কম তাহাদের প্রয়োজনীয় জমি দিবার নীতি প্রথম পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভূমিহীন-কৃষককে ভূমি প্রদানের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। শ্রমিক সমবায় (Labour Co-operative) গঠনে উৎসাহ দিতে হইবে এবং কৃষিশ্রমিকের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য বিনামূল্যে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভূমিহীন কৃষকের কষ্টের পরিমাণ লাঘব করিবার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনা চার ধরণের কর্মসূচীর প্রস্তাবনা দিয়াছে: (১) কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে; (২) গ্রামীন এলাকায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে; (৩) জমির পুনর্বণ্টন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের মাধ্যমে উপেক্ষিত কৃষি-শ্রমিকের সামাজিক মর্যাদা, দক্ষতা ও উদ্যোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং (৪) গ্রামীন এলাকায় উন্নয়ন ব্যয়ের এক মোটা অংশ কৃষিশ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধনে ব্যয় করিতে হইবে।

উন্নয়ন কর্মসূচী

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-শ্রমিকদের মূল সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে—ভবিষ্যৎ গ্রামীন অর্থনীতিতে উহাদের স্থান এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনা গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য বৃহৎ অংকের টাকা বরাদ্দ করিয়াছে, ইহার ফলে কৃষকের অবস্থারও উন্নতি হইবে। ইহা ছাড়া সেন্ট্রাল এডভাইসারি কমিটি অন এগ্রিকালচার লেবার-এর সুপারিশ অনুসারে ৭ লক্ষ ভূমিহীন কৃষিপরিবারকে ৫০ লক্ষ একর জমিতে পুনর্বাসনের জন্য ব্যবস্থা করা হইবে। রাজ্য-পরিকল্পনাগুলি কৃষি-শ্রমিকের জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছে। ইহা ছাড়া রাজ্যসরকারগুলিকে এই ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। কৃষি-শ্রমিকের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া গ্রামাঞ্চলে নিয়োগ-পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বৎসরের যে সময় কৃষিকার্যের অভাব থাকে সেই সময় এই নিয়োগ পরিকল্পনা (work projects) কার্যকরী করা হইবে। গ্রামে প্রচলিত মজুরি হার অনুসারে মজুরি দেওয়া হইবে। ৩৭টি পাইলট পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই চালু করা হইয়াছে। পরিপূরক জলসেচ ব্যবস্থা, বনপরিকল্পনা, ভূমিক্ষয় নিবারণ, নালা নির্মাণ, পতিত জমির পুনরুদ্ধার এবং যাতায়াতের সুব্যবস্থা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। নিয়োগ পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রথম বৎসরে ১০,০০০ লোকের, দ্বিতীয় বৎসরে ৫০,০০০ লোকের, তৃতীয় বৎসরে দশলক্ষ এবং পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ২৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে এই পরিকল্পনা বাবদ মোট ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান যজ্ঞের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য ভূম্যধিকারীর শুভবুদ্ধির নিকট আবেদন করিয়া ভূমিহীন কৃষককে ভূমিদানে প্রণোদিত করা। কয়েকটি রাজ্যে ভূদান আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত

করিবার জন্য ভূদান-যজ্ঞ আইন পাশ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে এখন কোনো সন্দেহই নাই যে কৃষি-শ্রমিকের সমস্যা উত্তরোত্তর সরকার এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

কৃষি-শ্রমিকের সমস্যা সমাধানই আজ দেশের নিকট বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ। কৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং উহার ফলে মজুরি হার নামিয়া যাইতেছে। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে বড় বড় জোতদারগণই লাভবান হইতেছে এবং জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির ফলে কৃষি-ঋণের বোঝা বাড়িয়া চলিয়াছে। জমির স্বল্পতার জন্য গ্রামের চারণক্ষেত্রের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে বলিয়া দুগ্ধপ্রদায়ী পশুপালন করিয়া আয় বাড়াইবার সুযোগও কমিয়া আসিতেছে; কৃষি-শ্রমিকের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। কৃষি-শ্রমিক সারা বৎসরে ছয়মাস কাজ পায়। গরু-মহিষের সঙ্গে একঘরে একত্র বাস করে; যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে তাহা জীবনধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ফলে সহজেই সে মড়ক, সাহুকর এবং স্বল্প-মজুরিতে বাধ্যতামূলক শ্রমবিক্রয়ের শিকার হইয়া পড়ে। ("Gainfully employed for only six months in the year, housed with cattle and beast of burden, subsisting on starvation diet, he is an easy prey to epidemics, sahukars and forced labour or depressed wages.")

মনে রাখিতে হইবে যে, যতদিন কৃষিশ্রমিকের মধ্যে অসন্তোষ থাকিবে ততদিন পর্যন্ত সে তাহার সর্বশক্তি লইয়া ফসল উৎপাদনে ব্রতী হইবে না। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করিতে না পারিলে দেশের ব্যাপক খাদ্যসমস্যা মিটানো বা বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী বন্ধ করা যাইবে না। শ্রীজগজ্জীবনরামের ভাষায় বলিতে পারি যে, কোন একস্থানে দারিদ্র্য সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ। যে কৃষক খাদ্যোৎপাদনের জন্য দায়ী তাহার দারিদ্র্য উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবেই। উৎপাদনের মানবিক উপাদান উপেক্ষিত হইলে সমগ্র জাতির পক্ষে বিপদের আশংকা থাকিয়া যায়। দীর্ঘদিন উপেক্ষিত এবং নির্লজ্জভাবে শোষিত কৃষিশ্রমিক আজও সহজেই সমাজবিরোধী এবং বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী লোকের শোষণের শিকারে পরিণত হইতে পারে। এই বিপদের আশংকা দূর করিবার জন্য সকল চিন্তাশীল লোকেরই উপলব্ধি করা কর্তব্য যে কৃষকের সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। কৃষকের স্বার্থ আজও যদি উপেক্ষিত হয় তাহা হইলে ইহা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং এমন এক আকার ধারণ করিবে যাহার ফলে সামাজিক কাঠামো শুধু ধাক্কাই খাইবে না—ধ্বংসও হইয়া যাইতে পারে।[1] আমরা আশাকরি সরকারের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক

1. "It should not be forgotten that poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere. The poverty and squalor of the persons who are primarily responsible for the production of agricultural commodities is telling heavily on our production. The human factor necessary for production can be ignored only at the risks of periling the whole nation. The long neglected and shamelessly

পরিকল্পনা, সর্বনিম্ন মজুরি আইন এবং কৃষিশ্রমিক অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে কৃষকের সমস্যার আশু সমাধান হইবে।

কৃষি-শ্রমিক ও তৃতীয় পরিকল্পনা (Agricultural Labour under the Third Five Year Plan) : কৃষিশ্রমিকের প্রধানত দুইটি সমস্যা—ভবিষ্যৎ গ্রামীন অর্থনীতিতে তাহার স্থান এবং কর্মসংস্থান ব্যবস্থা। কৃষি-শ্রমিকদের সামাজিক দুর্দশার কিছু লাঘব হইলেও তাহাদের অর্থ নৈতিক সমস্যা, বিশেষ করিয়া কর্মসংস্থান সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি মূল উদ্দেশ্য হইল গ্রামীন সমাজের সকল লোকের পূর্ণতর কর্মসংস্থান এবং উন্নত জীবনযাত্রার মানের ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থা সফল হইলে কৃষি-শ্রমিক এবং অনুন্নত জাতির লোকেরা সমাজের অন্যান্য লোকের সম-পর্যায়ে আসিতে পারিবে।

কৃষি-শ্রমিকের সমস্যা গ্রাম্য এলাকার বৃহত্তম বেকার এবং অর্ধবেকার সমস্যার একটি অংশ বিশেষ। কৃষি উন্নয়ন ও জলসেচ ব্যবস্থার প্রসারের ফলে উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকার ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন যে গ্রামবাসীদের স্বার্থে সামগ্রিকভাবে যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার সহিত কৃষকের অবস্থার উন্নতিকল্পে এবং গ্রাম উন্নয়নের ফলে যে ব্যাপক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হইতেছে তাহার যথাযোগ্য অংশগ্রহণে সহায়তা করিবার জন্য বিশেষ পরিপূরক কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে।

কৃষি-শ্রমিকের ভূবাসন, বাস্তু হইতে উৎখাতের বিরুদ্ধে রক্ষণ এবং সর্বনিম্ন মজুরি আইনের প্রবর্তন প্রথম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে বিভিন্ন রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় পুনর্বাসন পরিকল্পনা কার্যকরী করেন। কোনো কোনো রাজ্যসরকার বিনামূল্যে বাসগৃহের জন্য স্থান দিবার ব্যবস্থা করেন। কৃষি-উন্নয়ন, জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার, সমষ্টি উন্নয়ন, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার ইত্যাদির ফলে কৃষি-শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রভূত বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন এবং জলসেচের জন্য সরকারী খাতে ১৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতি, গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ, পানীয়জলের সরবরাহ, গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা এবং অনুন্নত জাতির মঙ্গলের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীতও, কৃষিশ্রমিক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির (Central Advisory Committee on Agricultural Labour) সুপারিশ অনুসারে ৫ মিলিয়ন একর জমিতে ৭ লক্ষ কৃষি পরিবারের

exploited agricultural workers to-day form the most vulnerable element in our society, easily and rightly susceptible to exploitation by groups bent on creating trouble and disorder. With a view to ward off this danger, it is incumbent on every thinking person to realise that this problem requires early solution. If further ignored it will go out of hand and assume a proportion enough not only to shock the whole social fabric but to destroy it." Mr. Jagjivan Ram.

বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইবে। রাজ্য-পরিকল্পনাসমূহ ভূবাসনের জন্য ৪ কোটি টাকা ব্যয় করিবে। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে এই ব্যাপারে সাহায্য দানের জন্য ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

কৃষি-শ্রমিকের অসুবিধার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনার সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হইল গ্রামীন এলাকায় কর্ম-পরিকল্পনা (work projects) গ্রহণ। আশা করা যাইতেছে এই কর্মসূচী অনুসারে ২৫ লক্ষ লোকের বৎসরে ১০০ দিনের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। সাধারণতঃ কৃষিবেকারত্বের সময়েই এধরণের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে। জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পতিত-জমির পুনরুদ্ধার, বনসৃষ্টি ভূমি সংরক্ষণ, রাস্তা নির্মাণ, ইত্যাদি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যে ধরণের গ্রামীন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে কৃষি-শ্রমিক তাহাতে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করিবে এবং অপর সকলের সঙ্গে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইবে।

নবম অধ্যায়

কৃষি মূলধন

(Agricultural Finance)

[বিষয়বস্তু : কৃষি মূলধনের প্রয়োজনীয়তা—কৃষিঋণ : কারণ ও প্রতিকার—গ্রাম্য ঋণের উৎস—সর্বভারতীয় কৃষিঋণ—জরিপ কমিটির সুপারিশ—সুপারিশগুলির কার্যে পরিণতি—কৃষি পুনঃঅর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন—জমি বন্ধকী ব্যাংক]

কৃষি মূলধনের প্রয়োজনীয়তা : কৃষি-উৎপাদন ও শিল্পোৎপাদন উভয় প্রকার উৎপাদনের জন্যই মূলধনের প্রয়োজন হয়। বীজ, সার, কৃষিযন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। উৎপাদনে মূলধন যোগানের উৎস হইতেছে দুইটি—একটি সঞ্চয় ও অপরটি ঋণগ্রহণ। কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থা হইতে যে সঞ্চয় সৃষ্টি হয় তাহা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত না হইলেই কৃষককে ঋণ করিতে হয়।

তিন ধরণের কৃষিঋণ

অপর সকল প্রকারের ঋণের মতো কৃষিঋণও তিন ধরণের হয়—স্বল্পমেয়াদী ঋণ, মধ্যমেয়াদী ঋণ এবং দীর্ঘকালীন ঋণ। এক বৎসরের অনধিক কালের জন্য প্রয়োজনএমন ধরণের ঋণকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ বলে। বীজ, সার, কৃষিশ্রমিকের মজুরি বাবদ ঋণ গ্রহণ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ফসল বিক্রয় হইয়া গেলে এই ধরণের ঋণ পরিশোধ করা হয়। কৃষিকার্যের উন্নতি, কৃষিযন্ত্রপাতি, ছোট সেচ পরিকল্পনা ইত্যাদির জন্য যে ধরণের ঋণের প্রয়োজন হয় তাহাকে মধ্যমেয়াদী ঋণ বলে। এই ধরণের ঋণ এক বৎসর হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। জমির

স্থায়ী উন্নতি, মাঝারি ধরণের সেচ প্রকল্প, পতিত জমির পুনরুদ্ধার বা মূল্যবান কৃষিযন্ত্রপাতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হয়। এই ধরণের ঋণ পাঁচ হইতে পনেরো বৎসরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য।

কৃষি-ঋণ (Rural Indebtedness): ভারতীয় কৃষক যুগ যুগ ধরিয়া পুরুষানুক্রমে আকণ্ঠ ঋণে ডুবিয়া আছে। সেই কারণে যথার্থই বলা হয় যে ভারতীয় কৃষক ঋণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, সারা জীবন ঋণ করিয়া কাটায় এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া মরিয়া যায় (Indian cultivator borns in debt, lives in debt and dies in debt)। ভারতীয় কৃষক অবিশ্বাস্য রকমের দরিদ্র তাই তাহাকে প্রায়ই ঋণ করিতে হয়। ঋণ না পাইলে সমস্যার সৃষ্টি হয় আবার ঋণ পাওয়া যাইলে তাহা সমস্যার সমাধান না করিয়া নূতন নূতন নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। টাকার মূল্য (অর্থাৎ সুদ) এতই বেশী যে উহা গ্রহণ করা কৃষকের পক্ষে বিপজ্জনক। ঋণের মধ্যে দিয়া কৃষকের সত্যকারের কোনো মুক্তি নাই। ফরাসী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে, ফাঁসির দড়ি যেমন আসামীকে ঝুলাইয়া রাখে, ঠিক তেমনভাবে ঋণও কৃষককে ঝুলাইয়া রাখে (credit supports the farmer as the hangman's rope supports the hanged).

ঋণের হিসাব

১৯০১ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশনের (Famine Commission) মতানুসারে ঋণের চাপে বোম্বাই-এর শতকরা ২৫ ভাগ কৃষক তাহাদের জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৯১১ সালে স্যার এডোয়ার্ড ম্যাকলাগান হিসাব করেন যে বৃটিশ ভারতের মোট কৃষি-ঋণের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকা। ম্যালকম ডার্লিং-এর হিসাবানুযায়ী ১৯১৮ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৬০০ কোটি টাকা। ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং অনুসন্ধান কমিটির (Indian Central Banking Enquiry Committee) মতে ১৯৩০ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৯০০ কোটি টাকা। ১৯৩৭ সালে রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাবানুযায়ী উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮০০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। যুদ্ধের সময় ফসলের দাম এবং কৃষি মুনাফার বৃদ্ধির ফলে কৃষি-ঋণের পরিমাণ অনেক হ্রাস পায়। রিজার্ভ ব্যাংক রিপোর্টেও বলা হয় যে যুদ্ধের সময় অধিকাংশ কৃষিঋণই পরিশোধ করা হইয়াছিল। সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির মতে বৎসরে ভারতীয় কৃষকগণের ৭৫০ কোটি টাকার মতো ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ভারতের গ্রামবাসীদের মাথাপিছু ঋণ হইল ২১০ টাকা।

সকল দেশের কৃষকই ঋণ করে কিন্তু ভারতের কৃষিঋণ সমস্যার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের বলিয়া উহা দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উৎপাদনশীল ঋণ গ্রহণের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই কিন্তু ভারতীয় কৃষক সব সময় কৃষিকার্য করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করে না। মামলা, মোকদ্দমা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল কাজের জন্যই তাহারা অধিক ঋণ করে। নিম্নে কৃষিঋণের কারণগুলি বর্ণিত হইল:

[এক] কৃষিঋণের প্রধান কারণ কৃষকের **অপরিসীম দারিদ্র্য।** আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইলেই লোক ঋণ করিয়া থাকে। কৃষকের ক্ষেত্রেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ভারতীয় কৃষকের আয় এতোই অল্প যে তাহা তাহার জীবন ধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। কৃষক তাহার জীবনধারণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কৃষিকার্য করিয়া থাকে। এদেশে কৃষক ক্ষুদ্র, খণ্ড এবং অসম্বদ্ধ জমি চাষ করিয়া কোনোরূপে দিন কাটায়। জীবন ধরণের জন্য টাকা খরচ করার পর কৃষকের হাতে কোনোরূপ উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে না। ফলে কোনো বছর অনাবৃষ্টি হইলে (হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রত্যেক চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে একবার অনাবৃষ্টি হইবেই) ঋণ গ্রহণ না করিলে আর কৃষকের কোনো উপায় থাকে না। সারা ভারত গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির মতানুসারে ছোট ছোট কৃষকের ঋণের ৫০% হইল পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য।

কৃষিঋণের কারণসমূহ

[দুই] **পূর্বপুরুষদিগের ঋণের বোঝা** কৃষকের ঘাড়ে চাপানো থাকে। পুরুষানুক্রমিক ঋণ কৃষককে বহুলাংশে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছে। ১৯০০ সালের হিসাবানুযায়ী ৯০০ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ৫০০ কোটির কিছু বেশী ছিল পূর্বপুরুষের চাপানো ঋণভার।

[তিন] কৃষকের **ব্যয়বহুল স্বভাব** তাহার দারিদ্র্য এবং ঋণের জন্য দায়ী। পূজাপার্বণ, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি কারণে কৃষক বহু টাকা ব্যয় করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং তদন্ত কমিটির মতানুসারে খুব কম ক্ষেত্রে কৃষক কৃষি উন্নয়নের জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। স্যার ম্যালকম ডারলিংও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অপব্যবহারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক ওয়াদিয়া এবং মার্চেন্ট ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে কৃষিঋণের কারণ হিসাবে কৃষকের অমিতব্যয়িতা ও বিবাদ প্রবৃত্তিকে দেখাইলে কৃষককে অকারণে অপরাধী করা হইবে এবং সত্য কারণ অনুসন্ধানের অক্ষমতাই প্রকাশ পাইবে।

[চার] কৃষি-ঋণের কারণ হিসাবে এই যুক্তিও দেখান হয় যে ভারতে **ভূমি-রাজস্বের হার অত্যন্ত বেশী** এবং সরকার অসময়ে রাজস্ব আদায় করে ফলে কৃষক ঋণ করিতে বাধ্য হয়। অবশ্য কর-অনুসন্ধান কমিশনের (Taxation Enquiry Commission, 1955) মতে বর্তমানে ভূমি-রাজস্বের ভার অত্যধিক নয়।

[পাঁচ] গ্রাম্য মহাজন অতি উচ্চহারে কৃষককে টাকা ধার দেয়। গ্রাম্য-মহাজন না থাকিলে কৃষক কোনো ঋণ পাইত না। মহাজন সুবিধা বুঝিয়া **চড়া সুদের হারে** টাকা ধার দেয় এবং কৃষক অসহায় অবস্থায় ঐ উচ্চ হারে টাকা ধার করিতে বাধ্য হয়। মহাজনেরা অসাধু প্রকৃতির হইলে অশিক্ষিত কৃষক সহজেই প্রবঞ্চিত হইত। ঋণগ্রাহক হিসাবে কৃষকের ভূমিকা অতি দুর্বল। সে এতই দরিদ্র যে জামিন দেবার তাহার কিছুই থাকে না। তাই কৃষককে ঋণ দিলে মহাজন আসল ফিরিয়া পাইবার ব্যাপারে অনিশ্চিত থাকে এবং সেই কারণে সুদের হারও উচ্চ হইয়া থাকে।

[ছয়] কৃষকের আয়ের স্বল্পতার কারণ ভারতীয় **কৃষিব্যবস্থা মুনাফাহীন।** নানাধরণের শোষণ এবং উৎপাদন হইতে সুরু করিয়া বিক্রয়ব্যবস্থা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে মধ্যস্বত্বভোগীদিগের অস্তিত্বের ফলে কৃষিকার্য আজ মুনাফাহীন পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কৃষিঋণের প্রতিবিধানের মূলতঃ তিনটি পথ—প্রথমতঃ সস্তায় কৃষককে প্রয়োজনীয় ঋণের সরবরাহ করা, দ্বিতীয়তঃ পুরাতন এবং অনুৎপাদনশীল ঋণভার হ্রাস করা এবং তৃতীয়তঃ, কৃষকের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

কৃষিঋণ প্রতিবিধানের জন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করেন:

[এক] ১৮৭৯ সালে দাক্ষিণাত্য কৃষক পরিত্রাণ আইন (Deccan Agriculturits' Relief Act) পাশ করা হয়। এই আইনের সাহায্যে অত্যধিক সুদের হার কমানো হইয়াছিল এবং মহাজনদিগকে হিসাবপত্র রাখিবার জন্য বাধ্য করা হইয়াছিল। পরে ১৯১৮ সালে সুদখোরী আইন (Usurious Loan Act, 1916) পাশ করিয়া সকল ক্ষেত্রে সুদের হার কমানো হয়।

[দুই] ১৮৮৩ সালে জমি উন্নয়ন আইন (Land Improvement Loans Act, 1883) পাশ করা হয়। এই আইনের দ্বারা আবাদী জমির উন্নয়নের জন্য কৃষককে দীর্ঘকালীন ঋণ দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

[তিন] ১৮৮৪ সালে কৃষি-ঋণ আইন (Agriculturists Loan Act, 1884) পাশ করা হয় এবং এই আইনের সাহায্যে কৃষককে চল্‌তি খরচ মিটাইবার জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিবাব ব্যবস্থা করা হয়।

[চার] ১৯০১ সালে পাঞ্জাব জমি হস্তান্তর আইন (The Punjab Land Alienation Act, 1901) পাশ করা হয়। এই আইনের সাহায্যে কৃষিকার্য ব্যতীত অন্য কোনো প্রয়োজনে জমি বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সংকোচ করা হইয়াছিল। এই আইনকে লক্ষ্য করিয়া লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন যে সাইলক জু কৃষকের নিকট হইতে জমির আকারে আর আধ পাউণ্ড মাংস কাটিয়া লইতে পারিবে না। ইহার পর বিভিন্ন রাজ্যে মহাজনী আইন পাশ করিয়া সর্বনিম্ন জোতের আয়তন স্থির করিয়া দেওয়া হয় যাহা কৃষক কোনো কারণেই হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

[পাঁচ] জমির উন্নতি, বীজ ক্রয় প্রভৃতি প্রয়োজনে সরকার কৃষককে অল্প সুদে তাকাভি ঋণ (এককালীন ঋণ) দানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাকাভি ঋণ কোনোদিনই বিশেষ জনপ্রিয় হয় নাই কারণ ঋণগ্রহণের পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল ছিল এবং এই ঋণ প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প ছিল।

[ছয়] গ্রাম্য ঋণের বিরুদ্ধে বিংশ শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান হইল **সমবায় আন্দোলন।** ১৯০৪ সালে ও পরে ১৯১২ সালে সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাশ করা হয়। সমবায়ের ভিত্তিতেই জমিবন্ধকী ব্যাংকের (Land Mortgage Bank) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

[সাত] ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দায় (World Wide Economic Depression) কৃষকদিগের অবস্থা সর্বাপেক্ষ শোচনীয় হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং অনুসন্ধানকমিটির সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশে ঋণসালিসী বোর্ড স্থাপন করা হয়। এই বোর্ডের সাহায্যে কৃষকের পুরুষানুক্রমিক ঋণভার কমাইবার, খাতকের ঋণের পরিমাণ পুনঃ নির্ধারণ করিবার এবং দীর্ঘ কিস্তিতে উহা পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলেই ১৮০০ কোটি টাকা ঋণভার হ্রাস পাইয়া ৯০০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

[আট] কৃষক যাহাতে তাহার জীবন-দর্শন পরিবর্তন করে এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও মামলা মোকদ্দমার জন্য অনর্থক অনুৎপাদনশীল ঋণ গ্রহণ না করে তাহার জন্য শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজন। সমবায় সমিতিগুলি শিক্ষাবিস্তারে কিছু পরিমাণ কাজ করিয়াছে।

ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কৃষকের ঋণের কারণ তাহার উৎপাদনের স্বল্পতা। উৎপাদন বাড়াইয়া কৃষকের আয় বৃদ্ধির মধ্যেই কৃষিঋণ সমস্যার সত্যকার সমাধান নিহিত রহিয়াছে।

গ্রাম্য ঋণের উৎস (Sources of Rural Credit): ভারতে কৃষিঋণ সমস্যা এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কৃষিঋণব্যবস্থা আদৌ সংগঠিত নয় এবং প্রতিষ্ঠানগত ঋণব্যবস্থা মোটেই প্রসার লাভ করেনি। ব্যাঙ্কারের অভাব নাই, কিন্তু ব্যাংক নাই (The people have many bankers but no bank); ঋণগ্রহণ কৃষকের পক্ষে অপরিহার্য কিন্তু যে সকল উৎস হইতে সে ঋণগ্রহণ করে সেগুলি তাহার স্বার্থের পরিপন্থী। ঋণের অপ্রতুলতা এবং অনুপোযোগিতা—ভারতীয় কৃষি-ঋণের এই দুইটিই প্রধান সমস্যা।

সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির মতানুসারে বৎসরে কৃষকদের ৭৫০ কোটি টাকার মতো ঋণের প্রয়োজন হয়। ভারতে কৃষক নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে প্রয়োজনীয় ঋণগ্রহণ করে—পেশাদার মহাজন, কৃষি-মহাজন, আত্মীয়স্বজন, ব্যবসায়ী ও দালাল, সরকার, সমবায় সমিতি, জমিদার, বাণিজ্যব্যাংক প্রভৃতি। গ্রামাঞ্চলে যে ঋণ গৃহীত হয় তাহার শতকরা ৫০% পারিবারিক অর্থাৎ অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয় হয়। কমিটি বলিয়াছেন যে বর্তমানে কৃষিঋণ প্রয়োজনের তুলনায় কম, ইহা ন্যায্য প্রকৃতির নয়, ইহা ন্যায্য উদ্দেশ্য সাধন করে না এবং প্রয়োজনের মানদণ্ডে বিচার করিলে দেখা যায় যে ইহা উপযুক্ত লোকের কাছে কদাচিৎ যায় ("To day the agricultural credit that is supplied falls short of the right quantity, is not of the right type, does not serve the right purpose and by criterion of need often fails to go to the right people.")

কৃষি ঋণের উৎস

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত গডোয়ালা কমিটির রিপোর্ট অনুসারে নিম্নলিখিত বিভিন্ন উৎস হইতে কৃষক কি অনুপাতে ঋণ পাইত তাহা দেখানো হইল:

	উৎস	মোট ঋণের অংশ		উৎস	মোট ঋণের অংশ
১।	পেশাদার মহাজন	৪৪·৮%	৬।	সমবায় সমিতি	৩·১%
২।	কৃষি-মহাজন	২৪·৯%	৭।	জমিদার	১·৫%
৩।	আত্মীয় স্বজন	১৪·২%	৮।	বাণিজ্য ব্যাংক	০·৯%
৪।	ব্যবসায়ী ও দালাল	৫·৫%	৯।	অন্যান্য	১·৮%
৫।	সরকার	৩·৩%			১০০·০

উপরের পরিসংখ্যান হইতে দেখা যাইতেছে যে অদ্যাবধি গ্রামে পেশাদার ও কৃষি-মহাজনগণ প্রভুত্ব করিতেছে; কৃষিঋণের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ ইহারাই যোগান দিয়া থাকে। গ্রাম্য মহাজন কৃষককে স্বল্পকালীন ঋণ দিবার জন্য সকল সময়ই প্রস্তুত আছে। মহাজনদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করার প্রধান অসুবিধা হইল যে ইহারা অত্যধিক সুদের হার আদায় করে।

গ্রাম্য ঋণের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় উৎস হইল ব্যবসায়ী ও তাহাদের দালাল। ব্যবসায়ীগণ ফসল লইয়া কেনাবেচা করিতে গিয়া কৃষককে দাদন দিতে বাধ্য হয় বলিয়া মহাজনী কারবারে তাহারা প্রবেশ করে। ইহাতে অবশ্য কৃষকের সাময়িক সাহায্য হয় এবং দাদন দেওয়াব জন্য কৃষকের উৎপাদিত ফসলের উপর ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক হয়। অনেক সময় এই দাদনের জন্য কোনোরূপ সুদ লওয়া হয় না।

সরকার মোট প্রয়োজনীয় ঋণের একটি সামান্য অংশই সরবরাহ করিয়া থাকে, মাত্র ৩·৩%। নানাকারণে সরকারী ঋণ জনপ্রিয় হইয়া ওঠে নাই। সরকারী ঋণ পরিমাণে কম, বণ্টনের দিক দিয়া অন্যায্য এবং নিরাপত্তার দিক দিয়া অনুপোযুক্ত। ঋণপ্রদান ও ঋণ আদায়ের ব্যাপারে ইহা অসুবিধাজনক ও ব্যয়বহুল, তদারকের দিক দিয়া ইহা দায়িত্বহীন এবং সামঞ্জস্যের দিক দিয়া অসংগঠিত।

সমবায় সমিতিগুলি মোট ঋণের মাত্র ৩·১% সরবরাহ করিয়া থাকে। এই সামান্য ঋণের অধিকাংশ বড় বড় কৃষকেরা পাইয়া থাকে আর ক্ষুদ্র কৃষকেরা অতি নগণ্য অংশ পাইয়া থাকে। ইহার কারণ সমবায় সমিতি হইতে টাকা ধার করিতে হইলে জমি বন্ধক রাখা প্রয়োজন হয়। সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর অভিযানের পরও যে ভারতে সমবায় আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই তাহার প্রমাণ ইহার হাস্যকর রকমের নগণ্য ভূমিকা।

সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ (Recommendations of the All India Rural Credit Survey Committee): অতীতে সমবায় আন্দোলন এদেশে ব্যর্থ হইলেও ইহা তাহার মূল্য হারায় নাই এবং ইহার পুনর্গঠনের মধ্যেই রহিয়াছে কৃষি-ঋণ সমস্যা সমাধানের সত্যকার ইংগিত। এই আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ ভারতে ইহার সঠিক প্রয়োগ হয় নাই। সমবায় আন্দোলনের ভিত্তিভূমিতেই কৃষিঋণ ব্যবস্থার নূতন কাঠামো তৈয়ারী করিতে হইবে। ১৯৫১ সালে রিজার্ভ ব্যাংক সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপকমিটি নিয়োগ করেন এবং ১৯৫৪ সালে এই কমিটি তাহার রিপোর্ট পেশ করেন। সর্বভারতীয় কৃষিঋণ

জরিপ কমিটি একটি সুসম্বদ্ধ গ্রাম্য ঋণ পরিকল্পনা (Integrated Rural Credit Scheme) গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত: প্রথমতঃ সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে সরকারকে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ রাজ্যসরকারগুলি সমবায় সমিতির অংশীদার হইবেন। দ্বিতীয়তঃ সমবায় ঋণ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ সমবায় আন্দোলন প্রসারের জন্য সমবায়সংক্রান্ত শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

এই তিনটি মূলনীতিকে কার্যকরী করার জন্য কমিটি ছয়টি প্রধান ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন।

ছয়টি প্রধান সুপারিশ

প্রথমতঃ সমবায় সমিতির মাধ্যমে **প্রতিষ্ঠানগত ঋণ ব্যবস্থাকে** (institutional credit) সম্প্রসারিত করিতে হইবে। সরকারী ঋণ ত্রুটিপূর্ণ এবং মহাজনের নিকট হইতে উচ্চহারে ঋণগ্রহণ অবাঞ্ছনীয় বলিয়া সমবায়ের ভিত্তিভূমিতে ঋণব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে সমীমদায়ের ভিত্তিতে বৃহত্তর আকারে সংগঠিত করিতে হইবে, উহাদের প্রচলিত নীতির পরিবর্তন করিতে হইবে এবং সমিতিগুলির সকল কাজে রাষ্ট্রের সাহায্য এবং সহযোগিতা থাকিবে যাহাতে ছোট কৃষকেরা সমবায় হইতে সাহায্য পায়। প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি উপরের সমিতি হইতে সাহায্য পাইবে এবং সমবায় ঋণব্যবস্থার প্রসারের ফলে মহাজনের কায়েমী স্বার্থ সংকুচিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ সমবায় ঋণদান সমিতির সহিত অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলির ঘনিষ্ঠ **যোগসূত্র স্থাপন** করিতে হইবে। মহাজনকে কৃষি-ঋণের বাজার হইতে সরাইবার জন্য সমবায় ঋণদান সমিতির সহিত সমবায় বিক্রয় সমিতির সংযোগ সাধন করা প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ কৃষিজ পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য দেশের সর্বত্র সমবায় সমিতির তত্ত্বাবধানে **গুদামঘর নির্মাণের** ব্যবস্থা করিতে হইবে। যখন ফসলের দাম বাড়িয়া যাইবে তখন কৃষক তাহার উৎপাদিত শস্য বিক্রয় করিবে এবং গুদাম ঘরের পরিকল্পনা থাকিলে কমদামে কৃষককে ফসল বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে না, সে প্রয়োজন মত উহা ধরিয়া রাখিতে পারিবে। কমিটি জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং গুদামবোর্ড (National Co-operative ard Warehousing Board) স্থাপনে সুপারিশ করিয়াছেন। এই বোর্ডের হাতে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ফাণ্ড (National Co-operative Development Fund) এবং জাতীয় গুদাম উন্নয়ন ফাণ্ড (National Warehousing Development Fund) নামে দুইটি ফাণ্ড থাকিবে। প্রথম ফাণ্ডটি হইতে রাজ্যসরকারদিগকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে তাহারা সমবায় সমিতির মূলধনের অংশ গ্রহণ করিতে পারে। দ্বিতীয়টি হইতে গুদামঘর নির্মাণের সুবিধার জন্য ঋণদান করা হইবে। পাঁচ কোটি টাকা লইয়া এই দুইটি ফাণ্ড গঠিত হইয়াছে এবং প্রতিবৎসর ইহাদের

পাঁচ কোটি করিয়া টাকা দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া সর্বভারতীয় গুদাম নির্মাণ কর্পোরেশন (All India Warehousing Corporation) এবং রাজ্য গুদাম নির্মাণ কোম্পানী (State Warehousing Companies) স্থাপনের জন্যও কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। গুদাম নির্মাণ কর্পোরেশন প্রধান প্রধান কৃষিকেন্দ্রে মোট ১০০টি গুদাম স্থাপন করিবে। কৃষকগণ সেই গুদামে ফসল জমা রাখিয়া রসিদ গ্রহণ করিবে এবং সেই রসিদ দেখাইয়া ব্যাংক হইতে ঋণ পাইবে।

চতুর্থতঃ, গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট **ব্যাংক স্থাপন** করিতে হইবে এবং উহাদের পরিচালনার সুবিধার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank) স্থাপন করা প্রয়োজন। এই নব গঠিত ব্যাংকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাংকের শতকরা ৫২ ভাগ শেয়ার মূলধন থাকিবে এবং ইহারাই এই ব্যাংকের অধিকাংশ ডিরেক্টার নিযুক্ত করিবেন। কমিটি পূর্বেকার ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে জাতীয়করণের জন্য সুপারিশ করেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে জাতীয়করণ এবং ইহার সহিত পাতিয়ালা ব্যাংক, বরোদা ব্যাংক, জয়পুর ব্যাংক, মহীশূর ব্যাংক ইত্যাদি ব্যাংককে সংযুক্ত করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাংক স্থাপন করিতে হইবে এবং গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে ঋণদান সমিতিগুলি সস্তায় এবং অধিক পরিমাণে ঋণ পাইতে পারে এবং গ্রামের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় একত্র হইতে পারে।

পঞ্চমতঃ, কমিটি বিশেষ ধরণের **তিনটি ফাণ্ড** স্থাপনের নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দুইটি রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে থাকিবে এবং একটি কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রীর দপ্তরে থাকিবে। রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে যে দুইটি ফাণ্ড থাকিবে তাহার মধ্যে একটি হইল জাতীয় কৃষি-ঋণ দান ফাণ্ড (দীর্ঘকালীন) [National Agricultural Credit (Long Term Operation) Fund]. ইহা পাঁচ কোটি টাকা লইয়া স্থাপিত হইবে এবং প্রতিবৎসর ইহাতে পাঁচ কোটি টাকা দেওয়া হইবে। এই ফাণ্ড হইতে রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সরকারগুলিকে সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদার হইবার জন্য ঋণদান করিবে। রাজ্য সরকার এই ঋণের অর্থ কৃষকদিগকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের জন্য সমবায় সমিতির হাতে দিবেন। রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনস্থ দ্বিতীয় ফাণ্ডটির নাম হইল জাতীয় কৃষিঋণ (স্থায়িত্ববিধানকারী) ফাণ্ড [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund]; ইহাতে প্রতি বৎসর এক কোটি টাকা দেওয়া হইবে। দুর্ভিক্ষ, অজন্মা, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় রাজ্য সরকার সমবায় ব্যাংকগুলিকে এই ফাণ্ড হইতে মধ্যমেয়াদী (medium term loans) ঋণ দিবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষিদপ্তরের অধীনে বাৎসরিক এক কোটি টাকা জমা লইয়া জাতীয় কৃষিঋণ (সাহায্য ও গ্যারান্টি) ফাণ্ড [National Agricultural (Relief and Guarantee) Fund] গঠন করিতে হইবে। এই ফাণ্ড হইতে রাজ্য সরকার মারফৎ সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে ঋণ দেওয়া হইবে। দুর্ভিক্ষ, অজন্মা ইত্যাদির পরে বকেয়া ঋণশোধ করিবার জন্য এই ফাণ্ড ব্যবহার করা হইবে। এই তিনটি ফাণ্ডের মিলনের দ্বারা গ্রামাঞ্চলে সুসম্বদ্ধ সমবায় কাঠামো গড়িয়া উঠিবে।

ষষ্ঠতঃ, সুসম্বদ্ধ গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থা গঠন করিতে হইলে প্রয়োজন একদল দক্ষতাসম্পন্ন সহানুভূতিশীল **শিক্ষিত কর্মী**। এই কথা চিন্তা করিয়া কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারীর শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিয়াছেন। ইহাদের শিক্ষার জন্য ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাংকের অধিক পরিমাণ টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন বলিয়া কমিটি ঘোষণা করিয়াছেন।

সুপারিশগুলির কার্যে পরিণতি (Implementation of the Plan) : ভারত সরকার গ্রামীন ঋণকাঠামোর পুনর্গঠনের জন্য সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির সকল প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি গ্রহণ করিয়া কার্যে পরিণত করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে জাতীয়করণ করিয়া উহার ষ্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া নামকরণ করা হইয়াছে। নবগঠিত ষ্টেট ব্যাংকের উপর প্রতিষ্ঠার সময় হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে (অর্থাৎ ১৯৬০ সালের মধ্যে) গ্রামাঞ্চলে মোট ৪০০টি শাখা স্থাপনের ভার দেওয়া আছে। ওই সময়ের মধ্যে ষ্টেট ব্যাংক ৪১৬টি শাখা স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। ১৯৬০ হইতে ১৯৬৫ সালের মধ্যে আরও ৩০০টি শাখা খোলা হইবে। তৃতীয় পর্যায়ে ১৯৬৯ সালের মধ্যে ষ্টেট ব্যাংক আরও ৩১৯টি শাখা খুলিবে।

দ্বিতীয়তঃ, ১৯৫৬ সালে ১০ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া রিজার্ভ ব্যাংক জাতীয় কৃষি ঋণদান (দীর্ঘকালীন) ফাণ্ড [National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund] গঠন করিয়াছে। রাজ্যসরকারগুলি যাহাতে শেয়ার কিনিয়া সমবায় সমিতির মালিকানায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই ফাণ্ড গঠিত হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে জাতীয় কৃষিঋণদান (স্থায়িত্ব বিধানকারী) ফাণ্ড [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] প্রাথমিক দুই কোটি টাকা লইয়া স্থাপিত হয়।

তৃতীয়তঃ, কৃষিপণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৯৫৬ সালে কৃষিপণ্য (উন্নয়ন এবং গুদাম ঘর) কর্পোরেশন [Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act, 1956] আইন পাশ করা হয়। এই আইনের দ্বারা ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং গুদামঘর বোর্ড (National Co-operative Development and Warehousing Board) গঠিত হয় এবং ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় গুদামঘর কর্পোরেশন (Central Warehousing Corporation) স্থাপিত হয়।

চতুর্থতঃ, রিজার্ভ ব্যাংকের সহায়তায় সরকার পুণাতে একটি কেন্দ্রীয় সমবায় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। ইহা কর্মচারীদিগকে সমবায় সংক্রান্ত শিক্ষা দিবে। ইহা ছাড়া সমবায় শিক্ষা দিবার জন্য, পুণা, রাঁচি, মীরাট, মাদ্রাজ এবং ইন্দোরে পাঁচটি আঞ্চলিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ যাবতীয় কৃষিকার্য সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হইতেছে এবং সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির গঠনে সরকার প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিতেছেন।

১৯৫৮ সালে স্যার ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্ট প্রদানের ফলে সমবায় আন্দোলনের গতি মন্থর হয়। তাঁহার মতানুসারে অতীতে সমবায় আন্দোলন সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে নাই এবং এই দুবল ভিত্তির উপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুবৃহৎ কর্মসূচী গড়িয়া তোলা উচিত হয় নাই। তাঁহার মতে সমবায় আন্দোলনের সহিত ষ্টেট ব্যাংকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ না হওয়াই ভালো।

প্রধানমন্ত্রী নেহেরুও বলিয়াছিলেন যে সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব বেশী না থাকাই ভালো এবং গডোয়ালা কমিটির অধিকাংশ সুপারিশ গ্রহণ করিয়া সরকার সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই।

কৃষি পুনঃ-অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন (Agricultural Re-finance Corporation):

কৃষি পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন প্রতিষ্ঠা ভারতীয় কৃষিঋণের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বহুদিন ধরিয়া দেশে এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন ঋণ সরবরাহের জন্য ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে—ঠিক সেইরূপ কৃষির ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে কৃষিপুনঃ অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন স্থাপিত হয়।

ভারতে বৎসরে কৃষির জন্য একহাজার কোটি টাকার মতো স্বল্প মেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হয়। মহাজন এবং সমবায় ব্যাংক কৃষকদিগকে কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী ঋণ দান করে। শুধুমাত্র জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করে কিন্তু কৃষির প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ দিবার আর্থিক সামর্থ এই ব্যাংকগুলির নাই। দীর্ঘকালীন কৃষিঋণ বাজারের এই ত্রুটি দূর করিবে এই কর্পোরেশন। এই প্রতিষ্ঠানটি টাকার বাজারের সহিত কৃষির স্থায়ী সংযোগ স্থাপন করিবে।

কর্পোরেশনের গঠন (Organisation): ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই কৃষি পুনঃঅর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন পাঁচ কোটি টাকা শেয়ার মূলধন লইয়া কাজ সুরু করে এবং ইহার অনুমোদিত মূলধন ২৫ কোটি টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০ হাজার টাকা। প্রারম্ভিক ৫ হাজার শেয়ারের মধ্যে ৫০ ভাগ রিজার্ভ ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, জীবনবীমা কর্পোরেশন, তপশীল ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি কিনিবে। শেয়ার যদি সম্পূর্ণরূপে বিলি না হয় তাহা হইলে অবশিষ্ট শেয়ার রিজার্ভ ব্যাংক কিনিবে। কেন্দ্রীয় সরকার শেয়ারের মূল্য এবং উহার অন্তত শতকরা ৪½% হারে লভ্যাংশের জামিন আছেন। এই ঋণ ২৫ বৎসরের অনধিককালের মধ্যে পরিশোধ্য। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেশনকে আরও পাঁচ কোটি টাকা বিনা সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে দিবেন। এই কর্পোরেশন প্রয়োজন বোধ করিলে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে তাহার আদায়ীকৃত ও সঞ্চিত মূলধনের ২০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

মূলধন

কৃষিপুনঃঅর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা (autonomous body). ইহার প্রধান কার্যালয় বোম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কর্পোরেশনের কার্যভার নয়জন পরিচালক লইয়া গঠিত একটি পরিচালকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। রিজার্ভব্যাংকের কৃষিঋণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহকারী গভর্ণর এই পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি।

কর্পোরেশনের কার্য (Function)ঃ কৃষিউন্নয়ন এবং বৃহৎ কৃষি পরিকল্পনার জন্য এই কর্পোরেশন মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দান করিবে।

মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দান

এই কর্পোরেশন একটি পুনঃ অর্থ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ জমিবন্ধকী ব্যাংক, সমবায় ইত্যাদি কৃষি ঋণদান কাজে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষকদের যে ঋণ দিয়াছে তাহা পূরণ করিবার জন্যই তাহাদের ইহা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিবে। এই ঋণ ২৫ বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে পরিশোধ্য। ইহা প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদের সংস্পর্শে আসিবে না। এই কর্পোরেশন ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণদান করিতে পারে। এই কর্পোরেশন রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া কাজ করিবে। কর্পোরেশনের হিসাব পত্র এবং বিবরণাদি রিজার্ভ ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। প্রয়োজন মনে করিলে কেন্দ্রীয় সরকার অডিটর জেনারেল দ্বারা ইহার হিসাবপত্র পরীক্ষা করাইতে পারিবেন।

এই কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতের কৃষিঋণের ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘকালের অনুভূত অভাব পূরণ হইয়াছে। কৃষিঋণ পুনর্গঠনে সহায়তা করিয়া ইহা কৃষিকে এক নূতনরূপ দিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী কৃষিঋণ সরবরাহে রিজার্ভ ব্যাংকের যে ভূমিকা দীর্ঘকালীন কৃষি ঋণের বাজারে এই কর্পোরেশন সেই ভূমিকা লইবে। নিজে স্বয়ং ঋণ সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করা অপেক্ষা অপরাপর ঋণদান সংগঠনকে শক্তিশালী করিয়া তোলাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনায় তপশীলবহির্ভূত ব্যাংক এবং স্টেট ব্যাংককে কেন গ্রহণ করা হইল না ইহা বুঝিতে পারা যায় না।

জমিবন্ধকী ব্যাংক (Land Mortgage Bank)ঃ—শিল্পের মতো কৃষিতেও স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হয়। সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি কৃষকদিগকে কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী ঋণ যোগান দিতে পারে—দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান করা ইহাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

অদ্যাবধি মহাজনেরাই কৃষকদের সর্বাধিক স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিয়াছে কিন্তু তাহারাও তাহাদের টাকা দীর্ঘকালীন ঋণে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। জমিদারী উচ্ছেদ ও মহাজনী আইনের সংস্কারের দরুণ গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘকালীন ঋণসংগ্রহের বে-সরকারী উৎসগুলি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ১৮৮৩ সালের ভূমি উন্নয়ন ঋণদান আইনানুসারে (Land Improvement Loans Act, 1883) সরকার দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিবার ব্যবস্থা করেন কিন্তু ইহার দুইটি অসুবিধা ছিল—ইহা প্রয়োজনের তুলনায়

অতি অল্প এবং ঋণদান পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল থাকায় ইহা কোনোদিনই জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। এইরূপ অবস্থায় কৃষির স্থায়ী উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহের নূতন উৎসের প্রয়োজন। এই নূতন উৎস হইল জমিবন্ধকী ব্যাংক। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করিয়া জার্মাণীতে, দীর্ঘকালীন কৃষিঋণ সরবরাহ করিবার জন্য পূর্বেই জমিবন্ধকী ব্যাংকের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভারতের কৃষিকমিশন এবং (১৯২৬), সেণ্ট্রাল ব্যাংকিং অনুসন্ধান কমিটি (১৯২৯) সমবায়ের ভিত্তিতে জমিবন্ধকী ব্যাংক স্থাপনের সুপারিশ করেন।

১৯২০ সালে পাঞ্জাবের জাং-এ প্রথম জমিবন্ধকী ব্যাংক স্থাপিত হয়। জমিবন্ধকী ব্যাংক স্থাপনের ব্যাপারে অগ্রণী হইলেও এই ব্যাংক ব্যবস্থা সেখানে সফল হয় নাই। ১৯২৫ সালে মাদ্রাজে জমিবন্ধকী ব্যাংক স্থাপিত হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আসল অগ্রগতি সুরু হয় ওই প্রদেশে ১৯২৯ সালে কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক স্থাপিত হইবার পর হইতে। পরবর্তী বিশ বৎসরে মাদ্রাজে প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাংকের সংখ্যা ১১৯-এ আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯৩৫ সালে বোম্বাই-এ প্রাদেশিক জমিবন্ধকী ব্যাংক স্থাপিত হয় এবং এই আন্দোলনের সফলতা সম্পর্কে সুরুতে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করা হইয়াছিল কিন্তু মাদ্রাজের মত বোম্বাই প্রদেশে এই ব্যাংক ব্যবস্থা তেমন সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। ১৯৬০-৬১ সালে মাদ্রাজে, বোম্বাই, অন্ধ্র এবং অন্যান্য রাজ্যে ১৮টি কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক ছিল। ওই বৎসর সকল রাজ্যে প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ৪৬৩ এবং ইহারা মোট ৭১৭ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছিল।

তিন ধরণের জমিবন্ধকী ব্যাংক

জমিবন্ধকী ব্যাংক সাধারণতঃ তিন ধরণের হইতে পারে—(১) সমবায় ভিত্তিক, (২) আধা সমবায় ভিত্তিক (Quasi-Co-operative) এবং (৩) বাণিজ্য-ভিত্তিক (Commercial type); সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত জমিবন্ধকী ব্যাংক ক্ষুদ্র কৃষকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং অনুসন্ধান কমিটি সমবায়ের ভিত্তিতে জমিবন্ধকী ব্যাংক স্থাপনার সুপারিশ করেন। আধা-সমবায় ভিত্তিতে জমি-বন্ধকী ব্যাংক মূলত সমবায় ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু সদস্য ছাড়াও বাহিরের লোককে মূলধন যোগানে, এবং পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয়। বাণিজ্যভিত্তিক জমিবন্ধকী ব্যাংকের প্রভূত মূলধন থাকে বলিয়া ইহারা বড় বড় জমিদারকে মূলধন যোগান দিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

আমাদের দেশে অধিকাংশ জমিবন্ধকী ব্যাংক সমবায় ভিত্তিতে গঠিত এবং উহারা চারিটি উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করিয়া থাকে। পুরাতন ঋণ পরিশোধ, জমির স্থায়ী উন্নতিসাধন, জমি ক্রয় এবং জমির দায়মোচন। সাধারণতঃ বন্ধকী সম্পত্তির দামের ৫০% পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয় এবং উহা ২০ বৎসরের মধ্যে সমান বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হয়। ঋণগ্রহণকারীর ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা এবং ঋণের উদ্দেশ্য এই দুইটি বিষয় চিন্তা করিয়া ঋণের মেয়াদ এবং পরিমাণ নির্ধারিত

হয়। কৃষকগণ যে জমি বন্ধক রাখিয়া ঋণগ্রহণ করে, ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংক উহাকে নিলামে উঠাইতে পারে।

কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলি সাধারণতঃ সমবায়িক ভিত্তিতে সংগঠিত। ইহারা প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাংক কর্তৃক গঠিত হইয়াছে এবং ইহাদের প্রধান কাজ হইতেছে ডিবেঞ্চার বিক্রয় করা, জনসাধারণের কাছ হইতে আমানত গ্রহণ করা এবং প্রাথমিক ব্যাংকগুলির কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলি সাধারণতঃ দুইভাবে তাহাদের মূলধন সংগ্রহ করে—ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া এবং জনসাধারণের কাছ হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া। রিজার্ভ ব্যাংক এই সকল ডিবেঞ্চারের শতকরা ২০ ভাগ ক্রয় করিয়া এই সকল জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে সাহায্য করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত প্রাদেশিক সরকার ইহাদের ডিবেঞ্চারের উপর গ্যারান্টি দিয়া থাকে।

জমিবন্ধকী ব্যাংকের অগ্রগতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে কয়েকটি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমেই বলিতে হয় যে ইউরোপের দেশগুলির মতো আমাদের দেশে জমিবন্ধকী ব্যাংক আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই। সর্বভারতীয় কৃষি ঋণ জরিপ কমিটিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ যেটুকু উন্নয়ন হইয়াছে তাহাও অসম। প্রধানতঃ মাদ্রাজ এবং অন্ধ্রে এই ধরণের ব্যাংক ব্যবস্থার বিশেষ প্রসার ঘটিয়াছে কিন্তু আসাম পশ্চিমবংগ, রাজস্থান ইত্যাদি রাজ্যে ইহার আদৌ প্রসার ঘটে নাই। জমিবন্ধকী ব্যাংক প্রদত্ত মোট ঋণের শতকরা ৩৩ ভাগ কেবল মাত্র মাদ্রাজ যোগান দিয়াছে। মোট রাজ্য সংখ্যার অর্ধেকে কোনোরূপ জমিবন্ধকী ব্যাংক নাই। তৃতীয়তঃ ইহাদের কাজ প্রধানতঃ পুরাতন ঋণ পরিশোধের ব্যাপারেই নিবদ্ধ ছিল। ইহা দুর্ভাগ্যের কথা যে ইহারা জমির স্থায়ী উন্নতি বিধানের জন্য বিশেষ ঋণ দেয় নাই। ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, ভূমি উন্নয়নের প্রয়োজনে ঋণ দিলে তবেই উহা উৎপাদনশীল ঋণরূপে পরিগণিত হইবে। চতুর্থতঃ জমিবন্ধকী ব্যাংকের ঋণদানের সর্তগুলি বেশ কঠোর এবং সুদের হারও বেশ উচ্চ—৫.৫% হইতে ১০% পর্যন্ত হয়। সুদের হার কম না হইলে ইহা কৃষকদের আয় বৃদ্ধি তথা সত্যকার উন্নতি সাধনে ব্যর্থ হইবে। পঞ্চমত জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলি ছোট আকারের, উহাদের মূলধনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয় বলিয়া অধিকাংশ ঋণের পরিমাণ ৫০০০ টাকার কম। ষষ্ঠতঃ, এই ব্যাংকগুলির পরিচালকগণের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে বলিয়া কৃষকদের ঋণ পাইতে অনেক দেরী হয়। প্রয়োজনের সময়ে ঋণ না পাইলে ঋণ গ্রহণের আসল উদ্দেশ্যই ক্ষুণ্ণ হয়। সর্বশেষে, জমিবন্ধকী ব্যাংকের সহিত অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাজের সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

কয়েকটি ত্রুটি

সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির মতানুসারে জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলি কখনোই অধিকাংশ কৃষকদের স্পর্শ করে নাই। তাহারা ধনী জমিদারদের চাহিদাই

মিটাইয়াছে। সকল ত্রুটি সত্ত্বেও জমিবন্ধকী ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদী কৃষি ঋণ সরবরাহের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে।

সম্প্রতি কৃষিপুনঃ অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন (Agricultural Re-finance Corporation) স্থাপিত হইয়াছে। ইহা কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংককে ঋণদান করিবে।

দশম অধ্যায়

খাদ্য সমস্যা

(Food Problem)

[বিষয়বস্তু : খাদ্য সমস্যার প্রকৃতি—খাদ্য ঘাটতির কারণ—খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায়-সমূহ—খাদ্য উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন—খাদ্য পরিকল্পনা : মেহেতা কমিটির রিপোর্ট—ডেবর কমিটির রিপোর্ট]

সাম্প্রতিক কালে ভারতে খাদ্যসমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। খাদ্যশস্যের মূল্য যে অস্বাভাবিক গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যায় যে খাদ্য পরিস্থিতি দেশে জটিলতর আকার ধারণ করিয়াছে।

১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং তারপর হইতে প্রতি বৎসরই খাদ্য ঘাটতি, বাহির হইতে খাদ্য আমদানী, এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ আমাদের দৃষ্টিকে খাদ্যসমস্যার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। ভারতের মতো কৃষি-প্রধান দেশে খাদ্যসংকট আপাত দৃষ্টিতে উদ্ভট বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু ভারতে এই উদ্ভট এবং অদ্ভুত ব্যাপারই ঘটিয়াছে।

খাদ্য সমস্যার প্রকৃতি (Nature of the Food Problem) : ভারতে খাদ্যসমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া আমরা মোটামুটি ইহার তিনটি দিক লক্ষ্য করিতে পারি—পরিমাণগত দিক, গুণগত দিক এবং বণ্টনগত দিক।

প্রথমতঃ খাদ্যোৎপাদন বর্তমানের অপর্যাপ্ত খাদ্যগ্রহণের ভিত্তিতেই প্রয়োজনের তুলনায় অল্প ; ১৯৬২-৬৩ সালে ভারত ১১৭ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী করে। মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞদিগের মতে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১১ কোটি টনের মতো খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে। আর বর্তমান হারে খাদ্যোৎপাদন বাড়িতে থাকিলে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টনের মতো ঘাটতি দেখা দিবে। বর্তমানের অপর্যাপ্ত খাদ্যগ্রহণের পরিবর্তে মাথাপিছু গড় খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাহাতে সকলেই সুষম খাদ্য (balanced diet) পায়। ইহাই আমাদের চরম লক্ষ্য।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে খাদ্যের যোগানই শুধু প্রয়োজনের তুলনায় অল্প নয় উহা গুণগত বিচারেও নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যবিদেরা বলেন যে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সুষম খাদ্যের জন্য প্রয়োজন দৈনিক ৩০০০ ক্যালোরী খাদ্য গ্রহণ করা। কিন্তু ভারতে জনগণ গড়ে ২১০০ ক্যালোরী সম্বলিত খাদ্যগ্রহণ করিতে পারে মাত্র। মনে রাখা প্রয়োজন যে ইহা গড় হিসাব—অধিকাংশ লোক ১২০০ হইতে ১৫০০ ক্যালোরী অপেক্ষা অধিক খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না। দুধ, ঘি, মাখন, মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রোটিন খাদ্যগ্রহণ প্রয়োজনের তুলনায় অবিশ্বাস্য রকমের কম। সুষম খাদ্যের অভাবে নানাধরণের অপুষ্টিজনিত ব্যাধি, মৃত্যু এবং শ্রমের দক্ষতা কম হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ, খাদ্যসমস্যা শুধুমাত্র খাদ্যের উৎপাদন বা যোগান বৃদ্ধির সমস্যাই নয়—উপযুক্ত বণ্টনব্যবস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। খাদ্যের যোগান বৃদ্ধির সহিত দেখিতে হইবে যে দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিটিও যেন তাহার প্রয়োজনীয় খাদ্য কিনিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা সুদক্ষ হওয়া প্রয়োজন। ব্যবসায়ীরা যাহাতে খাদ্য মজুত করিয়া কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি না করিতে পারে, মজুতদারী বা চোরাকারবারী যাহাতে না চলে তাহার জন্য প্রশাসনিক সততা এবং দৃঢ়তার প্রয়োজন।

খাদ্য ঘাটতির কারণ (Causes of Food Shortage) : খাদ্য সমস্যা বিগত ত্রিশ বৎসরের সমস্যা—ইহা কোনো নূতন সমস্যা নয়। খাদ্য ঘাটতি এবং তজ্জন্য খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা। ১৯৩৮ সালে ডাঃ রাধাকমল মুখার্জী তাঁহার Food Planning For Four Hundred Millions গ্রন্থে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে স্বাভাবিক সময়ে দেশের আভ্যন্তরীণ খাদ্যোৎপাদন হইতে শতকরা ৮৮ জন লোকের খাদ্যের যোগান সম্ভব হইত। বাকী শতকরা ১২ জন লোকের খাদ্য বাহির হইতে আমদানী করা হইত। ১৯৪৮ সালের পর হইতে এই আমদানীর পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়া যায়। বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা ৪৪ কোটির কিছু বেশী এবং সর্বনিম্ন ১৪০০ ক্যালোরী খাদ্যমূল্যের পরিমাপে ত্রিশকোটি লোকের খাদ্য সরবরাহ হইতে পারে অর্থাৎ জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যের যোগান অত্যন্ত কম।

দ্বিতীয়তঃ ১৯৩৬ সালে ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে ১৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা দেয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের ফলে খাদ্যশস্যের যোগানে ঘাটতির পরিমাণ আরও ৭ লক্ষ টন বাড়িয়া যায়। দেশবিভাগের ফলে মোট ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকরা ৮৩ ভাগ লোক ভারতের ভাগে পড়ে কিন্তু ধান জমির শতকরা ৭২.৫ ভাগ এবং গমজমির শতকরা ৭০ ভাগ মাত্র ভারতের ভাগে পড়ে।

তৃতীয়তঃ যুদ্ধের সময় যে মুদ্রাস্ফীতি হয় তাহাতে দেশবাসীর আয় এবং ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। একদিকে যেমন যোগান হ্রাস পায় অপরদিকে তেমন চাহিদাও

বৃদ্ধি পায় ফলে সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে। দাম নিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিং ব্যবস্থার দ্বারা অতিরিক্ত চাহিদা দমন করা হয়।

চতুর্থতঃ চাহিদার তুলনায় যোগান কম হইলেই কালোবাজার এবং মজুতদারীর সৃষ্টি হয়। অধিক মুনাফার লোভে কালোবাজারী এবং মজুতদারগণ খাদ্যশস্য মজুত করিয়া কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যশস্যের সরবরাহে ঘাটতি সৃষ্টির চেষ্টা করে। ইহার ফলে খোলাবাজারে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট খাদ্যশস্য পাওয়া যায় না, দাম অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায় এবং দরিদ্রজনগণ অনাহারের সম্মুখীন হয়।

পঞ্চমতঃ চোরাকারবারীরা গোপনে গোপনে ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য পূর্বপাকিস্তানে লইয়া যাইতেছে, ইহাও খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির একটা কারণ। ইহা ছাড়া প্রাকৃতিক কারণ তো রহিয়াছেই। অনাবৃষ্টি এবং প্লাবনের ফলে স্থানে স্থানে ফসল নষ্ট হওয়ায় খাদ্যশস্যের যোগান হ্রাস পাইয়া সংকট বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে।

ষষ্ঠতঃ, ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে। ১৯২১ সালে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল ১১১ সেন্ট, ১৯৫১ সালে ইহা ৮৪ সেন্টে আসিয়া দাঁড়ায়। বর্তমানে ইহা আরও কম। মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম হওয়ার সাথে সাথে যদি উন্নত কৃষি পদ্ধতিতে জমিচাষ করা হইত তাহা হইলে খাদ্যশস্যের যোগানে ঘাটতি দেখা দিত না কিন্তু কৃষির উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রথম পরিকল্পনার পূর্বে হয় নাই। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে জনসংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২০ ভাগ মাত্র। ১৯৪১-৫১ এই দশ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৩·৪% হারে কিন্তু খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র ৩·২% হারে।

খাদ্যসমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া **খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি (Food Grains Enquiry Committee, 1957)** বলিয়াছেন যে চাহিদা ও যোগান উভয়শক্তির প্রতিক্রিয়াতেই বর্তমানে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ উন্নয়নমূলক কাজ চলিতেছে, ঘাটতি ব্যয় ও বৈদেশিক ঋণের সহায়তায় বিপুল মূলধন লগ্নী করা হইয়াছে আর ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে। জনসাধারণের আয় বাড়িয়া গিয়াছে, লোকের খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস পরিবর্তিত হইয়াছে কিন্তু খাদ্যোৎপাদন অনুপাতিক হারে বাড়ে নাই সেই কারণে মূল্যস্তর স্বভাবতই বাড়িয়া যাইবে।

খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি

খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ (Measures to Solve Food Problems): পরিকল্পনাধীন সময়ে গৃহীত ব্যবস্থাবলী ছাড়া খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায়গুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) অধিক খাদ্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা (২) বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করা এবং (৩) খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে কণ্ট্রোল এবং রেশনিং প্রথা চালু করা।

[এক] **অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন (Grow More Food Campaign)** ঃ ১৯৪৩ সালে সরকার এই আন্দোলন স্বরু করেন। এই আন্দোলনকে মোটামুটি দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়—প্রথম পর্যায় (১৯৪৩—১৯৪৭) এবং দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৪৯—অদ্যাবধিকাল) ; প্রথম পর্যায়ের উদ্দেশ্য ছিল খাদ্যের ফলন বৃদ্ধি করা আর দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্য হইল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা। প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনে সেচ সম্প্রসারণ, পতিত জমির উদ্ধার, বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের পরিবর্তে খাদ্য ফসলের উৎপাদন করা, উন্নত বীজ, সার ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এই উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্য করেন। কিন্তু আন্দোলনের এই পর্যায়ে কোনো উৎপাদন লক্ষ্য (target) ধার্য হয় নাই। ১৯৪৬ সালে এই আন্দোলনকে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে পরিচালনা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সর্বভারতীয় খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য ৪০ লক্ষ টনে ধার্য করা হয়। কিছু কিছু ব্যাপারে এই আন্দোলন ফলপ্রসূ হইলেও, এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করে নাই। সেইজন্য সরকার ১৯৪৭ সালে একটি খাদ্যশস্য নীতি কমিটি (Food Grains Policy Committee, 1947) নিযুক্ত করেন। এই কমিটি খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষুদ্র জলসেচ পরিকল্পনা, সার উৎপাদন, সমবায় ও পঞ্চায়েৎ গঠনের সুপারিশ করেন। সরকার লর্ড বয়েড ওরকে (Lord Boyd Orr) পরামর্শদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

এই আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকার একজন প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্যউৎপাদন কমিশনার নিযুক্ত করেন। সকল রাজ্য সরকারই খাদ্য ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ক্যাবিনেটে সাবকমিটি গঠন করেন। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ইহার লক্ষ্য হইল ১৯৫১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছিল ঃ (১) ক্ষুদ্র জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য পুষ্করিণী, কূপ ইত্যাদি খনন ; (২) সারের যোগান বৃদ্ধি (৩) উন্নত বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং (৪) পতিত জমি উদ্ধার করিয়া চাষের আয়তন বৃদ্ধি করা। ১৯৭৯-৫০ সাল হইতে পরবর্তী সাত বৎসরে ত্রিশ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধার করিয়া তাহাতে চাষের প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর অর্গানাই-জেশন এক কর্মসূচী প্রস্তুত করেন এবং “অধিক খাদ্য ফলাও” আন্দোলনের অংগ হিসাবে উহাকে কার্যকরী করা হয়।

এই আন্দোলনও আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলির জন্য। প্রথমতঃ উন্নত বীজ, এবং সারের যোগান প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত ছিল। দ্বিতীয়তঃ এই আন্দোলনের ঘনঘন উদ্দেশ্য পরিবর্তনও ইহার সফলতার পথে একটা বড় বাধাস্বরূপ। প্রথমে বলা হইয়াছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা, পরে উহা পরিবর্তন করিয়া খাদ্য, তূলা এবং পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির এক সুসম্বন্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তৃতীয়তঃ, সমস্ত

আন্দোলনটাই সাময়িক এবং অস্থায়ী কর্মসূচীর ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছিল এবং সেইজন্য এই কর্মসূচীকে কার্যকর করার দায়িত্ব অনভিজ্ঞ এবং অযোগ্য কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত হয়।

পরিশেষে ভি. টি কৃষ্ণমাচারী কমিটির মতে (Krishnamachari Committee, 1952). এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি যে ইহা লক্ষ্য করে নাই যে গ্রাম জীবনের সকল সমস্যাই পরস্পরসংশ্লিষ্ট এবং বিচ্ছিন্নভাবে কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। এই আন্দোলন গ্রামবাসীর মনে সাড়া জাগাইতে পারে নাই বলিয়াই ইহা ব্যাপকভাবে জন সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। এই কমিটি খাদ্য আন্দোলনের সহিত যুক্ত করিয়া গ্রাম সম্প্রসারণ সেবা (Rural Extension Service) প্রবর্তনের সুপারিশ করেন এবং তদনুসারে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার (National Extension Service) সৃষ্টি হয়।

[দুই] খাদ্য আমদানী (Import of Food Grains) : খাদ্য সংকটের দুই ধরণের সমাধানের কথা চিন্তা করা যায়—স্বল্পকালীন বা অস্থায়ী এবং দীর্ঘকালীন বা স্থায়ী সমাধান। কৃষির উন্নতিবিধান করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা যে সমাধান তাহা স্থায়ী সমাধান। কিন্তু আভ্যন্তরীণ উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত হইলেই তৎক্ষণাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয় না। আশু প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। ভারত ১৯৪৮ সালে ২৮ লক্ষ টন, ১৯৫১ সালে ৫৩ লক্ষ টন এবং ১৯৫২ সালে ৭০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করে। মেহতা কমিটিও বলিয়াছেন যে আগামী কয়েক বৎসর ভারতকে বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর ২০ হইতে ৩০ লক্ষ টন খাদ্য শস্য আমদানী করিতে হইবে। ১৯৬২-৬৩ সালে ১১৭ কোটি টাকার খাদ্য শস্য আমদানী করা হয়। বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হইয়া যাইতেছে। খাদ্যশস্যের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় সমর্থনযোগ্য নয় কারণ উহার পরিবর্তে মূলধনী দ্রব্য ক্রয় করা এবং দেশের শিল্পোন্নতি দ্রুততর করা যাইতে পারিত।

[তিন] খাদ্য নিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিং (Food Control and Rationing) যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশী হইলেই দাম নিয়ন্ত্রণ এবং বরাদ্দ ব্যবস্থার প্রবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। খাদ্যের মতো জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য সামগ্রী যাহাতে দরিদ্রতম লোকেরও ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে তার জন্য দাম নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন আর অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিরা যাহাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য ক্রয় না করিতে পারে তাহার জন্য রেশনিং প্রথা চালু করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র দাম নিয়ন্ত্রণ করিলেই চলিবে না, দেখিতে হইবে, যে ব্যক্তির নিকট দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যটির চাহিদার তীব্রতা সবচেয়ে বেশী সে যেন উহা লাভে অসমর্থ না হয়। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সকলেই খাদ্য দ্রব্য পায় এবং অত্যধিক চাহিদা দমিত থাকে। ১৯৫৪ সালে রেশনিং ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়া হয় কিন্তু পরে তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে খাদ্য সংকট চরম আকার ধারণ করায় উহা পুনরায় প্রবর্তন করা হইয়াছে।

খাদ্য উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ণ (Food Production and Economic Development) : দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে খাদ্যসংকট এক বিরাট বাধাস্বরূপ। দেশবিভাগ, কৃষিপদ্ধতির অনমনীয়তা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং একর প্রতি উৎপাদনের স্বল্পতা প্রভৃতি কারণে খাদ্যসংকট চরম আকার ধারণ করিয়াছে। জনগণের নিম্ন জীবনযাত্রার মানের মধ্যেই খাদ্যসংকটের বীজ লুকাইয়া রহিয়াছে। জনগণের সামান্য আয় বৃদ্ধি পাইলে খাদ্য শস্যের চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে যে আয় বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা সঞ্চয়ে সাহায্য না করিয়া খাদ্যশস্যের উপর ব্যয়িত হইতেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে অধিকতর নগরীকরণের (urbanisation) ফলে অধিক হারে খাদ্য শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। যখন গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া লোকেরা শহরের কল কারখানায় কাজ করিতে আসে তখন অধিক পরিমাণে খাদ্য শহরে পাঠানো প্রয়োজন। এই লোকগুলি গ্রামে যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিত, আয় বৃদ্ধির জন্য শহরে তদপেক্ষা অধিক খাদ্য গ্রহণ করিবে। স্তরাং অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে আর যদি চাহিদার অনুপাতে খাদ্যের যোগান না বাড়ে তাহা হইলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে। ভারতে ঠিক এই অবস্থাই ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ খাদ্যের যোগান অপেক্ষা চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা বিদেশ হইতে ২০-হইতে ৩০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করিতে বাধ্য হইতেছি; ইহার ফলে যে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হইতেছে তাহা মূলধনী দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হইলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হইতে পারিত।

খাদ্য পরিকল্পনা—মেহেতা কমিটির রিপোর্ট (Food Plan—Report of the Mehta Committe) : খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান ও ইহার প্রতিবিধান নির্দেশ করিবার জন্য ১৯৫৭ সালে সরকার শ্রীঅশোক মেহেতার সভাপতিত্বে খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি (Foodgrains Enquiry Committee) নিযুক্ত করেন। এই কমিটি ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসেই রিপোর্ট পেশ করেন। খাদ্যসমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া কমিটি বলিয়াছেন যে চাহিদা ও যোগান উভয় শক্তির প্রতিক্রিয়াতেই বর্তমানে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ উন্নয়নমূলক কাজ চলিতেছে, ঘাটতি ব্যয় ও বৈদেশিক ঋণের সহায়তায় বিপুল মূলধন বিনিয়োগ করা হইতেছে আর ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ (1) জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি (2) লোকের খাদ্যগ্রহণের পরিবর্তিত অভ্যাস (3) কৃষির অনগ্রসরতা এবং (4) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নলিখিতরূপ :

[এক] পরিকল্পনাকালে যাহাতে মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব রক্ষা করা যায় সেইজন্য কমিটি মূল্যস্থিতিকরণ বোর্ড (Price Stabilisation Board) নামে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা গঠনের সুপারিশ করিয়াছে। এই সংস্থাটি কিছুকাল পর পর দেশের

মূল্যন্তর সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবে এবং কিভাবে মূল্যস্তর স্থির রাখা যায় তাহা নির্দেশ দিবে।

[দুই] কমিটি খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংস্থা (Foodgrains Stabilisation Organisation) নামে অপর একটি সংগঠন স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। এই সংগঠনটি খাদ্যশস্যের একটি মজুত ভাণ্ডার (buffer Stock) স্থাপন করিবে এবং খাদ্যশস্য কেনাবেচার কাজ চালাইয়া খাদ্যশস্যের দাম স্থির রাখিবে। খাদ্যশস্যের দাম বাড়িলে এই সংগঠনটি তাহার মজুত খাদ্যশস্য ন্যায্যদামে বাজারে বিক্রয় করিবে, আবার বাজারে খাদ্যশস্যের দাম অস্বাভাবিকরূপে হ্রাস পাইলে বাজার হইতে খাদ্যশস্য ক্রয় করিবে—এইভাবে দামের উঠানামা বন্ধ করা সম্ভবপর হইবে; এই সংস্থাটির মজুতের পরিমাণ হইবে ২০ লক্ষ টন।

[তিন] উপরোক্ত সংস্থা দুইটিকে সাহায্য করিবার জন্য কমিটি কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদান কাউন্সিল (Central Food Advisory Council) এবং মূল্য সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহ বিভাগ (Price Intelligence Division) স্থাপনের নির্দেশ দিয়াছেন। প্রথম সংস্থাটি মূল্যস্থিতিকরণ বোর্ডকে খাদ্যনীতি সম্পর্কে পরামর্শদান করিবে ও দ্বিতীয় সংস্থাটি মূল্যসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করিবে।

[চার] খাদ্যের ব্যাপারে অবাধবাণিজ্য বা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কোনোটাই খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না বলিয়া কমিটি পূর্ণ কণ্ট্রোলের পক্ষপাতী নন আবার অবাধ বাণিজ্যও সমর্থন করেন না; মধ্যপন্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন। খাদ্যশস্যের বিক্রেতামাত্রকেই লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। এই লাইসেন্স প্রদানের একটি সর্ত হইবে যে বিক্রেতাগণ প্রত্যেক পনেরো দিন অন্তর একবার করিয়া কর্তৃপক্ষকে তাহাদের মজুত, বিক্রয় এবং ক্রয়ের হিসাব দিবে।

কমিটি রেশনিং ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তনের পক্ষপাতী নয় কিন্তু যে সকল স্থানে খাদ্যশস্যের যোগানে ঘাটতি আছে সেই সকল অঞ্চলকে ঘাটতি বলিয়া চিহ্নিত করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে দ্রুত খাদ্যসরবরাহ করিতে হইবে। উত্তরপ্রদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলাকে ঘাটতি অঞ্চলরূপে নির্দিষ্ট করিবার কথা কমিটি বলিয়াছেন।

[পাঁচ] খাদ্য বণ্টন প্রচলিত ন্যায্যমূল্যের দোকান (Fair Price Shop) সমবায় বিক্রয়কেন্দ্র প্রভৃতির মাধ্যমে করিতে হইবে। ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে বিনালাভে (no profit no loss basis) খাদ্যশস্য বিক্রয় করিতে হইবে এবং বিশেষ কয়েক শ্রেণীর লোকদিগকে অপেক্ষাকৃত কমদামে (subsidised prices) খাদ্যশস্য সরবরাহ করিতে হইবে। বড় শহরে উৎপাদন হ্রাস পাইলে বা আমদানীর পরিমাণ কমিয়া গেলে, সেই শহরকে কর্ডন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে উহার চাহিদা অন্যান্য অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ঘটাইতে না পারে।

[ছয়] কমিটির মতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার পরও দেশে খাদ্য ঘাটতি থাকিবে এবং প্রতিবৎসর ২০ হইতে ৩০ লক্ষ টাকা খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইবে।

[**সাত**] খাদ্যসমস্যা দেশের এক দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা বলিয়া কমিটি খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। উন্নয়নমূলক কার্য চলা কালে মূল্যস্তর অবশ্যম্ভাবীরূপে বাড়িবে বলিয়া ধীরে ধীরে এবং পরিকল্পিত পদ্ধতিতে পাইকারী খাদ্যের বিক্রয়ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্রীকরণ করা প্রয়োজন (progressive and planned socialisation of all wholesale trade in food grains).

[**আট**] সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হিসাবে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

ভারত সরকার কমিটির সকল সুপারিশ গ্রহণ করেন নাই। মূল্য স্থিতিকরণ বোর্ড এবং খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংস্থা প্রভৃতি স্থাপন করা হয় নাই। অবশ্য সরকার কমিটির সাময়িক সুপারিশগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে প্রবর্তনের সুপারিশ আংশিকভাবে গৃহীত হইয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে ভারত সরকার ২৫ কোটি টাকার একটি ফাণ্ড খুলিয়াছেন এবং ইহার অর্থ খাদ্যশস্য সরবরাহে ব্যয়িত হইবে। ইহাছাড়া রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের যাবতীয় ব্যাংকগুলিকে নির্দেশ দিয়াছে যে খাদ্যশস্য মজুত করিবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যবসায়ী ব্যাংক হইতে ঋণ চাহিলে তাহাকে যেন ঋণ না দেওয়া হয়।

ঢেবর কমিটির রিপোর্ট (Report of the Dhebar Committee) : ১৯৬৪ সালে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রী ইউ. এন. ঢেবরকে সভাপতি করিয়া ভারতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্প্রসারণের উপায় নির্ধারণের নির্দেশ দিতে বলা হয়। এই কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি হইল :

(১) আগামী দুইবৎসরের মধ্যে খাদ্যশস্য সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনিতে হইবে।

(২) যে সব রাজ্যে চাল প্রধান খাদ্য সেই সকল রাজ্যের চাল কলগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনিতে হইবে।

(৩) খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ীদের শস্যের ক্রয়মূল্য এবং বিক্রয়মূল্য প্রকাশ্য স্থানে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।

(৫) খাদ্যশস্যের মজুতদারী এবং মুনাফাকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিরাজ্যে একটি করিয়া সংস্থা গঠন করা প্রয়োজন।

(৬) দেশে ন্যায্য মূল্যের দোকান এবং ক্রেতা সমবায় সমিতির ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

একাদশ অধ্যায়

ভারতে সমবায় আন্দোলন

(Co-operative Movement in India)

[বিষয়বস্তু : সমবায়ের উদ্দেশ্য ও সংজ্ঞা—ভারতে সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—বর্তমান অবস্থা—সমবায়ের গঠন—সমবায় কৃষি-ঋণদান সমিতি—কৃষি সমবায় অ-ঋণদান সমিতি—অ-কৃষি ঋণদান সমিতি—অ-কৃষি অ-ঋণদান সমিতি—সমবায় ব্যাংক ব্যবস্থা: কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক : রাজ্য সমবায় ব্যাংক—বহু উদ্দেশ্য সাধক সমবায় সমিতি—সমবায় আন্দোলনের মূল্যায়ন—সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ—নির্দেশিত প্রতিবিধান—রাজ্য ও সমবায় আন্দোলন—পরিকল্পনাধীন সময়ে সমবায় আন্দোলন—সেবা সমবায় সমিতি]

সমবায়ের উদ্দেশ্য ও সংজ্ঞা (Definition and Objects of Co-operation) : ধনীব্যক্তির শোষণ হইতে দরিদ্র জনগণকে রক্ষার জন্য ইউরোপে প্রথম সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ইহা মূলতঃ দরিদ্র শ্রমিক এবং কৃষকদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই পদ্ধতির দ্বারা দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা ধনিক, বণিক, মালিক এবং মহাজনের কবল হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারিবে। ভারতে সমবায় আন্দোলন বিংশ শতাব্দীর আন্দোলন। ব্যবসায় সংগঠনের যে সকল রূপ আছে সমবায় সংগঠন তাহার অন্যতম।

সমবায়ের নানাভাবে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে: আই. এল. ও. এইভাবে সমবায়ের সংজ্ঞা দিয়াছে: সমানাধিকার এবং সমদায়িত্বের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতি দরিদ্রজনগণের সংগঠন। সদস্যগণ তাহাদের যে সকল সাধারণ অর্থনৈতিক প্রয়োজন তাহাদের একক এবং বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় মিটাইতে পারে না তাহা সমবায়ের উপর ন্যস্ত করে এবং সকলে মিলিয়া প্রত্যেকের আর্থিক এবং নৈতিক স্বার্থে উহা পরিচালনা করে।[1]

সমবায়ের সংজ্ঞা

মিষ্টার ক্যালভার্ট বলেন যে কয়েকজন লোক যখন তাহাদের আর্থিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে সাম্যের ভিত্তিতে এবং স্বেচ্ছায় মিলিত হয় তখন সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই দরিদ্র এবং দুর্বল ব্যক্তিগণ ধনীব্যক্তিদের মতো সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে পারে। সমবায়ের আদর্শ উন্নত জীবন, উন্নত কৃষি এবং উন্নত ব্যবসায় (better living, better farming and better business.)

1. "A co-operative society is an association of the economically weak who, voluntarily associating on the basis of equal rights and equal responsibility, transfer to an undertaking one or several of their economic needs which are common to them all, but which each of them is unable fully to satisty by his own individual efforts and manage and use such undertakings in mutual collaboration to their common material and moral advantage."

সমবায় সমিতির এই বৈশিষ্ট্যগুলি রহিয়াছেঃ (১) দারিদ্র্যের পীড়নই সমবায় আন্দোলনের মূল কারণ (২) ইহা দরিদ্র ব্যক্তিগণের সংগঠন (৩) ইহা সাম্যের ভিত্তিতে গঠিত—মূলধন মালিকানার ভিত্তিতে নয় (৪) সদস্যগণ স্বেচ্ছায় সমিতিতে যোগদান করিবে এবং স্বেচ্ছায় সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবে, এবং (৫) সদস্যদের আর্থিক উদ্দেশ্য সাধন ইহার লক্ষ্য।

বৈশিষ্ট্য

সংকীর্ণ অর্থে সমবায় বলিতে একধরণের ব্যবসায় সংগঠন বুঝায় যাহা পরস্পরকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে—মুনাফা সর্বাধিক করার উদ্দেশ্যে নয়—সংগঠিত হয়। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে উৎপাদকের মূল লক্ষ্য থাকে মুনাফা সর্বাধিক করার প্রতি। কিন্তু সমবায় সমিতির সদস্যগণ অন্য উদ্দেশ্যে মিলিত হন। তাহাদের উদ্দেশ্য নিজেদের আর্থিক এবং নৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করা। মূলধনের স্বল্পতার জন্য দরিদ্র ব্যক্তিগণ যৌথ মূলধন কারবার গঠন করিতে পারে না বলিয়া সমবায় সমিতি তাহাদের বিশেষ উপযোগী।

সমবায় সমিতি বহুবিধ উদ্দেশ্যে সংগঠিত হইতে পারে। প্রথমতঃ খুচরা বিক্রয় পরিচালনার জন্য সাধারণ ক্রেতারা এই ধরণের সমিতি গঠন করিলে তাহাকে ক্রেতা সমবায় সমিতি (Consumers' Co-operative Society) বলে। দ্বিতীয়তঃ কোন দ্রব্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উৎপাদকেরা উৎপাদক সমবায় সমিতি (Producers' Co-operative Society) গঠন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ কাঁচামাল অথবা যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্য বা সদস্যদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য পাইকারী সমবায় সমিতি স্থাপিত হইতে পারে। চতুর্থতঃ অর্থসংগ্রহ এবং সদস্যদের প্রয়োজনের সময় ধার দিবার উদ্দেশ্যেও সমবায় সমিতি স্থাপিত হইতে পারে। ভারতে এই ধরণের সমবায় সমিতির সংখ্যাই অধিক।

সমবায়ের বহুবিধ উদ্দেশ্য

ভারতে সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (A Short History of the Co-operative Movement in India)ঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ভারতে এই আন্দোলন সুরু হয়। ওই সময় পাঞ্জাব এবং যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদিগকে ঋণ দিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি ঋণের প্রতিবিধান হিসাবে ভারতে এই আন্দোলন সুরু হয়। এই সময় মাদ্রাজ সরকার স্যার ফ্রেডরিক নিকলসন (Sir Fredrick Nicholson) নামে একজন সিভিলিয়ানকে জার্মানীতে আন্দোলন সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য পাঠান। নিকলসন ১৮৯৭ সালে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন এবং তিনি এদেশে রাইফিজেন ধরণের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। ১৯০১ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন গ্রাম্য এলাকায় সমবায় সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯০১ সালে সরকার সমবায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিয়োগ করেন এবং অবশেষে ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান সমিতি আইন (Co-operative Credit Societies Act) পাস হয়। এই আইন ভারতে সমবায় আন্দোলন প্রসারের ভিত্তি স্থাপন করে।

রাইফিজেন ধরণের সমবায় সমিতি

সমবায় ঋণদান সমিতি আইনে শুধুমাত্র ঋণদানের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি প্রধানতঃ দুই ধরণের—রাইফিজেন আদর্শে গঠিত গ্রাম্য সমবায় ঋণদান সমিতি এবং সুলজে ডেলিৎস আদর্শে গঠিত নগর সমবায় ঋণদান সমিতি। রাইফিজেন (Raiffeisen) এবং সুলজে ডেলিৎস (Schultze-Delitsch) ইঁহারা দুইজন জার্মানীর সমাজ সংস্কারক। ইঁহারা যে ধরণের সমবায় সমিতি গঠনের নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের নামানুসারে পরিচিত। রাইফিজেন সমিতি সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে সংগঠিত হয়। ইহা পরিচিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত এবং সদস্যদের দায় অসীম। অপরপক্ষে সুলজে ডেলিৎস ধরণের সমিতিগুলি নগরাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠিত হয়। ইহাতে অপরিচিত ব্যক্তিগণও সদস্য হইতে পারে এবং সদস্যদের দায় সসীম।

১৯০৪ সালে সমবায় আইন পাশ হইবার পর হইতে দ্রুতগতিতে সমবায় সমিতির প্রসার ঘটে। ১৯১২ সালে সমবায় সমিতির সংখ্যা ১০,০০০-এ আসিয়া দাঁড়ায়। এইসময় কতকগুলি অসুবিধাও দেখা দিতে থাকে। ঋণদান ছাড়াও অন্যান্য ধরণের বায় সমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কিন্তু ওই আইনের মাধ্যমে অ-ঋণদান সমিতি (Non-credit Society) গঠন সম্ভব ছিলনা। ইহা ছাড়া প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠনের কোনো ব্যবস্থা ওই আইনে ছিল না। এই সকল অসুবিধা দূরিকরণের জন্য ১৯১২ সালে সমবায় সমিতি আইন (Co-operative Society Act, 1912) পাশ করা করা হয়। সমবায় বিক্রয় সমিতি, সমবায় গৃহ নির্মাণ সমিতি প্রভৃতি অ-ঋণদান সমিতি গঠনের ব্যবস্থা এই আইনে করা হয়। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ব্যাংক স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয়তঃ এই আইনে গ্রাম্য এবং নগরাঞ্চলের সমবায় সমিতির মধ্যে যে অবৈজ্ঞানিক শ্রেণীকরণ ছিল তাহা বিলোপ করিয়া নূতনভাবে সসীমদায় সমিতি এবং অসীমদায় সমিতি—এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। কৃষি ঋণদান সমিতিগুলি অসীম দায়ের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং অন্যান্য সমিতিগুলি উভয়বিধ নীতির যে কোনটি অনুসরণ করিতে পারে।

সমবায় সমিতি আইন ১৯১২

১৯১২ সালে সমবায় সমিতি আইন পাস হইবার পর হইতে এই আন্দোলন বিভিন্ন দিকে প্রসারলাভ করে এবং সরকার ১৯১৪ সালে আন্দোলনের অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ম্যাকলাগান কমিটি (Maclagan Committee) নামে এক কমিটি নিয়োগ করেন। এই আন্দোলনকে জোরদার করিবার জন্য এই কমিটি কতকগুলি সুপারিশ করেন। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনানুসারে সমবায় প্রাদেশিক বিষয়ে পরিণত হইল এবং মন্ত্রীদের কর্তৃত্বাধীনে আসিল। নিজ নিজ প্রদেশে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতিকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে প্রদেশগুলি সমবায় সংক্রান্ত আইন পাশ

ম্যাকলাগান কমিটি নিয়োগ

করে। বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় এই আন্দোলন বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এই আন্দোলনের উন্নতি হয়।

বর্তমান অবস্থা (Present position)ঃ সমবায় সমিতির সংখ্যা এবং উহাদের মূলধনের পরিমাণ দেখিয়া এই আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে। ১৯৬১ সালে সমবায় সমিতির সংখ্যা ৩·৩২ লক্ষ আর কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৩১২ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। অবশ্য এই সকল সমবায় সমিতির অধিকাংশ (প্রায় শতকরা ৬৪ ভাগ) সমবায় ঋণদান সমিতি এবং সমবায় ঋণদান সমিতির ৯০ ভাগ সমবায় কৃষিঋণদান সমিতি। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে মোট জনসংখ্যার শতকরা ২১ ভাগ লোক সমবায় আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়াছে।

বর্তমান প্রসার

দ্বিতীয়তঃ সমবায় আন্দোলন বিভিন্ন দিকে শাখা বিস্তার করিয়াছে। যদিও অদ্যাবধি সমবায় ঋণদান সমিতিই সমবায়ের মূলকেন্দ্র তথাপি অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে সমবায় আন্দোলনকে প্রসারিত করা হইতেছে।

তৃতীয়তঃ বর্তমানে এক উদ্দেশ্যসাধক (Single-purpose) সমিতি ছাড়াও বহুমুখীন উদ্দেশ্য সাধক (Multipurpose) সমবায় সমিতিও সম্প্রসারিত হইতেছে। বহুমুখীন উদ্দেশ্য সাধক সমিতি একাধিক উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং রাজস্থানে বহুমুখীন উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি রহিয়াছে।

একউদ্দেশ্য সাধক ও বহুউদ্দেশ্য সাধক সমিতি

এই আন্দোলনের একটি ত্রুটি যে বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা সমানভাবে প্রসারলাভ করে নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ১৬৬৫৪৩ প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমিতির শতকরা ৭৫·৪ ভাগ বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং উত্তরপ্রদেশ—এই তিনটি রাজ্যে রহিয়াছে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ অ-ঋণদান সমিতিও বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মহীশূর, কেরল এবং অন্ধ্রে সমবায় আন্দোলন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রসারিত হইলেও মাদ্রাজ বা বোম্বাই-এর মতো এই আন্দোলন এই সকল রাজ্যে শক্তিশালী হইতে পারে নাই। দেশ বিভাগের ফলে বাংলা এবং পাঞ্জাবে সমবায় সমিতির কাঠামো ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

ত্রুটি

সমবায়ের গঠন (Structure of Co-operatives)ঃ সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি হইল প্রাথমিক সমবায় সমিতি। প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি কৃষি ও অ-কৃষি সমিতি হইতে পারে। সুতরাং চার ধরণের প্রাথমিক সমবায় সমিতি হইতে পারে—কৃষি ঋণদান সমিতি, কৃষি অ-ঋণদান সমিতি, অকৃষি ঋণদান সমিতি এবং অকৃষি অ-ঋণদান সমিতি। এই সমিতিগুলির কার্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সমবায় সমিতির ইউনিয়ন রহিয়াছে।

প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে অর্থ সাহায্য দিবার উদ্দেশ্যে জেলায় বহু সংখ্যক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শীর্ষদেশে রহিয়াছে রাজ্য সমবায় ব্যাংক (State Co-Operative Bank).

সমবায় কৃষি-ঋণদান সমিতি (gricultural Co-operative Credit Societies) : এই ধরণের সমবায় সমিতি গঠনে কতকগুলি নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। এইগুলি মূলতঃ গণতান্ত্রিক সংগঠন এবং সদস্যরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট পরিচিত। যতদূর সম্ভব সদস্যগণ সমিতির কাজ বিনাপারিশ্রমিকে করিবে এবং সমিতি পরিচালনার কার্যভার সদস্যদের উপর ন্যস্ত থাকে। এই ধরণের সমিতি গ্রামের দশজন বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিয়া গঠন করিতে পারে। সদস্যদের দায় অসীম। সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একটি কার্যকরী সমিতি (Managing Committee) গঠন করে এবং এই কমিটি সমিতির দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করে। প্রয়োজন বোধ করিলে সমিতি একজন বেতনভুক সেক্রেটারী নিযুক্ত করিতে পারে।

সমবায় গঠনের নীতি

সমিতি নিম্নলিখিত পদ্ধতি মাধ্যমে তাহার কার্যকরী মূলধন সংগ্রহ করে, (১) সদস্যদের ভর্তি ফী, (২) সদস্যগণ সমিতির শেয়ার কিনিয়া মূলধন যোগান দেয়। (৩) সদস্য এবং বাহিরের লোকের আমানত এবং (৪) অপর সমিতি, সরকার, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক হইতে ঋণ এবং আমানত সংগ্রহ। এই ফাণ্ড হইতে সমিতি তাহার সদস্যদিগকে জমির উন্নতি, বীজ ও সার ক্রয়, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রভৃতি উৎপাদনশীল কাজের জন্য ঋণ দিয়া থাকে। অবশ্য বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল কাজের জন্যও সমিতি হইতে ঋণ দেওয়া হয়। ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত এবং সম্পত্তির জামিন ঋণ দেওয়া হয়।

মূলধন সংগ্রহ

প্রত্যেক সমবায় সমিতিকে একটি রিজার্ভ ফাণ্ড গঠন করিতে হয়। যে সমিতিতে শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা হয় না সেক্ষেত্রে মুনাফার সবটাই রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা দেওয়া হয়। যে সমিতিতে শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা হয় সেই ক্ষেত্রে মুনাফার শতকরা ২৫ ভাগ রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখা হয় এবং বাকী লভ্যাংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় রেজিষ্ট্রার অনুমতি দান করিলে সমবায় সমিতি তাহার মুনাফার শতকরা ১০ ভাগ সাহায্যদান বাবদ দিতে পারে। প্রত্যেক সমবায় সমিতির হিসাব পরীক্ষা রেজিষ্ট্রার কর্তৃক নিযুক্ত অফিসার দ্বারা করা হয়। সমিতিকে ষ্ট্যাম্পকর এবং আয়কর হইতে অব্যাহতির কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়।

রিজার্ভ ফাণ্ড

সমবায় আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হইল এই সমিতিগুলি। কৃষি সমবায় সমিতিগুলির শতকরা ৭৯ ভাগ হইল সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতি।

কৃষিসমবায় অ-ঋণদান সমিতি (Agricultural Non Credit Societies) : এই ধরণের সমিতিগুলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে। সমবায় ক্রয়, সমবায় বিক্রয়, সমবায় উৎপাদন, সমবায় সেচ ইত্যাদি সমিতি রহিয়াছে।

সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতি যে পদ্ধতিতে সংগঠিত ইহারাও সেইভাবে সংগঠিত হয়। *তবে সদস্যদের দায় এখানে সীমাবদ্ধ থাকে।*

অ-কৃষি ঋণদান সমিতি (Non-agricultural Credit Societies) : অ-কৃষি ঋণদান সমিতিগুলি সুলজে-ডেলিংস নীতিতে গঠিত। এই সমিতিগুলিতে সদস্যদের দায় সসীম থাকে এবং শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরণের লোকের চাহিদা মিটাইবার জন্য এই ধরণের সমিতি স্থাপিত হয়। পৌরব্যাংক (Urban banks) এই ধরণের সমিতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য উদাহরণ। ১৯৬১ সালে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৯১৬ এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫২ কোটি টাকা। ইহারা আধুনিক ব্যাংক নীতিতে গঠিত এবং জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া থাকে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্রে এই ধরণের পৌরব্যাংক বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া, মজুর সমবায় সমিতি, ধীবর সমবায় সমিতি, হুকার সমবায় সমিতি ইত্যাদি রহিয়াছে।

অ-কৃষি-ঋণদান সমিতি (Non-agricultural Non-credit Societies) : ক্রেতা সমবায় সমিতি, সমবায় গৃহনির্মাণ, উৎপাদক সমবায় সমিতি ইত্যাদ অ-কৃষি অ-ঋণদান সমিতির অন্তর্গত।

(ক) সদস্যদের জন্য দ্রব্যক্রয়ের উদ্দেশ্যে **ক্রেতা সমবায় সমিতি** স্থাপন করা হয় সদস্যগণ সমিতির শেয়ার ক্রয় করে এবং তাহাদের খুচরা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমিতি হইতে ক্রয় করে। চল্‌তি দামে দ্রব্যাদি বিক্রীত হয় এবং বৎসরের শেষে প্রত্যেক সদস্য তাহার ক্রয়ের পরিমাণের উপর লভ্যাংশ পাইয়া থাকে। এই ধরণের ক্রেতা সমবায় সমিতি গ্রেট বৃটেনের সমবায় আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে কিন্তু ভারতে সাম্প্রতিক কালেই এই সমবায় সমিতির কিছু প্রসার ঘটিয়াছে। ১৯৬১ সালে ভারতে ৭১৩৩টি ক্রেতা সমবায় সমিতি ছিল এবং উহাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩৬৭১৫৭ ; স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ভিতর এই ধরণের ক্রেতা সমবায় সমিতি বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে।

(খ) **সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতির** গুরুত্ব বর্তমানে খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই এই ধরণের সমবায় সমিতি প্রসার লাভ করে। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উদ্বাস্তু সমস্যার দরুণ বাসগৃহের সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। অপরপক্ষে, চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও গৃহনির্মাণ সরঞ্জামের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণে গৃহাদি নির্মিত হইতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় সমস্যার সমাধান সমবায়ের মাধ্যমেই হইতে পারে। মাদ্রাজে ১৯৫০ সালে সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতির সংখ্যা ছিল ২৮০, বোম্বাই-এ ৭৬৯, পশ্চিম বাংলায় ১০৩ এবং মহীশূরে ৯৩। মূলধনের স্বল্পতা গৃহনির্মাণ সমিতির উন্নতির পথে একটি বড় বাধা। অবশ্য বিভিন্ন রাজ্য সরকার ঋণদান করিয়া এই সমিতিগুলিকে সাহায্য করিতেছে।

(গ) কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে **উৎপাদক সমবায় সমিতি** বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে। তাঁত শিল্পে বিরাট সংখ্যক উৎপাদক সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

মাদ্রাজে ৯১৪টি, পশ্চিম বাংলায় ৯৩৯টি, যুক্তপ্রদেশে ৫৬৯টি এবং বোম্বাই এ ৩৫৪টি সমবায় তাঁত সমিতি রহিয়াছে। মাদ্রাজ তাঁত সমবায় সমিতি (Madras Hand loom Weavers' Provincial Co-operative Society) নামে মাদ্রাজে একটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।

(ঘ) বর্তমানে সমবায় পদ্ধতিতে **বীমাব্যবসায়ও** (Co-operative insurance) প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ১৯৫০ সালে বোম্বাই-এ ৫টি জীবনবীমা, একটি অগ্নি ও সাধারণ বীমা এবং একটি মোটর বীমা সমিতি ছিল। ওই বৎসর পশ্চিম বাংলায় ১০টি জীবন বীমা সমিতি ছিল।

সমবায় ব্যাংকব্যবস্থা (Co-operative Banking) : ভারতে সমবায় ব্যাংকের কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের। সর্বনিম্নে রহিয়াছে প্রাথমিক গ্রাম্য বা পৌর সমবায় সমিতি, তাহার উপর রহিয়াছে ইউনিয়ন, তাহার উপর রহিয়াছে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক আর শীর্ষদেশে রহিয়াছে রাজ্য সমবায় ব্যাংক। প্রাথমিক সমিতিগুলি কৃষিকার্য পরিচালনার জন্য কৃষকদিগকে ঋণদান করে। প্রাথমিক সমিতিগুলির নিজেদের ফাণ্ড রহিয়াছে এবং প্রয়োজনানুসারে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক হইতে ঋণ লইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলি শেয়ার মূলধন, আমানত, শীর্ষ ব্যাংক অথবা রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ঋণ গ্রহণ, এবং বাণিজ্য ব্যাংক হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া ফাণ্ড তৈয়ারী করে।

প্রাথমিক সমিতি এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের মধ্যে রহিয়াছে ইউনিয়ন। কয়েকটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি মিলিত হইয়া ইউনিয়ন গঠন করে। ইহারা প্রাথমিক সমবায় সমিতিদের কার্যের তত্ত্বাবধান অথবা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি হইতে ঋণ পাইতে প্রাথমিক সমিতিগুলির পক্ষে গ্যারান্টি দেয়। ইউনিয়নগুলি নিজেরা ঋণদান করে না বটে কিন্তু প্রাথমিক এবং কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে যোগাযোগের সূত্র হিসাবে কাজ করে। এই ধরনের ইউনিয়নগুলি বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। সমবায় ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষদেশে রহিয়াছে রাজ্য সমবায় ব্যাংক। ইহা শেয়ার মূলধন, আমানত, বাণিজ্য ব্যাংক, রিজার্ভ ব্যাংক এবং সরকারের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া ফাণ্ড গঠন করে। ইহারা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলিকে টাকা ধার দেয় যাহাতে তাহারা প্রাথমিক সমিতিগুলিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণদান করিতে পারে।

ইউনিয়ন

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক (Central Co-operative Bank) : কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলি প্রধানতঃ প্রাথমিক সমিতিগুলিকে ঋণদানের উদ্দেশ্যে গঠিত। প্রাথমিক সমিতিগুলি দরিদ্রজনগণের প্রতিষ্ঠান বলিয়া ইহাদের মূলধনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। সেই কারণে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি কেবলমাত্র প্রাথমিক সমিতিগুলির দ্বারা অথবা প্রাথমিক সমিতি এবং সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

অবিমিশ্র ও মিশ্র ব্যাংক

প্রথম ধরণের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে অবিমিশ্র (pure) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বলে এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গঠিত হইলে উহাদের মিশ্র (mixed) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বলে।

প্রাথমিক সমবায় ব্যাংকগুলিকে ঋণ দেওয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের প্রধান কাজ হইলেও ইহা কিছু কিছু অন্যান্য কাজও করিয়া থাকে। প্রাথমিক সমিতির হাতে কখনো কখনো উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিতে পারে। উহা বিনিয়োগের কোনো পন্থা খুঁজিয়া নাও পাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে উহা জমা রাখিয়া সুদ পাইতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আবার ওই অর্থ অভাবগ্রস্ত কোনো প্রাথমিক সমিতিকে ঋণ হিসাবে দিতে পারে এবং এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রাথমিক সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধনের উদ্বৃত্ত এবং ঘাটতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া টাকার উপযুক্ত ব্যবহারে সহায়তা করে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ, টাকা পাঠানো, বিল, হুণ্ডি এবং চেক গ্রহণ ইত্যাদি সাধারণ ব্যাংক-সংক্রান্ত কাজও করিয়া থাকে। ১৯৫৮-৫৯ সালে ৬৮ কোটি টাকা আমানত সংগ্রহ করে এবং ইহা এই ব্যাংকগুলির মোট কার্যকরী মূলধনের ৪১·১% ; কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলি মোট ঋণের ৮১ ভাগ ব্যাংক এবং সমিতিগুলিকে দেয় আর মাত্র ১৯ দেয় জনসাধারণকে। অনেক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ঋণদান ছাড়াও অন্য কাজ করিয়া থাকে। মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বণ্টনের জন্য প্রাথমিক সমিতিগুলিকে টাকা ধার দেয়। ১৯৬১ সালে দেশে মোট ৩৮০টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ছিল।

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের উন্নয়নের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। প্রথমতঃ, ব্যাংকগুলির শেয়ার মূলধনের কাঠামো অতি দুর্বল—মোট কার্যকরী মূলধনের মাত্র ৭·১ ভাগ। ব্যাংকগুলির রিজার্ভ ফাণ্ডও তুলনামূলকভাবে অল্প। মোট মুনাফার এক-তৃতীয়াংশ রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ অধিক পরিমাণে আমানত সংগ্রহের জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াসের প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ এই ব্যাংকগুলির সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী হ্রাস করা ও সুদের হারের হ্রাস করা প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ মন্দ ঋণের (bad debt) পরিমাণের উপর অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে।

রাজ্য সমবায় ব্যাংক (State Co-operative Bank) : রাজ্য সমবায় ব্যাংক রাজ্যের রাজধানীতে স্থাপিত এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলিকে ঋণদান ও তাহাদের কাজের সমন্বয় সাধনই ইহার কাজ। বিভিন্ন রাজ্যে এই ব্যাংকগুলি বিভিন্নভাবে গঠিত। কতকগুলি রাজ্যে ব্যক্তি এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক উভয়েই রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সদস্য হইতে পারে। অপর কতকগুলি রাজ্যে কেবল মাত্র সমবায় প্রতিষ্ঠানই রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সদস্য হইতে পারে। রাজ্য ব্যাংকগুলির প্রধান কাজ হইতেছে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলিকে ঋণদান করা এবং যেখানে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক নাই সেখানে

ইহার কাজ

প্রাথমিক সমিতিগুলিকে ইহারা ঋণদান করে। দ্বিতীয়তঃ ইহারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির উদ্বৃত্ত এবং ঘাটতির মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া ইহারা, আমানত গ্রহণ, বিল চেক, হুণ্ডি গ্রহণ ইত্যাদি সব রকম সাধারণ ব্যাংকিং কাজকর্মও করিয়া থাকে। ইহারা রাজ্য সরকার, রিজার্ভ ব্যাংক, ষ্টেট-ব্যাংক এবং অন্যান্য উৎস হইতে ঋণ পাইয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাংক এবং টাকার বাজারের সহিত সমবায় আন্দোলনের যোগসূত্র স্থাপিত হয় রাজ্য সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে। ১৯৬১ সালে ২১টি রাজ্য সমবায় ব্যাংক ছিল।

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং শীর্ষ সমবায় ব্যাংকের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়; প্রথমতঃ, উভয় ধরণের প্রতিষ্ঠানেই শেয়ার মূলধন এবং রিজার্ভের পরিমাণ অপর্যাপ্ত। প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের দারিদ্র্য এবং মুনাফার স্বল্পতা এই দুই কারণে ব্যাংকগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে রিজার্ভ ফাণ্ড তৈয়ারী করিতে পারে নাই। আশা করা যাইতেছে যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের দরুণ কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাইলে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির উন্নতি হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সমবায় ব্যাংক উভয়েই মিশ্র এবং অবিমিশ্র ধরণের হইতে পারে। অবিমিশ্র ধরণের প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র সমবায় সমিতিই সদস্য হইতে পারে। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান সমবায় নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু মিশ্র ধরণের সমবায় সমিতির সুবিধা যে তাহারা অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। অবশ্য এই ধরণের সমবায়ব্যাংক সমবায় নীতির পরিপন্থী। তৃতীয়তঃ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সমবায়ব্যাংকগুলি হুণ্ডি, চেকগ্রহণ, শেয়ার কেনাবেচা, ইত্যাদি সাধারণ ব্যাংকিং কাজকর্মও করিয়া থাকে। এই সকল কাজ সমবায় ব্যাংকের করা উচিত কিনা ইহা বিতর্কমূলক বিষয়। চতুর্থতঃ সমবায় ব্যাংকগুলির অর্জিত মুনাফা দেশের অন্য ধরণের ব্যাংকের অর্জিত মুনাফার তুলনায় অনেক কম।

সমবায়ের ভিত্তিতে দীর্ঘকালীন ঋণদানের উদ্দেশ্যে জমিবন্ধকী ব্যাংক স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৬১ সালে ৭৮১টি প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাংক ছিল এবং ইহারা ওই বৎসর ৪৩৬ কোটি টাকা ঋণদান করে। জমিবন্ধকী ব্যাংক সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি (Multipurpose Co-operative Societies): কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত সমবায় সমিতি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য (ঋণদান, জলসেচ বা ফসল বিক্রয় ইত্যাদি) লইয়া গঠিত হইত। ১৯৩৭ সালের পর হইতে রিজার্ভ ব্যাংক বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি গঠন বিশেষভাবে সমর্থন করে। অর্থাৎ বহু উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বহু সমিতি স্থাপন না করিয়া কৃষকের সকল প্রকার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য একটি সমিতি স্থাপন করা উচিত। সমবায় পরিকল্পনা কমিটির (Co-Operative Planning Committee) মতে বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতি কৃষকদের ঋণদান করিবে শস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে, জলসেচ প্রসারের ব্যবস্থা করিবে এবং সর্বপ্রকারে সমিতির সদস্যদের আর্থিক উন্নয়নের চেষ্টা করিবে।

বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতির স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখানো হয়ঃ

প্রথমতঃ, মহাজনের কবল হইতে কৃষককে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে হইলে বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি গঠন করা প্রয়োজন। গ্রাম্য মহাজনেরা কৃষকদিগকে শুধু মাত্র টাকাই ধার দেয় না, কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বিক্রয় ইত্যাদি কাজও করিয়া থাকে। সেই কারণে শুধুমাত্র ঋণদানের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠন করিলে গ্রাম্য মহাজন এবং সাহুকরকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত সমবায় সমিতির আর্থিক সঙ্গতি এবং সামর্থ্য খুবই সীমাবদ্ধ বলিয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ-কল্যাণ প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামীণ সমস্যার সমাধান ইহারা করিতে পারিবে না। কিন্তু বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতির আর্থিক শক্তি এবং সামর্থ্য অধিক বলিয়া গ্রামজীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা ইহার পক্ষে সম্ভবপর। তৃতীয়তঃ, গ্রামে বহু ধরণের সমবায় প্রতিষ্ঠান থাকিলে তাহাদিগকে পরিচালনা করিবার জন্য সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ লোক পাওয়া কঠিন কিন্তু গ্রামে একটি সমিতি থাকিলে তাহা পরিচালনা করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। প্রতিষ্ঠানটি আয়তনে বড় হইলে সুদক্ষ পরিচালনাজনিত ব্যয়সংক্ষেপ হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ, বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতি বিভিন্নধরণের কাজ করে বলিয়া কোনো একটি কাজের ক্ষতি অপর দিকের লাভের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হয়।

বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতির স্বপক্ষে যুক্তি

অপরপক্ষে যাহারা এক উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি সমর্থন করেন তাহারা বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতির বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখান।

প্রথমতঃ, এক উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমবায় সমিতির নীতিগুলি যেমন সহজবোধ্য, বহু উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমবায় সমিতির নীতিগুলি সেইরূপ সহজবোধ্য নয় বলিয়া নানা জটিলতার সৃষ্টি হইবে ও গ্রামবাসীরা উৎসাহ হারাইয়া ফেলিবে। উপরন্তু বৃহদায়তন সমিতি পরিচালনা করিবার মতো দক্ষ পরিচালকেরও যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতিগুলি সাধারণতঃ কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত হয়, সমিতির সদস্যগণ পরস্পরের নিকট পরিচিত নাও হইতে পারে ফলে সমবায়ের ভিত্তি যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা তাহার অভাব ঘটিবে। তৃতীয়তঃ, একটি সমিতির পক্ষে গ্রামীণজীবনের সকল সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখার বিপদও আছে। একটি বিষয়ে ব্যর্থতা অন্য সকল বিষয়ে ব্যর্থতার কারণ হইতে পারে। চতুর্থতঃ, সীমাহীন দায়িত্ব-ই সমবায়ের মূল ভিত্তি কিন্তু বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতিগুলি সীমাবদ্ধদায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সমবায়ের উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। এই সকল কারণে ১৯২৮ সালে রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার (Royal Commission on Indian Agriculture) এক-উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমবায় সমিতি গঠনের স্বপক্ষে সুপারিশ করেন।

বিপক্ষে যুক্তি

বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতির স্বপক্ষের এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতির পক্ষেই রায় দিতে হয়। যে সকল

অসুবিধার কথা বলা হইল তাহা শিক্ষাবিস্তার এবং প্রশাসনিক উন্নতির মাধ্যমে দূর করা খুব কঠিন নয়। রিজার্ভ ব্যাংকের সক্রিয় সহায়তায় বহু উদ্দেশ্য সাধক সমবায় সমিতি দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। ১৯৫১-৬২ সালে বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৪০ হাজারের মতো। সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির মতে সমবায় আন্দোলনকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে মাত্র ঋণদান কাজে ইহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনের কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। শুধু মাত্র ঋণদানের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিলে, এই কাজেও ইহা সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ সমিতি অবশ্যই থাকিবে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলনকে বহু উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করিতে হইবে। স্যার ম্যালকম ডারলিং বিভিন্ন বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতির কার্যাবলী পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে অধিকাংশ সমিতিগুলিই আসলে বহু উদ্দেশ্য সাধক নয়। বর্তমানে যে সেবা সমবায় (Service Co-operatives) সমিতি গঠন করা হইতেছে তাহা বহুলাংশে বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতির মতো।

সমবায় আন্দোলনের মূল্যায়ন (Assessment of the Co-operative Movement): ১৯০৪ সালে ভারতে সমবায় আন্দোলনের সুরু হয়, তারপর দীর্ঘ ৬০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সমবায় আন্দোলনের সফলতার হিসাব-নিকাশ করিবার সময় এখন আসিয়াছে। দাবী করা হয় যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলন বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছে।

প্রথমতঃ, সমবায় সমিতি তাহার সদস্যদের অল্প সুদে যথেষ্ট মূলধন সরবরাহ করিয়াছে। সমবায় সমিতিগুলি অল্প সুদে টাকা ধার দেয় বলিযা মহাজনেরাও বাধ্য হইয়া সুদের হার কমাইয়াছে। হিসাব করা হইয়াছে যে সুদের হার হ্রাস হওয়ার ফলে প্রায় এক কোটি টাকার মতো সঞ্চয় সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থা প্রসারে যথেষ্ট অবদান জোগাইয়াছে। সমবায় সমিতির ফলে গ্রামবাসীগণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অভ্যাস গড়িয়া তুলিযাছে। ১৯৬০ সালে প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমিতিগুলি ১১.৮৬ কোটি টাকা আমানত গ্রহণ করে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমবায় ব্যাংকগুলি মিলিয়া ৫৬.১৫ কোটি

সাফল্য

টাকা সংগ্রহ করে। তৃতীয়তঃ, সমবায় সমিতিগুলির প্রচেষ্টার ফলে ভোগের জন্য অর্থাৎ অনুৎপাদনশীল কাজের জন্য ঋণগ্রহণ হ্রাস পাইয়াছে এবং কৃষকেরা প্রধানতঃ উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই ঋণগ্রহণ করে। চতুর্থতঃ, এই আন্দোলন দেশের কৃষিশিল্পকে এবং কুটিরশিল্পকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছে। সমবায় পদ্ধতিতে বীজ ও সার ক্রয়, জমির একত্রিকরণ, জলসেচের প্রসার, সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থা ইত্যাদির ফলে বর্তমানে কৃষির উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে। কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। পঞ্চমতঃ, সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি এক একটি শিক্ষাকেন্দ্র বিশেষ। বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলি উহাদের কর্মচারী এবং পরিচালকদের শিক্ষার ক্ষেত্র। ইহা অশিক্ষিত গ্রামবাসীর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহের সঞ্চার

করিয়াছে। পরিশেষে, সমবায়, আন্দোলনের সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যও কম নয়। ম্যালকম ডার্লিং-এর মতে যেখানে সমবায় সমিতির প্রসার ঘটিয়াছে সেখানে মামলা মোকদ্দমা, মদ্যপান এবং জুয়াখেলা হ্রাস পাইয়াছে এবং পরিবর্তে সেখানে জনগণের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, পরিশ্রম, শিক্ষা, মিতব্যয়িতা এবং পারস্পরিক সহায়তা প্রসার লাভ করিয়াছে।

সমবায় আন্দোলনের উপরিউক্ত সফলতার দাবী করা হইলেও ভারতে এই আন্দোলন সাফল্যের মানদণ্ডের বিচারে ব্যর্থ বলিয়াই ধরিতে হইবে।

প্রথমতঃ, এই আন্দোলন দেশের সর্বত্র প্রসার লাভ করে নাই। ১৯৬২ সালে গ্রামের মোট অধিবাসীদের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ লোক প্রাথমিক সমবায় সমিতিভুক্ত ছিল। যে সকল গ্রামাঞ্চলে এই আন্দোলন প্রসারিত হইয়াছে সেখানেও ইহা সকল জনগণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ, সমবায় আন্দোলন প্রধানত ঋণদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু সে আন্দোলনও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। সারা ভারত কৃষিঋণ জরিপ কমিটির মতানুসারে সমবায় সমিতিগুলি মোট কৃষিঋণের মাত্র শতকরা ৩.১ ভাগ যোগান দিয়া থাক দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের ব্যাপারে সমবায়ের কোন ভূমিকাই নাই বলিলে ভুল বলা হয় না। তৃতীয়তঃ, সমবায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হইল অল্পসুদে কৃষককে টাকা ধার দেওয়া কিন্তু সমবায়ের প্রসারে এই সমস্যার কোনো সমাধান হয় নাই—প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি ৯% হইতে ১২½% পর্যন্ত সুদ আদায় করে। বিভিন্ন সুদখোর আইনানুসারে মহাজনেরা কৃষকদের নিকট হইতে এইরূপ সুদের হার আদায় করিত। বহু কমিটি সুদের হার হ্রাস করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছে। অল্পমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী ঋনের জন্য ৬½% এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য ৪% সুদের হার হওয়া উচিত। চতুর্থতঃ, সমবায় সমিতিগুলি জমি ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির জামিন ছাড়া ঋণদান করে না। দরিদ্র কৃষকগণের অধিকাংশেরই কোনো জমি জায়গা নাই ফলে তাহারা সমবায় সমিতি হইতে ঋণের সুবিধা পায় না। ধনী এবং মধ্যবিত্ত কৃষকেরা লাভবান হইয়াছে। দরিদ্র কৃষক ঋণের সুবিধা না পাইলে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। পঞ্চমতঃ, অধিকাংশ সমিতিই স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। আবার সমবায় সমিতির প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ অচল।

ব্যর্থতার কারণসমূহ

সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির মতে এই আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ প্রশাসনিক ত্রুটি অপেক্ষা অনেক গভীর। ইহার আসল কারণ কৃষকের আয়ের স্বল্পতা এবং উৎপাদনের তুলনায় ভোগ প্রবণতার আধিক্য। শুধুমাত্র ঋণদান পদ্ধতির উন্নতি সাধন করিয়া ঋণের সমস্যা সমাধান করা যাইবে না; সমবায়ের মাধ্যমে ছোট ছোট কৃষকদের ঋণদান সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে যদি ইহা কৃষি পুনর্গঠনের অংশ হিসাবে গৃহীত হয়। যতদিন পর্যন্ত উৎপাদন ভোগ অপেক্ষা কম হইবে ততদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র ঋণদান কাঠামোর উন্নয়ন করিয়া সমস্যার সমাধান

করা যাইবে না। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র, ঋণ, উচ্চসুদের হার তখনই বিনষ্ট হইবে যখন কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে।[1]

সংক্ষেপে, ভারতে সমবায়ের যে তিনটি আদর্শ ছিল—উন্নত কৃষি, উন্নত জীবন এবং উন্নত ব্যবসায়—তাহার একটিও পরিপূর্ণরূপে সার্থক হয় নাই।

সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ (Causes of the Failure of the Movement) : যে আশা এবং উদ্দীপনা লইয়া সমবায় আন্দোলন ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা সফল হয় নাই। নিম্নলিখিত কারণগুলি সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী :

প্রথমতঃ, প্রাথমিক সমিতিগুলি আকারে ক্ষুদ্র এবং ইহাদের কার্যের পরিধিও অতিশয় সংকীর্ণ। শুধুমাত্র প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিই নয় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক-গুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আকারে ছোট এবং তাহাদের মূলধনের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়। ইহারা যথেষ্ট পরিমাণে আমানত সংগ্রহ করিতে পারে না বলিয়া অধিক সুদ আদায় করিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, অসীম দায়ের নীতি সমবায় ঋণদান সমিতির প্রসারে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, সমবায় সমিতিগুলি এক উদ্দেশ্য সাধক হওয়ায় গ্রামজীবনের সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারে না বলিয়া কৃষকগণও এই ধরণের সমিতি গঠনে বিশেষ উৎসাহ পায় না। চতুর্থতঃ, পল্লীবাসীদের অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং রক্ষণশীলতা সমবায় আন্দোলন প্রসারে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। অজ্ঞতা এবং রক্ষণশীলতার দরুণ তাহারা এই আন্দোলনের সুযোগ সুবিধা বুঝিতে পারে না। পঞ্চমতঃ, এই অভিযোগ করা হয় যে প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে সহযোগিতার অভাব রহিয়াছে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমবায় সমিতিগুলি প্রাথমিক সমিতিগুলিকে সাহায্য করা অপেক্ষা সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলীর দিকেই অধিক দৃষ্টি দেয়। ষষ্ঠতঃ, অর্থসংগ্রহের দিক হইতে সদস্য অপেক্ষা বাহিরের উৎস হইতে ঋণসংগ্রহের আধিক্য এই আন্দোলনের একটি বিশেষ ত্রুটি। সপ্তমতঃ, অনেক বিশেষজ্ঞের মতে অত্যধিক সরকারী হস্তক্ষেপ এবং নিয়ন্ত্রণের দরুণ এই আন্দোলন পল্লীবাসীর মনে যথেষ্ট সাড়া জাগাইতে পারে নাই। পরিশেষে, অযোগ্য পরিচালনা, সদস্যদের ঝগড়া বিবাদ, শৈথিল্য এবং অসাধুতা এই আন্দোলনের গতিকে মন্থর করিয়াছে।

---

1. "The problem of credit cannot be solved in terms of reform of the credit mechanism alone, and that the extension of credit facilities to small farmers through the Co-operative principles can only be successful if it is applied as part of a general programme of agricultural reconstructions. No change in the machinery of credit-giving can be a sufficient remedy so long as consumption tends to run permanently ahead of production. The vicious circle of poverty, debt and high interest rates can only be broken by measures which increase the productivity of holding and lessen the rent and tax burden."

নির্দেশিত প্রতিবিধান (Remedies Suggested) : অতীতে সমবায় আন্দোলন সাফল্য লাভ করে নাই সত্য কিন্তু সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠনের মধ্যেই কৃষকের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হইলে গ্রামীন ভারতের উজ্জ্বল আশাও বিনষ্ট হইবে ("If Co-operrtion fails, there will fail the best hope of rural India." Royal Commission on Agriculture) সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটি সমবায় আন্দোলনের ভিত্তিভূমিতেই কৃষিঋণ ব্যবস্থার নূতন কাঠামো তৈয়ারী করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। সমবায় আন্দোলন পুনর্গঠনের জন্য এই কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নলিখিত রূপ ;-(১) সমবায় আন্দোলনের সকল পর্যায়ে—প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসমিতি—সরকারকে সাহায্য করিতে হইবে। রাজ্য সমবায়ব্যাংক এবং জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগ সরকার যোগান দিবেন। (২) সমবায় সমিতিগুলিকে আকারে বৃহত্তর হইতে হইবে। বৃহত্তর সমিতিগুলির আর্থিক সামর্থ্য অনেক বেশী বলিয়া ইহাদের কর্মপরিধি ব্যাপক হইবে। বর্তমানে সমবায় সংক্রান্ত ব্যবসায় জটিল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া ইহার কার্য পরিচালনা করিবার জন্য সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ কর্মীর প্রয়োজন। বৃহদায়তন সমিতির পক্ষেই কার্য পরিচালনার জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত সেক্রেটারী এবং কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভবপর হয়। ক্ষুদ্রায়তন সমিতির আয় অল্প বলিয়া ওই ধরণের দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। (৩) সমবায় ঋণ এবং সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধার জন্য সমবায়ের মাধ্যমে গুদাম ঘর প্রস্তুত করিতে হইবে। এই সকল গুদামঘরে শস্য রাখিয়া কৃষকেরা যে রসিদ পাইবে তাহার জামিনে ব্যাংক হইতে ঋণ পাইবে। (৪) একটি ষ্টেট ব্যাংক স্থাপন করা প্রয়োজন এবং ইহার শাখাসমূহ সারাদেশে ছড়াইয়া থাকিবে। ইহা সমবায় ব্যাংকগুলিকে ঋণদান এবং টাকা পাঠানোর ব্যাপারে সাহায্য করিবে। (৫) সমবায় সংক্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারের জন্য সমবায় শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হইয়াছে। (৬) রাজ্য সরকার যাহাতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিক পরিমাণে সাহায্য করিতে পারে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন) ফাণ্ড নামে একটি তহবিল গঠন করিয়াছে।

সমবায় আন্দোলনের উন্নয়নের জন্য অন্যান্য বিশেষজ্ঞ মহলের প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি এইরূপ : (১) প্রাথমিক সমিতিগুলি আকারে বৃহদায়তন হইলেই চলিবে না—উহাদের সীমাবদ্ধদায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। (২) জমির পরিবর্তে উৎপন্ন ফসলের জামিনে ঋণদিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমানে জমির জামিনে সদস্যদের ঋণ দেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ সদস্য দরিদ্র এবং তাহাদের জমির পরিমাণ অতি অল্প বলিয়া অতি সামান্যই ঋণ তাহারা পায়। কৃষকের ঋণপরিশোধনের ক্ষমতার ভিত্তিতে তাহাকে ঋণদান করিতে হইবে। (৩) ঋণ টাকার আকারে না দিয়া যতদূর সম্ভব—দ্রব্যসামগ্রীর আকারে দিতে হইবে। (৪)-

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সমবায় ব্যাংকগুলি ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া বন্ধ করিয়া শুধুমাত্র সমবায় সমিতিকেই ঋণ দিবার নীতি গ্রহণ করিবে।

স্যার ম্যালকম ডার্লিং যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন তাহা সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশের বিপরীত। স্যার ম্যালকম ডার্লিং-এর মতে বৃহৎ আকারে সমবায় সমিতি গঠন করা বাঞ্ছনীয় নয়। সমবায়ের একটি মূলনীতি হইল যে ইহার সদস্যগণ পরস্পরকে চিনিবে কিন্তু সমিতির আকার বৃহৎ হইলে সমবায়ের এই মূলনীতি ক্ষুণ্ণ হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্যার ম্যালকম ডার্লিং-এর মতে সমবায় সমিতির সহিত সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এই আন্দোলনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিবে। সমবায় জনগণের মধ্যে হইতে স্বতঃউৎসাহিত একটি আন্দোলন এবং ইহা জনগণের দ্বারাই পরিচালিত হইবে—সরকারী হস্তক্ষেপ সমবায়ের মূলনীতির পরিপন্থী। ইহাতে আত্মনির্ভরশীলতার নীতি ক্ষুণ্ণ হইবে।

একটি গ্রাম একটি সমিতি

স্যার ম্যালকম ডার্লিং-এর সুপারিশের ফলে জাতীয় উন্নয়ন কমিটি (National Development Council) মতের পরিবর্তন করে এবং "একটি গ্রাম একটি সমিতি" এই নীতিতে সমবায় স্থাপনের নির্দেশ দেয় এবং ক্ষুদ্রায়তন সমিতিগুলিকে বড আকারে গঠন করার নীতি পরিত্যক্ত হয়।

বৈকুণ্ঠ মেহতা কমিটির (Vaikuntha Mahta Committee on Co-operative Credit, 1970) মতে সমবায় সমিতির আকার তাহার আর্থিক ক্ষমতার দ্বারাই নির্ধারিত হইবে। অধিকাংশেরই মত যে ৩০০০ লোক বা ৬০০ পরিবারের জন্য একটি সমিতি থাকিবে।

রাজ্য ও সমবায় আন্দোলন (The State and the Co-operative Movement) ঃ ভারতে সমবায় আন্দোলন প্রসারে রাষ্ট্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে আসলে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে রাষ্ট্রের সহযোগিতায়। ভারতের মতো অনুন্নত দেশে সরকারের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া এই আন্দোলন সফল হইতে পারে না। এই জন্যই সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটি সরকারকে সমবায় আন্দোলনের সকল পর্যায়ে সাহায্য করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। সরকার সমবায় সংক্রান্ত আইন পাশ করিয়া, সমবায় সমিতিকে অর্থ সাহায্য দিয়া এবং সুদ ও আসলের গ্যারান্টি দিয়া এই আন্দোলনের অগ্রগতিকে সহায়তা করিয়াছে। ইহা ছাড়া সমবায় সমিতিকে আয়কর, ষ্ট্যাম্পকর, রেজিষ্ট্রেশান ফী ইত্যাদি হইতে অব্যাহতি দানের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া সরকার এই আন্দোলনকে সহায়তা করিয়াছেন। সরকার কখনো কখনো সরাসরি বা কখনো রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে সাহায্য করিয়া থাকেন। রাজ্য সরকারগুলি অডিট পরিচালনা এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। রাজ্য সরকারগুলি যাহাতে সমবায় সমিতিগুলির শেয়ার কিনিয়া

সমবায় আন্দোলনে সরকারী সহযোগিতা

সাহায্য করিতে পারে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন) ফাণ্ড গঠন করিয়াছে। সমবায়সংক্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাংক মিলিতভাবে পুণাতে সমবায় কলেজ ও আরও পাঁচটি সমবায় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। ইহাছাড়া সময় সময় বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়া সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাংক সমবায় আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করে এবং উহার ভিত্তিতে এই আন্দোলনকে সহায়তা করিবার জন্য কর্মসূচী গ্রহণের নির্দেশ দেয়।

পরিকল্পনাধীন সময়ে সমবায় আন্দোলন (Co-operation under the Plans): পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমবায়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় এমনই একটি পদ্ধতি যাহার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় উদ্যোগের সুবিধাকে অব্যাহত রাখিয়াও পরিকল্পনার সামগ্রিক নির্দেশ এবং উদ্দেশ্যসাধন করা সম্ভব। গণতন্ত্রের পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় ইহা একটি অপরিহার্য অস্ত্র।[1] পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে সমবায়কে, বিবিধ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। গ্রাম পঞ্চায়েৎ এবং সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। অবশ্য প্রথম পরিকল্পনায় সমবায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও সরকার এই আন্দোলন পুনর্গঠনের জন্য বিশেষ কিছুই চেষ্টা করেন নাই। এই সময় শুধুমাত্র রিজার্ভ ব্যাংক এবং রাজ্য সরকারগুলিই সমবায়কে যা কিছু সাহায্য দেয়। রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৭ কোটি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৫ কোটি টাকা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায়কে উন্নয়নের অংগ হিসাবে গ্রহণ করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করাকে জাতীয় নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে গণতান্ত্রিক ধারায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভিন্ন আকারে সমবায় পদ্ধতির প্রয়োগের বিরাট সম্ভাবনা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সমাজ গঠনের অর্থ কৃষি এবং শিল্পে বিকেন্দ্রীকরণ প্রসার করা। ছোট ছোট ইউনিটগুলি নিজেদের মধ্যে মিলিত হইয়া বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা লাভ করিতে পারে। ভারতে অর্থনৈতিক প্রগতি সমবায় সংগঠনের বিশেষ অনুকূল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্থির করা হয় যে (১) গ্রামের প্রত্যেক পরিবারকে অন্ততঃ একটি সমবায় সমিতির সদস্য হইতে হইবে। (২) সমবায়ের কাজ ঋণদান হইতে আরম্ভ হইবে, পরে অভিজ্ঞতালাভের ভিত্তিতে কৃষিতে প্রসারিত করিতে হইবে।

1 "In a regime of planned development, co-operation is an instrument, which while retaining some of the advantages of decentralisation and local initiative will yet service willingly and readily the overall purposes and directives of the plan. It is an indispensible instrument of planned economic action in a democracy." C

(৩) প্রত্যেক গ্রাম্য পরিবারের ঋণযোগ্যতা (credit worthy) বৃদ্ধি করিতে হইবে।
(৪) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় আন্দোলনকে গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া শহরেও সম্প্রসারিত করিবার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট বাহির হয় এবং সরকার ওই কমিটির সকল সুপারিশই গ্রহণ এবং কার্যে পরিণত করেন। ইহার পর ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। স্যার ম্যালকম ডার্লিং-এর সুপারিশগুলি অনেকাংশে সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির বিপরীত থাকায় সরকার দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী জহরলালও বলেন যে সরকার সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির সকল সুপারিশ গ্রহণ করিয়া ভুল করিয়াছেন। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে সমবায় প্রধানত স্যার ম্যালকম ডার্লিং-এর নির্দেশিত পথে চলিবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাহা এই নীতিতেই প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫৮ সালে জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল (National Development Council) গ্রামসমাজকে প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে ধরিয়া প্রতি গ্রামে একটি করিয়া গ্রাম সমবায় গঠন করার নির্দেশ দেয়। গ্রামের যাবতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব বহন করিবে গ্রামপঞ্চায়েত ও গ্রাম সমবায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায়ের জন্য ৩৪ কোটি ও তৃতীয় পরিকল্পনায় ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ১৯৫৯ সালে শ্রীবৈকুণ্ঠলাল মেহ্‌তাকে সভাপতি করিয়া সমবায় ঋণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। ১৯৬০ সালের মে মাসে ওই কমিটি রিপোর্ট পেশ করেন। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই কমিটির সুপারিশগুলিকে কার্যকরী করা হয়। সাধারণতঃ এক একটি গ্রাম লইয়া এক একটি সমবায় সমিতি গঠিত হইবে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একাধিক গ্রাম লইয়াও সমবায় সমিতি গঠন করা যাইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের শতকরা ৬০ জনকে সমবায়ের অধীনে আনার লক্ষ্য নির্ধারিত হইয়াছে।

কৃষকদিগকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ হিসাবে ৪০০ কোটি টাকা, মধ্য মেয়াদী ঋণ হিসাবে ১৬০ কোটি টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে ১১৫ কোটি টাকা সমবায় সমিতির লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে।

সেবা সমবায় সমিতি (Service Co-operatives): ১৯৫৬ সালের নাগপুর প্রস্তাবে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত দেশকে সেবা সমবায়ের দ্বারা ভরিয়া ফেলিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে সেবা সমবায় সমিতিতে পরিণত করা হয় এবং তাহাদের সংখ্যা ২'৭০ লক্ষে লইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেবা সমিতিগুলি অনেকাংশে বহু উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমবায় সমিতির মতো। ইহারা কৃষককে ঋণদান ছাড়াও ফসল বিক্রয়, সার ও বীজ ক্রয়, জমির উন্নয়ন ইত্যাদি বিবিধ কার্য করিবে। ইহারা কুটির শিল্পের কারিগরদের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় ইত্যাদি কার্যও পরিচালনা করিবে। সেবা সমবায়গুলি পঞ্চায়েতের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করিবে। ১৯৬২ সালে সারা দেশে সেবা সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৭৫ হাজার।

EXERCISE

প্রথম অধ্যায়

1. Discuss the main features of under development to be witnessed in India's economy to-day. [পৃষ্ঠা ২-৭]

2. Give an outline of the structure of Indian Economy. [পৃষ্ঠা ২-৯]

3. Discuss the relative importance of the different sources of development finance. [পৃষ্ঠা ১১-১৫]

4. Give an outline of the Harrod-Domar model. [পৃষ্ঠা ১৬-১৭]

দ্বিতীয় অধ্যায়

5. What are the monsoons ? Describe their influence on the economic life of India. [পৃষ্ঠা ১৭-১৮]

6. Discuss briefly the different varieties of soil in India and point out their suitability for the growth of particular kinds of crops. [পৃষ্ঠা ১৯-২০]

7. Describe the various systems of irrigation in India and point out their economic significance. [পৃষ্ঠা ২০-২২]

8. What do you mean by soil erosion ? Describe the economic effects of soil-erosion and suggest some measures for tackling the problem. [পৃষ্ঠা ২৩-২৫]

9. Mention the principal agricultural crops of India. State their regional distribution and indicate their importance in the foreign trade of India. [পৃষ্ঠা ২৬-২৮]

10. What should be the objectives of Price Policy in a developing economy? Discuss the price policy adopted in the course of the Third Plan. [পৃষ্ঠা ২৬-২৮]

11. Describe the various sources of power in India and point out the importance of their utilisation for the development of industries. [পৃষ্ঠা ৩৮-৪৪]

12. Describe the principal mineral products of India with special reference to their location. Point out the quality of each for industrial development (C. U. B. A. 1947) (পৃষ্ঠা ৪৪-৪৬]

13. Describe the influence of forests on the economic life of India. (C. U. B.Com 1946) [পৃষ্ঠা ৪৭-৫০]

14. Give an account of the forest policy of the Government of India. Discuss in this connection the importance of forests in the economic life of India. (C. U. B. Com 1948) [পৃষ্ঠা ৪৭-৫০]

তৃতীয় অধ্যায়

15. In what manner do the socio-economic factors help or hinder the economic progress of the people in India ? [পৃষ্ঠা ৫১-৫৫]

চতুর্থ অধ্যায়

16. Examine some of the salient features of Indian population as revealed by the last census. [পৃষ্ঠা ৫৬-৫৮]

17. Under what conditions can a country be said to be over-populated ? Is India over-populated ? (C. U. B. A. 1940, '43, 53. B. Com 1955) [পৃষ্ঠা ৬০-৬৩]

18. Discuss fully the effects of economic development on the growth of population in the present Indian Context.
(C. U. B. Com. 1958. B. A. (Hons) 1959) [পৃষ্ঠা ৬৩-৬৬]

19. Write a note on the population problems of India. [পৃষ্ঠা ৬০-৬৩]

20. Discuss the growth of population in the context of planned economic development. [পৃষ্ঠা ৬৩-৬৬]

21. Is India over-populated ? If so, what remedies would you suggest to solve the problem (Ag. 1954). [পৃষ্ঠা ৬০-৬৩, ৬৬-৬৯]

22. Do you agree with the view that the rapid growth of population in India stands in the way of economic progress ? Give reasons for your answer. [পৃষ্ঠা ৬৩-৬৬]

23. What are the factors that have accelerated the growth of population on India during the last two decades or so ? What action is called for on the part of the state and the people (I.A.S. 1954) [পৃষ্ঠা ৫৮-৬০, ৬৬-৬৯]

24. Why is Fumily Planning essential in India ? Mention the main difficulties in its way and suggest measures to remove them. (Punjab 1957) [পৃষ্ঠা ৬৬-৬৯]

পঞ্চম অধ্যায়

25. Write a note on the importance of estimating National Income of a country with special reference to India. [পৃষ্ঠা ৭১-৭৩]

26. Discuss the difficulties in the way of a satisfactory estimation and analysis of National Income in India. (W. B. C. S. 1952) [পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪]

27. Bring out the main features of the National Income of India. [পৃষ্ঠা ৭৪-৭৭]

ষষ্ঠ অধ্যায়

28. Discuss the evils of subdivision and fragmentation of holdings and indicate the lines, on which attempts have been made to remedy the evils of excessive subdivision aud fragmentation of holdings. (C. U. B. Com 1944) [পৃষ্ঠা ৭৭-৮০]

29. Write a short note an Bhoodan Movement. [পৃষ্ঠা ৮০-৮৩]

30. Examine the case for and against Co-operative Farming in India. (C.U. [পৃষ্ঠা ৮৩-৮৮]

31. Write note on the concept of Economic Holding. Are agricultural land holdings in India economic ? [পৃষ্ঠা ৮০-৮১]

32. Write a note on Co-operative Village Management [পৃষ্ঠা ৮৮-৯০]

33. Would you like to have mechanized agriculture in India ? Explain clearly its possibilities and drawbacks in a country like India. (C. U. 1951) [পৃষ্ঠা ৯০-৯৩]

34. Describe the present system of marketing of agricultural produce in India. Point out the defects of this system and show how they can be overcome (C. U, 1943, Luck 1654) [পৃষ্ঠা ৯২-৯৪]

35. What measures would you suggest for improving agricultural marketing in India ? [পৃষ্ঠা ৯৫-৯৮]

36. Describe the main features of the Community Development Programme in India. (C. U. B. A. 1957) [পৃষ্ঠা ৯৮-১০১]

37. Give your own views on the achievements and prospects of the Community Development and National Extension Services in India. (C. U B. Com 1959) [পৃষ্ঠা ৯৮-১০১]

সপ্তম অধ্যায়

38. Discuss the principal types of land tenure in India and discuss the economic bearings of each. (C. U. B. Com, 1952) [পৃষ্ঠা ১০২-১০৪]

39. Discuss the different aspects of the question of fixing ceilings on agricultural holdings in India. (C. U. B. Com 1959) [পৃষ্ঠা ১০৫-১০৭]

অষ্টম অধ্যায়

40. Discuss the characteristics of Agricultural Labour in India. [পৃষ্ঠা ১১০-১১৭]

নবম অধ্যায়

41. Discuss the nature and extent of agricultural indebtedness in India. Show its harmful consequences. [পৃষ্ঠা ১১৭-১২১]

42. Analyse the causes of agricultural indebtedness in India. [পৃষ্ঠা ১১৭-১২১]

43. Examine the agencies for the supply of rural credit in India. How would you organise the system ? (C. U. B. A. 1957) [পৃষ্ঠা ১২১-১২২]

44. Give your own evaluation of the scheme of "integrated structure of rural credit" recommended by the All India Rural Credit Survey. (C. U B. Com. 1959) [পৃষ্ঠা [illegible]-১২৪]

45. Write a short note on the organisation and function of the Agricultur Re-Finance Corporation. [পৃষ্ঠা ১২৫-১২৭]

46. Describe the functions and workings of Land Mortgage Banks in India. [পৃষ্ঠা ১২৭-১২৯]

দশম অধ্যায়

47. What are the causes of food shortage in India ? Discuss the measures adopted by the Government of India to remedy the shortage. (C. U. B. A. 1958) [পৃষ্ঠা ১৩০-১৩৪]

48. Discuss in brief the recommendations of the Foodgrains Enquiry Committee, 1957. [পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৬]

একাদশ অধ্যায়

49. Trace briefly the history of the Co-operative Movement in India. What factors have been responsible for the slow progress of the movement in the country. (C. U. B. A. 1656) [পৃষ্ঠা ১৩৮-১৪০]

50. Describe the main features and the different forms of Co-operative Societies in India. [পৃষ্ঠা ১৪০-১৪৪]

51. Write notes on (a) Central Co-operative Banks and (b) State Co-operative Banks. [পৃষ্ঠা ১৪৩-১৪৪]

52. Discuss the possibilities of Co operation in respect of (a) agriculture and (b) cottage industries. (Cal. C. U. 1948) [পৃষ্ঠা ১৪০-১৪৪]

53. What do you understand by Multipurpose Co-operative Society ? How far has this type been successful in India ? (Ag. 1953) [পৃষ্ঠা ১৪৫-১৪৭]

54. Examine critically the achievements of the Co-operative movement in India. [পৃষ্ঠা ১৪৭-১৪৮]

55. State the measures adopted by the Government for the development of the Co-operative movement in the planning period. [পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৩]

সর্বদেশব্যাপী শিল্পোন্নতির প্রবল
চেষ্টা না থাকিলে কখনো মাতৃভূমির
সৌষ্ঠব সম্পন্ন হইতে পারে না।
—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলোতো এসব কাহাদের দান ?
—নজরুল ইসলাম

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প

(Cottage and Small Scale Industries)

[**বিষয়বস্তু :** ভূমিকা—সংজ্ঞা—ভারতীয় শিল্পকাঠামোয় কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান—ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের সমস্যা ও তাহাদের প্রতিবিধান—পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান—তৃতীয় পরিকল্পনা এবং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প—শিল্প তালুক]

ভূমিকা (Introduction) : বৃটিশ শাসনের পূর্বে কুটির শিল্পের এক গৌরবময় ভূমিকা ছিল। দেশের সম্পদ ও সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উৎস ছিল কুটির শিল্প। মধ্য-যুগে যে সকল পর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা ভারতের কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের কারুকার্য এবং শিল্পীর কলাকৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের বিশেষ সমাদর ছিল। ১৭৮৭ সালে ইংলণ্ডে ৩০ লক্ষ টাকার ঢাকাই মসলিন রপ্তানী হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ধীরে ধীরে কুটিরশিল্পের ধ্বংস আরম্ভ হইল। ইহার প্রধান কারণ বৈদেশিক প্রতিযোগিতা, বিদেশী শাসকের প্রতিকূল শাসননীতি ও বৃটিশ শাসন প্রসারের সহিত কুটিরশিল্পের পৃষ্ঠপোষক রাজতন্ত্রের অবসান। ইহা ছাড়া পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের সাথে সাথে দেশের লোকের রুচির পরিবর্তনও কিছু পরিমাণে এই শিল্পের ধ্বংসের জন্য দায়ী। এই সকল প্রতিকূলপ্রভাব সত্ত্বেও কুটিরশিল্প, কোনোদিনই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। এই শিল্প পার্শ্বজীবিকা (subsidiary) হিসাবে কৃষির অনুপূরক। সারাবৎসর কৃষিকাজ চলে না, সেই অবসর সময়ে কৃষক কুটিরশিল্পের উপর নির্ভর করিয়া কোনোরকমে দিন গুজরান করে। ভারতের বেকার সমস্যা সমাধানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পকে এক নূতন তাৎপর্য দেওয়া হইয়াছে। আমেরিকা, জাপান, জার্মাণী, ইংলণ্ড প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ক্ষুদ্রায়তন এবং কুটির শিল্পের বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৯২·৫ ভাগ হইল ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসা। দেশের মোট শ্রমিকদের মধ্যে ৪৫% লোক এই সকল ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত রহিয়াছে। জাপানে মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৮০ ভাগ হইল ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান। ইংলণ্ডের মোট উৎপাদনের শতকরা ১৯ ভাগ উৎপাদিত হয় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে এবং মোট শ্রমিকের শতকরা ২৯ ভাগ এই শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে।

অতীতের গৌরবময় ভূমিকা

কুটির শিল্পের ধ্বংসের কারণ

সংজ্ঞা (Definitions) : শিল্পকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয় (১) বৃহদায়তন শিল্প, (২) ক্ষুদ্রশিল্প এবং (৩) কুটির শিল্প। বৃহদায়তন শিল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করা খুবই সহজ; যে শিল্পে অনেক শ্রমিক কাজ করে, প্রচুর পরিমাণ মূলধন বিনিয়োজিত থাকে এবং উৎপাদনের পরিমাণ পর্যাপ্ত তাহাকে বড়বহরের শিল্প বা বৃহদায়তন শিল্প বলে। ফিসক্যাল কমিশনের মতে যে শিল্পে ৯০ জনের বেশী শ্রমিক কাজ করেনা তাহাকেই ক্ষুদ্র শিল্প বলা হইবে। অপর একটি সংজ্ঞা অনুসারে, প্রধানতঃ অপরের শ্রম ভাড়া করিয়া কম পরিমাণে উৎপাদন করিলে এবং কুটিরশিল্পের তুলনায় অধিক পরিমাণ মূলধন থাকিলে তাহাকে ক্ষুদ্রশিল্প বলে। কুটিরশিল্পের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হইয়াছে: যে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন প্রধানতঃ পরিবারের অথবা আশেপাশের লোক এবং স্বল্পপরিমাণ নিজস্ব মূলধন লইয়া পরিচালিত হয় তাহাকে কুটির শিল্প বলে। ক্ষুদ্রশিল্পবোর্ড ক্ষুদ্র শিল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে ক্ষুদ্রশিল্প শক্তির সাহায্যে চালিত এবং সাধারণতঃ শহর ও শহরতলীতে অবস্থিত। কিন্তু গ্রামেও ক্ষুদ্রশিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। পরিকল্পনা কমিশন যথার্থই বলিয়াছেন যে, কোনো সংজ্ঞাতেই ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পকে আলাদা করিয়া দেখানো যায় না।[1] ফিসক্যাল কমিশন বলেন গ্রাম্য এলাকায় কুটির শিল্প সাধারণতঃ কৃষির সহিত জড়িত এবং শুধুমাত্র সহরাঞ্চলেই ইহা হইতে পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে যে সকল শিল্পে ৫ লক্ষ টাকা বা তদপেক্ষা কম মূলধন বিনিয়োজিত আছে তাহাকে ক্ষুদ্রশিল্প বলা হয়।

শিল্প তিন ধরণের

শ্রীদেশমুখ বলেন যে বৃহদায়তন শিল্পের সুসংগঠিত উৎপাদন ব্যতীত সকল প্রকার উৎপাদনই কুটির শিল্পের অন্তর্গত। যাহারা কুটিরশিল্পে নিযুক্ত থাকে তাহারা প্রধানতঃ নিজেদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল এবং সাধারণতঃ গৃহে বসিয়া সাধারণ ধরণের যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করে। অপরপক্ষে ক্ষুদ্রশিল্পে আমরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে (entrepreneur) দেখি যিনি উৎপাদনের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করেন। যাহা হউক এই সকল সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে আমরা কুটির শিল্পের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, শ্রমিকের কুটিরেই উৎপাদন হয় এবং ভাড়াটে শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, মামুলী ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যবহার হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, ইহা হইতে পূর্ণ এবং স্বাধীন নিয়োগের ব্যবস্থা নাও হইতে পারে। কৃষি বা অন্য কোনো প্রধান উপজীবিকার পার্শ্বজীবিকা হিসাবে ইহা থাকিতে পারে। অপরপক্ষে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বৈশিষ্ট্য যে ইহাতে শ্রমিকের কুটিরে উৎপাদন হয় না কিন্তু উৎপাদকের মূলধনের পরিমাণ খুব বেশী হয় না। ভারতে প্রায় দুই কোটি লোক কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প হইতে জীবিকা অর্জন করিতেছে।

কুটির শিল্পের তিনটী বৈশিষ্ট্য

1. "A Cottage industry is one which is carried on wholly or primarily with the help of the members of the family, either as a whole or a part time occupation.

ভারতীয় শিল্প কাঠামোয় কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান (Place of Smallscale and Cottage industries in India's industrial structure): নূতন ফিসক্যাল কমিশন এবং পরিকল্পনা কমিশন উভয়েই পরিকল্পিত ভারতীয় শিল্প কাঠামোয় কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের পুনর্গঠনের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, এই শিল্পের সব চেয়ে বড় সুবিধা যে ইহা বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করিয়া দিয়াছে। জাতীয় আয় কমিটির (National Income Committee) হিসাবানুযায়ী ১৯৫০-৫১ সালে বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনের মূল্য ছিল ৪৫০ কোটি টাকা এবং নিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ, অপরপক্ষে ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯১০ কোটি টাকা এবং নিয়োগের পরিমাণ ছিল এক কোটি পনেরো লক্ষ লোক। ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যে কুটির শিল্পকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল কিন্তু কারখানা আইনের আওতায় পড়ে এমন ক্ষুদ্রায়তন কারখানাকে ধরা হয় নাই। এই সকল ক্ষুদ্রায়তন কারখানাকে হিসাবের মধ্যে ধরিলে কুটির শিল্পে মোট নিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াইবে দুই কোটি এবং বাৎসরিক উৎপাদন মূল্য ১২০০ কোটি টাকা। সুতরাং কর্মসংস্থানের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় বৃহদায়তন শিল্প অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ২২০ লক্ষ লোক বেকার থাকিবে—তৃতীয় পরিকল্পনায় মাত্র এক কোটি চল্লিশ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার নির্দেশ আছে। এই বিরাট বেকার সমস্যার সমাধান বৃহদায়তন শিল্পে হইবে না—ইহার একটি বৃহত্তর অংশের কর্মসংস্থান ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের মাধ্যমেই করা সম্ভবপর। স্মরণরাখা প্রয়োজন যে বৃহদায়তন শিল্প মূলধন-প্রধান (Capital-intensive) অর্থাৎ বৃহৎ শিল্পে যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা হয় সেই অনুপাতে নিয়োগ বৃদ্ধি পায় না। অপরপক্ষে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প শ্রম-প্রধান (labour-intensive) অর্থাৎ ক্ষুদ্রশিল্পে যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা হয় তদপেক্ষা অধিক অনুপাতে নিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

কর্মসংস্থানের সুযোগ

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে মূলধনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। ইহা বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটি বড় বাধা। এই কারণে আমরা এমন কতকগুলি শিল্প গঠন করিতে চাই যাহারা অধিক শ্রমিক এবং স্বল্প-মূলধন ব্যবহার করিবে। কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্প শ্রম-প্রধান বলিয়া ইহাতে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় না।

শ্রম-প্রগাঢ় মূলধন স্বল্প

তৃতীয়তঃ, কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমাইবার জন্যও ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের প্রসারের প্রয়োজন। ভারতের জনসংখ্যার মোট শতকরা ৬৯ জন লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভারতে কৃষি জীবনধারণের জন্য গঠিত এবং ইহা একটি মুনাফাবিহীন পেশা। ইহাছাড়া কৃষক বৎসরের কয়েক মাস মাত্র জমিতে কাজ করে এবং বাকী সময়

কৃষির উপর চাপ হ্রাস

কার্যাভাবে অলসভাবে কাটাইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় কুটিরশিল্পকে পার্শ্ববর্তী উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়া কৃষক তাহার আয় বৃদ্ধি এবং অবসর সময়ের যথাযথ ব্যবহার করিতে পারে। ইহা ছাড়া কোনো বৎসর অজন্মা হইলে কৃষক কুটিরশিল্পকে শেষ আশ্রয় হিসাবে লইতে পারিবে। কুটিরশিল্পের প্রসার হইলে জমির উপর জনগণের চাপ এবং নির্ভরশীলতা হ্রাস পাইবে।

চতুর্থতঃ, বিকেন্দ্রীকরণের যুক্তিতে কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার সমর্থন করা হয়। বৃহদায়তন শিল্পগুলি যখন গড়িয়া ওঠে (সাধারণতঃ নগরাঞ্চলে) তখন সেগুলি নানাকারণে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে গৃহসমস্যা, স্বাস্থ্যসমস্যা এবং জনাধিক্য সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু কুটিরশিল্প এবং ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারের সাথে সাথে এই ধরণের কোনোরূপ সমস্যা দেখা দেয় না। দেশের সর্বত্র কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প গড়িয়া উঠিলে বৃহদায়তনশিল্পের আঞ্চলিক কেন্দ্রীভবণজনিত অসুবিধা দূর হয়। শিল্পকে সারা দেশের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারিলে আকাশযুদ্ধের সময় কেন্দ্রীভূত শিল্পাঞ্চলের উপর আক্রমণ করিয়া দেশের আর্থিকজীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা কঠিন হয়। ইহা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে শিল্পকে বিকেন্দ্রীকরণ করিয়া দিতে পারিলে ইহা গ্রামাঞ্চলে বিনিয়োগের অভ্যাস গড়িয়া তুলিবে।

বিকেন্দ্রীকরণ

পঞ্চমতঃ, ক্ষুদ্রশিল্পের সামাজিক ব্যয় (social cost) বৃহদায়তন শিল্প অপেক্ষা অনেক কম। বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় ইউনিট প্রতি উৎপাদন ব্যয় কম হয় এবং ইহা সত্য যে ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হইলে বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যায় না কিন্তু এই অসুবিধা বণ্টনগত সুবিধার দ্বারা কিছু পরিমাণে পূরণ হইয়া যায়। বৃহদায়তনশিল্পের জন্য অধিক পরিমাণে পরিবহন এবং যোগাযোগের সুবিধা প্রয়োজন হয় কিন্তু ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে উহার বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

সামাজিক ব্যয় কম

ষষ্ঠতঃ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সমাজগঠন ভারতের অর্থনৈতিক নীতির লক্ষ্য। আর্থিকবৈষম্য হ্রাস করিতে কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের একটি বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। বৃহদায়তন শিল্প কয়েকজন মুষ্টিমেয় শিল্পপতির হাতে দেশের সকল অর্থ কেন্দ্রীভূত করিতেছে; ফলে ধন-অসাম্য বাড়িয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র এবং কুটিরশিল্পের প্রসার করিতে পারিলে আয়বৈষম্য কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ধনবৈষম্য হ্রাসের উপায়

সপ্তমতঃ, বৃহদায়তন শিল্পে শুধুমাত্র প্রচুর মূলধনেরই প্রয়োজন হয় না, যথেষ্ট উন্নত কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। ভারতে বর্তমানে টেকনিসিয়ানের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। ভারতের মতো দেশে বৃহদায়তন শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটিতেছে না এবং যতদিন বৃহদায়তন শিল্পের দ্রুত প্রসার না ঘটে ততদিন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে কৃষি এবং ক্ষুদ্রশিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

উন্নত কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

অষ্টমতঃ, ক্ষুদ্র এবং কুটিরশিল্পে যে পরিমাণ দামের উঠানামা হয়, বৃহদায়তন শিল্পে তদপেক্ষা অনেক বেশী হয়। ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে স্থির ব্যয় কম বলিয়া ইহা সহজেই মন্দার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

দামের তারতম্য কম হয়।

পরিশেষে, পরিকল্পনার ফলে যে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ এবং ক্রয়ক্ষমতার সৃষ্টি হইতেছে তাহা যাহাতে মুদ্রাস্ফীতি না ঘটাইতে পারে তাহার জন্য ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে অধিকমাত্রায় ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে হইবে। ভারীশিল্পে ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া অতি দ্রুত ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয় না। স্বল্পকালে ভোগ্যদ্রব্যের বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইতে কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে।

মুদ্রাস্ফীতিরোধ

ক্ষুদ্র এবং কুটিরশিল্পের সমস্যা ও তাহাদের প্রতিবিধান (Problems of Cottage and Small Scale industries and their remedies) : ভারতীয় কুটিরশিল্প নিম্নলিখিত সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে :

প্রথমতঃ, **মূলধনের সমস্যা :** ক্ষুদ্র এবং কুটিরশিল্পের উদ্যোক্তাব দুই ধরণের মূলধনের প্রয়োজন হয়—দীর্ঘকালীন মূলধন এবং স্বল্পকালীন মূলধন। যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য দীর্ঘকালীন মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং কাঁচামাল কিনিবার এবং মজুরী দিবার জন্য স্বল্পকালীন মূলধনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদকগণ সাধারণতঃ দরিদ্র এবং জামিন দিবার মতো কোনো সম্পত্তিই তাহাদের নাই। ক্ষুদ্রশিল্পের উৎপাদকগণের সামান্য পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়, সেই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ইহাদের ঋণ সরবরাহ করা লাভজনক বলিয়া মনে করে না। এই কারণে ক্ষুদ্রশিল্পের উৎপাদকগণ সাহুকর, মহাজন প্রভৃতির শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হয়। উচ্চহারে সুদ আদায় করা ব্যতীত ইহারা অল্পদামে তাহাদের কাছে দ্রব্যবিক্রয়ের সর্তে ঋণ দিয়া থাকে। এইভাবে উৎপাদকগণ তাহাদের ন্যায্য দাম হইতে বঞ্চিত হয়। অন্যান্য দেশগুলিতে সমবায় সমিতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিয়া থাকে কিন্তু ভারতে সমবায় আন্দোলন বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। মূলধন সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ উন্নয়ন কর্পোরেশন (Special Development Corporation) গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে। আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশান কর্তৃক পরিচালিত আন্তর্জাতিক প্ল্যানিং টিম (International Planning Team, 1954) ঋণের অভাব দূরিকরণের জন্য চারিটি সুপারিশ করেন : (১) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আঞ্চলিক শাখাসমূহ ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে অধিক পরিমাণে ঋণদান করিবে, (২) সমবায় ব্যাংকগুলিকে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে ; (৩) প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া ষ্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন থাকিবে এবং ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োগের জন্য উহারা মূলধনের একটি অংশ সংরক্ষিত করিয়া রাখিবে ; (৪) সম্পত্তি বন্ধকের বিনিময়ে ঋণদানের ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

মূলধন

দ্বিতীয়তঃ, **কাঁচামাল সংগ্রহের অসুবিধা :** কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলি নিয়মিতভাবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট ধরণের কাঁচামাল পায় না; ফলে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ইহা ছাড়া অনেক মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী (অর্থাৎ ফড়িয়া) থাকার দরুণঃ কাঁচামালের দাম বেশী হয় এবং সেই কারণে শিল্পজাত দ্রব্যেরও দাম বাড়িয়া যায়। বিক্রয়মূল্য বেশী বলিয়া বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প আঁটিয়া উঠিতে পারে না। ক্ষুদ্রশিল্পের মালিক এক সঙ্গে অধিক পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করে না বলিয়া খুচরাদামে (অর্থাৎ পাইকারীদাম অপেক্ষা বেশী দামে) কাঁচামাল কিনিতে হয়। ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পগুলি যাহাতে ন্যায্যমূল্যে উৎকৃষ্ট কাঁচামাল পাইতে পারে তাহার জন্য সমবায় সমিতি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

কাঁচামাল

তৃতীয়তঃ, **অনুন্নত উৎপাদন পদ্ধতি এবং শিল্প কৌশলজনিত সমস্যা :** ক্ষুদ্র এবং কুটিরশিল্পের উৎপাদনপদ্ধতি অত্যন্ত অনুন্নত। ইহারা অতি প্রাচীন যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন করিয়া থাকে। আধুনিক যন্ত্রপাতি বি[illegible] প্রসার লাভ করে নাই। গবেষণা ও শিক্ষার বিশেষ সুযোগ সুবিধা [illegible] এবং গুণগতবিচারে উৎপন্ন দ্রব্যের মান নিম্নস্তরের। আধুনিক রুচি ও ফ্যাশন অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদনের বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায় না। আধুনিক ধরণের ছোট ছোট যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে হইবে এবং চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ডিজাইন ও প্যাটার্ণের পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে।

অনুন্নত উৎপাদন পদ্ধতি

আন্তর্জাতিক প্ল্যানিং টিম উৎপাদনপদ্ধতি উন্নয়নের এবং কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য কয়েকটি সুপারিশ করেন। এই টিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চারিটি করিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Regional Institutes of Technology) স্থাপনের প্রস্তাব করেন। প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্রশিল্পের কারিগরদিগকে যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবে, উন্নতধরণের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে খোঁজখবর দিবে, গবেষণা করিবে এবং তাহার ফলাফল কারিগরদিগকে জানাইবে। ইহা ব্যতীত ডিজাইন এবং ফ্যাসান শিক্ষা দিবার জন্য একটি জাতীয় ডিজাইন শিক্ষালয় (National School of Designs) স্থাপনের সুপারিশ করেন। কাজ করিতে করিতেই যাহাতে কর্মীরা উন্নতশিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষা-সমেত উৎপাদন কেন্দ্র (training cum production centre) স্থাপন করা প্রয়োজন। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য গবেষণাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আন্তর্জাতিক প্ল্যানিং টীমের সুপারিশ

চতুর্থতঃ, **কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় সমস্যা :** দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বা তৎপরবর্তী কয়েক বৎসর বিক্রয়ের কোনোরূপ সমস্যা ছিল না কারণ তখন চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণ কম ছিল। কিন্তু দ্রব্যের নির্দিষ্ট মান না থাকায় এবং মধ্যবর্তী ব্যবসায়ের অস্তিত্বের ফলে তখনো ক্ষুদ্রশিল্পের মালিকেরা তাহাদের দ্রব্যসামগ্রীর ন্যায্য মূল্য পাইতেছিল না। বর্তমানে বিক্রয় সমস্যা আরো তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। সাধারণ লোকের আয় ক্ষমতা

বিক্রয় সমস্যা

হ্রাস পাওয়ায় চাহিদা কমিয়া গিয়াছে। চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদকেরা যাহাতে ন্যায্য দাম পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া চাহিদা বাড়াইতে পারা যাইবে। ক্যানাডা, নিউজিল্যাণ্ড আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা রহিয়াছে। এই সকল দেশ ভারত হইতে কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিতেছে এবং অধিক ক্রয় করিবার জন্য অনুসন্ধান করিতেছে। তথাপি এই সকল দেশে ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে না তাহার কারণ চাহিদা অনুযায়ী নমুনা অনুসারে নির্দিষ্ট ধরণের দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা নাই। শিল্পজাতদ্রব্যের মান নির্দিষ্ট করিয়া নমুনা অনুসারে দ্রব্য সরবরাহ করিলে এই সকল বাজারের চাহিদা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। আন্তর্জাতিক প্ল্যানিং টিম বিদেশী বাজার প্রসারের জন্য রপ্তানী উন্নয়ন অফিস (Export Development Office) স্থাপনের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। বাহিরের বাজারের সম্প্রসারণের সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ বাজার বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক প্ল্যানিং টিমের সিদ্ধান্ত এই যে ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম সম্ভাব্য (Potential) বাজার। ইহার কারণ ইহার জনসংখ্যা আয়তনে বিরাট এবং মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ অত্যন্ত কম। আভ্যন্তরীণ বাজারে কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্যকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য প্রদর্শনী, মিউজিয়াম ও সুনিপুণ প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পঞ্চমতঃ, **বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখা এক সমস্যা:** অনেক ক্ষেত্রেই কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না, ইহার জন্য প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পকে সংগঠন করা এবং যতদিন পর্যন্ত না এই শিল্পগুলি প্রাথমিক বাধাসমূহ অতিক্রম করিয়া স্বাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইতে পারে ততদিন পর্যন্ত বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিতে হইবে এবং বৃহৎ শিল্পগুলির উপর শুল্ক ধার্য করিতে হইবে। ইহাছাড়া দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যাপারে কর অব্যাহতির ব্যবস্থা করিয়াও কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাইবে।

বাঁচাইয়া রাখার সমস্যা

ষষ্ঠতঃ, **বৃহদায়তন এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান** করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক হইতে পারে। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র শিল্পের দ্বারা আংশিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের বাকী অংশ বৃহদায়তন শিল্পে সম্পন্ন হইতে পারে। ১৯৫৫ সালে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (National Small Industries Corporation Ltd.) স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইল ক্ষুদ্র এবং বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

সামঞ্জস্যবিধানের সমস্যা

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটীর এবং ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান (Cottage and Small Scale industries under the Five Years Plans): প্রথম পঞ্চ-

বার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের গুরুত্বকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার উন্নতির সাথে সাথে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে, জীবনযাত্রার মান উন্নততর হইবে এবং গ্রামীন অর্থনৈতিক সংগঠনে অধিকতর ভারসাম্য দেখা দিবে। যেখানে বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা রহিয়াছে সেখানে কুটির-শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে: (১) বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সংকোচন (২) বৃহদায়তন শিল্পের উপর শুল্ক ধার্যকরা (৩) কুটির ও ক্ষুদ্র-শিল্পের উৎপাদন ক্ষেত্র সংরক্ষণ করা এবং (৪) কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে কাচামাল যোগানের ব্যবস্থা করা। কুটিরশিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে ১৭·৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। পরে মিলবস্ত্রের উপর "সেস" বসাইয়া ২০ কোটি টাকা পাওয়া যায়। বিভিন্ন রাজ্য সরকার মিলিয়া ১২ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোট [illegible] ব্যয়ের পরিমাণ হয় ৪৩ কোটি টাকা।

প্রথম পরিকল্পনায় কুটিরশিল্প

[এক] ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের উন্নয়নের দায়িত্ব প্রধানতঃ রাজ্য সরকার-দিগের হইলেও প্রথম পরিকল্পনাকালে ইহাদের সমস্যা ও উহার সমাধানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ছয়টি বোর্ড স্থাপন করেন—(ক) সারা ভারত খাদি ও গ্রামশিল্প বোর্ড (All India Khadi and Village Industries Board), (খ) সারা ভারত হস্তশিল্প বোর্ড (All India Handicrafts Board), (গ) সারা ভারত তাঁতশিল্প বোর্ড (All India Handloom Board) (ঘ) ক্ষুদ্রশিল্প বোর্ড (Small Scale Industries Board), (ঙ) কেন্দ্রীয় সিল্কবোর্ড (Central Silk Board) এবং (চ) নারিকেল দড়ি বোর্ড (Coir Board).

[দুই] ইহা ছাড়া কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের জন্য প্রথম পরিকল্পনাকালে বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক (cess) আরোপ করা হয়, বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণের উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয় এবং অনেকক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় প্রসারের জন্য রিবেট (rebates) দেওয়া হয়।

[তিন] ক্ষুদ্রশিল্পকে ঋণদানের অধিকতর সুযোগ এবং সুবিধাদান করিবার জন্য রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন (State Finance Corporation) স্থাপিত হয়। ইহা ব্যতীত ১৯৫৫ সালে জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন স্থাপিত হয় এবং ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের নিকট হইতে যাহাতে সরকার তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে তাহার বন্দোবস্ত করা এবং ঋণদানের ব্যাপারে ক্ষুদ্রশিল্পকে গ্যারান্টি প্রদানের ব্যবস্থা করা। রিজার্ভ ব্যাংক আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য সমবায় ব্যাংক-গুলিকে অর্থ দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

[চার] ফোর্ড ফাউণ্ডেশান দল চারিটি আঞ্চলিক কারিগরী প্রতিষ্ঠান (Regional Institutes of Technology), একটি বিক্রয় সেবা কর্পোরেশন (Marketing

Service Corporation) এবং একটি ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন (Small Industries Corporation) স্থাপনের সুপারিশ করেন। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সকল সুপারিশই প্রথম পরিকল্পনাকালে গৃহীত হয়।

[পাঁচ] পরিশেষে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের চেষ্টা করা হয় এবং ব্লকের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য একজন ব্লক শিল্প উন্নয়ন অফিসার (Block Industrial Development Officer)-এর পদ সৃষ্টি করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কুটির শিল্প

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের উপর অনেক বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাহা প্রধানতঃ কার্ভে কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া। এই কমিটি ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের উন্নয়নেয় জন্য ২৬০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের সুপারিশ করেন। কমিটি কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের সুপারিশের সময় তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হন। প্রথমতঃ কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের যান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে শিল্পে যাহাতে নিয়োগের পরিমাণ সংকুচিত না হয় তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে সকল লোক বর্তমানে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প হইতে জীবিকা অর্জন করিতেছে তাহাদিগকে কাজে বহাল রাখিয়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পোন্নয়নের মূলনীতি হইবে বিকেন্দ্রীকরণ। এই সকল শিল্প দেশের প্রত্যেক অংশে গড়িয়া তুলিতে পারিলে দেশের বৃহদায়তন শিল্পগুলির আঞ্চলিক একদেশতা জনিত অসুবিধা দূর হইবে। তৃতীয়তঃ, পরিকল্পনাকালে কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের সাহায্যে যতদূর সম্ভব কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করিতে হইবে।

কার্ভে কমিটির (ইহা গ্রামীন এবং ক্ষুদ্রশিল্প কমিটি [Village and Small Scale Industries Committee] ১৯৫৫ নামেও পরিচিত) প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি এইরূপ :—

কার্ভে কমিটির সুপারিশ

[এক] রাষ্ট্র সমবায় সমিতিগুলিকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিবে যাহাতে তাহারা কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতে পারে। সরকার, রিজার্ভ ব্যাংক, ষ্টেটব্যাংক কিভাবে কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পকে সাহায্য করিতে পারে তাহার পন্থা এই কমিটি নির্দেশ দিয়াছেন। এই কমিটি আরও বলিয়াছিলেন যে যতদিন পর্যন্ত না এ সকল শিল্পের জন্য নূতন সুসম্বদ্ধ (new integrated structure of institutional credit) প্রতিষ্ঠানগত ঋণদান সংস্থা গড়িয়া ওঠে ততদিন পর্যন্ত বর্তমান সংগঠনসমূহ প্রয়োজনীয় ঋণ এবং সাহায্য দিবে।

[দুই] রাষ্ট্র ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পকে অর্থ সাহায্য করিবে কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে কমিটি রাষ্ট্র কর্তৃক সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদিত ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের সর্বনিম্ন দাম বাঁধিয়া দিবার সুপারিশ করেন। ক্রয়মূল্য অপেক্ষা বিক্রয়মূল্য কম হওয়ার কারণ কোনো ক্ষতি হইলে রাষ্ট্র তাহার ক্ষতিপূরণ করিবে।

[তিন] ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক আরোপ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা সীমিত করিয়া এবং ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্র সংরক্ষণ করিয়া কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পকে সহায়তা করিতে হইবে।

[চার] কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য একজন বিভাগীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রীদপ্তর খোলার সুপারিশ এই কমিটি করেন।

[পাঁচ] সমবায়ের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎকৃষ্ট কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমবায় সমিতির মাধ্যমেই ক্রয়বিক্রয় করিতে হইবে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে গুদাম তৈয়ারী করিতে হইবে। এই সকল গুদামে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পপতিগণ তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য জমা রাখিয়া প্রয়োজনীয় অর্থগ্রহণ করিতে পারিবে।

[ছয়] দীর্ঘকালীন ঋণের জন্য রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশনের একাংশে কুটিরশিল্প বিভাগ খোলা প্রয়োজন।

[সাত] কৃষিঋণের ন্যায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণ যোগানের সামগ্রিক দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাংকের গ্রহণ করা উচিত। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ঋণ সরবরাহের ব্যাপারে ষ্টেট ব্যাংকের কর্মপরিধি সম্প্রসারণশীল হওয়া প্রয়োজন।

[আট] কমিটির নিয়ন্ত্রণমূলক এবং ঋণাত্মক সুপারিশগুলির (restrictive and negative) মধ্যে তিনটি প্রধান; প্রথমতঃ, তাঁতবস্ত্র এবং ঢেঁকিতে চাল তৈয়ারীর উৎপাদনের কিছুটা ক্ষেত্র সংরক্ষণ করা; দ্বিতীয়তঃ, ভেজিটেবল তৈল এবং চামড়া শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনক্ষমতা সংকোচ করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ, মিলবস্ত্র, ভেজিটেবল তৈল, মিলের চাল এবং চামড়া শিল্পের উপর সেস এবং উৎপাদন শুল্ক বসাইতে হইবে।

কার্ভে কমিটির সুপারিশসমূহ তীব্রভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, কমিটি কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে আধুনিক রূপ দিবার কথা বলিয়াছেন এবং একই সঙ্গে বলিতেছেন যে ইহার ফলে যদি বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহা হইলে ইহা করা হইবে না। এই সকল শিল্পগুলিকে আধুনিকীকরণ করা হইবে অথচ কিছু শ্রমিক বেকার হইবে না ইহা স্ববিরোধী।

দ্বিতীয়তঃ, কার্ভে কমিটির উদ্দেশ্য বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পকে রক্ষা করা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দেশীয় মিলের কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না। বিদেশীয় বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্য ভারতের কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে। যদি ক্ষুদ্রশিল্পের স্বার্থে আমরা আমদানী বন্ধ করিয়া দিই তাহা হইলে আমাদের রপ্তানীও বন্ধ হইয়া যাইবে। ফলে ভারতের রপ্তানীশিল্প ধ্বংস হইয়া যাইবে।

তৃতীয়তঃ, কার্ভে কমিটির সুপারিশগুলি গ্রহণ করা হইলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে দ্রুত শিল্পায়ন এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে তাহা অর্থহীন হইয়া পড়ে। যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা তখনই প্রয়োজন যখন তাহার চাহিদা থাকে এবং যন্ত্রপাতির চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে যদি ভোগ্যবস্তু উৎপাদনকারী শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে। কিন্তু যেহেতু কমিটি মিল শিল্পের উৎপাদনের উপর সেস বসাইয়া ইহা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে, সেই কারণে ভবিষ্যতে ভারতের যন্ত্রপাতির চাহিদা বাড়িবে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য ১৮০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনা এবং কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প: কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উৎপাদন এবং বৈষম্যহ্রাসকরণে কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্প প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যথেষ্ট অবদান যোগাইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই সকল শিল্পগুলির ভূমিকা এবং দায়িত্ব অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। [redacted] ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য উন্নততর যান্ত্রিক পদ্ধতি এবং সংগঠনের মাধ্যমে উৎপাদন করা যাহাতে উন্নয়নের ফলে যে সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা পূর্ণভাবে কাজে লাগানো; অবশ্য সেইসঙ্গে যান্ত্রিক কৌশল এরূপ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যেন যান্ত্রিক বেকারত্ব পরিহার করা যায়।

তৃতীয় পরি
ও কু

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রশিল্প প্রায় ৫ লক্ষ কারিগর এবং স্ত্রীলোকের আংশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ক্ষুদ্রশিল্প (বা গ্রামশিল্প) ২.৭ মিলিয়ন লোকের আংশিক এবং ৩৫০ লোকের পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রাম এবং ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যসূচী রূপায়নের ব্যাপারে নিম্নলিখিত পাঁচটি নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে:

(১) কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিতে হইবে।

(২) অর্থসাহায্য, বিক্রয় রেয়াৎ (sales rebates) এবং সংরক্ষিত বাজারের উপর নির্ভরশীলতা কমাইয়া আনিতে হইবে।

(৩) ছোট ছোট শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে শিল্পের বিকাশসাধন করিতে হইবে।

(৪) বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক হিসাবে ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশ সাধন করিতে হইবে, এবং

(৫) কর্মী এবং কারিগরদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করিবার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

[এক] কারিগরী এবং পরিচালকদের শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে।

[দুই] তৃতীয় পরিকল্পনায় ঋণদান ব্যবস্থার প্রসার করা হইবে। ন্যায়সঙ্গত সুদের হারে এবং বিলম্ব না করিয়া ঋণদানের ব্যবস্থা করা হইবে। ব্যাংক ও অন্যান্য

অর্থ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতেই যাহাতে অধিক ঋণ পাওয়া যায় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

[**তিন**] প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সাধারণ উৎপাদন কর্মসূচী (Common Production Programme) গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প এবং বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনের ক্ষেত্র নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থির হইয়াছে যে "সাধারণ উৎপাদন কর্মসূচী" গ্রহণের পূর্বে পুংখানুপুংখ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

[**চার**] কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে সহায়তার উদ্দেশ্যে কর্মসূচী ক্রমশই বিস্তৃততর হইতেছে বলিয়া সাহায্যদান, বিক্রয়রেয়াৎ, সংরক্ষিত বাজারের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশই কমাইয়া আনিতে হইবে। অবশ্য কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহার আরও কিছুদিন থাকিবে।

[**পাঁচ**] তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চল, ছোট ছো[illegible] এবং অনুন্নত এলাকায় ক্ষুদ্রশিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে।

[**ছয়**] বৃহৎশিল্পের পরিপূরক হিসাবে ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির বিভিন্ন পন্থা [illegible] পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের সহিত বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের সংযোগ স্থাপন উৎসাহিত করা হইতেছে।

[**সাত**] তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায় সমিতিগুলিকে সুদৃঢ় করিতে হইবে এবং অধিক সংখ্যক কর্মীকে সমবায়ের অধীনে আনিতে হইবে। যে সকল ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় প্রসারলাভ করে নাই সেখানে সমবায় গড়িয়া তুলিতে উৎসাহিত করিতে হইবে।

[**আট**] তৃতীয় পরিকল্পনায় কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য ২৬৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। ব্যয়ের হিসাব নিম্নলিখিতরূপ।

শিল্প	রাজ্যগুলির ব্যয়+	কেন্দ্রের ব্যয়	=মোটব্যয়
হস্তচালিত তাঁত শিল্প	৩১·০	৩·০	৩৪·০
শক্তিচালিত তাঁত	——	৪·০	৪·০
খাদি	৩·৪	৮৯·০	৯২·৪
সিল্ক	৫·৫	১·৫	৭·০
নারিকেল কাতা	২·৪	০·৮	৩·২
হস্তশিল্প	৬·১	২·৫	৮·৬
ক্ষুদ্রশিল্প	৬২·৬	২২·০	৮৪·৬
শিল্প-তালুক	৩০·২	——	৩০·২
মোট ব্যয়	১৪১·২	১২২·৮	২৬৪·০

এই ব্যয়বরাদ্দ ব্যতীত সমষ্টি উন্নয়ণ কর্মসূচীতে আরও ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রহিয়াছে। বেসরকারী বিনিয়োগ ২৭৫ কোটির মতো হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

[নয়] তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন আয়তনবিশিষ্ট ৩০০ শিল্পতালুক (industrial estates) স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার শেষে ১০টি শিল্প তালুক ছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে আরও ৬০টি শিল্পতালুক স্থাপিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই সকল শিল্পতালুক যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র শহরের নিকট স্থাপন করিতে হইবে।

[দশ] তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট সরকারী এবং বেসরকারী বিনিয়োগের ভিত্তিতে হিসাব করা হইয়াছে যে ৮০ লক্ষ লোকের আংশিক এবং ৯ লক্ষ লোকের পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে।

শিল্পতালুক (Industrial Estates) : ১৯৫৫ সালে ক্ষুদ্রশিল্প বোর্ড (Small Scale Industries Board) ভারতে শিল্প-তালুক স্থাপনের সুপারিশ করে। শিল্প-তালুকগুলি সাধারণতঃ দুই ধরণের হয়—বৃহৎ শিল্প-তালুক এবং ক্ষুদ্র শিল্পতালুক। ১৯৬১ সালে দেশে ৬০টি শিল্প-তালুক প্রতিষ্ঠিত হয়; আর ওই শিল্পতালুকগুলিতে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থার সংখ্যা ছিল একহাজারেরও অধিক। বৃহৎ শিল্প-তালুকগুলির প্রতিটির ব্যয় হয় ৪০ হইতে ৫০ লক্ষ টাকা আর ছোট শিল্প তালুকগুলির জন্য ব্যয় হয় ২০ হইতে ২৫ লক্ষ টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় শহরাঞ্চলে ছোট বড় বিভিন্ন ধরণের ৩০০ শিল্প তালুক নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ১৫ হইতে ৬০ একর স্থান লইয়া এক একটি শিল্প-তালুক স্থাপিত হইবে।

কুটির শিল্পের প্রসার, মূলধন, কাঁচামাল এবং শ্রমিকের যোগান ছাড়া আরও অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, রেলওয়ে সাইডিং ইত্যাদির সুযোগ চাই। সরকারী ব্যয়ে শহরের নিকট এই সকল বিষয়গুলি সরবরাহের ব্যবস্থাই শিল্প-তালুক নামে পরিচিত। এই সকল শিল্প-তালুকে শিল্প সংক্রান্ত সুবিধা ছাড়াও সরকারী ব্যয়ে শ্রমিকদের বাসগৃহ, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, পার্ক ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে। শিল্পতালুক নির্মাণের সকল ব্যয়ভারই রাজ্য সরকারগুলি বহন করিবে।

শিল্প-তালুকগুলি শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক। ইহা শহরাঞ্চলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির চাপ হ্রাস করিতে সহায়তা করিবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় সাধারণতঃ ছোট এবং মাঝারি ধরণের শহরের নিকট শিল্প-তালুক প্রতিষ্ঠা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য যে সকল গ্রামীন এলাকায় শক্তি, জলসরবরাহ এবং অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যায় সেখানেও শিল্প-তালুক প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা করা যাইবে। সহরাঞ্চলে শুধুমাত্র জমি সরবরাহের দায়িত্বই সরকার গ্রহণ করিবেন। কারখানাঘর উদ্যোক্তা নির্মাণ করিবে। শিল্প-তালুকগুলির মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক দ্রব্য উৎপাদন করিবে। এইগুলিকে কার্যগত তালুক (functional estates) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প

(Some Large Scale Industries)

[**বিষয়বস্তু :**—পাটশিল্প—বস্ত্রশিল্প—লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—চিনিশিল্প—কাগজ শিল্প—কয়লা-শিল্প—চা-শিল্প]

ভারতে কয়েকটি সুগঠিত বৃহদায়তন শিল্প গড়িয়া উঠিলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রেট-বৃটেনে যে ধরণের শিল্পবিপ্লব দেখা দিয়াছিল আজও তাহা আমাদের দেশে আসে নাই। ভারতে মাথাপিছু শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন অত্যন্ত অল্প এবং দেশের মোট জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্রঅংশই বৃহদায়তন শিল্পে [illegible] রহিয়াছে। ১৯৬৯ সালে ভারতীয় শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের দৈনিক গড় সংখ্যা ছিল মাত্র ৬ লক্ষ ; বর্তমানে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৬ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কিন্তু মোট ৫৪ কোটি জনসংখ্যার তুলনায় ইহা অতি ক্ষুদ্র সংখ্যা এবং দেশে শিল্পোন্নতির অফুরন্ত সুযোগ রহিয়াছে।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতীয় শিল্পের মোটামুটি তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই : (১) অসম এবং অপরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিল্পের বিকাশ ; (২) বস্ত্র এবং চিনি ইত্যাদি কতকগুলি শিল্পে অত্যধিক উৎপাদন সমস্যা এবং (৩) ইঞ্জিনিয়ারীং, ভারী রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদির অভাব। বর্তমানে জাতীয় সরকারের প্রচেষ্টায় এই ত্রুটিগুলি কিছু পরিমাণে দূর হইয়াছে। নিম্নে ভারতের প্রধান প্রধান বৃহদায়তন শিল্পগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল :

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য

[এক] পাটশিল্প (Jute Industries) : ১৮৫৫ সালে জর্জ অকল্যাণ্ড নামে জনৈক স্কচ ভদ্রলোক শ্রীরামপুরের নিকট রিষড়ায় প্রথম পাটকল স্থাপন করেন। এই কলটি স্থাপিত হইবার পর প্রথম ৩০ বৎসর যাবৎ এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ১৮৫৯ সালে শক্তির সাহায্যে তাঁত পরিচালনার কাজ আরম্ভ হয় বরানগরের পাটকলে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই শিল্প বিশেষ প্রসারলাভ করে কারণ সামরিক প্রয়োজনে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যায়। এই সময় পাটকলের সংখ্যা এবং বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। কিন্তু ১৯২৯-৩৩ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় বাংলার পাটশিল্প চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। এই সময় কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই শিল্পের আবার সুদিন দেখা দেয়। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ এই শিল্পের উপর চরম আঘাত হানিয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানেই বেশী পাটের চাষ হয় এবং ভারতে উৎপাদিত পাটের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অনেক কম। বর্তমানকালে এই শিল্পের একটি

পাটশিল্পের বিবর্তন

রাউরকেল্লা : উড়িষ্যায় অবস্থিত এই লৌহ ও ইস্পাত কারখানাটি কয়েকটি জার্মান প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় স্থাপিত হইয়াছে। রাউরকেল্লার নিকটবর্তী অঞ্চলে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। নিকটবর্তী অঞ্চলে কয়লার খনিও রহিয়াছে এবং রেলপথে ইহা কলিকাতা ও বিশাখাপত্তম্ বন্দরের সহিত যুক্ত। তৃতীয় পরিকল্পনায় বোকারোতে চতুর্থ সরকারী লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইতেছে। নীভেলিতে একটি লৌহপিণ্ডের কারখানাও স্থাপিত হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য ৫২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ বরাদ্দ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ইস্পাতের মোট উৎপাদন ২৪ মিলিয়ন টন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

সমস্যা (Problems) : মূলধনের সমস্যা এই শিল্পটির সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপন করিতে ১০০ কোটি টাকার মতো ব্যয় হয় ; তাছাড়া বর্তমান কারখানাগুলির সম্প্রসারণের জন্যও প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। বেসরকারী কারখানাগুলিকে সম্প্রসারণের জন্য বিশ্বব্যাংক এবং ভারত সরকার ঋণ দিয়াছে। ইহার ফলে টাটার লৌহ ও ইস্পাত কারখানার ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতা ৯ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২২ লক্ষ টনে লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। সরকারী লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ক্ষেত্রে জার্মানী, বৃটেন এবং সোবিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতা গ্রহণ করা হইয়াছে। বোকারো কারখানাটি মার্কিন সহযোগিতায় স্থাপিত হইতেছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের চারটি সমস্যা

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে লৌহ আকরিক পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তিনগুণ) পরিমাণে থাকিলেও ধাতু নিষ্কাশক কয়লার পরিমাণ খুব বেশী নয়। উৎকৃষ্ট কয়লা সংরক্ষণ বিশেষ প্রয়োজন এবং ক্রুপরেন (Krupp-Renn) পদ্ধতিতে লৌহশিল্পে নিকৃষ্ট কয়লার ব্যবহার প্রবর্তন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ এই শিল্পে কারিগরী জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীর খুবই অভাব রহিয়াছে। দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এইদিকে যথোচিত দৃষ্টি দেওয়ার সময় আসিয়াছে। চতুর্থতঃ, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব এই শিল্প সম্প্রসারণের একটি বিরাট প্রতিবন্ধক। বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতার জন্য বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করা বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে।

এই শিল্পের সম্ভাবনাময় এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে। দেশের অবস্থা এই শিল্প সম্প্রসারণের অনুকূল। মূল শিল্প হিসাবে সঙ্গত কারণেই জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে ইহা অগ্রাধিকার দাবী করিতে পারে।

[চার] চিনি শিল্প (Sugar Industry) : অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে দেশীয় প্রথায় চিনি উৎপাদন হইয়া আসিতেছে কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদন অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ব্যাপার। ১৯০৩ সালে উত্তর ভারতে প্রথম চিনির কল স্থাপিত হয় এবং ১৯২১ সালে সারা ভারতে চিনির কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৯টিতে। বিদেশী প্রতিযোগিতার দরুণ ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই শিল্প বিশেষ

প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ১৯৩২ সালে এই শিল্পকে প্রথম সংরক্ষণ দেওয়া হয় এবং তখন হইতেই ইহার অভূতপূর্ব উন্নতি হইতে থাকে। এই কারণে ইহাকে 'সংরক্ষণের সন্তান' (child of protection) বলা হয়। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সংরক্ষণ বহাল রাখা হয়। ১৯৪৬ সালে ভারতে আধুনিক ধরণের চিনির কলের সংখ্যা দাড়ায় ১৪০; ইহার মধ্যে যুক্তপ্রদেশে ৭০টি, বিহারে ৩১টি, মাদ্রাজে ১০টি, বোম্বাই-এ ১০টি, পশ্চিমবংগে ৮টি, উড়িষ্যায় ২টি এবং অন্যান্য স্থানে ৯টি চিনির কল ছিল। ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে চিনির উপর উৎপাদন শুল্ক বসানো হইয়াছে। বর্তমানে চিনির কলের সংখ্যা ১৬০টি। এই শিল্পে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ৬০ কোটি টাকা এবং ইহা হইতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইতেছে।

চিনি শিল্পের বিবর্তন

ইক্ষু উৎপাদনের দিক দিয়া ভারত প্রধান স্থান অধিকার করে। ভারতের চিনি শিল্প ইক্ষুকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে ইক্ষুর উৎপাদন এবং উহার গুণগত মান বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে বর্তমানে তিন পদ্ধতিতে চিনি তৈয়ারী করা হয়। প্রথমতঃ, কল হইতে, দ্বিতীয়তঃ দেশীয় খান্দেশ্বরী প্রথায় এবং তৃতীয়তঃ, পরিস্রাবণ প্রথায় গুড় হইতে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে অতি সামান্য পরিমাণ চিনিই উৎপাদিত হয়।

এই শিল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ এই শিল্পটির যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে অত্যধিক একদেশতা ঘটিয়াছে। মোট চিনি উৎপাদনের শতকরা ৮৫ ভাগ এই দুইটি রাজ্য হইতে পাওয়া যায়। ভারতে মোট ৪৫ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষু চাষ হয় তন্মধ্যে যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে ৩০ লক্ষ একর জমিতে ইহার চাষ হয়। মাদ্রাজ, পশ্চিম বাংলা, বোম্বাই, পাঞ্জাব ইত্যাদি অঞ্চলেও বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ইক্ষু উৎপাদিত হয় এবং এই সকল অঞ্চলে চিনির চাহিদাও কম নয়, তথাপি এই সকল অঞ্চলে চিনি শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভারতে উৎপন্ন চিনির উৎপাদন খরচ অন্যান্য দেশে উৎপাদিত চিনির উৎপাদন খরচ অপেক্ষা অনেক বেশী। তৃতীয়তঃ, বহু কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা কাম্য উৎপাদনক্ষমতা (optimum capacity) অপেক্ষা অনেক কম। ইহার ফলে উৎপাদন খরচ অনেক বেশী হয়। এই শিল্প নানা করভারে প্রপীড়িত। এই শিল্প হইতে অধিক মুনাফা আদায়ের উদ্দেশ্যে সরকার ইক্ষুর সর্বনিম্ন দাম বাঁধিয়া দিয়াছেন। চিনিকলের মালিকগণ অভিযোগ করেন যে এই দাম খুব বেশী এবং এদেশে চিনির উৎপাদন ব্যয় অধিক হওয়ার ইহা অন্যতম কারণ।

শিল্পের বৈশিষ্ট্য

সমস্যা (Problems): ভারত বর্তমানে প্রধান চিনি উৎপাদক দেশ। ভারতে চিনি শিল্পের উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় চিনির দাম বেশী। চিনি একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য, সেই কারণে ইহার মূল্য হ্রাস করা প্রয়োজন। শেষ টারিফ বোর্ড এই শিল্পটি হইতে সংরক্ষণ তুলিয়া লইবার স্বপক্ষে

বলেন যে শিল্পটি বর্তমানে সংরক্ষণ ব্যতীতই চলিতে পারিবে, এবং সংরক্ষণ এই শিল্পে একটা দুঃখজনক সন্তুষ্টির মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছে। চিনির উৎপাদন ব্যয়ের ৬০ ভাগ হইল ইক্ষুর মূল্য। চিনির দাম কমাইতে হইলে, একর প্রতি ইক্ষু উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং উৎকৃষ্ট জাতের ইক্ষু চাষ বাড়ানো প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতে চিনিশিল্প হইতে উপজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের বিশেষ ব্যবস্থা নাই। জাভায় চিনিশিল্পের সহিত উপজাত দ্রব্য (by-products) রাম, মেথিলেটেড স্পিরিট, পেষ্টবোর্ড প্রভৃতি প্রস্তুত হয় কিন্তু ভারতের কারখানায় সেরূপ কোনোও উপজাত দ্রব্য তৈয়ারী হয় না; এই কারণে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ, ভারতের চিনির কলগুলি সারা বৎসরে মাত্র ৪ মাস কাল চালু থাকে (জাভা ও কিউবায় উহারা ৮-১০ মাস চালু থাকে) আর বাকী সময় এই কলগুলিকে বন্ধ রাখিতে হয় বলিয়াও চিনির উৎপাদন খরচ বেশী হয়। চতুর্থতঃ, দেশের ইক্ষু[illegible] চিনির কল হইতে বহুদূরে অসম্বদ্ধভাবে অবস্থিত এবং বিভিন্ন ক্ষে[illegible]ক্ষু বিভিন্ন প্রকারের। দূরবর্তী ক্ষেত্র হইতে কলে ইক্ষু বহন করিয়া আনিতে যথেষ্ট ব্যয় হয় এবং ইক্ষুর রস বহু পরিমাণে শুকাইয়া যায়। ইহাছাড়া ইক্ষু হইতে রস নিষ্কাষণ পদ্ধতিও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এই সকল কারণে দেশীয় চিনির উৎপাদন ব্যয় বিদেশী চিনির উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অনেক বেশী। পরিশেষে, এই শিল্পের প্রতিযোগী ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য ইহাকে আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন এবং আধুনিকীকরণের একটি প্রয়োজনীয় অংশ হইবে বিকেন্দ্রীকরণ করা। বিকেন্দ্রীকরণ করা হইলে উৎপাদনব্যয় কম হইবে। ১৯৬৬ সালে শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইনানুসারে [Industries (Development and Regulation) Act.] চিনিশিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি উন্নয়ন পরিষদ (Development Council) গঠন করা হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই, কারণ আশা করা হইয়াছিল যে ১৯৫৫-৬৬ সালের মধ্যেই বৎসরে ১৫ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হইবে। কিন্তু ১৯৫৪-৬৫ সালে চিনির উৎপাদন হয় ১৬ লক্ষ টন, ফলে পরিকল্পনার লক্ষ্য বাড়াইয়া ১৮ লক্ষ টন ধার্য করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সরকার ৩৭টি নূতন কারখানা স্থাপন এবং ৪০টি পুরাতন কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য লাইসেন্স দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বাৎসরিক উৎপাদনের লক্ষ্য ২২·৫ লক্ষ টন ধার্য করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় বাৎসরিক উৎপাদনের লক্ষ্য ৩৫ লক্ষ টনে ধার্য করা হইয়াছে। চিনির উৎপাদন আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে এবং উদ্বৃত্ত বিদেশে রপ্তানী করা হইবে।

চিনিশিল্পের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। জনসাধারণের আয় এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাওয়ার সহিত আভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারিত হইবে। বর্তমানে আমেরিকায় বাৎসরিক মাথাপিছু চিনি ভোগের পরিমাণ ১০০ পাউণ্ড, অপরপক্ষে ভারতে মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ মাত্র ৩০ পাউণ্ড। বৈদেশিক বাজারে, বিশেষ করিয়া আমেরিকার বাজারে চিনি রপ্তানীর যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

[পাঁচ] কাগজশিল্প (Paper Industry): প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে হস্তনির্মিত কাগজ তৈয়ারী হইত। আধুনিক ধরণের কাগজের কল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৬ সালে দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোরে। কিন্তু ১৮৬৭ সালে বালিতে রয়াল পেপারমিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে এই শিল্পের প্রকৃত উন্নতি স্থরু হয়। বর্তমানে কাগজ কলের সংখ্যা ১৯ এবং আদায়ীকৃত মূলধন ২·২৫ কোটি টাকা। বর্তমানে পশ্চিমবংগে চারিটি কাগজের কল রহিয়াছে। এই শিল্পে দশ হাজারের বেশী শ্রমিক নিযুক্ত আছে। বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ১৯২৫ সালে ভারতীয় কাগজশিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হয় এবং ১৯৪৭ সালে সংরক্ষণ তুলিয়া লওয়া হয়। সংরক্ষণের আওতায় এই শিল্প দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কাগজ শিল্পের প্রসারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এই সময় বিদেশ হইতে কাগজ আমদানীর অস্থবিধা হেতু সামরিক এবং আভ্যন্তরীণ যাবতীয় কাগজের চাহিদা দেশীয় কাগজ দ্বারা [illegible] হইয়াছিল। এতকাল পর্যন্ত একমাত্র সংবাদপত্রের কাগজ ভিন্ন অন্যান্য সকল প্রকার কাগজই ভারতে প্রস্তুত হইত এবং ইহারা গুণের দিক হইতে বিদেশী কাগজের তুলনায় কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। ১৯৫৬ সালে মধ্যপ্রদেশ ও ভারত সরকারের মালিকানায় নাগপুরের নিকট সংবাদপত্রের কাগজ উৎপাদনের জন্য জাতীয় নিউজপ্রিণ্ট এণ্ড পেপার মিলস (National Newspaper and Paper Mills) বা সংক্ষেপে নেপা মিলস NEPA MILLS) স্থাপিত হয়। বর্তমানে ইহা হইতে ১১ হাজার টনের মতো সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ তৈয়ারী হইতেছে।

ভারতীয় কাগজ কলসমূহে সবাই-ঘাস ও বাঁশ কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সবাই ঘাস এবং বাঁশ ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। হিমালয়ের পাদদেশে পাইন, ফার, বার্চ প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ প্রচুর জন্মায় কিন্তু উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে ইহাদিগকে ব্যবহার করা যাইতেছে না। কাশ্মীরের পাইন বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠমণ্ড ও উচ্চশ্রেণীর কাগজ প্রস্তুতের বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে। দেরাদুন ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে (Dehra Dun Forest Research Institute) কাগজ শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য নানারূপ গবেষণা চলিতেছে। কাঁচামালের যোগান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন। (১) বিশেষ বিশেষ বনাঞ্চল সংরক্ষণ করিতে হইবে, (২) ন্যায্য দামে নিয়মিত যোগানের জন্য বাঁশ এবং ঘাসের সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দাম বাঁধিয়া দিতে হইবে; (৩) পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বনাঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ করিতে হইবে এবং (৪) ছাঁট কাপড়, ছাঁট পাট এবং পরিত্যক্ত কাগজের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

সমস্যা (Problems): কাগজ শিল্পের কতকগুলি সমস্যা রহিয়াছে। প্রথমতঃ আধুনিকীকরণের সমস্যা, ভারতীয় কাগজকলগুলির যন্ত্রপাতি স্থদীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া, ইহারা পুরাতন ধরণের যন্ত্রপাতি

ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সকল যন্ত্রপাতির পরিবর্তন সাধন করিয়া আধুনিক ধরণের যন্ত্রপাতি বসাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার, সল্টকেক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যসকল বিদেশ হইতে উচ্চমূল্যে ক্রয় করিতে হয়। এই সকল রাসায়নিক দ্রব্য দেশে উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, কলগুলির বর্তমান উৎপাদন ইহাদের সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় অনেক কম, ফলে উৎপাদন খরচ বেশী হয়। কাগজের কলগুলি যাহাতে সর্বনিম্ন খরচে সর্বাধিক পরিমাণ কাগজ উৎপাদন করিতে পারে তাহার জন্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় কাগজ উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য করা হয় ২ লক্ষ টন; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহা ছিল ৪ লক্ষ ১০ হাজার টন। ১৯৬৫-৬৬ সালে কাগজ এবং কাগজ বোর্ডের চাহিদা ৭ লক্ষ টন হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে এবং ওই বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার [illegible] তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ৮২০,০০০ টন করিতে হইবে। নিউজপ্রিণ্টের ক্ষেত্রে উৎপাদন ৩০,০০০ টন হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১৫০,০০০ টন করার লক্ষ্য ধার্য আছে।

ভারতীয় কাগজ শিল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। পরিকল্পনার ফলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে কাগজের আভ্যন্তরীণ চাহিদাও বাড়িয়া চলিবে। কাগজের রপ্তানী বাণিজ্যের বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া ভারত ব্রহ্মদেশ, সিংহল মালয় এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও উদ্বৃত্ত কাগজ রপ্তানী করিতে পারিবে।

[ছয়] **কয়লা শিল্প (Coal Industry) :** কয়লা হইতে শক্তি (power) উৎপাদিত হয় বলিয়া কয়লা একটি মূলশিল্প। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় হইতেই খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের চেষ্টা করা হয় কিন্তু ওই চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই। প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা হয় ১৭৭৪ সালে রাণীগঞ্জে কয়লা উত্তোলনের সাথে সাথে। ১৮৮০ সালে ভারতীয় রেলপথের ব্যাপক বিস্তারের সাথে সাথে এই শিল্পের উন্নতি হইতে থাকে। ১৯২৫ সালে কয়লা শিল্প বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় সংকটের সম্মুখীন হয় এবং সংরক্ষণের দাবী জানায় কিন্তু ১৯২৬ সালে শুল্কবোর্ড ওই দাবী অগ্রাহ্য করে। ১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় এই শিল্প আবার বিপদের সম্মুখীন হয়। ১৯৩৭ সালে কয়লা খনি কমিটি (Coal Mining Committee) নিযুক্ত হয় এবং ওই সময় হইতে পুনরায় এই শিল্পের অগ্রগতি চলিতে থাকে।

উৎপাদনের পরিমাণের দিক দিয়া ভারতীয় কয়লা শিল্প পৃথিবীতে সপ্তম স্থান অধিকার করে। বর্তমানে ৮৪৩টি কয়লাখনি ৩৫ হাজার বর্গমাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। ১৯৬০ সালে এই শিল্পে সাড়ে তিন লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। ভারতীয় কয়লা খনিসমূহ সমগ্র ভারতে সমানভাবে বণ্টিত নয়। মোট উৎপাদনের শতকরা ৯৮ ভাগ পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যে। উত্তর ভারতে অতি সামান্য পরিমাণ কয়লা পাওয়া যায়।

যুক্তপ্রদেশে কয়লা একেবারেই পাওয়া যায় না। ভারতের কয়লা খনিগুলি সমুদ্র উপকূল বা জলপথের সন্নিকটে না থাকায় সুলভ পরিবহণের কোনো সুবিধা নাই। ভূতত্ত্ববিদগণের মতে ভারতে মাত্র ৪৫০ কোটি টন কয়লা আছে। বর্তমান হারে উত্তোলিত হইলে এই কয়লার দ্বারা ভারতে মাত্র আর ২০০ বৎসর চলিতে পারে।

কয়লাখনির শ্রমিকেরা অধিকাংশই ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারের অধিবাসী। ইহাদের অধিকাংশই কৃষিজীবি বলিয়া ইহারা সারাবৎসর সমানভাবে খনিরকার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে না। উপরন্ত এই সকল শ্রমিক সুদক্ষ নয়।

ভারতে উত্তোলিত সমগ্র কয়লার প্রায় শতকরা ৩২ ভাগ রেলপথসমূহে এবং শতকরা ২৫ ভাগ লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলিতে ব্যবহৃত হয়। বাঁকী কয়লা গৃহস্থালীর কাজে ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ভারত হইতে সামান্য পরিমাণ কয়লা হংকং, সিংহল ও মালয়ে রপ্তানী হয়। ভারতীয় কয়লার মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী এবং নিকৃষ্টস্তরের হওয়ায় জাপান, এবং দ[illegible]য়ার সহিত প্রতিযোগিতায় ভারত পারিয়া উঠিতেছে না এবং ভারত হইতে কয়লা র[illegible] পরিমাণ ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে।

দেশাভ্যন্তরে কয়লার উৎপাদন প্রচুর হওয়া সত্ত্বেও ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে কয়লা আমদানী করে কারণ ঐ সকল দেশ হইতে আমদানীকৃত কয়লা উৎকৃষ্ট। বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলা ও বিহার হইতে স্থলপথে কয়লা আনার খরচ বাহির হইতে সমুদ্রপথে আনীত কয়লার খরচ অপেক্ষা বেশী।

শক্তি উৎপাদন ছাড়াও কয়লা হইতে গ্যাস ও উপজাতদ্রব্য হিসাবে নানাপ্রকার মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়। ওই সকল রাসায়নিক দ্রব্য অন্যান্য শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সুরুতে এই শিল্প বৈদেশিক মূলধন দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই শিল্পে বিনিযোজিত মূলধনের পরিমাণ ১২ কোটি টাকার মত এবং খনিজ শিল্পগুলির মধ্যে কয়লা শিল্পেই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হইয়া থাকে।

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি অনুসারে কয়লাশিল্পের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ ভার রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। অনেক কয়লাখনি রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে আনা হইয়াছে এবং এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য ওই সালেই জাতীয় কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশন (National Coal Development Corporation) গঠিত হইয়াছে। বর্তমানে কয়লাশিল্পে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি রহিয়াছে। অবশ্য সরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদন বেসরকারী উদ্যোগের তুলনায় খুবই কম।

সমস্যা (Problems) : কয়লাশিল্প বর্তমানে কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রথমতঃ, কয়লাশিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিকীকরণ করা আশু প্রয়োজন। যদিও কয়লার উত্তোলন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি এই শিল্পের দক্ষতা বাড়ে নাই। বহুসংখ্যক খনি এতোই ক্ষুদ্র যে সর্বনিম্ন ব্যয়ে উৎপাদন সম্ভবপর নয়। কয়লাশিল্পে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে এবং অপর দেশের তুলনায় ভারতে

মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকপিছু উৎপাদন ৭০৭ টন, অপরপক্ষে ভারতে উহা মাত্র ১৩১ টন।

চারিটি সমস্যা

খনি প্রতি গড় উৎপাদন আমেরিকায় দশলক্ষ টন অপরপক্ষে ভারতে উহা মাত্র ৩৮০০০ টন। এই শিল্পের অদক্ষতার জন্য উৎপাদন ব্যয় বেশী, প্রতিযোগী ক্ষমতা এবং মুনাফার পরিমাণ কম হয়। ভারতীয় কোলফিল্ড কমিটি (১৯৪৬) এবং ওয়ার্কিং পার্টি (Working Party on Coal Industry, 1951) কয়লাশিল্পের আশু যন্ত্রিকরণের সুপারিশ করিয়াছে। দেশের ভবিষ্যৎ শিল্পায়ণের জন্য যে অধিক পরিমাণ কয়লার প্রয়োজন হইবে, যন্ত্রিকরণ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধিই তার একমাত্র সমাধান। কিন্তু ছোট ছোট খনিতে যন্ত্রিকরণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং লাভজনক নয়, সেই কারণে পাশাপাশি অবস্থিত ছোট ছোট কয়লাখনিকে একত্রিকরণের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। কয়লাখনিগুলিতে উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং নূতন নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহার ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ধাতুনিষ্কাশক এবং কোক কয়লার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ওয়ার্কিং পার্টি ধাতু নিষ্কাশক (metallurgical coal) কয়লা সংরক্ষণের সুপারিশ করেন। ভারতে যে পরিমাণ উৎকৃষ্ট কয়লা আছে তাহার দ্বারা ১২৯ বৎসর চলিতে পারে এবং যে পরিমাণ কোক কয়লা আছে তাহাতে ৬২ বৎসর চলিবে। উৎকৃষ্ট কয়লার পরিমাণ কম বলিয়া ইহার ব্যবহার কমাইতে হইবে এবং কয়লার ব্যবহার কমাইয়া জলবিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার বাড়াইতে হইবে। ১৯৫৬ সাল হইতে রেলপথসমূহ কোক কয়লার পরিবর্তে অন্য কয়লা ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতেছে।

তৃতীয়তঃ, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ব্যবহারের জন্য ধাতুনিষ্কাশক কয়লার ধৌতকরণ প্রয়োজন। ইতিমধ্যে কারগালিতে ধৌতকরণের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং শীঘ্রই আরও তিনটি কারখানা স্থাপিত হইবে। নিঃশেষিত কয়লাখনিগুলির গহ্বরগুলি বালি দিয়া ভরাট করা (stowing) প্রয়োজন যাহাতে খনির উপরিভাগ ধ্বসিয়া না পড়ে। ইহা ব্যয়বহুল বলিয়া অনেক সময় খনির মালিকগণ ইহা করে না। ১৯৫২ সালে আইন পাশ করিয়া ভরাটকরণের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

চতুর্থতঃ কয়লাশিল্পে পরিবহন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কয়লাখনিগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণ ওয়াগন (wagon) সংগ্রহ করিতে পারে না, ফলে খনিতে কয়লা সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। সম্প্রতি সরকার পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন।

প্রথম পরিকল্পনায় কয়লাখনির উন্নতির জন্য কোনোরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্য ৬০ মিলিয়ন টন ধার্য করা হয়। নূতন কয়লা খনি সাধারণত, সরকারী পরিচালনাধীনে কাজ করিবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্য ৯৭ মিলিয়ন টন ধার্য করা হয়—দ্বিতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা ৩০ মিলিয়ন টন বেশী।

[সাত] চা-শিল্প (Tea Industry) : চা-শিল্প ভারতের অন্যতম সুগঠিত শিল্প। ভারতের বিশেষ করিয়া আসামের, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই শিল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। আসামের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ জন লোক চা-বাগানে বাস করে। ভারত পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চা-উৎপাদক দেশ এবং পৃথিবীর মোট চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ যোগান দেয়। এই শিল্পে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ১১৩ কোটি টাকারও বেশী এবং ইহার শতকরা ৩৫ ভাগ দেশীয় মূলধন, বাকী বৈদেশিক মূলধন। চা শিল্পে দশ লক্ষ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। চা-শিল্প একটি মূল্যবান রপ্তানী শিল্প, মোট উৎপাদনের ৬৮ ভাগ বিদেশে রপ্তানী হয়। ১৯৫৯ সালে রপ্তানীর মূল্য ছিল ১২৬·৩৯ কোটি টাকা।

১৮২৮ সালে মেজর রবার্ট ব্রুস নামক জনৈক ব্যক্তি আসামে চা গাছ আবিষ্কার করেন এবং তখন হইতেই এই শিল্পের আরম্ভ হয়। ১৮৩৩ সালে সরকার আসামের লখিমপুরে চা-চাষ সুরু করেন। ১৮৩৮ সালে [illegible] লণ্ডনে চা রপ্তানী করা হয় এবং পর বৎসর সরকারী চা বাগানগুলি আসাম কোম্পানী নামক ভারতের প্রথম চা-কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হয়। ইহার পর হইতে এই শিল্প দ্রুত উন্নতি করিয়া চলে। এই শিল্পেই প্রথম বৃটিশ মূলধন বিনিয়োজিত হয় এবং এখনো পর্যন্ত এই শিল্পে বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ ৬৪ কোটি টাকার মতো। মোট চা-চাষের জমির শতকরা ৬০ ভাগ বৃটিশ কোম্পানীর পরিচালনাধীন। এই শিল্পটি কলিকাতার ২০টি ম্যানেজিং এজেন্সি হাউস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হইতেছে। এই শিল্পের আরও একটি বৈশিষ্ট্য যে মাত্র চারিটি ইউরোপীয় ফার্ম চা-এর বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে।

আসামেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চা উৎপাদিত হয়। মোট কর্ষিত জমির শতকরা ৫৫ ভাগ আসাম রাজ্যেই রহিয়াছে এবং পাঁচ লক্ষ লোক এই শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। আসামের অধিকাংশ চা-বাগান বিদেশী মালিকানাধীন। মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ চা-বাগান ভারতীয় মালিকানাধীন। চা-এর দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক অঞ্চল হইল পশ্চিমবংগ, মোট চা-চাষে নিযুক্ত জমির ২৪ ভাগ এই রাজ্যে অবস্থিত। এই রাজ্যে দুই লক্ষের অধিক লোক এই শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের চা-উৎপাদক অঞ্চলগুলিকে চারটি 'অঞ্চলে' ভাগ করা যায়: (১) পাহাড় অঞ্চল, (২) তরাই অঞ্চল (৩) জলপাইগুড়ি (ডুয়ার্স) অঞ্চল এবং (৪) আলিপুরদুয়ার অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গে ১৮০টি চা-বাগান রহিয়াছে। মোট চা উৎপাদনে নিযুক্ত জমির ১৯ ভাগ দক্ষিণ ভারতে রহিয়াছে। বাকী সামান্য অংশ পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, এবং বিহারে উৎপাদিত হয়।

সংগঠনের দিক হইতে চা-শিল্প কৃষি এবং শিল্পকার্যের এক সংমিশ্রণ বলিয়া কথিত হয়। ইহা ৬০ ভাগ কৃষি এবং ৪০ ভাগ শিল্পকার্যের সমন্বয়। সাধারণতঃ এক একটি চা-বাগান বিরাট অঞ্চল লইয়া গঠিত হয় এবং যৌথ মূলধনী কোম্পানীর পরিচালনাধীন। ইউরোপীয় পরিচালনাধীন চা-বাগানের গড় আয়তন ৮০০ একর,

অপরপক্ষে ভারতীয় পরিচালনাধীন চা-বাগানের গড় আয়তন ১০০ একরের অধিক নয়। চা-শিল্প মালিকদের চারিটি সংগঠন রহিয়াছে—ভারতীয় চা সংগঠন (Indian Tea Association), ভারতীয় চা-উৎপাদক সংগঠন (Indian Tea Planters' Association), টেরাই চা-মালিক সংগঠন (Terrai Plantation of Employers) এবং ভারতীয় চা-সংগঠন (Tea Association of India).

চা-শিল্প সরকারী নিয়ন্ত্রণে চা-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (Tea Control Scheme) চালু করে। ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দায় চা-শিল্প যখন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চা-শিল্পপতিরা মিলিয়া চা-এর দাম বৃদ্ধির জন্য চা-উৎপাদন এবং রপ্তানীর এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা বিশেষ কার্যকরী হয় এবং চা-এর দাম বৃদ্ধি পায়।

সমস্যা (Problems) : প্রথমতঃ, শ্রমিকদের প্রতি মালিকদের দুর্ব্যবহারের জন্য এই শিল্পের সর্বাপেক্ষা অধিক [illegible] আছে। মুলুকরাজ আনন্দের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস Two Leaves And a Bud-এ ইহার এক জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। শ্রমিকের প্রতি মালিকের দুর্ব্যবহার রোধ করিবার জন্য সরকার বহুবার আইন পাশ করিতে বাধ্য হয়। ১৯৩২ সালে Tea District Emigrants Act পাশ হয় কিন্তু ইহা সর্বভারতীয় আইন নয়, শুধুমাত্র আসামের চা-বাগানেরই শ্রমিক নিয়োগ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৫১ সালে Plantations Labour Act পাশ করা হয়। এই আইনে বাগিচা-শিল্প শ্রমিক কল্যাণকর বহু ব্যবস্থা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় চা-শিল্প বর্তমানে জাপান, সিংহল, ইত্যাদি দেশের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছে। চা-এর উৎপাদনব্যয় হ্রাস না করিতে পারিলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় চা-এর চাহিদা হ্রাস পাইবে। চা-একটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী বৃহত্তম শিল্প। রপ্তানীর বাৎসরিক গড় মূল্য ১৫০ কোটি টাকার মত। তৃতীয়তঃ, ভারতীয় চা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নমানের হয় বলিয়া বিদেশের বাজারে ইহার আদর কম।

ভারত প্রচুর পরিমাণে চা উৎপাদন করিলেও মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ অত্যন্ত কম। গ্রেট বৃটেনে মাথাপিছু বার্ষিক চা-ভোগের পরিমাণ ৮·৫ পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়ায় ৭ পাউণ্ড, অপরপক্ষে ভারতে আধ পাউণ্ডের চেয়েও কম। গ্রেট-বৃটেন ভারতীয় চা-এর বৃহত্তম খরিদ্দার। মনে রাখা প্রয়োজন যে লণ্ডনের বাজারেই ভারতের চা-এর দাম নির্ধারিত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চা-পান জনপ্রিয় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। চা-এর রপ্তানী বৃদ্ধি ও ভারতীয় বাজারে চা-বিক্রয় বাড়াইবার জন্য সরকার কেন্দ্রীয় চা-বোর্ড (Central Tea Board) স্থাপন করিয়াছেন এবং চা-এর উপর সামান্য সেস ধার্য করা হইয়াছে। সেস বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা চা-এর জনপ্রিয়তা বর্ধনের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে। ১৯৫৬ সালে চা-শিল্পের উন্নতির জন্য বাগিচা অনুসন্ধান কমিশন (Plantation Enquiry Commission) নিযুক্ত হইয়াছিল।

● তৃতীয় পরিকল্পনায় চা-এর উৎপাদন ৯০ কোটি পাউণ্ড হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্পসংক্রান্ত সমস্যা ও নীতি

[বিষয়বস্তু : শিল্পগত অবস্থান—শিল্পের আধুনিকীকরণ—ভারতীয় শিল্পে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা—ভারতের শুল্কনীতি—নূতন ফিসক্যাল নীতি ১৯৪৯-৫০—সরকারের শিল্পনীতি—শিল্প উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ,আইন—নূতন শিল্প নীতি ১৯৫৬—নূতন শিল্পনীতির বিচার—শিল্পের জাতীয়করণের নীতি]

এই অধ্যায়ে আমরা ভারতীয় [illegible]সংক্রান্ত সমস্যাগুলি লইয়া আলোচনা করিব। শিল্পের সমস্যা ও নীতি হিসাবে শিল্পগত অবস্থান, [illegible]নিকীকরণ, শিল্পনীতি এবং শিল্পসংরক্ষণ আলোচিত হইবে।

শিল্পগত অবস্থান (Industrial Location) : কোনো শিল্পের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন নির্ভর করে প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের উপর। যদি এই সকল শক্তির মিলনের ফলে কোনো বিশেষস্থানে কোনো বিশেষশিল্পের অন্তর্গত বহু সংখ্যক কারখানা স্থাপিত হয় তখন শিল্পের একদেশতা (localisation of industries) ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। অন্যভাবে বলিতে পারা যায় যে শ্রমবিভাগ ব্যক্তির মধ্যেও হইতে পারে (industrial division of labour) আবার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও হইতে পারে (territorial division of labour)।

একদেশতার সংজ্ঞা

আঞ্চলিক শ্রমবিভাগকে শিল্পের একদেশতা বলে। পশ্চিমবংগে পাটশিল্প, আসামে চা-শিল্প, বোম্বাই-এ বস্ত্র-শিল্প, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে চিনি-শিল্প একদেশতার উদাহরণ। শিল্পের একদেশতার প্রধান কারণ হইল ব্যয় সংকোচন। একটি বিশেষ এলাকায় একটি বিশেষ শিল্প গড়িয়া উঠিলে কতকগুলি সুযোগ সুবিধা (মার্শালের ভাষায় বাহ্যিক সুবিধা) পাওয়া যায় বলিয়া নূতন নূতন কারখানা সেইখানে আসিয়া ভিড় জমায়।

দোষত্রুটিবিমুক্ত না হইলেও শিল্পের অবস্থান নির্দেশে ওয়েবারের (Weber's theorem) মতবাদ এখনো শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হয়। এই মতানুযায়ী শিল্পের প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সর্ত হইল টন-মাইল হিসাবে পরিবহণ খরচ অর্থাৎ কি পরিমাণ ওজন বহন করিতে হইবে এবং কতদূর বহন করিতে হইবে। উদ্যোক্তা সেইখানেই শিল্প স্থাপন করিবে যেখানে কাঁচামাল কারখানায় পরিবহন এবং শিল্পজাত

ওয়েবারের মতবাদ

দ্রব্য বাজারে প্রেরণ করার ব্যাপারে টন-মাইল পরিবহন ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম। ওয়েবার কাঁচামালকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন ; (১) সর্বত্র পাওয়া যায় এমন কাঁচামাল (ubiquities) যেমন ইট, বালি, জল ইত্যাদি, এবং (২) বিশেষ স্থানে পাওয়া যায় এমন দ্রব্য (localised materials)

যেমন, আকরিক লৌহ, বক্সাইট. তূলা, কয়লা ইত্যাদি। বিশেষ স্থানে প্রাপ্ত দ্রব্যগুলিকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে—(ক) বিশুদ্ধ উপকরণ (pure materials) যেমন কাঁচা তূলা। বিশুদ্ধ উপকরণ বলিতে সেইসকল কাঁচামালকে বুঝায় যাহাদের প্রায় সম্পূর্ণ ওজন শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে এবং (খ) স্থূল উপকরণ (gross materials), যেমন ইক্ষু, আকরিক লৌহ প্রভৃতি—ইহাদের মোট ওজনের অতি সামান্য অংশ মাত্র শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে নিহিত থাকে। সর্বত্র পাওয়া যায় এমন কাঁচামাল শিল্পের অবস্থান নির্ণয়ে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না। বিশেষ স্থানে পাওয়া যায় এমন দ্রব্যই শিল্পের অবস্থান নির্ণয়ে প্রভাব বিস্তার করে আর এই ক্ষেত্রে স্থূল কাঁচামাল তাহার উৎসের দিকে শিল্পকে টানিয়া আনে। ওয়েবার একটি পদার্থ-সূচক (Material Index) রচনা করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে শিল্পের অবস্থান নির্ণয়ে কাঁচামালের উৎস এবং বাজারের সান্নিধ্য, দুইয়ের কোন্‌টি অধিকতর কাম্য বুঝিতে পারা যাইবে। স্থানীয় পদার্থের (Localised materials) ওজনকে শিল্পজাত দ্রব্যের ওজন দিয়া ভাগ করিলে পদার্থসূচক পাওয়া যাইবে। যদি পদার্থসূচক বেশী হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে শিল্পের স্থান নির্বাচনে কাঁচামালের প্রভাব বেশী এবং কাঁচামালের উৎস সান্নিধ্যে শিল্পকে স্থাপিত করিলে উদ্যোক্তা লাভবান হইবে আর যদি পদার্থ-সূচক কম হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে কাঁচামালের গুরুত্ব কম এবং শিল্পকে বাজারের সান্নিধ্যে স্থাপন করাই বাঞ্ছনীয়।

ওয়েবারের মতবাদ অনুসারে সেখানেই শিল্প স্থাপন হওয়া উচিত যেখানে পরিবহন ব্যয়জনিত সুবিধা সর্বাধিক। কিন্তু কয়েকটি কারণের জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে সব সময় তাহা হয় না: প্রথমতঃ, উপকরণ এবং বাজার সম্পর্কে শিল্পপতিদের জ্ঞান সব সময় সঠিক ও সম্পূর্ণ নয়। কয়েকটি একজাতীয় কারখানা একস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচের (External and Internal Economies) সুবিধা দেখা দেয় এবং অন্যান্য শিল্পপতিগণ সেইখানে তাহাদের কারখানা স্থাপন করেন। দ্বিতীয়তঃ, সকল সময় শিল্পপতিগণ অর্থনৈতিক বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া কাজ করেন না, সামাজিক সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া কিছু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও শহরের নিকট শিল্প স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। তৃতীয়তঃ, বিমান যুদ্ধের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেক সময় দেশের অভ্যন্তরে শিল্প কারখানা স্থাপন করা হয়।

ভারতীয় শিল্পের অবস্থান ত্রুটিপূর্ণ

ভারতে শিল্পের অবস্থান অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। দেশের সকল অঞ্চলে সমানভাবে শিল্পপ্রসার ঘটে নাই। বোম্বাই, পশ্চিমবংগ, বিহার এবং যুক্তপ্রদেশে শিল্পের সমধিক প্রসার হইয়াছে কিন্তু অপর সকল রাজ্যে শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটে নাই। ইহা ব্যতীত নগরাঞ্চলে শিল্পের একদেশতা হওয়ার ফলে শহরগুলি জনসংখ্যার চাপে অস্বাভাবিক ভাবে ফুলিয়া উঠিয়াছে।

কয়েকটি বৃহৎ নগরের লোকসংখ্যা :

	১৯৩১	১৯৫১
কলিকাতা	১৩.৪৯ লক্ষ	২৫.৪৯ লক্ষ
বোম্বাই	১১.৬১ ,,	২৮.৩১ ,,
কাণপুর	২.৪৪ ,,	৭.০৫ ,,
মাদ্রাজ	৬.৪৭ ,,	১৪.১৬ ,,
দিল্লী	৩.৪৭ ,,	৯.১৫ ,,

এই সকল নগরগুলিতে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বাড়িতেছে তাহার কারণ শিল্পের একদেশতা এবং গ্রাম হইতে লোকের শহরাঞ্চলে আগমন। ১৯৩৯ সালে মোট কারখানা শ্রমিকদের শতকরা ৫৯.২ ভাগ বোম্বাই এবং বাংলায় বাস করিত। তাহার পর অন্যান্য রাজ্যে শিল্প স্থাপন করার প্রবণতা দেখা দেয়। কিন্তু ১৯৫১ সালেও বোম্বাই এবং [illegible] মোট [illegible] শ্রমিকদের শতকরা ৫৪.৩ ভাগ বাস করিত। ১৯৫১ সালে বোম্বাই, পশ্চিমবংগ, বিহার, মাদ্রাজ এবং যুক্ত-প্রদেশে মোট শিল্প শ্রমিকদের মোট ৮৮.৪ ভাগ বাস করিত।

শিল্পের একদেশতার অনেক সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, চাকুরীর সম্ভাবনা থাকায় দক্ষ শ্রমিকেরা শিল্পাঞ্চলের আশেপাশে আসিয়া ভিড় করে ফলে দক্ষ শ্রমিক পাইতে মালিকের কোনো অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান একসঙ্গে থাকে বলিয়া ইহারা কাঁচামাল কিনিতে অথবা রেল এবং জাহাজ কোম্পানীর নিকট হইতে পাইকারী খরিদ্দারের সুবিধা পাইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, একই দ্রব্য উৎপাদনে ব্যস্ত থাকায় সকলে মিলিয়া আলাপ-আলোচনার সুযোগ পান, গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন এবং সকলে সম্মিলিতভাবে উহার সুবিধা ভোগ করিতে পারেন। চতুর্থতঃ, কোনো অঞ্চলে শিল্পের একদেশতা ঘটিলে উহাকে কেন্দ্র করিয়া অনেক পরিপূরক এবং সহায়ক শিল্প গড়িয়া ওঠে। পঞ্চমতঃ কোনো স্থানে শিল্পের একদেশতা ঘটিলে উপজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যাইতে পারে। পরিশেষে শিল্পের একদেশতার ফলে সেই স্থানের সুনাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং পরবর্তীকালে যাহারা কোনো নূতন কারখানা স্থাপন করিতে চাহে, সুনামের সুবিধার জন্য, একই জায়গায় আসিয়া ভীড় করে।

একদেশতার সুবিধা

একদেশতার কিছু সুবিধা থাকিলেও ইহার কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি রহিয়াছে। প্রথমতঃ, একটিমাত্র শিল্পের উপর কোনো অঞ্চল নির্ভরশীল হইলে, সেই শিল্পে কোনো কারণবশতঃ মন্দা (depression) দেখা দিলে ওই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বেকার সমস্যা দেখা দিবে। এই কারণেই আজকাল শিল্পের বিকেন্দ্রিকরণকে বিশেষভাবে সমর্থন করা হয়। পাটশিল্পে মন্দা দেখা দিলে পশ্চিমবংগ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, বস্ত্রশিল্পে মন্দা দেখা দিলে বোম্বাই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ইত্যাদি। যদি শিল্পকে বিকেন্দ্রিকরণ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে কোনো শিল্পে মন্দা দেখা দিলে কোনো বিশেষ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

একদেশতার ত্রুটি

দ্বিতীয়তঃ, কয়েকটি রাজ্যে শিল্পকে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে ফলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলসমূহ অবহেলিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, শিল্পের একদেশতা ঘটিলে যুদ্ধবিগ্রহের সময় এই সকল অঞ্চল শত্রুপক্ষের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হইয়া বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চতুর্থতঃ, কোনো স্থানে কোনো একটি শিল্প আসিয়া ভিড় করিলে সেই স্থানে জনাধিক্য এবং বসতির সমস্যা দেখা দিবে। কম পরিমাণ জায়গায় অধিকসংখ্যক লোক বাস করার ফলে লোকের স্বাস্থ্য, চরিত্র এবং রুচির অবনতি ঘটিবে।

সাম্প্রতিক উন্নতি

আধুনিককালে শিল্পের স্থান নির্বাচনে উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে বোম্বাই ছাড়া, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্যান্য অঞ্চলে কাপড়ের মিল স্থাপিত হইতেছে। যদিও এখনো পর্যন্ত বোম্বাই বস্ত্রশিল্পের দিক হইতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান, তথাপি অন্যান্য অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়িতেছে চিনির যে নূতন কল বোম্বাই এবং মাদ্রাজে স্থাপিত হই কাগজের কলগুলি পশ্চিমবাংলায় স্থাপিত হইয়াছিল, আধুনিককালে অঞ্চলেও উহারা স্থাপিত হইতেছে।

আধুনিক উন্নতির কারণসমূহ

শিল্পের স্থান নির্বাচনের গতিধারায় যে আধুনিক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে তাহার পাঁচটি কারণ রহিয়াছে; (১) দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের গুরুত্ব বাড়িতেছে, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হইতেছে এবং দেশের ভিতরে আর্থিক বাজারের (Money market) প্রসার ঘটিতেছে, (২) উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি ঘটিতেছে; (৩) শিল্পপতিগণ প্রতিযোগিতা এড়াইতে চাহেন বলিয়া শিল্প অবস্থানের উন্নয়নে মনোযোগী, (৪) পুরাতন আমলের দেশীয় রাজারা শিল্পকে অধিকতর সুযোগসুবিধা দিয়া নিজ নিজ রাজ্যের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং (৫) অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে শিল্প উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ আইনানুসারে [Industries (Development and Regulation) Act 1951] সরকার শিল্পের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

শিল্পউন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন

শিল্প উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ আইন ভারত সরকারকে শিল্পের অবস্থান নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিয়াছে। শিল্পকে রেজেষ্ট্রি করিতে হইবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার পূর্বে সরকারের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক কারখানাকে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হয় এবং লাইসেন্স দিবার সময় লাইসেন্সিং কমিটি শিল্প অবস্থানের সর্ত নির্ধারণ করিয়া দেন। যে সকল শিল্প নূতন এবং উপযুক্ত স্থানে যাইতে চায় লাইসেন্স দিবার সময় সেই সকল শিল্পকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। শিল্পের অবস্থান সম্পর্কে সরকারী নীতি এই যে বড় বড় শহরও উন্নত রাজ্যগুলির শিল্পকে বিকেন্দ্রিকরণ এবং অনুন্নত অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠায় শিল্পপতিদের উৎসাহিত করা। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে শিল্পস্থাপনের অগ্রাধিকারের নীতি গৃহীত হইয়াছে।

শিল্পের আধুনিকীকরণ (Rationalisation of Industries): শিল্পে যুক্তি প্রয়োগ করাকে আধুনিকীকরণ বা র‍্যাশানালাইজেশান বলে ("Rationalisation is putting reason into industry")। শিল্পে যুক্তি প্রয়োগ করার অর্থ হইল যে সর্বনিম্ন খরচে সর্বাধিক পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করিয়া উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা। যে পদ্ধতি ও পরিচালনার দ্বারা শ্রমিক, কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতির অপচয় সর্বনিম্ন করা যায় তাহারই নাম আধুনিকীকরণ, ("the method of technique and of organisation designed to secure the minimum of waste, either of effort or of material") উৎপাদনের প্রত্যেকটি উপাদানকে কাম্যভাবে কাজে লাগাইয়া উৎপাদন ক্ষমতাকে সর্বাধিক করিতে হইলে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার অপরিহার্য্য। শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদনব্যয় হ্রাস করার যুক্তিকে র‍্যাশানালাইজেশান বলে। শ্রমবিভাগের গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তে নূতন ধরণের শ্রমসঞ্চয়ী যন্ত্রপাতির ব্যবহার করিয়া উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাধিক করাই র‍্যাশানালাইজেশান। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বা Scientific Management অপেক্ষা র‍্যাশানালাইজেশনের অর্থ অধিকতর ব্যাপক। শিল্পের র‍্যাশানালাইজেশন বলিতে যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ, অপচয় নিবারণ, শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহায়তায় কাজের গতিবেগ বৃদ্ধি করা (যেমন Time and Motion Study-র প্রবর্তন করা) উৎপাদিত দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা (Quality Control) প্রভৃতি বুঝায়।[1] এক কথায়, র‍্যাশানালাইজেশন কথাটির অর্থ হইতেছে উৎপাদনব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করিয়া শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এই ব্যবস্থার ফলে খরচ কমে, এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

আধুনিকীকরণের সংজ্ঞা

র‍্যাশানালাইজেশানের উদ্দেশ্য উৎপাদনব্যয় হ্রাস করা, উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মানোন্নয়ন করা এবং উৎপাদকের ক্ষতিরোধ করা। ঠিকভাবে পরিচালিত হইলে ভোগকারী, শ্রমিক এবং সকলেই লাভবান হইবে। শ্রমিক লাভবান হয় কারণ শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে সে অধিক হারে মজুরি পায়। ভোগকারী সস্তায় জিনিস কিনিতে পারে এবং বাজার বিস্তৃত হইলে লাভ বাড়িবে এবং বিক্রেতা লাভবান হইবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় র‍্যাশানালাইজেশনের সকল সুযোগসুবিধা উৎপাদকেরাই পকেটস্থ করে, ভোগকারী কমদামে ভালো দ্রব্য পায় না বা শ্রমিকেরা বর্ধিতহারে মজুরী পায় না। শ্রমিকেরা র‍্যাশানালাইজেশনে বাধাদান করে তাহার কারণ ইহা বেকার সমস্যার সৃষ্টি করে। শ্রমিকের পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয় মেশিনের ব্যবহার, শ্রম-সঞ্চয়ী যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকীকরণ বেকারসমস্যার সৃষ্টি করে, সে কারণে শ্রমিকেরা র‍্যাশানালাইজেশনের তীব্র বিরোধিতা করে। শ্রমিকের এই মনোভাবের অবশ্য কিছু

আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্য

1. "Rationalisation means that instead of traditional processes, established routine and empirical rules and improvisations, use is made of methods that are the fruits of patient scientific study and aim at the optimum adjustment of means to ends thus securing that every effort produces the maximum useful result."

ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে। অতীতে আমাদের দেশে র‍্যাশানালাইজেশনের কোন ফলই শ্রমিকেরা ভোগ করিতে পারে নাই। কিন্তু যদি র‍্যাশানালাইজেশনের ফলে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পায় এবং ভোগকারী কমদামে জিনিষ কিনিতে পারে তাহা হইলে শ্রমিকের এই পদ্ধতিকে বাধা দিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকে না। বৃহদায়তন শিল্পের উন্নতি র‍্যাশানালাইজেশনের মাধ্যমেই সম্ভবপর। ইহা সত্য যে র‍্যাশানালাইজেশনের ফলে সাময়িক বেকার সমস্যা দেখা দিবে, কিন্তু দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় এবং দাম কম হওয়ার ফলে চাহিদা বাড়িয়া যাইবে এবং চাহিদা বৃদ্ধির সহিত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ও অধিক পরিমাণে লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে। সুতরাং র‍্যাশানালাইজেশনের ফলে যে বেকার সমস্যা তাহা সাময়িক ঘটনা এবং শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে উহা হ্রাস পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকের মজুরি এবং জীবনযাত্রার মান প্রয়োজনীয় বিষয়। যদি র‍্যাশানালাইজেশনের ফলে শ্রমিকেরা বর্ধিত হারে মজুরী পায় তাহা হইলে তাহাদের আয় বাড়িবে এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হইবে এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে র‍্যাশানালাইজেশন সর্বদাই গ্রহণযোগ্য। তৃতীয়তঃ, ভারতীয় শিল্পে যদি র‍্যাশানালাইজেশন করা না হয় তাহা হইলে ইহা বিশ্বের বাজারে সুগঠিত বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিবে না। শ্রমিকেরা র‍্যাশানালাইজেশনের বিরুদ্ধাচারণ করিলে তাহার ফলে বহু কারখানা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং বহু লোক বেকার হইয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে র‍্যাশানালাইজেশন করিলেও বেকারসমস্যার সৃষ্টি হইবে এবং না করিলেও ইহা রোধ করা যাইবে না।

শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের মধ্য দিয়া বেকারসমস্যার সৃষ্টি হইলেও তাহা ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করিবে বলিয়া ইহা বাঞ্ছনীয়।

আধুনিকীকরণের সুবিধা ও অসুবিধা ঃ আধুনিকীকরণের ফলে (১) বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সংকোচজনিত সুবিধা অধিক ভোগ করা যায়;

সুবিধা

(২) শিল্পের সামগ্রিক উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে; (৩) চাহিদার সহিত উৎপাদনের সামঞ্জস্যবিধান হয় বলিয়া শিল্পের স্থিতিশীলতা (stabilisation) বাড়ে; এবং (৪) শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

শিল্পে আধুনিকীকরণ কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করে; (১) ইহা ব্যয়বহুল; (২) যে হারে কাজের গতি ও বেগ বাড়ে সেই হারে শ্রমিকদের আয় বাড়ে না। (৩) শ্রমিক ছাঁটাই অপরিহার্য; (৪) ভারত ও অন্যান্য দেশে শিল্পে র‍্যাশানালাইজেশন

সমস্যা

করিলে বিদেশ হইতে আধুনিকধরণের যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হয় ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ অর্ধোন্নত দেশগুলির বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল বলিয়া বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করা বেশ কঠিন; (৫) শিল্পপতিগণ শিল্পে আধুনিকীকরণ ব্যয়বহুল বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহা বহন করিতে রাজী নয়। (৬) ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পে যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োজিত রহিয়াছে। বিদেশী শিল্পপতিগণ জাতীয়করণের আশংকায় প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া শিল্পসংস্কার করার পক্ষপাতি নয়।

র‍্যাশানালাইজেশন ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Rationalisation and Scientific Management) : আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার এফ. ডি. টেলারকে (১৮৫৬-১৯১৫) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়। টেলার ছাড়াও গ্যাণ্ট (gantt), গিলবার্ট, কেনডেল এবং মেরিকেরও এবিষয়ে যথেষ্ট অবদান আছে। টেলারের মতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূলকথা হইল : (১) কার্যসুরু করিবার পূর্বে পরিকল্পনা করা। (২) নির্দিষ্ট কাজের সময়ের মাত্রা (standard time) স্থির করা ; (৩) নির্দিষ্ট মানের যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করা ; (৪) যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য কাজের জন্য নিয়োগ করা ; (৫) শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ; (৬) শ্রমিকদের উৎসাহ দানের উপযোগী মজুরীব্যবস্থা প্রবর্তন করা ; (৭) বিভিন্ন কাজের জন্য সময় ও গতি নিরীক্ষণ (Time and Motion Study) করিয়া শ্রম এবং সময়ের অপচয় দূর করা।

র‍্যাশানালাইজেশনের সহিত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নিম্নলিখিত পার্থক্য রহিয়াছে।

(১) র‍্যাশানালাইজেশন এক সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী—বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা উহার অংশমাত্র।

র‍্যাশানালাইজেশন ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা

(২) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার দ্বারা একক কারবারের ক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় কিন্তু র‍্যাশানালাইজেশান দ্বারা জাতীয় স্তরে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(৩) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য বাজারের সহিত ফার্মের সামঞ্জস্যবিধান করা কিন্তু শিল্পসংস্কারের উদ্দেশ্য হইল শিল্পের মোট উৎপাদনের সহিত সমগ্র ক্রেতা সমাজের আনুমানিক ভোগের সামঞ্জস্য বিধান করা।

(৪) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলিতে একটি ফার্মের আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন করা বুঝায়, ইহা সংকীর্ণ অর্থ বহন করে—অপরপক্ষে র‍্যাশানালাইজেশন বলিতে শিল্পের সামগ্রিক সংস্কার বুঝায়—ইহা ব্যাপকতর।

(৫) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির উপরই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু উৎপাদন, পরিবহন বিক্রয় সকল বিষয়ই র‍্যাশানালাইজেশনের অন্তর্ভুক্ত।

(৬) র‍্যাশানালাইজেশনে শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মের অপচয় নিবারণ করা হয়, পক্ষান্তরে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় একটি ফার্মের অপচয় নিবারণ করা হয়।

(৭) র‍্যাশানালাইজেশনে প্রয়োজন হইলে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কোনো কোনো অদক্ষ ফার্মের (uneconomic firm) বিলোপ সাধন করা হয় কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় তাহা করা হয় না।

ভারতীয় শিল্পে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা : (Argument for Rationalising Indian Industries) :

ভারতে যতদিন পর্যন্ত বিক্রেতা-বাজার (Sellers' market) ছিল, ভোগকারীকে দ্রব্যের জন্য উচ্চমূল্য দিতে হইত ততদিন পর্যন্ত আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা

দেয় নাই। শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য খুব বেশী থাকায় উৎপাদকেরা শিল্পে আধুনিকীকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয় নাই। প্রতি ইউনিট মেশিনে অধিক শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া অতি পুরাতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে দ্রব্য উৎপাদিত হইলেও উৎপাদকেরা মুনাফা অর্জন করিত। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে ক্রেতা-বাজারের (Buyers' market) প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভোগকারীগণ এখন দ্রব্যের জন্য বেশী দাম দিতে রাজী নয়। দ্রব্যের দাম কমিলে উৎপাদককে উৎপাদনখরচ কমাইতে হইবে এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করার পদ্ধতি হইল র‍্যাশানালাইজেশন।

বর্তমানে ভারতীয় শিল্পে র‍্যাশানালাইজেশান করার স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখানো হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, অনেকক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি পুরাতন ও অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। অনেকদিন ধরিয়া পুরাতন যন্ত্রপাতির দ্বারা কাজ চালানো হইতেছে। নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহার ভিন্ন এই সকল শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর নয়।

আধুনিকীকরণের যুক্তি

১৯৫[redacted]শিল্পে, ১৯৫১ লে Working Party on Coal Industry কয়লা শিল্পে এবং ১৯৫৪ সালে Jute Enquiry Commission পাট শিল্পে যন্ত্রপাতির পরিবর্তন এবং আধুনিকীকরণের সুপারিশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, সাম্প্রতিককালে ট্রেড ইউনিয়ানগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী হওয়ার ফলে এবং রাষ্ট্রের শ্রমিক-কল্যাণ-মূলক আইন পাশ করার ফলে শ্রমিকব্যয় অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় উৎপাদনখরচ কমাইতে এবং শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে হইবে আর র‍্যাশানালাইজেশনের মাধ্যমেই ইহা সম্ভবপর। তৃতীয়তঃ, বৈদেশিক প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করিয়া র‍্যাশানালাইজেশান প্রবর্তন করা কর্তব্য। উৎপাদন-ব্যয় কমাইতে না পারিলে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে। রপ্তানীর উপর নির্ভরশীল শিল্পগুলিকে র‍্যাশানালাইজ করিয়া তাহাদের প্রতিযোগী ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চা, পাট এবং বস্ত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সাম্প্রতিককালে চীন, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি দেশ ভারতের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় রপ্তানীশিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় চা, পাট, চিনি, বস্ত্র প্রভৃতির বাজার অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে এই সকল শিল্পে র‍্যাশানালাইজেশন করা আশু প্রয়োজন। বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে জাপানের প্রতিযোগিতা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা ছাড়া সস্তায় পাটের পরিবর্ত দ্রব্যের (substitutes) ব্যবহার ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সকল কারণে আধুনিক উন্নততর প্রণালীতে উৎপাদন করিতে না পারিলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়িবে। চতুর্থতঃ, মূল্যস্তর উচ্চ বলিয়া ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজার প্রসারিত হইতে পারিতেছে না। দাম কমাইয়া দেশীয় বাজারের পরিধি বাড়াইতে হইবে। দ্রব্যমূল্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস করার অর্থই হইতেছে র‍্যাশানালাইজেশনের প্রবর্তন করা। পরিশেষে, দেশে মূল্যস্তর ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। শিল্পজাতদ্রব্যের

ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তর কমাইতে হইলে র্যাশানালাইজেশনের মাধ্যমে উৎপাদন-ব্যয় কমাইতে হইবে।

আধুনিকীকরণের বিরুদ্ধ যুক্তি

র্যাশানালাইজেশন সম্বন্ধে শ্রমিকেরা বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে তাহার কারণ ইহার ফলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। ইহা ছাড়া অন্য যুক্তিও দেখানো হয় যে ভারতে মূলধনের স্বল্পতা রহিয়াছে, অপরপক্ষে শ্রমিক সহজলভ্য। এইরূপ অবস্থায় র্যাশানালাইজেশন না করিয়া শ্রম প্রগাঢ় (labour intensive) পদ্ধতিতে শিল্পপরিচালনার স্বপক্ষে যুক্তি দেখানো হয়। কিন্তু র্যাশানালাইজেশন না করিলেও যে বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে তাহা আমরা দেখিয়াছি। সহসা আমূল পরিবর্তন না করিয়া ধীরে ধীরে র্যাশানালাইজেশন প্রবর্তন করিতে হইবে এবং সর্বদাই শ্রমিকের স্বার্থের কথা মনে রাখিতে হইবে। ১৯৫৭ সালের ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলন তিনটি সর্তে র্যাশ[illegible] হইয়াছে: প্র[illegible] র্যাশানালাইজেশনের ফলে কাহাকেও ছাটাই করা চলিবে না অথবা র্যাশানালাইজেশনের [illegible]জুহাতে শ্রমিকদের মজুরি কমানো যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, র্যাশানালাইজেশনের ফল শ্রমিক, উৎপাদক এবং ক্রেতা এই তিন দলের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, র্যাশানালাইজেশানের ফলে কাজের ভারের হিসাব করিতে হইবে।

১৯৫১ সালে শিল্পোন্নয়ন কমিটি (Industrial Development Committee) র্যাশানালাইজেশন সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে উৎপাদন কমাইবার এবং ভারতীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য র্যাশানালাইজেশন প্রয়োজন কিন্তু সেই সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে শ্রমিকের স্বার্থও দেখিতে হইবে এবং অতি দ্রুতগতিতে র্যাশানালাইজেশন করা হইবে না।[1]

সরকারী নীতি

র্যাশানালাইজেশন সম্পর্কে সরকারী নীতি এই যে সরকার র্যাশানালাইজেশন সমর্থন করিবেন যদি (১) শ্রমিক এবং মালিক ইহা করিতে সম্মত হয় অথবা (২) যদি র্যাশনালাইজেশন শিল্পোন্নয়ন কমিটির পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়।

অধিকাংশ ভারতীয় শিল্পে র্যাশানালাইজেশন তিনদিক হইতে প্রয়োজন। প্রথমতঃ, শিল্পের স্থান নির্বাচন উন্নত করা প্রয়োজন। চিনি শিল্পের অবস্থানের আশু উন্নতি করা প্রয়োজন। কাঁচামালের নৈকট্য এবং ভোগকারীর সান্নিধ্য এই দুই বিষয় চিন্তা করিয়া সিমেণ্ট শিল্প, কাগজ শিল্প এবং চিনিশিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনপদ্ধতির উন্নতি করা প্রয়োজন। চিনিশিল্পে, সালফার ব্যবহারের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ধাতুনিষ্কাশক কয়লা ব্যবহারের পরিমাণ কমাইতে হইবে এবং অধিকাংশ শিল্পজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে

1 "Rationalisation should be attempted when it does not lead to unemployment is introduced in consultation with workers and is effected after improving working conditions and guaranteeing a substantial share of gains to workers" Second Plan.

গুণগত মান উন্নয়ন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, প্রতি ইউনিট মেসিনে শ্রমিকের সংখ্যা কমাইতে হইবে এবং শিল্পকে অন্ততঃ সর্বনিম্ন অর্থনৈতিক আয়তনে আনিতে হইবে। ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত, পাট, চিনি, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পে প্রতি ইউনিট মেসিনে অপেক্ষাকৃত বেশী শ্রমিক কাজ করে ফলে উৎপাদন-খরচ বৃদ্ধি পায় এবং শিল্পের প্রতি-যোগিতার ক্ষমতা কমিয়া যায়।

ভারতের শুল্কনীতি (Fiscal Policy of India):

১৯২১ সালে ভারত সরকার প্রথম ফিসক্যাল কমিশন নিয়োগ করেন। ইহার পূর্বে কোনো ফিসক্যাল কমিশন নিযুক্ত হয় নাই। ১৯২১ সালের পূর্বে যে কোনরূপ আমদানী শুল্ক আদায় করা হইত না, তাহা সত্য নয়, কিন্তু উহা শুধু নিছক রাজস্ব আদায়ের জন্যই করা হইত, উহার পিছনে কোনো দীর্ঘকালীন লক্ষ্য বা সুপরিকল্পনা ছিল না।

স্বদেশী দ্রব্য ও শিল্পকে সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিদেশী দ্রব্যের আমদানীর উপর বাধানিষেধ আরোপ করাকে সংরক্ষণ বলে। সংরক্ষণের নানা পদ্ধতি আছে, ইহাদের মধ্যে শুল্ক (Duties) এবং অর্থ সাহায্যই (Bounties and Subsidies) প্রধান। বিদেশী দ্রব্যের আমদানীর উপর শুল্ক বসাইলে বিদেশী দ্রব্যের দাম বাড়িয়া যায়। এই শুল্কের ফলে দেশীয় উৎপাদকরা বিদেশী উৎপাদকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি দেশীয় শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতার সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারে তাহা হইলে সরকার সংগৃহীত কর হইতে দেশীয় শিল্পকে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন। ফলে অপেক্ষাকৃত কম দামে দেশীয় উৎপাদকেরা বিদেশী উৎপাদকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। উপযুক্ত শুল্ক নীতির ফলে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা হয়।

সংরক্ষণের ধারণা

১৯২১ সালের এগারোজন সদস্যবিশিষ্ট ফিসক্যাল কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা। এই কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে বিভেদমূলক সংরক্ষণ নীতি (Discriminating Protection) গ্রহণের সুপারিশ করেন। ইহার অর্থ সকল শিল্পকেই সংরক্ষণ দেওয়া হইবে না—সংরক্ষণ দিবার সময় বিচার করিয়া দেখিতে হইবে কোন কোন্ শিল্প সংরক্ষণ পাইবার উপযুক্ত। সংরক্ষণের জন্য যোগ্যতাবিচারের তিনটি মূলনীতি (triple formula) ছিল। প্রথমতঃ শিল্পটির পক্ষে স্বাভাবিক সুবিধা (natural advantage) থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা-মালের যোগান, পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রমিকের যোগান, বিস্তৃত বাজার প্রভৃতি থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পটি এরূপ হওয়া চাই যে সংরক্ষণ ব্যতীত ইহার উন্নয়ন সম্ভবপর নয় অথবা জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে যত দ্রুত প্রসার লাভ করা প্রয়োজন বিনা সংরক্ষণে তাহা সম্ভবপর নয়। তৃতীয়তঃ, শিল্পটি এরূপ হওয়া চাই যাহা সংরক্ষণ

বিভেদমূলক সংরক্ষণ

পাইয়া অদূর ভবিষ্যতে এমন উন্নত হইয়া উঠিবে যে তখন উহা বিনা সংরক্ষণেই বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে।

ইহা ব্যতীত যদি আশা করা যায় যে শিল্পটি অদূর ভবিষ্যতে দেশের সমগ্র চাহিদা মিটাইতে পারিবে, এবং উহা দেশরক্ষাসংক্রান্ত অথবা মূলশিল্প তাহা হইলে সংরক্ষণের দাবী অগ্রগণ্য হইবে। সংরক্ষণ নীতি কার্যকরী করার জন্য কমিশন একটি ট্যারিফ বোর্ড গঠনের সুপারিশও করেন। অবশ্য সরকার টারিফ বোর্ড গঠনের সুপারিশ গ্রহণ করেন নাই।

এই শুল্কনীতিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। এই নীতি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং দেশের শিল্পায়ণের মোটেই অনুকূল ছিল না। অবশ্য সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতি হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করেন নাই। সংরক্ষণ দানে ওই তিনটি মূলনীতির কঠোর প্রয়োগের ফলে অধিকাংশ শিল্পই সংরক্ষণের সুবিধা

সমালোচনা

[illegible] হইতে বঞ্চিত হয়। এই [illegible]নীতিতে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিকেই সংরক্ষণ দেওয়া হয়, নূতন শিল্প স্থাপনের কোনো প্রয়াস দেখা যায় না। অবশ্য আমরা আশা করিতে পারিনা যে বিদেশী সরকার তাহার নিজস্ব স্বার্থ সঙ্কুচিত করিয়া ভারতীয় শিল্পপতিকে সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য যে এই শুল্কনীতি কিছু পরিমাণে ভারতের শিল্প সম্প্রসারণের সহায়তা করে। এই সংরক্ষণের ফলে লৌহ ও ইস্পাত, চিনি প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প গড়িয়া উঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শিল্প সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রায় লোপ পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে একপ্রকার স্বাভাবিক সংরক্ষণের অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ইহার সুযোগ লইয়া শিল্পপতিগণ নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিযাছিল। কিন্তু শিল্পপতিদের মনে আশংকা ছিল যে যুদ্ধোত্তর কালের অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে নবগঠিত শিল্পগুলি ধ্বংস হইয়া যাইবে। ১৯৪০ সালে ভারত সরকার ঘোষণা করিলেন যে যুদ্ধের সময় স্থাপিত সুসংগঠিত শিল্পগুলিকে যুদ্ধোত্তর যুগে সংরক্ষণ দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

নূতন ফিসক্যাল নীতি, ১৯৪৯-৫০ (New Fiscal Policy, 1949-50) ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায় উপযুক্ত ফিসক্যাল নীতি প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল এবং তদনুসারে ১৯৪৯ সালে ভি. টি. কৃষ্ণমাচারীর সভাপতিত্বে একটি ফিসক্যাল কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ছয়—বি, এন. গাঙ্গুলি, বি. এম. বিরলা, এম. আয়েঙ্গার, চৌধুরী মুকতার সিং, খান্দুভাই দেশাই এবং ডি. এল. মজুমদার। ১৯৫০ সালে কমিশন তাহার রিপোর্ট পেশ করেন।

পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুযায়ী ভারতীয় শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করিতে হইলে উপযুক্ত শুল্কনীতির প্রবর্তন করা প্রয়োজন। দেশের বৃহত্তর উন্নয়নের

পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণ নীতিকে বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হইবে সামগ্রিক উন্নয়ন। শুল্কনীতি এরূপ হইবে যাহার দরুণ জনসংখ্যা এবং শিল্প সংগঠনে এরূপ পরিবর্তন সাধিত হইবে যে দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং সামগ্রিক ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত হইবে। মাত্র কয়েকটি বিশেষ শিল্পের উন্নয়ন ইহার লক্ষ্য হইবে না। এই পটভূমিকায় বিচার করিলে সংরক্ষণ উদ্দেশ্য নয়—জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধির উপায় মাত্র।*

সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য

প্রথম ফিসক্যাল কমিশনের বিভেদমূলক সংরক্ষণ নীতির উদ্দেশ্য ছিল বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় পর্যুদস্ত কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শিল্পকে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সহায়তা করা। সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে দেশের শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি প্রস্তুত করা ইহার লক্ষ্য ছিল না। অপরপক্ষে এই নূতন ফিসক্যাল কমিশন সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ভারতীয় শুল্কনীতির বিচার করিয়াছেন। কমিশন ভারতের শিল্পোন্নয়ণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া শিল্প সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন। সংরক্ষণ যে দেশের শিল্পোন্নয়নের একটি উপায় এ সম্পর্কে কমিশন সচেতন ছিলেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে পূর্বতন ফিসক্যাল নীতি ছিল প্রতিরক্ষামূলক সংরক্ষণনীতি (defensive protection), অপরপক্ষে নূতন সংরক্ষণ নীতি হইল উন্নয়নমূলক সংরক্ষণনীতি (developmental protection); দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বার্থ বিবেচনা করিয়া নূতন ফিসক্যাল নীতি নির্ধারিত হইয়াছে।

সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নূতন সংরক্ষণ নীতিতে ভারতীয় শিল্পগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রতিরক্ষা শিল্পসমূহ; এই সকল শিল্পগুলিকে সম্পূর্ণ সংরক্ষণ দিতে হইবে। ইহাতে ব্যয় যত বেশী হউক না কেন, আর্থিক ক্ষতি যতই হউক না কেন সরকারকে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ মূল ও ভারীশিল্প; এই শিল্পগুলিকে কি পরিমাণ সংরক্ষণ দিতে হইবে তাহা ট্যারিফ কমিশন (Tariff Commission) কিছুকাল পর পর বিবেচনা করিয়া দেখিবে। এই শিল্পগুলিকে সংরক্ষণদানের ব্যাপারে ট্যারিফ কমিশনকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সংরক্ষণ দানে কোনো কঠোর নীতি অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয়তঃ, অপরাপর শিল্প, মূল ও ভারী শিল্প ছাড়া অন্যান্য সকল শিল্প এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে যে সকল শিল্প পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার

* "A policy of protection is judged entirely by its effects in the broad context of economic development in a country situated in a particular economic environment This view places the rationale of protection in the proper perspective of developmental protection, the object of which is not merely to foster particular branches of production but to induce such a change in the demographic and industrial structure as will transform the economic environment and raise the level of productivity in the country as a whole. In such a perspective protection becomes means to an end—which is national welfare." Fiscal Commission

পাইবে অথবা যাহারা মূলশিল্পের পরিপূরক বা সহায়ক তাহাদেরও সংরক্ষণ দেওয়া উচিত। শিল্পের অর্থনৈতিক সুবিধা, সংরক্ষণ ব্যয় এবং জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করিয়া সংরক্ষণ দেওয়া বা না দেওয়া স্থির করিতে হইবে।

সংরক্ষিত শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগী বৈদেশিক দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক স্থাপন করা হয়। এই আদায়ী শুল্ক সঞ্চয় করিয়া একটি উন্নয়ন ফাণ্ড (Development Fund) গঠন করিতে হইবে এবং যে সকল শিল্পকে অর্থ সাহায্য (subsidy) করা প্রয়োজন তাহাদিগকে এই ফাণ্ড হইতে অর্থ সাহায্য দান করা যাইবে।

শিল্পে সংরক্ষণ দিবার সকল প্রশ্নের বিচার বিবেচনার জন্য একটি স্থায়ী ট্যারিফ কমিশন গঠনের সুপারিশও এই ফিসক্যাল কমিশন করিয়াছেন।

নূতন ট্যারিফ কমিশন কিভাবে কাজ করিবে তাহার স্পষ্ট নির্দেশ ফিসক্যাল কমিশন দিয়াছে। যে সকল শিল্পে সস্তায় শ্রমিক পাইবার এবং আভ্যন্তরীণ বিস্তৃত বাজার পাইবার সুযোগ রহিয়াছে কিন্তু কাঁচামাল বিদেশ হইতে আনিতে হয়, তবুও সেগুলিকে সংরক্ষণ দিয়া উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। কোনো শিল্পকে সংরক্ষণ দান করিলে যদি সেই শিল্পজাত সামগ্রী দেশের সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে না পারে তথাপি সংরক্ষণদানে কোনো প্রকার বাধা থাকিবে না। শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার সময় আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা ছাড়াও বিদেশে সেই শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী করিবার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না তাহার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে প্রভূত পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন সেগুলিকে প্রথম হইতেই সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে নতুবা কেহই এই ধরণের শিল্প স্থাপনে অগ্রসর হইবে না। প্রয়োজন হইলে, জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কৃষিজ দ্রব্য সামগ্রীকেও সংরক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে সংরক্ষণ এক সঙ্গে পাঁচ বৎসরের অধিককালের জন্য হইবে না। আরও বলা হইয়াছে যে, যখন শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে তখন সেই শিল্পের উপর কোনো উৎপাদন শুল্ক (excise duty) বসানো হইবে না।

যে সকল শিল্প সংরক্ষণের সুবিধা পাইবে তাহাদের কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির গুণগত মান উচ্চ রাখিতে হইবে এবং মূল্য ন্যায্য রাখিতে হইবে।

ভারত সরকার এই ফিসক্যাল কমিশনের সকল সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছে এবং ১৯৫২ সাল হইতে স্থায়ী ট্যারিফ কমিশন কাজ আরম্ভ করিয়াছে। ইহার সদস্য সংখ্যা অনধিক পাঁচজন হইবে।

এই নূতন ফিসক্যাল নীতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে এইনীতি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সংরক্ষণের নূতন নীতি নির্ধারণ করিয়াছে। প্রথম ফিসক্যাল নীতির সহিত

নূতন ফিসক্যাল নীতির চারিটি মূল পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, পূর্বতন ফিসক্যাল কমিশন (১৯২১-২৩) যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহাকে প্রতিরক্ষামূলক সংরক্ষণ (defensive protection) বলা চলে, অপরপক্ষে নূতন ফিসক্যাল নীতিকে উন্নয়নমূলক সংরক্ষণ (development protection) বলা চলে। পূর্বতন ফিসক্যাল নীতিতে সংরক্ষণকে দেখা হইয়াছিল একটি লক্ষ্য হিসাবে, কিন্তু নূতন নীতিতে ইহাকে দেখা হইয়াছে একটি উপলক্ষ্য হিসাবে—যাহার মূল লক্ষ্য দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের বিকাশ সাধন। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বতন ফিসক্যাল নীতি অনুসারে বিভিন্ন শিল্পকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখা হইয়াছে কিন্তু নূতন ফিসক্যাল নীতির দৃষ্টি হইতে বিভিন্ন শিল্পকে এক অখণ্ড পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে দেখা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ পূর্বেকার ফিসক্যাল নীতিতে কতকগুলি সর্ত পূরণ করিলে [illegible] শিল্পকে সংরক্ষণ [illegible] হইত কিন্তু নূতন ফিসক্যাল নীতিতে এই সব সর্তকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই। জাতির আর্থিক উন্নয়নের সহিত জড়িত সকল শিল্পকেই সংরক্ষণ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, নূতন ফিসক্যাল নীতিকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি হইতে পৃথক করিয়া দেখা চলে না। এই নূতন ফিসক্যাল কমিশন যখন তাহার রিপোর্ট পেশ করে তখনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয় নাই সত্য, কিন্তু পরিকল্পিত অর্থনীতির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই নূতন ফিসক্যাল নীতি গৃহীত হইয়াছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের পার্থক্য

নূতন ফিসক্যাল নীতিতে সংরক্ষণ দানের কথাই বলা হইয়াছে কিন্তু সংরক্ষণ নীতির অবসান সম্পর্কে কমিশন কিছুই নির্দেশ দেন নাই। উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে সংরক্ষণ প্রয়োজনীয় হইতে পারে কিন্তু দীর্ঘকাল সংরক্ষণ চালু রাখা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে। যে সরকারী শিল্পে দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনাধীন শিল্প হইলেই যে সংরক্ষণ দান করিতে হইবে এই নীতিও যুক্তিসঙ্গত নয় কারণ পরিকল্পনাধীন সকল শিল্পেরই সংরক্ষণের প্রয়োজন নাও হইতে পারে।

সরকারের শিল্পনীতি (Government's Industrial Policy) : স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত ভারত সরকারের কোনো নির্দিষ্ট এবং সুসম্বদ্ধ শিল্পনীতি ছিল না। বিদেশী সরকারের নিকট ভারতের দ্রুত শিল্পোন্নয়ন কাম্য ছিল না কারণ ইহা তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী। অধিকন্তু উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। বিদেশী সরকারের শিল্পনীতিকে উদাসীন স্বাতন্ত্র্যবাদ (apathetic laissez-faire) বলা চলে। ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত স্বভাবতই পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালে সর্বপ্রথম ভারতীয় শিল্পনীতি গৃহীত হয় এবং ১৯৬৬ সালের শিল্পনীতির ভিত্তি হইল ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি।

দেশের শিল্পনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইল দ্রুত এবং সুসম শিল্পায়ন। যদি সকল কিছুই বে-সরকারী উদ্যোগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে শিল্পের দ্রুত এবং সুসম (balanced) উন্নয়ন সম্ভবপর নয় তাহার কারণ মূলধনের স্বল্পতা, নৈপুণ্যের

অভাব এবং প্রাথমিক অবস্থায় মুনাফার স্বল্পতা। এই কারণে অদ্যাবধি ভোগ্যবস্তু শিল্পের (consumer's goods industries) উপরই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে কিন্তু মূল এবং মূলধনী বস্তু উৎপাদন শিল্পের (capitalgoods industries) কোনো প্রসার ঘটে নাই। এই কারণে বেসরকারী উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রের মালিকানায় নূতন শিল্প স্থাপন করা প্রয়োজন। সরকারী নীতি শুধুমাত্র নেতিবাচক হইলেই চলিবে না। বে সরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করাও সরকারী-নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত।

১৯৫৬ সালের গৃহীত শিল্পনীতির সম্যক তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ১৯৪৮ সালে গৃহীত পূর্বতন শিল্পনীতি আগে বুঝিতে হইবে।

১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সরকারী শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। এই শিল্পনীতির ভিত্তি হইল মিশ্র অর্থনীতি (mixed economy)। এই শিল্পনীতিতে সুস্পষ্টভাবে ইহা ঘোষণা করা হইয়াছে যে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোতে সরকারী ও বে-সরকারী উভয়প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্থান থাকিবে।

এই ঘোষণায় শিল্পগুলিকে মোটামুটি চারভাগে ভাগকরা হইয়াছে। প্রথমতঃ, দেশরক্ষা ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারে (Exclusive State Monopoly) রাখা হয়। ইহার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, আণবিক শক্তি উৎপাদন এবং রেলপথ এই তিনটি শিল্প ছিল। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণক্ষেত্রে (State Controlled Sphere): মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প (Basic and Key industries) যথা লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, বিমানপোত, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি সরকারী মালিকানায় গড়িয়া তোলা হইবে এবং এই সকল শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন নূতন যে সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে তাহা সরকারী মালিকানায় পরিচালিত হইবে কিন্তু বে-সরকারী মালিকানায় পুরানো শিল্পগুলি দশ বৎসর চলিতে পারিবে এবং তাহার পর জাতীয়করণের প্রশ্ন উঠিবে। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রতান্ত্রিক বে-সরকারী শিল্পসমূহ (Industries subject to State Regulation and Control): চিনি, তুলাবস্ত্র, সিমেণ্ট, কাগজ, লবণ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কুড়িটি শিল্প বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে থাকিবে কিন্তু এগুলির উপর সরকারের অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। চতুর্থতঃ, বাকী শিল্পগুলিতে (rest of industrial field) সম্পূর্ণরূপে বে-সরকারী মালিকানা থাকিবে কিন্তু প্রয়োজনবোধে এই অংশেও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ঘটিতে পারে।

১৮৪৮ সালের শিল্পনীতি

এইশিল্পনীতি ঘোষণায় জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোয় কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের যথাযোগ্য স্থান নির্ধারণ করা হইয়াছিল। বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রশিল্পের ভিত্তিতে শিল্পোন্নয়নের আদর্শ সম্মুখে রাখা হয়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে সেইসকল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়িয়া তুলিতে জোর দেওয়া হয়, যেগুলিতে অধিকসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হইতে পারে। এই সকল শিল্পে সমবায় পদ্ধতির প্রসার ঘটাইতে হইবে।

কুটিরশিল্পের স্থান

শ্রমিক মালিক সম্পর্ক

উৎপাদনবৃদ্ধি ও শিল্প সুপরিচালনার জন্য সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির, বাসস্থানের উন্নতির এবং শিল্প পরিচালনায় শ্রমিক যাহাতে ক্রমান্বয়ে অধিকতর অংশ গ্রহণ করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বৈদেশিক মূলধন

বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে এই ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে ভারতে লগ্নীকৃত বৈদেশিক মূলধনের বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইবে না। বৈদেশিক মূলধনকে দেশীয় মূলধনের সমান সুবিধা দেওয়া হইবে এবং মুনাফা ও বিনিয়োগকারীদের মূলধন স্বদেশে পাঠানোর সুবিধা দেওয়া হইবে। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে এবং অন্যান্য বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পসংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত নূতন শুল্কনীতি নির্ধারণ করিতে হইবে।

এই শিল্পনীতি যাহাতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করিতে পারে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে সম্পদ [redacted] তাহার জন্য উপযুক্ত করনীতির প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করা হয়।

পাবলিক কর্পোরেশন কর্তৃক সরকারী শিল্প পরিচালিত হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের অবস্থান নির্বাচন রাষ্ট্র স্বয়ং করিবে।

সমালোচনা

ভারতের প্রথম শিল্পনীতি বিশেষ কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। তবে এই নীতিতেই ভারত সরকার মিশ্র অর্থনীতির (Mixed Economy) ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহাতে সরকারী ও বে-সরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয় এবং বে-সরকারী শিল্পের উপর নানারূপ সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে মুনাফাশিকার সংকুচিত হইবে এবং ধনবৈষম্য হ্রাস পাইবে।

কিন্তু এই নীতিতে জাতীয়করণের প্রশ্নটিকে যেভাবে বিচার করা হইয়াছিল তাহাতে বে-সরকারী উদ্যোগ ভীত হইয়া পড়ে। বলা হইয়াছিল যে দশবৎসর পরে জাতীয়করণের প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনা করা হইবে। ইহাতে যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় তাহার ফলে বে-সরকারী শিল্পের প্রসার বাধা পায় এবং বৈদেশিক মূলধনও ভীত হইয়া পড়ে।

শিল্প (উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ) আইন [Industries (Development and Regulation) Act, 1951] : বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে শিল্প উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করা হয়। বে-সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন-দক্ষতা যদি আশানুরূপ না হয়, তাহা হইলে সরকার সেগুলিকে গ্রহণ করিতে পারিবেন। দেশের সুষ্ঠু শিল্পোন্নয়নের জন্য বে-সরকারী সকল শিল্পকে রেজেষ্ট্রি করিতে এবং নূতন শিল্প স্থাপন করিতে হইলে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

এই আইনানুসারে বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই আইনের উল্লেখযোগ্য তিনটি বিষয় হইল : (১) এক লক্ষ

টাকার অধিক মূলধন লইয়া গঠিত শিল্পগুলিকে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে; (২) এই আইনের তালিকাভুক্ত যে কোনো শিল্পের জন্য সরকার উন্নয়ন পরিষদ (Development Council) গঠন করিতে পারিবেন; (৩) এই আইন দ্বারা কতকগুলি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হইয়াছে। যদি কোনো ফার্মের উৎপাদন অথবা মান হ্রাস পায়, অথবা শিল্পজাতদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি করে তাহা হইলে সরকার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বা মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে নির্দেশ জারি করিতে পারিবে। প্রয়োজন মনে করিলে সরকার উহার পরিচালনার ভারও গ্রহণ করিতে পারে।

১৯৫৩ সালে শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন করিয়া ইহার কার্যপরিধি বৃদ্ধি করা হয়। প্রথমে এই আইন ৩৭টি শিল্পের উপর প্রযোজ্য ছিল, পরে ১৯৫৩ সাল হইতে ৪৫টি শিল্পে এই আইন প্রযোজ্য হয়।

এই আইন অনুসারে শিল্প সমস্যা [illegible] চিন্তা করিবার এবং উপদেশ দিবার জন্য শ্রমিক, মালিক এবং ভোগকারীদের প্রতিনিধি লইয়া একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কাউন্সিল (Central Advisory Council) গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোনো নূতন শিল্পকে লাইসেন্স দিবার পূর্বে তাহার যোগ্যতা এবং অবস্থান বিচার করিয়া দেখিবার জন্য একটি লাইসেন্সিং কমিটি (Licensing Committee) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য একটি করিয়া উন্নয়ন পরিষদ (Development Council) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬২ সালে এই ধরণের উন্নয়ন পরিষদের সংখ্যা ছিল ১৮টি।

নূতন শিল্পনীতি, ১৯৫৬ (New Industrial Policy, 1956):— ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির ঘোষণার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে এবং ইহার মধ্যে নানারূপ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়া গিয়াছে, যেমন ভারতীয় সংবিধান রচিত হইয়াছে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হইয়াছে এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের নীতি গৃহীত হইয়াছে। এই সকল কারণে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচনায় নূতন করিয়া শিল্পনীতি নির্ধারণের প্রয়োজন হইয়াছিল। পরিকল্পনা কমিশনের ভাষায়, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুত শিল্পায়নের খাতিরে প্রতিরক্ষামূলক, মূল ও জনস্বার্থ সম্পর্কিত যাবতীয় শিল্পকে জাতীয়করণ করা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত যে সকল ক্ষেত্রে বে-সরকারী মূলধন প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প, সেই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এলাকা প্রসারিত করা প্রয়োজন এই সিদ্ধান্তের আলোকে নূতন শিল্পনীতি গৃহীত হইয়াছে।

এই নূতন শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে রহিয়াছে কয়লা, লৌহশিল্প খনিজ তৈল, আণবিকশক্তি, কতকগুলি পরিবহনশিল্প প্রভৃতি ১৭টি শিল্প। এই সকল শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমান বে-সরকারী উদ্যোগ বজায় থাকিলেও ইহাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের উপর

ন্যস্ত থাকিবে (exclusive responsibility of the state) মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ১৯৪৮ সালে যে সকল শিল্পগুলিকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল, এই শিল্পনীতিতে তাহাদের একটিমাত্র শ্রেণীতে (প্রথম শ্রেণীতে) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১২টি শিল্পকে রাখা হইয়াছে—মেশিনটুল, এন্টিবায়োটিক, প্রয়োজনীয় ঔষধ সার, সিনথেটিক রাবার. রাস্তাপরিবহন, সামুদ্রিক পরিবহন ইত্যাদি—এবং এই সকল শিল্পে সরকারী এবং বে-সরকারী মালিকানা পাশাপাশি চলিবে কিন্তু ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রের মালিকানার প্রসার হইবে এবং সেই কারণে সাধারণতঃ রাষ্ট্রই নূতনশিল্প স্থাপন করিবে (which will be progressively State-owned and in which the State will therefore generally take the initiative in establishing new undertakings); বাকী শিল্পগুলিকে (যেমন চিনি, বস্ত্র, সিমেন্ট ইত্যাদি) তৃতীয় শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে। সাধারণতঃ এই সকল শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন বে-সরকারী [illegible] উপর ন্যস্ত থাকিবে (Future development will, in general, be left to the initiative and enterpriso of the private sector) কিন্তু এই ক্ষেত্রেও প্রয়োজনবোধে নূতন শিল্প স্থাপনের অধিকার রাষ্ট্রের থাকিবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই তিনটি শ্রেণী স্বতন্ত্র হইলেও সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। প্রয়োজন হইলে এক শ্রেণীর শিল্পকে অন্যশ্রেণীতে স্থানান্তরিত করা যাইবে। এই নমনীয়তা (flexibility) ভারত সরকারের ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে ছিল না।

প্রথম শিল্পনীতির মতো দ্বিতীয় শিল্পনীতিতেও কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই শিল্পগুলি কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার ঘটিলে যে মূলধন গ্রামাঞ্চলে সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা ব্যবহার করার সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়তঃ, স্বল্পপরিমাণ মূলধনেই এই সকল শিল্প গড়িয়া তোলা যায়। চতুর্থতঃ. এই সকল শিল্পের সাহায্যে ধন-বৈষম্য হ্রাস করা যায়।

ভারতে আঞ্চলিক শিল্প বৈষম্য রহিয়াছে। কোনো অঞ্চলে শিল্পের বিপুল প্রসার ঘটিয়াছে আবার কোনো অংশে শিল্প অতিমাত্রায় অনগ্রসর। এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য রাষ্ট্র অনগ্রসর অঞ্চলগুলিকে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। এই নূতন শিল্পনীতিতে বৈদেশিক মূলধন ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বিষয়ে পূর্বতন শিল্পনীতিরই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য যে ইহাতে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় সমাজ গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্পের উদ্যোক্তাই শুধুমাত্র মুনাফা ভোগ করিয়া থাকে কিন্তু জাতীয়করণ করা হইলে সমগ্রজাতি উহার মুনাফা ভোগ করিতে পারিবে।

প্রথম শিল্পনীতির সহিত দ্বিতীয় শিল্পনীতির কয়েকটি পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমতঃ, প্রথম শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে চারভাগে ভাগ করা হইয়াছিল অপরপক্ষে দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম শিল্পনীতিতে যে সকল শিল্পগুলিকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাখা হইয়াছিল মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে তাহাদের প্রথম শ্রেণীতে রাখা হয়। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে সরকারী উদ্যোগের সম্প্রসারণের উপর প্রথম শিল্পনীতি অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, প্রথম শিল্পনীতিতে বেসরকারী শিল্পকে জাতীয়করণ করার যে কথা বলা হইয়াছিল, দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে সেরূপ কোনো কথার উল্লেখ নাই। চতুর্থতঃ, দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে সমবায় পদ্ধতিকে বে-সরকারী ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার যে কথা বলা হইয়াছে প্রথম শিল্পনীতিতে এ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নাই।

প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্পনীতির পার্থক্য

নূতন শিল্পনীতির বিচার (Evaluation of the New Iudustrial Policy):

এই শিল্পনীতিকে উদাসীন ধনতন্ত্রের (laissez-faire capitalism) সমর্থকেরা তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই শিল্পনীতিতে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাবে প্রসারিত এবং বে-সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। টেকনিসিয়ান, পরিচালন-দক্ষতা, মূলধন ইত্যাদির অভাবে যে সকল শিল্পকে রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে নিজের এক্তিয়ারে রাখিয়াছে তাহাদের পরিচালনা করিতে পারিবে না; আবার বে-সরকারী মালিকানা অগ্রসর হইয়া সাহায্য করিতে আসিবে না। কারণ নূতন শিল্পনীতিতে তাহাদের সে অধিকার খর্ব হইয়াছে এবং যদিও তাহারা রাষ্ট্র কর্তৃক আহুত হয় তথাপি তাহারা অগ্রসর হইতে সাহসী হইবে না। ইহার ফলে দেশের দ্রুত শিল্পায়ন ব্যাহত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাপক জাতীয়করণের অনিশ্চয়তা দেশের শিল্পপতিদের মনে ভয়, সন্দেহ এবং নিরাশার সৃষ্টি করিয়াছে—শিল্পপ্রসারের উপযুক্ত অর্থনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় নাই। তৃতীয়তঃ, বলা হয় যে বে সরকারী উদ্যোগকে যে পরিমাণ কার্যের পরিধি দেওয়া হইয়াছে তাহা এতোই ক্ষুদ্র যে দক্ষতা সহকারে কাজ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই সকল যুক্তিগুলি কেবলমাত্র শিল্পপতিদের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া বলা হয়—সমগ্র দেশের স্বার্থ চিন্তা করিয়া নয়। রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ছাড়া কোনো অনুন্নত দেশে দ্রুত শিল্পোন্নতি সম্ভবপর নয় জাপানের মতো ধনতান্ত্রিক দেশেও রাষ্ট্রের সক্রিয় প্রচেষ্টায়ই দ্রুত শিল্পোন্নতি হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বর্তমান শিল্পনীতিতে যখন বে-সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক ও অন্যপ্রকার সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তখন এই ধরণের সমালোচনার বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই।

শিল্পের জাতীয়করণের নীতি (Policy of Nationalisation of Industries):

সরকারের শিল্পনীতির সহিত জাতীয়করণের প্রশ্নটিও জড়িত রহিয়াছে।

শিল্প উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ আইনানুসারে কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকার বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে গ্রহণ করিতে পারে।

জাতীয়করণের ধারণা

জাতীয়করণ বলিতে বুঝায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও পরিচালনার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনা। বে সরকারী মালিকানার কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে যদি রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ দিয়া অথবা না দিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করে তখন উহাকে জাতীয়করণ করা হইল বলা হয়। ইহা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের উদ্যোগে কোনো নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারে। রাষ্ট্র যদি উদাসীন ধনতন্ত্রে (laissez-faire capitalism) বিশ্বাসী হয় তাহা হইলে জাতীয়করণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু রাষ্ট্র যদি মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy) বা সমাজতন্ত্রবাদের (Socialism) পথে চলে তাহা হইলেই জাতীয়করণের সমস্যা দেখা দিবে।

জাতীয়করণের স্বপক্ষে যুক্তি

জাতীয়করণের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে বহুতর যুক্তি রহিয়াছে। জাতীয়করণকে সমর্থন করিয়া বলা হয় যে, রাষ্ট্রের শিল্প পরিচালনা মুনাফা অর্জনের প্রবৃত্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় না। রাষ্ট্র শিল্প পরিচালনা করিবে সর্বাধিকজনের সর্বাধিক মঙ্গলের আদর্শে (greatest good of the greatest number); যেখানে প্রাথমিক অবস্থায় মুনাফা নাই বা যেখানে মুনাফা কম সেখানে বে-সরকারী শিল্পপতিদের সন্ধান মিলে না। মূল এবং ভারীশিল্পগুলি গড়িয়া তুলিতে প্রাথমিক অবস্থায় বিশেষ মুনাফা হয় না সেই কারণে বে-সরকারী উদ্যোগে এই সকল শিল্প দ্রুত গড়িয়া ওঠে না।

দ্বিতীয়তঃ, জাতীয়করণের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে সামাজিক মুনাফার প্রবর্তন করা। ব্যক্তিগত মালিকানায় যে ব্যক্তি শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করিয়াছে কেবলমাত্র সেই উহার মুনাফা ভোগ করিবে। কিন্তু কোনো শিল্পের জাতীয়করণ হইলে ব্যক্তিগত কোনো মুনাফার সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া শোষণেরও কোনো পথ থাকে না। শিল্প হইতে যে মুনাফা হয় তাহা উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে ন্যায্যভাবে বন্টিত হয়।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ব্যতীত দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভবপর নয়, কারণ বে-সরকারী প্রচেষ্টায় দেশের সমগ্র সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভবপর নয়। লর্ড কেনস তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক General Theory-তে দেখাইয়াছেন যে বে-সরকারী প্রচেষ্টায় শিল্প গড়িয়া উঠিলে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের সৃষ্টি হইতে পারে না। বে-সরকারী উদ্যোগের গলদের জন্যই বাণিজ্যচক্রের তেজী ও মন্দার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বে-সরকারী প্রচেষ্টায় শিল্প গড়িয়া উঠিলে দেশে প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হইতে পারে। ইহা ব্যতীত বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে রাষ্ট্রের প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, বে-সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি ব্যাপার শিল্পশান্তি নষ্ট করে। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে ব্যক্তিগত মুনাফা এবং শ্রমিক-শোষণের

কোনো প্রশ্ন থাকে না বলিয়াই শ্রম ও মূলধনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চমতঃ, শিল্পে র‍্যাশানালাইজেশনের জন্যও জাতীয়করণের সমর্থন করা হয়। বে-সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান মুনাফার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া র‍্যাশনালাইজেশনের কথা চিন্তা করিবে, অপরপক্ষে রাষ্ট্র দেশের সামগ্রিক মঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়া র‍্যাশনালাইজে-শনের প্রয়োজনীয়তা বিচার করিবে। ইহা ব্যতীত শিল্পে র‍্যাশনালাইজেশন করিতে হইলে প্রচুর পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন এবং বে-সরকারী শিল্পপতিদের পক্ষে ঐ পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন হইতে পারে সেই কারণে শিল্পে জাতীয়করণকে সমর্থন করা হয়। ইহাছাড়া বে-সরকারী শিল্পপতিদের মধ্যে পারস্পরিক অবৈধ প্রতিযোগিতা থাকায় বহু অর্থের অপচয় হয়—শিল্পের জাতীয়করণ হইলে ইহার প্রশ্নই থাকিবে না।

ষষ্ঠতঃ, শিল্পে জাতীয়করণ করা হইলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং যথাযোগ্য ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যায়। কিন্তু বে-সরকারী শিল্পপতিগণ ব্যক্তিগত মুনাফার দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার হইয়া থাকে।

জাতীয়করণের বিরুদ্ধে বলা হয় যে বে-সরকারী মালিকানায় ও পরিচালনায় প্রতিযোগিতার দরুণ শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ফলে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য কম এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্পের জাতীয়করণ হইলেই যে উহা জনগণের মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে সরকারী মালিকানাভুক্ত শিল্পের পরিচালনাও লাভ ক্ষতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করা হয়।

তৃতীয়তঃ, যুক্তি দেখানো হয় যে জাতীয়করণের মাধ্যমে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে। এই যুক্তির ভিত্তি হইল যে গণতন্ত্রে শ্রমিকেরা রাষ্ট্রের সহিত নিজেদের অভেদ কল্পনা করিয়া থাকে, সুতরাং ইহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে না। কিন্তু ইহা একটি তত্ত্বগত ধারণামাত্র এবং সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। শুধুমাত্র জাতীয়করণের দ্বারা শ্রমিকের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটিবে এবং সে অধিক দক্ষতার সহিত কাজ করিবে, ইহার কোনো যুক্তি নাই। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে তখনই যখন রাষ্ট্র নিজে অধিক পরিমাণে শিল্প নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করিবে। ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে জাতীয়করণ স্বয়ং একটি উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র (means to an end), ইহার উদ্দেশ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মূল্য হ্রাস করা।

চতুর্থতঃ, ব্যাপকভাবে জাতীয়করণ করা হইলে ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য প্রভূত-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। সেই কারণে অনেকে বলেন যে কোনো প্রতিষ্ঠিত শিল্পকে জাতীয়করণ না করিয়া সরকার যদি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করে তাহা হইলে ইহাতে দেশের অধিক মঙ্গল হইবে। সরকারের হাতে যে ফিসক্যাল এবং আর্থিক অস্ত্রসমূহ

রহিয়াছে তাহাদের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া বে-সরকারী শিল্পগুলিকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর বলিয়া জাতীয়করণের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ক্রমশই অধিকতর অংশ গ্রহণ করিতেছে। অনুন্নত অর্থনীতি এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের প্রসার সমর্থনযোগ্য হইলেও যাহাতে দ্রুতগতিতে এবং যথেচ্ছভাবে জাতীয়করণ না হয় সে সম্পর্কে সচেতন থাকা কর্তব্য। দ্রুতগতিতে শিল্পের জাতীয়করণ হইলে ব্যক্তিগত মূলধন খাটাইয়া শিল্পোন্নয়নের যেটুকু সুযোগ বে-সরকারী মালিকদের আছে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রথম হইতেই যদি রাষ্ট্র দেশের শিল্পোন্নয়নের সকল দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করে তাহা হইলে শিল্পের উন্নতি না ঘটিয়া অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। একই সঙ্গে অধিক পরিমাণ দায়িত্ব সরকারের উপর আসিয়া পড়িলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির দক্ষতা নষ্ট হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে ভারত সরকারের অভিপ্রেত সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন করা। এই আদর্শে পৌঁছিতে হইলে শিল্পের জাতীয়করণ ব্যতীত তাহা সম্ভবপর নয়। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে বলা হইয়াছে কতকগুলি শিল্প সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইবে; ১৯৫১ সালের শিল্প উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ আইনানুসারে ৪৫টি শিল্পের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৩ সালে বিমান কোম্পানীকে জাতীয়করণ করা হইয়াছে। ১৯৫৫ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে জাতীয়করণ করিয়া স্টেট ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়া নাম দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে জীবন বীমা কোম্পানীগুলিকে জাতীয়করণ করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে শিল্পনীতিতে বলা হইয়াছে যে মোট ১৭টি শিল্প সরকারী পরিচালনাধীনে থাকিবে এবং আরো ২৬টি শিল্পকে ধীরে ধীরে সরকারী পরিচালনার অধীনে আনা হইবে।

জাতীয়করণ কাম্য হইলেও এই বিষয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর না হইলে দেশের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। ডাঃ জনমাথাই যথার্থই বলিয়াছেন যে অতি সতর্কতার সহিত জাতীয়করণের পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের শিল্প শ্রমিক

(Industrial Labour in India)

[বিষয়বস্তু : ভারতীয় শিল্পশ্রমিকের বৈশিষ্ট্য—ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতা—শ্রমদক্ষতা উন্নয়নের পন্থাসমূহ—ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন—ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের অসুবিধা—ট্রেড ইউনিয়ন আইন—শ্রমিকমালিক সম্বন্ধ—শিল্পবিরোধের কারণ—মিঃ গিরির দৃষ্টিভংগী—শিল্পবিরোধ আইন—শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যান্য ব্যবস্থা—শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা—বেকার সমস্যা—সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ—লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা—শিল্প শ্রমিকের গৃহসমস্যা—পরিকল্পিত অর্থনীতিতে শ্রমনীতি]

ভারতীয় শিল্প শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Industrial Labour in India) :

ভারত শিল্পে অর্ধোন্নত এবং কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশে শিল্পবিপ্লব সবেমাত্র সুরু হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের মতো সঙ্ঘবদ্ধ সহায়সম্বলহীন শ্রমজীবি শ্রেণী এখনো এদেশে গড়িয়া ওঠে নাই। ভারতীয় শিল্প শ্রমিকদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায় :

প্রথমতঃ, ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের অদক্ষতা সর্বজনবিদিত। স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকরবার্টের বর্ণনানুযায়ী একজন ইংরাজ শ্রমিকের দক্ষতা চারজন ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতার সমান। অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের তুলনায় ভারতীয় শ্রমিক কম দক্ষ হইলেও তাহার অদক্ষতাকে অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকগণ অধিকাংশই কৃষকসন্তান। গ্রামে জীবিকা অর্জনে ব্যর্থ হইয়া ইহারা শিল্পাঞ্চলে আসিয়া অন্নসংস্থান করে। গ্রামের সহিত গভীর সম্পর্ক থাকার ফলে শিল্পাঞ্চলে স্থায়ী শিল্পশ্রমিক শ্রেণী গড়িয়া উঠে নাই। কাজে ঘন ঘন অনুপস্থিতির কারণও ইহাই।

তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ শিল্পশ্রমিকই অশিক্ষিত। ইহাদের অধিকাংশেরই কোনোরূপ সাধারণ শিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষা নাই। ভারতীয় শিল্পশ্রমিকের অদক্ষতার অন্যতম কারণ ইহাই।

চতুর্থতঃ, ভারতীয় শিল্পশ্রমিক সংগঠিত নয়। শিক্ষা ও সমাজচেতনার অভাব, ভাষা, জাতি ও ধর্মের বিভিন্নতা এবং শ্রমিক আন্দোলনের ত্রুটির জন্য শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয় নাই।

পঞ্চমতঃ, অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের তুলনায় ভারতীয় শ্রমিকদের মজুরি বিস্ময়কর রকম কম। মজুরি কম বলিয়া শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান নিচু এবং দক্ষতা কম হইয়া থাকে।

ষষ্ঠতঃ, শিল্প শ্রমিক যে অঞ্চলেই ভীড় করিয়াছে সেখানেই অব্যবস্থার দরুন বস্তি এবং কুলিধাওড়া গড়িয়া উঠিয়াছে। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়।

ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতা (Efficiency of Indian Labour) :— ভারতীয় শ্রমিকের অ-দক্ষতা (inefficiency) প্রবাদবচনে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা অত্যন্ত কম। জাপান, ইংলণ্ড অথবা আমেরিকার শ্রমিক অপেক্ষা ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা অত্যন্ত কম। ইংলণ্ডের বস্ত্রবয়নশিল্পের একজন শ্রমিক যে পরিমাণ কাজ করে, ছয় জন ভারতীয় শ্রমিক সেই পরিমাণ কাজ করে। ১৯২৮-২৭ সালের শুল্কবোর্ড বলে যে একজন ভারতীয় শ্রমিক মাত্র ১৮০টি মাকু পরিচালনা করে অপরপক্ষে জাপানে একজন শ্রমিক ২৪০টি, ইংলণ্ডে ৬০০টি এবং আমেরিকায় ১১২০টি মাকু পরিচালনা করে। অবশ্য গত কয়েক বৎসরে বস্ত্রবয়নশিল্পে ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতা অনেক বাড়িয়াছে। কয়লাখনির ক্ষেত্রে দেখানো হইয়াছে যে ভারতীয় শ্রমিকের গড় উৎপাদন ১৩১ টন, ইংলণ্ডে ২৫০ টন এবং আমেরিকায় ৭৮০ টন। পরিকল্পনা কমিশনের মতানুসারে ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৫১ সালে কয়লাশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ২১৪,২৪৪ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪০,০০০ হয়, অপরপক্ষে ঐ সময়ে উৎপাদন ২৬৫ লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া ৩৭০ লক্ষ টন হয়। এইভাবে দেখা যায় যে শ্রমিকের সংখ্যা ৫৮ ভাগ বাড়িয়াছে কিন্তু উৎপাদন মাত্র ৩২ ভাগ বাড়িয়াছে। অবশ্য আমেরিকা হইতে প্রেরিত গ্রেডী কমিশন (Grady Commission) বা শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটির মতে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা কম নয় এবং ভারতীয় শ্রমিকের অ-দক্ষতার যে অভিযোগ করা হয় তাহা ভিত্তিহীন ("The alleged inefficiency of Indian worker is largely a myth" Labour Investigation Committee, 1946). আমেরিকা অথবা ইংলণ্ডের শ্রমিকের মতো সমান দক্ষতাসম্পন্ন ভারতীয় শ্রমিক কখনোই নয়, কারণ তাহা হইলে ইহাদের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ অবিশ্বাস্য রকমের কম হইতে পারিত না। শিল্প-কমিশনের মতে ভারতে শ্রমিকদের মজুরি কম হইলেও মজুরি-জনিত ব্যয় (wage-cost) খুবই বেশী। অবশ্য ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে শ্রমিক নিজেই তাহার অদক্ষতার জন্য পুরাপুরী দায়ী নয়—কিছু পরিমাণে অদক্ষ সংগঠন, স্বল্প মূলধন; পুরাতন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি শ্রমিকের অদক্ষতার জন্য দায়ী।

ভারতীয় শ্রমিকের অদক্ষতা অতিরঞ্জিত

ভারতীয় শ্রমিকের অদক্ষতার জন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণগুলি দেখানো হয় :

[**এক**] দেহের গঠন ও স্বাস্থ্যহীনতা : ইহা সত্য যে গড় ভারতীয় শ্রমিকের দেহ এবং স্বাস্থ্য একজন বৃটিশ অথবা আমেরিকান শ্রমিকের দেহ এবং স্বাস্থ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু ভারতীয় শ্রমিকের সহিত আমেরিকান শ্রমিকের তুলনামূলক কর্মদক্ষতা আমাদের প্রশ্ন নয়। আসল কথা, দেখিতে হইবে ভারতীয় শ্রমিক যে ধরণের কাজ করে সেই কাজের সে উপযুক্ত কিনা।

দেহের গঠন ও স্বাস্থ্যহীনতা

[দুই] অধিকাংশ শ্রমিকই গ্রাম হইতে আসে এবং সুযোগ সুবিধা পাইলে তাহারা গ্রামে ফিরিয়া যায়। বলা হইয়া থাকে যে শ্রমিকের এই দেশপরিবর্তনকারী অভাব (migratory nature) দক্ষতা হ্রাসের অন্যতম কারণ, কিন্তু এই যুক্তির বিশেষ সারবত্তা নাই। শ্রমিক গ্রামে যায় বিশ্রাম করিবার জন্য, কিংবা সামাজিক অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য অথবা আত্মীয়স্বজনের সহিত দেখা করিবার উদ্দেশ্যে। শ্রমিক গ্রামে বিশ্রাম উপভোগ করে এবং পুনরায় যখন কারখানায় ফিরিয়া আসে তখন বিশ্রামহেতু কাজের জন্য সে অধিকতর দক্ষ হইয়া ওঠে।

দেশ পরিবর্তনকারী স্বভাব

[তিন] জলবায়ু এবং অবস্থান : দেশের অবস্থান ও জলবায়ু শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে প্রভাবিত করিয়া থাকে। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া কঠোর শ্রম করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল। গরমদেশে বেশীক্ষণ ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করা যায় না। ভারতের উষ্ণ জলবায়ু দীর্ঘ এবং কঠোর পরিশ্রমের উপযোগী নয়, ইহা সহজেই শ্রমিকের মধ্যে ক্লান্তি এবং অবসাদ আনিয়া দেয়। আমেরিকান অথবা বৃটিশ শ্রমিকের অধিকতর কর্মদক্ষতার একটি কারণ তাহাদের দেশের অনুকূল জলবায়ু।

জলবায় ও অবস্থান

[চার] শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বহুলাংশে তাহার মজুরীর উপর নির্ভরশীল। মজুরীর পরিমাণের উপর জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে, আর জীবনযাত্রার মান শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে নির্ধারণ করে। মজুরির পরিমাণ কম হইলে শ্রমিক দরিদ্র হয় এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহার কর্মশক্তি হ্রাস পায়। ভারতীয় শ্রমিকের স্বল্প মজুরীই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র সৃষ্টি করিয়াছে। মজুরী কম হওয়ার ফলে শ্রমিকের কর্মশক্তি কম হয় এবং কর্মদক্ষতা না বাড়িলে মজুরী বাড়িতে পারে না। দেখা গিয়াছে আমেদাবাদে বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বোম্বাই-এর শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি বাড়াইতে পারিলে তাহার কর্মদক্ষতা অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে।

কর্মদক্ষতা ও মজুরী

[পাঁচ] শিক্ষা—সাধারণ এবং কারিগরী : শ্রমিক বুদ্ধিমান না হইলে নিপুণ হইতে পারে না। এই কারণে শিক্ষিত শ্রমিক অশিক্ষিত শ্রমিক অপেক্ষা অধিকতর দক্ষ হয়। সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষা উভয়প্রকার শিক্ষাই শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ এবং নৈতিক উন্নতি সাধনে সহায়তা করে আর কারিগরী শিক্ষা শ্রমিককে সুদক্ষ কর্মীতে পরিণত করে। নিরক্ষরতা এবং কারিগরী শিক্ষার অভাব শ্রমিকের অ-দক্ষতার একটি প্রধান কারণ। বর্তমানে সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষার প্রসারের কিছু উন্নতি সাধিত হইলেও তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

শিক্ষা—সাধারণ ও কারিগরী

[**ছয়**] নিকৃষ্ট ধরণের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল: ভারতীয় শ্রমিক যে ধরণের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ব্যবহার করে তাহা অতি নিকৃষ্ট। একটি ভাঙ্গা টাইপ মেশিন লইয়া একজন সুদক্ষ টাইপিস্টও নিপুণভাবে টাইপ করিতে পারিবে না। উৎকৃষ্ট কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতি যোগানের দায়িত্ব নিয়োগকর্তার। তাহারা যদি উৎকৃষ্ট কাঁচামাল এবং উন্নততর যন্ত্রপাতি যোগান দেয় তাহা হইলে শ্রমিকের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। ভারতীয় শিল্পে উন্নততর যন্ত্রপাতি যোগানের নিম্নলিখিত বাধা রহিয়াছে: প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, মূলধনী দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা এবং র‍্যাশনালাইজেসনে শ্রমিকদের বাধাদান।

নিকৃষ্ট যন্ত্রপাতি

[**সাত**] কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশ কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির অনুকূল নয়। কারখানার পরিবেশ অধিকাংশস্থলেই স্যাঁতস্যাঁতে, অপ্রচুর আলোবাতাস, পানীয়-জলের অভাব, চীপ ক্যানটিনের অব্যবস্থা।

কারখানার পরিবেশ

[**আট**] শিল্পশহরগুলিতে শ্রমিকদিগের গৃহসমস্যা একটি বড় সমস্যা। শ্রমিকেরা অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে বাস করে, ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের এবং নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটে। শিল্পশ্রমিকদের গৃহসমস্যার দিকে সরকার এবং শিল্পপতিদের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

গৃহসমস্যা

[**নয়**] পরিচালকের দক্ষতা: পরিচালকের নৈপুণ্য এবং কর্মসংগঠনের উপরেও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে। ভারতীয় শিল্প পরিচালনার ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন সব লোকের ওপর ন্যস্ত থাকে যাহাদের শিল্পপরিচালনার কোনরূপ যোগ্যতা নাই। ম্যানেজারেরা প্রায় সকলেই অর্ধ শিক্ষিত।

পরিচালকের অদক্ষতা

[**দশ**] শ্রমিকের দক্ষতা তাহার মনোভাবের উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। ভারতীয় শ্রমিকের শৃঙ্খলাবোধের অভাব তাহার অদক্ষতার একটা বড় কারণ। শ্রমিক যদি তাহার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয় এবং তাহার ও মালিকের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন করিয়া না দেখে তাহা হইলে সে কাজে ফাঁকি দিবে এবং অদক্ষ থাকিয়া যাইবে। স্বাধীনতা-লাভের পর হইতে শ্রমিকের মনোভাব উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিকূল হইয়াছে। শ্রমিকদিগের শৃঙ্খলাহীনতা বাড়িবার কারণ মহার্ঘ ভাতা, বোনাস ইত্যাদি কার্যগত সময়ের ভিত্তিতে দেওয়া হয়—উৎপাদনের ভিত্তিতে নয়। উৎপাদনের পরিমাণের ভিত্তিতে বোনাস দেওয়া হইলে শ্রমিক অধিকতর উৎপাদনের জন্য যত্নশীল হইবে।

শ্রমিকের মনোভাব

ইহা ছাড়াও আরো কতকগুলি বিষয়ের উপর শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন শ্রমিকের কাজ করিবার আকাংখা বাড়াইয়া দেয়। ভারতে শ্রমকল্যাণ এবং শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি হয় নাই। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার থাকিবে, ইহা শ্রমিকদের আত্মসচেতন করে এবং ঝাইয়া দেয় যে জাতীয় উৎপাদনে শ্রমিকেরও

একটি সম্মানসূচক ভূমিকা রহিয়াছে। ১৯২৬ সালে ভারতে ট্রেড-ইউনিয়ন আইন পাশ হইলেও অদ্যাবধি ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রসার আশানুরূপ হয় নাই।

শ্রমদক্ষতা উন্নয়নের পন্থাসমূহ (Remedial Measures) : ব্যক্তিগত এবং বিচ্ছিন্নভাবে দুই একজন শিল্পপতি শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা করিলেও এতদিন পর্যন্ত সর্বভারতীয় সাধারণ কোনো প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে নাই।

[এক] উৎপাদন-বৃদ্ধি করিবার জন্য British Productivity Council এর মতো কোনো প্রতিষ্ঠান ভারতে গঠন করা প্রয়োজন। ইহা শ্রমিকের উৎপাদন লক্ষ্য করিবে এবং কি পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় তাহার নির্দেশ দিবে। ১৯৫৮ সালে National Productivity Council গঠিত হইয়াছে এবং এই প্রতিষ্ঠান সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে।

[দুই] মাগ্‌গী ভাতা এবং বোনাস সময়ের ভিত্তিতে না দিয়া যদি উৎপাদনের ভিত্তিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। এদেশে যদি প্রেরণামূলক বোনাস (incentive bonus), লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা এবং শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় দক্ষতা কোড (Code of Efficiency) প্রবর্তন সুপারিশ করা হইয়াছে।

[তিন] শ্রমিক যদি দক্ষতা সহকারে কাজ না করে বা নির্ধারিত পরিমাণ উৎপাদন না করে তাহা হইলে নিয়োগকর্তার শ্রমিক ছাঁটাই করিবার অধিকার থাকিবে।

[চার] সরকার, শ্রমিকনেতা এবং মালিকেরা ব্যাপকভাবে প্রপাগাণ্ডা চালাইয়া শ্রমিককে তাহার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিবে এবং অলসতা পরিহার করিতে নির্দেশ দিবে।

[পাঁচ] সাধারণ এবং শিল্পশিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার এবং শিল্পপতিদের সচেতন হইতে হইবে। ইহা ছাড়া বিজ্ঞানসম্মত পরিচালনা, বাজেটারী কণ্ট্রোল, শিল্পের ভিতর শিক্ষা (training within industry) সময় এবং গতি বিশ্লেষণ (Time and Motion Study) প্রবর্তন এবং উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control) প্রবর্তন করিলে শ্রমিক এবং মূলধনের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে।

[ছয়] শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসার অধিকতর সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারখানা আইনে কারখানায় চিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং আঞ্চলিক হাসপাতাল স্থাপন ব্যাপকতর করিতে হইবে। কারখানার আভ্যন্তরীণ কর্ম-পরিবেশের উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

[সাত] শ্রমিকদের বাসগৃহের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। শ্রমিক যাহাতে তাহার পরিবারবর্গ লইয়া স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত বাস করিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। গৃহসমস্যা সমাধানকল্পে সরকার এবং শিল্পপতিদের বহুকর্তব্য

রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতিকে এবং অল্প আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

[আট] শ্রমিকের মজুরি বাড়াইতে হইবে এবং তাহার জন্য উন্নততর পদ্ধতিতে উৎপাদন করিতে হইবে এবং শিল্পকে র‍্যাশানালাইজ করিতে হইবে। শিল্পকে র‍্যাশানালাইজ না করিতে পারিলে মাথাপিছু উৎপাদন বাড়ানো কঠিন এবং উৎপাদন না বাড়িলে বর্ধিতহারে মজুরি দেওয়া নিয়োগকর্তার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন (Trade Union Movement In India) :

ট্রেড-ইউনিয়ন এমনই সংগঠন যাহার উদ্দেশ্য শ্রমিকদের মজুরির হার বাড়ানো অথবা নানাভাবে কাজের অবস্থার উন্নতিসাধন করা অথবা উভয়বিধ কাজই করা।

ট্রেড ইউনিয়নের সংজ্ঞা

শ্রমিকেরা মালিকের সহিত যৌথভাবে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে দরকষাকষি করিতে পারে। মালিকেরা সাধারণতঃ [illegible] শক্তিশালী এবং শ্রমিকেরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, ফলে মালিকের সহিত দর কষাকষিতে তাহারা পারিয়া ওঠে না। কিন্তু সংঘবদ্ধ হইলে শ্রমিকেরা মালিকের নিকট হইতে তাহাদের ন্যায্য দাবী আদায় করিয়া লইতে পারে।

উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করা এই দুই কারণে সুদৃঢ় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রয়োজন।

এমন এক সময় ছিল যখন নিয়োগকারী এবং নিয়োগপ্রার্থীর মধ্যে প্রভু এবং ক্রীতদাসের সম্বন্ধ ছিল। পরবর্তীকালে ইহা প্রভু-ভৃত্যের রূপ পরিগ্রহ করে। শিল্পবিপ্লবের পর এই অবস্থার আরো উন্নতি হয় এবং উভয়ের সম্পর্ক দাঁড়াইল নিয়োগকারী এবং শ্রমিকরূপে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র শ্রমিক তাহার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে এবং সে শিল্পে অংশীদার হইবার আকাংখা ব্যক্ত করিতেছে। ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিক তাহার ক্ষমতাকে প্রকাশ করিয়া থাকে।*

ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়নের প্রসার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। যদিও বিংশ শতাব্দীর সুরু হইতেই দেশে ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু তাহাদের কার্যাবলী ক্ষুদ্র পরিসীমায় আবদ্ধ ছিল এবং ট্রেড ইউনিয়নের যে সকল কাজ করা উচিত তাহা ইহারা করিত না। যখন নগরাঞ্চলে একদল শ্রমসম্বলকারী সহায়হীন শ্রমজীবি গড়িয়া ওঠে তখনই ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের পথ তৈয়ারী হয়। শিল্পবিপ্লব দেশে আসার সাথে সাথে এই অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রেটবৃটেনে যে ধরণের শিল্পবিপ্লব ঘটিয়াছিল ভারতে তাহা সবেমাত্র সুরু হইয়াছে।

---

* "Time was when worker-employer relation was one of master and slave. Later it evolved as a relation of master and servant, after the industrial revolution it became one of employer and worker. To day the worker everywhere has developed a consciousness of his strength and aspires to be treated as a partner in industry. It is through the trade union that a worker exercises his strength."

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনকে চারভাগে ভাগ করা যায়—

প্রথম পর্যায় (First Period) ঃ ১৮৫৩-১৯১৮ ঃ ১৮৫৩ সালে বোম্বাই-এ প্রথম সাফল্যমণ্ডিতভাবে বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৫৫ সালে রিষিড়ায় প্রথম বৃহদায়তন পাটকল স্থাপিত হয়। যদিও শ্রমিক অসন্তোষ, আন্দোলন এবং ধর্মঘট এই সময় ঘটিয়াছে তথাপি সত্যকারের শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া ওঠে নাই তাহার প্রধান কারণ এই যুগে শ্রমিকনেতার বিশেষ অভাব ছিল। যাঁহারা এই সময় শ্রমিকদের নেতৃত্ব করেন তাঁহারা কেহই শ্রমিক-নেতা নহেন, সমাজ সংস্কারক এবং মানবতার দোহাই দিয়া শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য আবেদন করেন। ১৮৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই মিল হ্যাণ্ডস এসোসিয়েশন (Bombay Millhands' Association) ভারতের প্রথম শ্রমিকসংঘ। অবশ্য সক্রিয় শ্রমিকসংঘ আন্দোলনের সুরু হয় অনেক পরে—১৯১৮ সালে মিঃ বি. পি. ওয়াদিয়ার নেতৃত্বে মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন (Madras Labour Union) প্রতিষ্ঠার সাথে।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিবর্তন ৩

দ্বিতীয় পর্যায় (Second period) ঃ ১৯১৯—'২৯ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দেশে শ্রমিক আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিল। এই আন্দোলনের পিছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক কারণ ছিল।

ডাঃ এ্যানি বেসান্ট এবং লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার দাবীতে দেশের সামাজিক জীবনে এক নবজাগরণ দেখা দেয়। জনগণের শ্বেতাঙ্গ ভীতি এবং বৃটিশ জাতির শ্রেষ্টত্বের ধারণা ক্রমশ লোপ পাইতে থাকে। বৃটিশ অফিসার এবং সুপারভাইসারগণ ভারতীয়দের প্রতি যে ধরণের বিভেদমূলক আচরণ করে তাহাতে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা শ্রমিক আন্দোলনের অনুকূল হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ায় ভারত বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। রাওলাট আইন পাশ, মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড জনগণকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জনসাধারণের সংগঠনে পরিণত হয় এবং ইহার নেতারা শিল্প-শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অর্থনৈতিক জগতে একটা পরিবর্তন সূচিত হয়। যুদ্ধের বাজারে শিল্পপতিগণ প্রচুর মুনাফা অর্জন করে এবং মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় কিন্তু সমানুপাতিক হারে শ্রমিকদের মজুরী বাড়ে নাই, সেই কারণে মজুরী বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট হইতে আরম্ভ করে এবং শ্রমিকগণ শ্রেণী সচেতন হইয়া ওঠে। এই সময় আন্তর্জাতিক শ্রমসংগঠন (ILO) প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা শ্রমিক জাগরণে সহায়তা করে। পরিশেষে ১৯১৭ সালে রাশিয়ান বিপ্লবের সাফল্য এবং সেখানে মেহনতী জনতার শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন বিশ্বব্যাপী শ্রমিক চেতনার জাগরণে সহায়তা করে ১৯২০ সালে নিখিলভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (All India Trade Union Congress) গঠিত হয়। লালা লাজপত রায় ইহার প্রথম সভাপতি ও দেওয়ান চিমনলাল ইহার প্রথম সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। ১৯২০ সাল হইতেই ট্রেড

ইউনিয়ন আইন পাশ করার জন্য আন্দোলন সুরু হয়। শ্রী এন. এম. জোসীর প্রচেষ্টায় অনেক বিতর্ক এবং আলোচনার পর ১৯২৬ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইন পাশ হয় এবং ইহার ফলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার স্বীকার করা হয়।

তৃতীয় পর্যায় (Third Period) ১৯৩০-১৯৩৯ঃ এই সময়ের প্রথম কয়েক বৎসর সারা বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দিয়াছিল। শ্রমিকেরা মজুরী বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট করিলে মালিক বহুক্ষেত্রেই উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেয় ফলে এই সময়ে শ্রমিক আন্দোলন বিশেষ সফল হয় নাই। আবার এই সময়েই শ্রমিকনেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় ফলে শ্রমিক আন্দোলনের গতি মন্থর হইয়া আসে। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায় এবং জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (National Trade Union Federation) সৃষ্টি হয়। এই সময় হইতেই সাম্যবাদীগণ শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে আসেন। এই সময় এম. এন. রায় এবং যমুনাদাস মেটার নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (Trade Union Federation) নামে আরও একটি শ্রমিক-সংঘ সংগঠিত হয়।

চতুর্থ পর্যায় (Fourth Period) ১৯৪০—অদ্যাবধিঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে অবস্থার সৃষ্টি করিল তাহাতে শ্রমিক আন্দোলন বিশেষভাবে প্রসারিত হয়। শ্রমিকেরা ইতিমধ্যেই শ্রেণী সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। উৎপাদন ব্যবস্থায় সে একটা সম্মানীয় স্থান দাবী করে এবং কম মজুরী লইতে অস্বীকার করিয়া তাহারা ধর্মঘট করে। এই সময়ে নিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যায়, বেকারের সংখ্যা হ্রাস পায়, দেশে পূর্ণনিয়োগের অবস্থা দেখা দেয় আর সেই কারণে মজুরী বৃদ্ধির জন্য যে সকল ধর্মঘট হইয়াছিল তাহা সফল হয়। এই সময়ে চারিটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে —নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (All India Trade Union Congress), ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (India National Trade Union Congress) হিন্দ্ মজদুর সভা (Hind Mazdoor Sabha) এবং সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (United Trade Union Congress). গুলজারীলাল নন্দের নেতৃত্বে গঠিত ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গান্ধীদর্শনে বিশ্বাসী। নিখিলভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সাম্যবাদী-দর্শনে বিশ্বাসী চরমপন্থী প্রতিষ্ঠান। হিন্দ্ মজদুর সভা রাজনৈতিক দল প্রজা সোসালিস্ট পার্টির মতাদর্শে আস্থাবান। এই সব কয়টি প্রতিষ্ঠানেরই লক্ষ্য হইল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, কিন্তু ইহাদের উদ্দেশ্য এক হইলেও পদ্ধতি এবং নীতি ভিন্ন। শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপক হওয়ার ফলে সরকার এই সময়ে শ্রমিকদের অবস্থা এবং কাজের শর্তাদি উন্নয়নের জন্য ফ্যাক্টরী আইন, সর্বনিম্ন মজুরী আইন, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আইন, স্টেটইন্সিওরেন্স আইন প্রভৃতি কতকগুলি আইন পাশ করেন।

ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের অসুবিধা (Difficulties of the Trade Union Movement in India) :

ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আজও পাশ্চাত্যদেশের মতো প্রসারলাভ করে নাই। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্যসংখ্যা অতি অল্প। ভারতের সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর মাত্র ৩% ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য। অপরপক্ষে ইংলণ্ডে শ্রমিক সংখ্যার শতকরা ৯০% ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গতি ব্যাহত হইয়াছে।

প্রথমতঃ, ভারতের শ্রমিক অশিক্ষিত এবং অদৃষ্টবাদী। শ্রমিকের নিরক্ষরতা তাহার সচেতনতার পথে প্রতিবন্ধক। শ্রমিকের নিরক্ষরতার দরুণ বহির্বিশ্বের সহিত তাহার কোনো যোগাযোগ থাকে না আর সেই কারণে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক জাগরণের ধারার সহিত তাহার কোনো পরিচয় নাই। উপরন্তু আমাদের দেশের শ্রমিক অদৃষ্টবাদী অর্থাৎ ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার উপযোগিতা বুঝিতে পারেনা, এবং নিজের চেষ্টায় যে অবস্থার উন্নতিসাধন করা যায় তাহাও বিশ্বাস করে না। একই কারখানায় বিভিন্ন ভাষাবলম্বী শ্রমিক কাজ করার ফলে তাহাদের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়িয়া ওঠে না।

অশিক্ষিত ও অদৃষ্টবাদী

দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য দেশসমূহের ন্যায় ভারতে এখনও স্থায়ী শিল্পশ্রমিক গড়িয়া ওঠে নাই। ভারতীয় শিল্পশ্রমিকেরা গ্রাম হইতে শিল্পাঞ্চলে আসিয়া কাজ করে এবং অল্পকাল কোনশিল্পে কাজ করিবার পর গ্রামে ফিরিয়া যায়। আবার কিছুকাল পরে তাহারা গ্রাম হইতে দলবদ্ধভাবে আসিয়া কাজে যোগদান করে। এই ভ্রাম্যমান চরিত্রের জন্য একই কারখানায় ইহারা বহু বৎসর ধরিয়া কাজ করিতে পারে না এবং এই কারণে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি গড়িয়া ওঠে না। সাম্প্রতিককালে অবশ্য নগরাঞ্চলে স্থায়ী শিল্পশ্রমিক গড়িয়া উঠিয়াছে।

স্থায়ী শিল্পশ্রমিকের অভাব

তৃতীয়তঃ, শ্রমিকদের অপরিসীম দারিদ্র্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অন্তরায়। শ্রমিকদের মজুরী এতোই অল্প যে ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য হইতে হইলে যে সামান্য চাঁদা দেওয়া প্রয়োজন তাহাও অধিকাংশ সভ্য দিতে পারেনা। অবশ্য শ্রমিক যদি সম্মিলিতভাবে সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারে তাহা হইলে তাহারা সামান্য চাঁদা দিবার কষ্ট স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিবেনা।

দারিদ্র্য

চতুর্থতঃ, মালিকশ্রেণীর বিরোধিতা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রসারে একটি বিশেষ বাধা। মালিকেরা ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে অশান্তির অগ্রদূত এবং বিরুদ্ধশক্তি বলিয়া মনে করে। মালিকদের বোঝা উচিত যে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন শিল্প-শান্তি (industrial peace) প্রতিষ্ঠার সহায়ক।

মালিকের বিরোধিতা

পঞ্চমতঃ, ট্রেড ইউনিয়নগুলির কার্য পরিচালনায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলি সৌভ্রাত্রমূলক কাজ অপেক্ষা সামরিক কাজে বেশী উৎসাহী। শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, অসুস্থ অবস্থায় শ্রমিককে সাহায্যদান করা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি ট্রেড ইউনিয়ন কদাচিৎ করে বলিয়া শ্রমিকদের উপর ইহারা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেনা। সেই কারণে ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানকারী শ্রমিকের সংখ্যা অতি অল্প।

গণতান্ত্রিকতার অভাব

ষষ্ঠতঃ, শ্রমিক নেতার পরিবর্তে বাহিরের নেতারাই ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনা ও নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। শ্রমিকনেতারা শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত হইলে নিজেদের সমস্যাগুলি যত ভালোভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেন, বাহিরের নেতাদের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নয়। অনেক সময় এই সব বাহিরের নেতারা সাধারণতঃ রাজনৈতিক দলভুক্ত হন এবং তাঁহাদের নিজেদের কোনো রাজনৈতিক স্বার্থের চরিতার্থতায় ট্রেড ইউনিয়নকে পরিচালিত করেন। ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া শ্রমিক আন্দোলনে রাজনৈতিক দলাদলি প্রবেশ করিয়া শ্রমিকদের সংহতি বিনষ্ট করে। অবশ্য পরিকল্পনা কমিশন ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, আন্দোলনের যে সামান্য অগ্রগতি হইয়াছে তাহা এই সকল বাহিরের নেতাদের প্রচেষ্টায়ই সম্ভবপর হইয়াছে।

বহিরাগত নেতা

১৯২৭-২৮ সালে রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৯ এবং সভ্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ৩৭৬৬টি রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন ছিল এবং সদস্যসংখ্যা ছিল ১৭·৫ লক্ষ। ১৯৬০ সালে চারিটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা ছিল এইরূপ: INTUC-এর সদস্যসংখ্যা ১০ লক্ষের কিছু বেশী; AITUC-এর সদস্যসংখ্যা ৫ লক্ষের কিছু বেশী; HMS-এর সদস্যসংখ্যা দুই লক্ষের কিছু বেশী; আর UTUC-এর সদস্যসংখ্যা এক লক্ষের কিছু কম। পরিসংখ্যান হইতে দেখা যাইতেছে যে ভারতে ট্রেড উইনিয়ন আন্দোলন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

প্রতিবিধানাবলী (Remedies): রয়েল কমিশনের মতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে দুইটি সর্ত পূরণ করা প্রয়োজন—গণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রসার (democratic spirit) এবং শিক্ষার বিস্তার। শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার করিতে হইবে এবং ট্রেড ইউনিয়নের কার্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানে একই শিল্পে বহু ট্রেড ইউনিয়ন রহিয়াছে। বহু সংঘ থাকিলে শ্রমিকের শক্তি কমিয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত গিরি যথার্থই বলিয়াছেন যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সফল করিতে হইলে "একটি শিল্পে একটি ইউনিয়ন" (one union in one industry)—এই নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তাহাদের সৌভ্রাত্রমূলক কাজের পরিধি বিস্তৃত করিতে হইবে।

গণতান্ত্রিক মনোভাব ও শিক্ষা

চতুর্থতঃ, শ্রমিকগণের মধ্য হইতেই শ্রমিকনেতা সৃষ্টি করিতে হইবে। পঞ্চমতঃ, শিল্পে নিযুক্ত সকল শ্রমিককে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হইতে হইবে।

ট্রেড ইউনিয়ন আইন (Trade Union Legislation) : ১৯২৬ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইন (Trade Union Act, 1926) পাশ হয় এবং ইহা ১৯২৮, ১৯৪২, ১৯৪৭ এবং ১৯৬০ সালে সংশোধিত হয়। এই আইনানুসারে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ১৯৬২ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইন পাশ হইবার পূর্বে ট্রেড ইউনিয়ন করা বে-আইনী বলিয়া গণ্য করা হইত।

ট্রেড ইউনিয়ন আইনানুসারে যে কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সাতজন বা তদপেক্ষা বেশী সভ্য রেজিষ্ট্রারের নিকট ট্রেড ইউনিয়নকে রেজেষ্ট্রী করিবার জন্য আবেদন করিতে পারে। রেজিষ্ট্রীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের পরিচালকগণের অর্ধেককে সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক হইতে হইবে। ইউনিয়নগুলিকে হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা প্রতি বৎসর হিসাব পরীক্ষা করাইয়া রেজিষ্ট্রারের নিকট বাৎসরিক হিসাব দাখিল করিতে হইবে। ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ তহবিলের টাকা (General Fund) আইনানুসারে খরচ করিতে হইবে। তবে রাজনৈতিক কাজের জন্য ইউনিয়ন অপর একটি তহবিল সৃষ্টি করিতে পারে। ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পরিচালকগণ যে সকল কাজ করিবেন তাহার জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারী মামলা রুজু করা যাইবেনা। সদস্যদের চাঁদার হার অন্যূন ২৫ পয়সা ধার্য করা হইয়াছে।

যদিও ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন শ্রমিক সংগঠনকে স্বীকার করিয়াছে এবং তাহাদের আইনগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তথাপি তাহাদের কতকগুলি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ, সকল ট্রেড ইউনিয়নকে বাধ্যতামূলকভাবে রেজিষ্ট্রী করিবার ব্যবস্থা আইনটিতে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহা ইউনিয়নের সাধারণ তহবিল এবং রাজনৈতিক তহবিলের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অবৈজ্ঞানিক এবং সমর্থনযোগ্য নয়। তৃতীয়তঃ, ট্রেড ইউনিয়ন সাধারণতঃ শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। কিন্তু এই আইন শুধুমাত্র শ্রমিকদের সংগঠনকে নয়—মালিক-দের সংগঠনকেও ট্রেড ইউনিয়নের আওতায় আনিয়াছে ফলে অনাবশ্যক গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। চতুর্থতঃ, এই আইনে মালিকপক্ষগুলি কর্তৃক ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দানের কোনো ব্যবস্থা নাই।

শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ (Industrial Relations) :

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শ্রমিকদের আর্থিক-অবস্থার উন্নতি এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শিল্পশান্তি (industrial peace) অপরিহার্য। যদি ধর্মঘট অথবা লক-আউট (অর্থাৎ মালিক পক্ষ হইতে কারখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া) হয়, শিল্পশান্তি ব্যাহত হয়, শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পায়, উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়, মজুরী বন্ধ থাকায় শ্রমিকেরা দুর্দশায় পড়িয়া যায় এবং শিল্পজাত দ্রব্যের যোগান ব্যাহত হওয়ায় ভোগকারী হিসাবে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিল্পবিরোধ দেশের শান্তি নষ্ট করে

শিল্পশান্তির প্রয়োজনীয়তা

প্রয়োজন। কিন্তু ভারতে শ্রমিক সংগঠন এখনো দুর্বল এবং শ্রমিক মালিকের বিরোধের আপস নিষ্পত্তি করিবার জন্য নিরপেক্ষ লোক পাওয়া বেশ কঠিন। এই সকল কারণের জন্য স্বেচ্ছামূলক সালিসীর দ্বারা কোনো সন্তোষজনক ফল আশা করা যায় না।

শিল্প-বিরোধ আইন (Industrial Disputes Act, 1947): ১৯৪৭ সালে শিল্প বিরোধ আইন পাশ হওয়ায় ১৯২৯ সালের Trade Disputes Act বাতিল হইয়া যায়। ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইনে শিল্প বিরোধের প্রতিরোধ (prevention) এবং নিষ্পত্তি (settlement) উভয়বিধ ব্যবস্থাই করা হয় এই উদ্দেশ্যে এই আইনে কার্যকমিটি (works committee) স্থাপন, আপস কর্মচারী নিয়োগ, আপস বোর্ড, অনুসন্ধান কোর্ট, লেবার কোর্ট এবং ট্রাইবুন্যাল গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২৯ সালের শিল্প বিরোধ আইনে শুধুমাত্র অনুসন্ধানের উপর জোর দেওয়া হয় কিন্তু ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনে পারস্পরিক, আলাপ আলোচনা এবং আপসের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়।

শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যাহাতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে তাহার জন্য মালিক ও শ্রমিকদের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া কার্যকমিটি গঠনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ১০০ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কার্যকমিটি গঠন করিতে নির্দেশ দেওয়া হইবে। কার্যকমিটিগুলি আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া দৈনন্দিন বিবাদবিসংবাদগুলি মীমাংসা করিয়া শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে মিত্রতামূলক সম্বন্ধ স্থাপনে সাহায্য করিবে। কার্যকমিটি বিরোধ প্রতিরোধের চেষ্টা করিবে, বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইলে আপস কর্মচারী ও আপসবোর্ডের মাধ্যমে স্বেচ্ছা-মূলক সালিসীর ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহাতেও কোনো নিষ্পত্তি না হইলে ট্রাইবুন্যালের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক সালিসীর ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই ট্রাইবুন্যালের রায় বাধ্যতামূলক।

এই আইনে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে পৃথকভাবে দেখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো শিল্পে ছয় সপ্তাহের নোটিশ ছাড়া এবং আপস বা ট্রাইবুন্যালের বিবেচনাধীন সময়ে ধর্মঘট বা লক-আউট নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

১৯৫০ শিল্প বিরোধ আইনের সংশোধনী প্রস্তাবে শ্রম আপীল আদালত (Labour Appellate Tribunal) সৃষ্টি করা হয়। পরে অবশ্য ১৯৫৬ সালের সংশোধনের ফলে শ্রম-আপীল আদালত তুলিয়া দেওয়া হয়।

সমালোচনা (Criticism): ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনে কতকগুলি ত্রুটি রহিয়াছে।

প্রথমতঃ, এই আইনে বাধ্যতামূলক সালিসীর উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। স্বেচ্ছামূলক আপস আলোচনার পথ খোলা রাখিলেও বাধ্যতামূলক সালিসীর উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, বাধ্যতামূলক সালিসী শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূল নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই আইনে ট্রাইবুন্যালের রায় বাতিল বা পরিবর্তনের ক্ষমতা সরকারের রহিয়াছে ইহাতে সরকারকে স্বেচ্ছাচার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং

বিচার-বিভাগের সম্মান ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে। সরকারের এই ক্ষমতার ফলে আদালতের সাহায্যে বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার উপর শ্রমিকদের আস্থা হ্রাস পাইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, আদালতের মাধ্যমে শিল্প বিরোধের মীমাংসা বিশেষ সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল।'

চতুর্থতঃ, ওয়াদিয়া এবং মার্চেন্টের মতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রমিকদিগের প্রতিবাদ জানাবার উপায় ধর্মঘট, উহাকে অকার্যকর করিয়া শ্রমিকদের প্রতি এই আইন সুবিচার করে নাই।

পরিশেষে, আপীল আদালত তুলিয়া দেওয়া সময়োচিত হয় নাই। অবশ্য বর্তমানে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিমকোর্টে আপীলের অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা ব্যয়বহুল বলিয়া শ্রমিকেরা অসুবিধা ভোগ করে। সরকার আপীল আদালত পুনপ্রবর্তনের কথা চিন্তা করিতেছেন।

শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যান্য ব্যবস্থা (Other Measures to Secure Industrial Peace) :

(ক) যৌথ দরকষাকষি (Collective Bargaining) : বাধ্যতামূলক সালিসীর পরিবর্তে মিঃ গিরি শ্রমিক-মালিক আলাপ আলোচনা ও যৌথভাবে দরকষাকষি করিয়া মজুরি এবং অন্যান্য বিষয় নিষ্পত্তির সুপারিশ করেন। পাশ্চাত্য দেশে এই ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইয়া থাকে। অবশ্য ইহার জন্য যে পরিবেশের প্রয়োজন ভারতে তাহা নাই বলিলেই চলে। যৌথ দরাদরির পদ্ধতিকে শক্তিশালী করিতে হইলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সুদৃঢ় হওয়া প্রয়োজন এবং সকল শ্রমিকের একটিমাত্র ইউনিয়ন থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারী আইন দ্বারা মজুরীহার ও কাজের সর্তাদি নির্ধারিত হইয়া থাকে।

(খ) নিয়মানুবর্তিতা বিধি (Code of Discipline) : শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিয়মানুবর্তিতা বিধি প্রবর্তন করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অনুসৃত শ্রমনীতি অনুযায়ী ১৯৫৭ সালে একটি নিয়মানুবর্তিতার বিধি গৃহীত হয়। উহা পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলন কর্তৃক সমর্থিত হয়। এই নিয়মানুবর্তিতা বিধির প্রধান ধারাগুলি এইরূপ : বিনা নোটিশে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট বা লক-আউট করা চলিবেনা। ধীরগতিতে (go-slow) উৎপাদন চালানো চলিবেনা ; যন্ত্রপাতির কোনো ক্ষতি করা হইবে না ; হিংসাত্মক পন্থা বা বল প্রয়োগ নীতি গ্রহণ করা হইবে না ; কোনো পক্ষই অপর পক্ষকে না জানাইয়া কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে না। শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় সংগঠনসমূহ এবং মালিক সংগঠনগুলি এই আচরণ বিধি গ্রহণ করায় শ্রমিক মালিক সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং শিল্প বিরোধের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

(গ) মজুরী বোর্ড (Wage Board) : মজুরীসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়াই অধিকাংশ শিল্পবিরোধের সৃষ্টি হয়। মজুরীসংক্রান্ত বিরোধ সন্তোষজনকভাবে মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রমিক মালিক এবং একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি লইয়া মজুরী

বোর্ড স্থাপন করিয়া মজুরী হার নির্ধারণ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক শিল্পের জন্য একটি করিয়া পৃথক মজুরী বোর্ড গঠন করা হইবে। এ পর্যন্ত সংবাদপত্র, কার্পাসবস্ত্র, পাটশিল্প, চিনিশিল্প, সিমেণ্টশিল্প প্রভৃতি শিল্পের জন্য মজুরী বোর্ড গঠন করা হইয়াছে।

(ঘ) **শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকগণের অংশগ্রহণ (Workers' Participation in Management) :** ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনে শ্রমিক ও মালিকের প্রতিনিধি লইয়া কার্য কমিটি (Works Committee) গঠনের ব্যবস্থ করা হয়। এই সকল কমিটি শিল্পসংক্রান্ত সকল সমস্যা লইয়া আলোচনা করে এবং নিষ্পত্তির উপায় খুঁজিয়া বাহির করে। ১০০ বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে কার্যকমিটি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ইংলণ্ডে ১৯১৭ সালে উইটলে কমিশনের (Whitley Commission) সুপারিশ অনুসারে এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে উইটলে কাউন্সিল (Whitley Council) বলা হয়। কিন্তু কার্যকমিটি স্থাপিত হইলেও ইহা হইতে কোনো উল্লেখযোগ্য সুফল না পাওয়ায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শ্রমিক মালিক সহযোগিতার (labour-management co-operation) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৬০ সালে "যুক্ত পরিচালনা" কাউন্সিল (Joint Management Council) গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ২০টি সরকারী এবং ৪০টি বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে যুক্ত পরিচালনা কাউন্সিল স্থাপন করা হইয়াছে। সম্প্রতি সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানেই এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।*

(ঙ) **লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা (Profit Sharing) :** শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি উপায় হইতেছে শ্রমিকদের নিয়মিত বোনাস বা লাভের অংশ প্রদানের ব্যবস্থা করা। শ্রমিকেরা অভিযোগ করিয়া থাকে যে মালিকেরা তাহাদের শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন করিয়া মুনাফা ভোগ করিতেছে। শিল্পের মুনাফার জন্য তাহারাও দায়ী বলিয়া শ্রমিকেরা মুনাফার একটি অংশ দাবী করে। বর্তমানে ১৯৬৫ সালে বোনাস আইন পাশ করিয়া সর্বনিম্ন বোনাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোম্পানীর লাভ না হইলেও শ্রমিকের বার্ষিক মজুরীর শতকরা ৪ ভাগ বোনাস দিতে হইবে। বোনাসের হার কোনো ক্ষেত্রেই শ্রমিকের মোট মজুরীর শতকরা ২০ ভাগের বেশী হইবে না।

শ্রমিকদিগের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Social Security of the Labourers in India).

সামাজিক ন্যায়বোধই হইল সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইনের উৎস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের ভাষায় সমাজে কতকগুলি লোক আছে যাহারা প্রতিকূল অবস্থার দরুণ অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইতে

* "The Scheme of Joint Management Council will be progressively extended to new industries and units so that it may become a normal feature of the industrial system." Third Five Year Plan.

পারে না। এই সকল ভাগ্যবিড়ম্বিত নরনারীকে সরকার সাহায্য করিবেন বদান্যতা দেখাইবার জন্য নয়—সামাজিক কর্তব্য হিসাবে।*

সরকারী সাহায্যের একটি রূপ হইতেছে সামাজিক আইন। শ্রমিক-সংক্রান্ত আইন সামাজিক আইনের একটি মূল্যবান অংশ।

'সামাজিক নিরাপত্তা' একটি নূতন ধারণা, সমাজদর্শনে বিবর্তনে ইহার সৃষ্টি। অভাবের ভীতি হইতে মুক্ত হইবার আকাংখা হইতেই সামাজিক নিরাপত্তার জন্ম। আই. এল. ও-র এক রিপোর্টে সামাজিক নিরাপত্তাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে: সামাজিক নিরাপত্তা বলিতে আমরা বুঝিব কতকগুলি দায় ও বিপদ যাহার সম্ভাবনা ব্যক্তির জীবনে রহিয়াছে ও তাহার বিরুদ্ধে সমাজের করণীয় ব্যবস্থাসমূহ। অসমর্থ ব্যক্তিরা এই সকল দায়দায়িত্বের বিরুদ্ধে এককভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে না। যদিও সকল রাষ্ট্রীয় নীতির সহিত সামাজিক নিরাপত্তার প্রভাব আছে, তথাপি আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বলিতে সেই সকল পরিকল্পনাকে বুঝিব যাহা নাগরিকের রোগমুক্তি, বেকার অবস্থায় রক্ষা এবং লাভজনক কাজের ব্যবস্থা করে। ("Social security is the security that society furnishes, though apporopriate organisation, against certain risks to which its members are exposed. These risks are essentially contingencies against which the individual of small means cannot effectively previde by his own ability or foresight alone or even in private combination with his fellows. While all state policy has some bearing on social security, it is convenient to regard as social security services only such schemes as provide the citizen with benefits designed to prevent or cure diseases, to support him when unable to earn and to restore him to gainful activity.")

সামাজিক নিরাপত্তা সংজ্ঞা

শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং শ্রমকল্যাণকর ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়। রাষ্ট্র ও মালিকেরা শ্রমিকের কল্যাণের প্রতি নজর দিলে শ্রমিকগণ বিরুদ্ধভাবে পোষণ না করিয়া সহযোগী মনোভাব দেখাইবে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার প্রবর্তন করিলে তাহার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে, উৎপাদন বাড়িবে এবং কাজে অনুপস্থিতি কমিয়া যাইবে। তৃতীয়তঃ, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হইলে সামাজিক কল্যাণ (social welfare) বর্ধিত হইবে।

শ্রমিকদিগের কল্যাণের জন্য নিম্নলিখিত আইনসমূহ পাশ করা হইয়াছে:

* "There are some whose adverse circumstances make them unable to obtain the mere necessities of existence without the aid of others. To these less fortunate men and women, aid must be given by Government not as a matter of charity but as a social duty."

[এক] শ্রমিকগণের ক্ষতিপূরণ আইন (Workmen' Compensation Act, 1923.) এই আইনানুসারে কার্যরত অবস্থায় শ্রমিক আহত বা পংগু হইয়া পড়িলে বা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বা পেশাগত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে মালিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। মাসিক ৫০০ টাকা বেতনভোগী শ্রমিক পর্যন্ত এই আইনের সুবিধা ভোগ করিবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ শ্রমিকের বেতন এবং ক্ষতির গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হইলে মজুরী অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের হার ৫০০ টাকা হইতে ৪৫০০ পর্যন্ত হইতে পারে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির স্থায়ী সামগ্রিক পংগুতার (permanent total disablement) জন্য ক্ষতিপূরণের হার ৭০০ টাকা হইতে ৬৩০০ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কর্মীর ক্ষেত্রে মৃত্যুর জন্য ৪০০ টাকা এবং স্থায়ী সামগ্রিক পংগুতার জন্য ১২০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। স্থায়ী আংশিক পংগুতার জন্য ক্ষতিপূরণ আয়ের শতকরা ক্ষমতাহ্রাসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। যে ব্যক্তি ESI আইনানুমোদিত সাহায্য পাইবে সে এই আইনে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ পাইবে না।

[দুই] প্রসূতি কল্যাণ আইন (Maternity Benefit Act): ১৯২৯ সালে সর্বপ্রথম বোম্বাই প্রদেশে প্রসূতিকল্যাণ আইন পাশ হয়। ইহার পর প্রায় সকল প্রদেশেই প্রসূতি কল্যাণ আইন পাশ হয়। সারা ভারতে প্রসূতি কল্যাণের জন্য যাহাতে একই ধরণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় সেই উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালে একটি কেন্দ্রীয় প্রসূতিকল্যাণ আইন পাশ হইয়াছে। এই আইন ESI আইনের অন্তর্গত ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে।

[তিন] শ্রমিকদিগের রাষ্ট্রীয় বীমা-ব্যবস্থা (Employee's State Insurance Act): ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রীয় বীমা আইন (Employees' State Insurance Act সংক্ষেপে ESI Act) পাশ করিয়া শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। কারখানা শ্রমিক, যাহাদের বেতন মাসে অনধিক ৪০০ টাকা তাহারাই স্টেট ইন্সিওরেন্সের সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে পারিবে।

স্টেট ইন্সিওরেন্সের পরিচালনাভার একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। ইহার নাম এমপ্লাইজ স্টেট ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন। প্রথম পাঁচ বৎসর পর্যন্ত এই কর্পোরেশনের মোট ব্যয়ের ⅔ অংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিয়াছেন। শ্রমিকদিগকে প্রতি সপ্তাহে কর্পোরেশন ফাণ্ডে সামান্য পরিমাণ চাঁদা দিতে হয়। এই চাঁদার হার এক আনা হইতে আরম্ভ করিয়া এক টাকা চার আনা পর্যন্ত হইতে পারে। শ্রমিকগণ মোট ⅓ অংশ কর্পোরেশন ফাণ্ডে জমা দেয় আর বাকী ⅔ অংশ প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষের দেয়।

এই আইনে পাঁচ প্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (১) অসুস্থ অবস্থায় অর্থ সাহায্য দান (sickness benefit); পীড়িত অবস্থায় বীমাকারী শ্রমিক বৎসরে ৫৬ দিনের জন্য অর্ধেক মজুরী হারে অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। (২) প্রসূতিকালীন সাহায্যদান (maternity benefit), প্রত্যেক প্রসূতি

প্রসবের পূর্বে ছয় সপ্তাহ ও প্রসবের পর ছয় সপ্তাহ দৈনিক ৭৫ পয়সা হারে অর্থ সাহায্য পাইবে; (৩) কারখানার দুর্ঘটনায় কোনো শ্রমিক স্থায়ীভাবে পংগু হইয়া পড়িলে অকর্মণ্যতা অনুসারে ক্ষতিপূরণ পাইবে (disablement benefit) (৪) কারখানায় কোনো দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা স্ত্রীকে পেনসন দেওয়া এবং নাবালক পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে (dependants' benefit) (৫) বীমাকৃত শ্রমিকের বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা (medical benefit) করা হইয়াছে। কর্পোরেশন ইচ্ছা করিলে বীমাকারী শ্রমিকদিগের পরিবারের লোকজনের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করিতে পারে।

[চার] শ্রমিকগণের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন (Employees' Provident Fund Act, 1952). প্রথমে এই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আইন ছয়টি শিল্পের জন্য প্রণীত হইয়াছিল, পরে ইহাকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। যে সকল কারখানায় ৫০ জন বা তদধিক শ্রমিক কাজ করে সেই সকল ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য। বর্তমানে ২০ জন শ্রমিকযুক্ত সকল কারখানাতেই এই আইন প্রয়োগ করা হইতেছে। যে সকল শ্রমিকের বেতন এক হাজার টাকার অধিক নয় তাহারা এই আইনের অধীনে আসিবে। শ্রমিকদের মূল বেতনের ৬১/৪% প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে চাঁদা হিসাবে জমা দিতে হইবে আর মালিক পক্ষেরও অনুরূপ পরিমাণ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের চাঁদা দেওয়া বাধ্যতামূলক। অবশ্য শ্রমিকেরা ইচ্ছা করিলে ৮১/৩% পর্যন্ত অর্থ জমা দিতে পারে। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ইহা ৪৭টি শিল্পের অন্তর্গত ২৮ লক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইয়াছে। এই আইন দ্বারা শ্রমিকের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

[পাঁচ] কারখানা আইন, ১৯৪৮ (Factories Act, 1948): এই আইনের বলে মালিকের শোষণের হাত হইতে শ্রমিককে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। এই আইনানুসারে মালিক কোনো কারখানা-শ্রমিককে একনাগাড়ে পাঁচ ঘণ্টার বেশী খাটাইতে পারিবে না—পাঁচ ঘণ্টা কাজের পর অন্ততঃ আধঘণ্টা বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক কোনো বালক কারখানায় কাজ করিতে পারিবে না। কোনো বালক বা স্ত্রী-শ্রমিক রাত্রে কাজ করিতে পারিবে না। সপ্তাহে একদিন করিয়া সকল শ্রমিককেই ছুটি দিতে হইবে। যে শ্রমিক একনাগাড়ে বারো মাস কাজ করিয়াছে সে পরবর্তী বারো মাসে প্রতি ২০ দিনের হিসাবানুসারে একদিন করিয়া ছুটি পাইবে। এই আইনে কারখানায় নিরাপত্তা, ক্যানটিন, ক্রেস (creeche) পানীয়জল, পায়খানা, থুথু ফেলিবার স্থান, ওয়েলফেয়ার অফিসার, এম্বুলেন্স রুম এবং ডাক্তার রাখিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

[ছয়] সর্বনিম্ন মজুরী আইন, ১৯৪৮ (Minimum Wages Act, 1948): শ্রমিকদিগকে মালিকের শোষণের হাত হইতে রক্ষা এবং শিল্পে শান্তি বজায় রাখিবার জন্য এবং শ্রমিকদের সর্বনিম্ন জীবনযাত্রায় মান সম্বন্ধে আশ্বাস দিবার

জন্য সর্বনিম্ন মজুরী আইন পাশ করা হয়। এই আইন দ্বারা রাজ্যসরকারগুলিকে নিজ নিজ এলাকায় মজুরদের সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারণ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

[সাত] **বাগিচা শিল্পশ্রমিক আইন, ১৯৫১ (Plantation Labour Act 1951).** এই আইন পাশ করিয়া বাগিচা শিল্প শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। এই আইনে বাগিচা শিল্প শ্রমিকদের জন্য পানীয় জল, চিকিৎসা ক্যানটিন-ক্রিস, আবাস গৃহ, আমোদপ্রমোদ, শিক্ষা এবং দৈনিক বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়।

[আট] **খনি আইন, ১৯৫২ (Indian Mines Act, 1952).** ভারতীয় খনি আইনে খনিশিল্প-শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল শ্রম কল্যাণকর আইন ছাড়াও কিছুকাল যাবৎ সরকার শিল্প শ্রমিকদের উন্নত বাসস্থান নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৫২ সালে সাবসিডাইসড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল হাউসিং স্কীম (Subsidised Industrial Housing Scheme) প্রবর্তিত হয়। প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প-শ্রমিকদের গৃহ নির্মাণ বাবদ ব্যয় হয় ৩৮·৫ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় হয় ৮০ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ওই খাতে ব্যয়বরাদ্দ করা হয় ১৪২ কোটি টাকা। শ্রমিক কল্যাণ এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য সরকার যে সচেতন তাহা উপরিউক্ত আইনসমূহ হইতেই বোঝা যাইতেছে। কিন্তু উন্নত পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় সাধারণ বেকার বীমা (unemployment insurance) এখনো আমাদের দেশে প্রবর্তিত হয় নাই।

বেকার সমস্যা (Unemployment Problem):—বর্তমান শতাব্দীর চরম অভিশাপ এই বেকার সমস্যা। বেকার সমস্যা হইতেই আসে শিল্পগত উন্নয়নে বাধা, ইহা হইতেই সৃষ্টি হয় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিদ্বেষ, এক দেশের মানুষের প্রতি আর এক দেশের মানুষের ঘৃণা। *আর্থিক দুরবস্থা এবং অভাবের সৃষ্টি করিয়া বেকারত্ব মানুষের যে ক্ষতি করে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি করে নৈতিক অধঃপতনের সূচনা করিয়া। লর্ড বিভারিজের ভাষায় বলা যায় যে, the greatest evil of unemployment is not physical but moral, not the want which it may bring but the hatred and fear which it breeds. Employment is wanted as a means to more consumption or more leisure, as a means to a higher standard of life.

* "So long as there is a scramble for jobs, it is idle to deplore the inevitable growth of jealous restrictions, of demarcations or organised or voluntary limitations of output, of resistance to technical advance. By this scramble are fostered many still uglier growths—hatred of foreigners, hatred of Jews, enmity between the sexes. Failure to use our productive powers is the source of an interminable succession of evils," Lord Beveridge.

পরিকল্পনা কমিশন বলিতেছেন যে ইহা আশ্চর্য ব্যাপার বলিয়া মনে হইবে যে ভারতের মতো অনুন্নত দেশে যেখানে দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম, সেই দেশে কি করিয়া নিয়োগের অভাব থাকিতে পারে। কিন্তু ভারতে এই আপাত অসম্ভব ব্যাপারই ঘটিয়াছে এবং ব্যাপক বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। বেকার সমস্যার জন্য জাতীয় আয় কম, জীবনযাত্রার মান নীচু এবং জনসাধারণ অসুখী। পাশ্চাত্য দেশসমূহে সাধারণতঃ চার ধরণের অস্থায়ী প্রকৃতির বেকার দেখিতে পাওয়া যায়ঃ (১) ঋতুগত বেকার (seasonal unemployment)—কতকগুলি শিল্প আছে যেখানে বৎসরের কয়েকমাস মাত্র কাজ পাওয়া যায় আর বাকী সময় শ্রমিকদিগকে বেকার থাকিতে হয়, যেমন চিনি শিল্প; (২) বাণিজ্য চক্র জনিত বেকার (cyclical unemployment)—শিল্পে মন্দা দেখা দিলে উৎপাদক উৎপাদন কমাইয়া দিবে ফলে কিছু লোক বেকার হইয়া পড়িবে; (৩) বিঘ্নজনিত বেকার (frictional unemployment)—এক কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজ খোঁজার সময় লোক সাময়িক ভাবে কিছুদিনের জন্য বেকার থাকিতে পারে; (৪) যান্ত্রিক বেকার (technological unemployment)—উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে কখনো কখনো শ্রমিক সাময়িকভাবে বেকার হইয়া পড়ে।

বিভিন্ন ধরণের বেকার

উন্নতদেশে বেকারদিগকে যে ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয় ভারতের বেকারদিগকে সেইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা ঠিক হইবে না। বেকার সমস্যা ভারতে নূতন নয়, পূর্বেও ইহা ছিল কিন্তু বর্তমান কালের মতো তখন ইহা গুরুতর সমস্যার আকার ধারণ করে নাই। লর্ড কেনসের মতে সুদের-হার এবং বিনিয়োগের হার অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় বলিয়া পাশ্চাত্যদেশে অনিচ্ছুক বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে বেকার সমস্যা সাময়িক এবং সরকার ও শিল্পপতিদের সময়োচিত প্রচেষ্টায় ইহার সমাধান করা যায়। ওই সকল দেশে যে পদ্ধতির দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান করা হয় ভারতের সমস্যা সেই উপায়ে সমাধান করা সম্ভবপর নয়। ভারতের বেকার সমস্যা স্থায়ী প্রকৃতির এবং ইহার দীর্ঘ মেয়াদী সমাধানের উপায় হইতেছে জনসংখ্যা পরিকল্পনা, আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা এবং দ্রুত শিল্পায়ন।

পরিকল্পনা কমিশনের মতানুসারে ভারতের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার কারণগুলি নিম্নলিখিতরূপঃ

(১) দ্রুত হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি; প্রতি বৎসর ৭০ লক্ষ করিয়া লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

(২) পুরাতন গ্রামীন শিল্পের ধ্বংস। বিদেশী বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা, রুচির পরিবর্তন প্রভৃতি নানা কারণে কুটির শিল্প ধ্বংস হইতে থাকে; পূর্বে এই সকল কুটিরশিল্প হইতে পল্লীঅঞ্চলের বহুলোকের আংশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইত।

(৩) শিল্পের অনগ্রসরতা ; জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে যদি শিল্পের আশানুরূপ উন্নতি হইত তাহা হইলে বেকার সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করিতে পারিত না।

(৪) দেশ বিভাগ : দেশ বিভাগের ফলে এক কোটি আশ্রয়প্রার্থী পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাও বেকার সমস্যার অন্যতম কারণ।

ভারতের বেকার সমস্যাকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করিতে পারা যায়—কৃষিগত (গ্রাম্য) বেকার সমস্যা, শিল্পগত (শহরের) বেকার সমস্যা এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের (শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার) সমস্যা।

কৃষিগত বা গ্রাম্য বেকার সমস্যা : কৃষিগত বেকার সমস্যা সাধারণতঃ অর্ধনিয়োগ সমস্যা (underemployment) এবং ঋতুগত বেকার সমস্যা। কৃষকেরা সাধারণতঃ ছয়মাস মাঠে কাজ করে আর বৎসরের বাকী সময় কার্যাভাবে বেকার থাকিতে বাধ্য হয়। যাহারা ছয়মাস মাঠে কাজ করে তাহাদের মধ্যেও বহু ছদ্মবেশী বেকার (disguised unemployment) রহিয়াছে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বাড়াইয়াছে অর্থাৎ কৃষিতে অনুৎপাদনশীল শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৮০ লক্ষ কৃষক ৬৩০০ লক্ষ একর জমি চাষ করে, অপরপক্ষে ভারতে ৭৩০ লক্ষ কৃষক মাত্র ৩৬০০ লক্ষ একর জমি চাষ করে। এই তুলনামূলক পরিসংখ্যান হইতেই ভারতে জমির উপব জনসংখ্যার চাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে আর জনসংখ্যার এই চাপের জন্যই জমি ক্ষুদ্রতর আকারে খণ্ড খণ্ড এবং অসম্বদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। গ্রামীন কুটির শিল্পের ধ্বংস হওয়ায় কৃষক অবসর সময়ে যে আংশিক উপজীবিকা গ্রহণ করিয়া আয় বৃদ্ধি করিবে সে উপায়ও নাই।

কৃষিগত বেকারের পরিমাণ সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নাই। অবশ্য ইহা অবিসংবাদিত যে কৃষিগত বেকারের সংখ্যা বিরাট। কাহারো কাহারো মতে উহা মোট গ্রামীন জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ।

কৃষিগত বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে হইবে এবং উদ্বৃত্ত শ্রমিককে কৃষি হইতে শিল্পে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটাইতে হইবে, উন্নত পদ্ধতিতে জমি চাষ করিতে হইবে, অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার করিতে হইবে এবং বহুধা বিভক্ত ও অসম্বদ্ধ জোতের সংহতি সাধন করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে জমিচাষ করিতে হইবে। যে দেশে মূলধনের পরিমাণ অল্প কিন্তু শ্রমিকের সংখ্যা বিপুল সেখানে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পকে পুনর্গঠিত করিতে পারিলে শুধুমাত্র গ্রামীনই নয় বহু শিক্ষিত বেকারদেরও কর্মসংস্থান হইবে।

শিল্পগত বেকার সমস্যা : এই শ্রেণীতে আমরা সেই সকল বেকারদের অন্তর্ভুক্ত করিব যাহারা গ্রামে মজুর বা কারিগরের কাজ করিত কিন্তু সেখানে জীবিকার্জনে ব্যর্থ হইয়া শহরের শিল্প কারখানায় কাজ ছে হারা সাধারণতঃ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত এবং শিল্পকার্যে কোনরূপ শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা

নাই; অদক্ষ (unskilled) কাজ করিয়া থাকে। এই ধরণের শিল্পগত বেকার-সমস্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। নিয়োগ-বিনিময়কেন্দ্রে (Employment Exchange) রেজিস্ট্রীভুক্ত কর্মপ্রার্থীর প্রায় শতকরা ৭০ ভাগের কোনরূপ শিল্পশিক্ষা বা অভিজ্ঞতা নাই। ১৯৫১ সালে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রের খাতায় নিয়োগপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩'২৯ লক্ষ। ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে নিয়োগপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৪'২৬ লক্ষ, ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে ইহা হয় ২৪'৫ লক্ষ। এই পরিসংখ্যান হইতে শিল্পগত বেকারের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন মোট বেকারের একটা সামান্য অংশই নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রে নাম তালিকাভুক্ত করে।

শিল্পগত বেকার সমস্যার মূল কারণ ভারতে শিল্পের অনগ্রসরতা। শিল্পে লগ্নীর পরিমাণ বৃদ্ধিকরা এবং ব্যাপকভাবে শিল্পসম্প্রসারণ করার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, নানা কারণে বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস হওয়ার ফলে চা, পাট প্রভৃতি রপ্তানী শিল্পের উৎপাদন সংকোচজনিত বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। তৃতীয়তঃ, মুদ্রাস্ফীতির ফলে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা এবং প্রকৃতআয় হ্রাস পাইতেছে। ইহাতে দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়ের পরিমাণ কম হইতেছে বলিয়া উৎপাদক উৎপাদন সংকোচ এবং শ্রমিক ছাঁটাই করিতেছে। চতুর্থতঃ শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইতে হইলে উৎপাদন ব্যয় কমাইয়া দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিতে হইবে। দ্রব্যের উৎপাদন খরচ কমাইতে হইলে শিল্পে র‍্যাশানালাইজেশন করা প্রয়োজন। কিন্তু ভারতীয় শিল্পে র‍্যাশানালাইজেশন করার দুইটি প্রধান বাধা রহিয়াছে—প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব এবং শ্রমিকগণের বিরোধিতা। শ্রমিকদিগের যুক্তি যে শিল্পে র‍্যাশানালাইজেশন করিলে বেকার সমস্যা দেখা দিবে। কিন্তু এই যুক্তির বিশেষ সারবত্তা নাই কারণ র‍্যাশানালাইজেশন না করিলেও বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইবে। উৎপাদন খরচ বেশী হইলে প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করা কঠিন হইবে; বিক্রয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইলে কিছু সংখ্যক শ্রমিক ছাঁটাই হইবে। অপরপক্ষে র‍্যাশানালাইজেশনের মাধ্যমে যে বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহা সাময়িক।

শিল্পগত বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে দ্রুত শিল্পায়ন এব শিল্পে র‍্যাশানালাইজেশন করা প্রয়োজন। দ্রুতশিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন শিল্পগত উদ্যোগ, মূলধন গঠন এবং দক্ষতাগঠন (skill formation); সরকারী প্রচেষ্টায় সরকারী শিল্পোদ্যোগের এবং শিল্পপতিদের প্রচেষ্টায় বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের প্রসার করিতে হইবে। শ্রমিকের কারিগরী দক্ষতা বাড়াইবার জন্য অধিক পরিমাণে কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। বর্তমান ভোগকে যথাসাধ্য কমাইয়া এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় আয় বাড়াইয়া মূলধন গঠন করিতে হইবে এবং দেশে এরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে বিদেশী মূলধনের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার সমস্যা: সাম্প্রতিককালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যা চরম আকার ধারণ করিয়াছে। শিক্ষিত বেকারেরা রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন এবং সেই কারণে তাহারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দিক হইতে বিপজ্জনক। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নাই তবে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে উহা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৫৫ সালে সমীক্ষাদলের (Study Group)-এর মতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল ৫·৫ লক্ষ। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬৬ সালে উহার সংখ্যা ৭·৫ লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

শিক্ষিত ব্যক্তি বলিতে আমরা অন্ততঃ প্রবেশিকা বা স্কুল ফাইন্যাল বা সমতুল্য কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে বুঝিব। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যার কারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষত্রুটি। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অতিমাত্রায় তত্ত্বাশ্রয়ী (theoretical) এবং বাস্তবজীবনের সহিত সম্পর্ক বিরহিত। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কেরাণীগিরি এবং সরকারী চাকুরী ছাড়া অন্য কোনো কাজ করিতে পারে না। এই শিক্ষাব্যবস্থায় সুদক্ষ শ্রমিক তৈয়ারী হয়না এবং দেশের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সহিত নিয়োগের যে সকল নূতন নূতন পথ খোলা হইতেছে সেখানে অদক্ষ শ্রমিকের কোনো প্রয়োজন হয় না। যে দেশে শতকরা ৮৩ জন লোক অশিক্ষিত সেই দেশে উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। শিক্ষিত বেকার সমস্যার জন্য যাঁহারা শিক্ষাধিক্যের অভিযোগ আনয়ন করেন তাঁহারা নিজেদের অক্ষমতাকে ঢাকিবার ব্যর্থপ্রয়াস করেন মাত্র। শিক্ষার আরো প্রসার ঘটাইতে হইবে। শিক্ষিত বেকার সমস্যার আর একটি কারণ মন্দার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপক ছাঁটাই।

শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করিতে হইবে। প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারের জন্য সর্বার্থসাধক (Multipurpose) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। পেশাগত কারিগরী শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষাসংস্কার করিলেই শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না—দেশের দ্রুতশিল্পায়নের মধ্য দিয়াই আসল সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

নিয়োগ-বিনিময় কেন্দ্র (Employment Exchange): দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সামরিক কাজে নিযুক্ত ছাঁটাই শ্রমিকের পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করা। ১৯৪৫ সালে ৭০টি নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্র ছিল। স্বাধীনতালাভের পর ইহার কার্যের পরিধি অনেক বাড়িয়া যায়। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৩৬, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫৬।

নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলি বেকারদিগের নিকট হইতে আবেদনপত্র গ্রহণ করে এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান লোক খুঁজিলে তাহাদের উপযুক্ত

শ্রমিকের সন্ধান দেয়। নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলি নিয়োগকারী এবং নিয়োগপ্রার্থীদের সম্বন্ধ নিকটতর করিয়া বেকার সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করে। বিনিময় কেন্দ্রগুলি শ্রমিকের গতিশীলতা বাড়ায় মাত্র কিন্তু ইহা কোনো নূতন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করিতে পারে না। তথাপি বেকার ও নিয়োগের মধ্যে সংযোগসাধন করিয়া ইহারা বেকারসমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করে।* দ্বিতীয়ত, যদিও নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রের হিসাবানুযায়ী দেশের বেকার সমস্যার নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়না তথাপি ইহারা বেকার সমস্যার গতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়।

নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলিকে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৫২ সালে শিবরাওয়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। উক্ত কমিটি ১৯৫৪ সালের এপ্রিলমাসে তাহার রিপোর্ট পেশ করে। ইহার প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নলিখিতরূপ :

(১) নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রকে পুনর্গঠন করিয়া জাতীয় নিয়োগ সংগঠনরূপে (National Employment Service) অভিহিত করিতে হইবে এবং ইহা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে। সরকারী এবং আধা-সরকারী চাকুরী নিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমেই দিতে হইবে।

(২) রাজ্যসরকারগুলির হাতে নিয়োগবিনিময় কেন্দ্রের পরিচালনার ভার থাকিবে। কিন্তু সাধারণ নীতি নির্ধারণ এবং কাজের তত্ত্বাবধান কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) যে সকল নিয়োগকর্তা এবং নিয়োগপ্রার্থী নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রের সেবা এবং সাহায্য চাহিবে তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ ফী আদায় করা চলিবে না।

(৪) নিয়োগ বিনিময়কেন্দ্রগুলি শিল্পগত এবং পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে।

শিবরাও কমিটির সুপারিশগুলি সরকার আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলি জাপানী পদ্ধতিতে গঠিত হইলে অধিকতর উপকার পাওয়া যাইবে। জাপানে নিয়োগ বিনিময়কেন্দ্রগুলি শ্রমিকদিগকে ঋণ দান করিয়া থাকে যাহাতে তাহারা বিশেষ ধরণের ট্রেনিং লইতে পারে অথবা দূরবর্তী স্থানে যেখানে নিয়োগের সম্ভাবনা রহিয়াছে সেইখানে যাইতে পারে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও নিয়োগ (Five Year Plans and Employment.)

প্রথম পরিকল্পনা : প্রথম পরিকল্পনায় সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছিল কিন্তু নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য কোনো বিশেষ বা পৃথক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু পরে বেকার সমস্যা তীব্রতর হইয়া দেখা দিলে উহা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৭০

* "The employment service itself is not a panacea for manpower problems. After all the Employment Exchange cannot create jobs. They can only direct the unemployed who are capable and available for work but unable to obtain suitable employment, to jobs if available and notified to it."

কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ও এগারো দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। গৃহনির্মাণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে সাহায্যদান, ভূমিসংরক্ষণ, রাস্তাঘাট নির্মাণে সাহায্য প্রভৃতি এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় ৪৫ লক্ষ লোকের সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অবশ্য ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা : প্রথম পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কোনো লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হয় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পরিকল্পনার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করেন যে প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ করিয়া নূতন শ্রমিক কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িতেছে। সুতরাং পরিকল্পনাধীন পাঁচ বৎসরে নূতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হইবে এক কোটি। ইহার মধ্যে শহরাঞ্চলের কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ৩৮ লক্ষ এবং গ্রামাঞ্চলের কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ৬২ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে পুরাতন নিয়োগপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ (শহরাঞ্চলের ২৫ লক্ষ+গ্রামাঞ্চলের ২৮ লক্ষ) সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট নিয়োগপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াইবে এক কোটি ৫৩ লক্ষ। অবশ্য উল্লিখিত হিসাবের মধ্যে গ্রামীন এলাকায় অর্ধ নিয়োগের (under employment) সংখ্যা ধরা হয় নাই। নূতন বেকারদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা, পুরাতন বেকারদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং গ্রামীন অর্ধবেকারদের পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা করা—দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সমস্যাকে এই তিন দিক হইতে সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে ২৩ লক্ষ এবং শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে ৮০ লক্ষ অর্থাৎ মোট এক কোটি নিয়োগ সৃষ্টির লক্ষ্য ধার্য করা হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে এই নূতন কর্মসংস্থানের কতখানি স্থায়ী নিয়োগ (sedimentary) আর কতোখানি অস্থায়ী (revolving) তাহা হিসাব করিয়া দেখানো হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতির রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত অকৃষিগত ক্ষেত্রে ৬৫ লক্ষের মতো নূতন নিয়োগের সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ৮০ লক্ষ।

তৃতীয় পরিকল্পনা : দ্বিতীয় পরিকল্পনার হিসাবানুযায়ী দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষ হইয়া যাইবার পরও দেশে প্রায় ৯০ লক্ষ লোক বেকার থাকিবে। ইহা ব্যতীত তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নূতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হইবে এক কোটি ৭০ লক্ষ। ইহার একতৃতীয়াংশ নগরাঞ্চলের এবং দুই তৃতীয়াংশ গ্রামাঞ্চলের বেকার। এই সম্পূর্ণ বেকার ছাড়াও দেশে অর্ধনিয়োগের সংখ্যা হইবে এক কোটি ৫০ লক্ষ হইতে এক কোটি ৮০ লক্ষের মতো।

তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট এক কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাইবে—ইহার মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে ৩৫ লক্ষ এবং অকৃষিগত ক্ষেত্রে ১০৫ লক্ষ লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশে এক কোটি ২০ লক্ষ লোক বেকার থাকিয়া যাইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন বেকার সমস্যাকে তিন দিক হইতে বিবেচনা করার কথা বলিয়াছেন। প্রথমতঃ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে পরিকল্পনাধীন কর্মসূচীতে যেন পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয়তঃ, গ্রাম-শিল্পায়নের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ, শিল্পতালুকের প্রসার, গ্রামশিল্পের উন্নয়ন এবং জনশক্তির পূর্ণনিয়োগের উপর গুরুত্ব দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, পঁচিশ লক্ষ বা ততোধিক ব্যক্তির যাহাতে বৎসরে অন্ততঃ ১০০ দিনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় তাহার জন্য নানাধরণের গ্রামীন কর্মসূচী (rural works programme) গ্রহণ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে অর্দ্ধনিয়োগের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইবে।

ব্যাপক বেকারত্ব এবং অর্ধবেকারত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনায় সর্বাধিক নিয়োগ বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিয়োগ সৃষ্টির কৌশল নির্বাচনের (choice of technique) কথা বলিয়াছেন। পরিকল্পনা কমিশন শ্রম-প্রগাঢ় (labour-intensive) পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন। ইদানীংকালে গ্রাম শিল্প এবং কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলেও ইহাদের নিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাব্য ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় নাই। গ্রাম-শিল্পায়ন এবং গ্রাম-বৈদ্যুতিকরণ ইহারা পরস্পরযুক্ত এবং একত্রে গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে স্থায়ী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করিতে পারে।

দেশের দ্রুত শিল্পায়নের সাথে সাথে শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশে শিল্পক্ষেত্রে যে ধরণের শ্রমিকের প্রয়োজন হইতেছে তাহার সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া শিক্ষাব্যবস্থাকেও পরিবর্তন করিতে হইবে। বর্তমানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১০ লক্ষের মতো। তৃতীয় পরিকল্পনায় নূতন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হইবে ৩০ লক্ষ। সমবায়ের প্রসার, বৈজ্ঞানিক কৃষিকর্মের প্রসার এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠার দ্বারা গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত বেকারদের নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে।

সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ (Minimum Wages in India) : শ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণের উদ্দেশ্য তাহার চরম দারিদ্র্য দূর করা এবং মালিকের শোষণ হইতে রক্ষা করা। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শ্রমিকের মজুরি প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যের সমান। সর্বনিম্ন মজুরি আইন কার্যকর হইলে নিম্নলিখিত দুইটি অবস্থার মধ্যে যে কোনো একটি ঘটিবে। প্রথমতঃ, যে সকল শ্রমিকের সেবার (service) মূল্য সর্বনিম্ন মজুরি অপেক্ষা অনেক কম তাহারা ছাঁটাই হইবে অথবা অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ শ্রমিকের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া সর্বনিম্ন মজুরির মূল্যের সমান হইবে।

সর্বনিম্ন মজুরি প্রবর্তনের ফলে শ্রমিক ছাঁটাই-এর সম্ভাবনা নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর : (১) সর্বনিম্ন মজুরি হার অপেক্ষা শ্রমিকের সেবার মূল্য যত কম হইবে ছাঁটাই-এর সম্ভাবনা ততই বেশী হইবে ; (২) উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদার

স্থিতিস্থাপকতা যত বেশী হইবে, ছাঁটাই-এর সম্ভাবনা ততই বেশী হইবে এবং (৩) অদক্ষ শ্রমিকের পরিবর্তে যত বেশী অপর উপাদান ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকিবে ছাঁটাই-এর সম্ভাবনা ততই বেশী হইবে। অদক্ষ শ্রমিকের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে সর্বনিম্ন মজুরি হারের প্রবর্তনের ফলে মোট উৎপাদন হ্রাস পাইবে। মোট নিয়োগের উপর সর্বনিম্ন মজুরি হারের ফল হিসাবে বলা যাইতে পারে যে সর্বনিম্ন মজুরি হার যত উচ্চহারে নির্ধারণ করা হইবে তত বেশী শ্রমিক ছাঁটাই হইবে।

সর্বনিম্ন মজুরি ও ছাঁটাই

শ্রমিকের দিক হইতে মজুরি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় কারণ ইহার উপর তাহার কর্মদক্ষতা নির্ভর করিতেছে। ইহাছাড়া শিল্পবিরোধের প্রধান কারণই হইল শ্রমিকের মজুরি সংক্রান্ত ব্যাপার। ভারতীয় শ্রমিকের মজুরি সুস্থ জীবনযাপনের তুলনায় নেহাৎই অকিঞ্চিতকর।

সর্বনিম্ন মজুরি হার নির্ধারণের প্রশ্ন সাম্প্রতিককালে সমস্যা। শ্রমিকেরা তিনটি কারণে পর্যাপ্ত মূল সর্বনিম্ন মজুরি (basic minimum wages) পাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রথমতঃ, শোষণের হাত হইতে শ্রমিককে রক্ষা করিবার জন্য সর্বনিম্ন মজুরিমান নির্ধারণ প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লাভের বোনাস মূল মজুরির (basic wages) ভিত্তিতে দেওয়া হয়—সমগ্র আয়ের ভিত্তিতে নয়। তৃতীয়তঃ, যে সকল শিল্পে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা আছে সেখানে মালিকের দেয় অংশ নির্ধারিত হয় মূল মজুরির ভিত্তিতে। সুরু হইতেই দেখা যায় যে সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণে অপর দুইটি উপাদানের অস্তিত্ব কম বেশী কার্যকরী রহিয়াছে শিল্পবিরোধ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা এবং জাতীয় জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

মজুরি নির্ধারণের চারিটি পদ্ধতি আছে—যৌথ দরকষাকষি (Collective bargaining), আপোষ পদ্ধতি (Conciliation process), মজুরীবোর্ড (Wage Board) স্থাপন এবং আইনগত (Statute) পদ্ধতি। সর্বনিম্ন মজুরী আইনগত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইয়াছে।

মজুরি নির্ধারণের পদ্ধতি

শিল্পে মজুরি নির্ধারণের তিনটি মানদণ্ড আছে। প্রথমত, মজুরি অবশ্যই জীবনধারণোপযোগী (living wage) হইবে। প্রত্যেক শ্রমিক পরিবার চারজন পূর্ণবয়স্ক লোক লইয়া গঠিত এই হিসাবের ভিত্তিতে জীবনধারণোপযোগী মজুরি নির্ধারণ করিতে হইবে। চারজন পূর্ণবয়স্ক লোকের প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন খাদ্য (প্রত্যেকের দৈনিক ২৭০০ ক্যালোরি মূল্যের খাদ্যগ্রহণের ভিত্তিতে), মাথাপিছু ১৮ গজের ভিত্তিতে মোট বাৎসরিক ৭২ গজ কাপড, বাড়ীভাড়া এবং অন্যান্য ব্যয়বাবদ মোট শতকরা ২০% ধরিয়া জীবনধারণোপযোগী মজুরি নির্ধারণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ বলেন যে সর্বনিম্ন মজুরি হারকে ন্যায্য মজুরি (fair wages) হইতে হইবে। সর্বনিম্ন মজুরি কেবলমাত্র প্রাণধারণের ব্যবস্থাই করিবে না, ইহা শ্রমিকের কর্মদক্ষতা রক্ষার

মজুরি নির্ধারণের মানদণ্ড

জন্য কিছু পরিমাণ শিক্ষা, চিকিৎসা এবং অন্যপ্রকার সুবিধাদানের ব্যবস্থা করিবে।* তৃতীয়তঃ, মালিকেরা সাধারণতঃ যে মানদণ্ডের সুপারিশ করিয়া থাকেন তাহা হইল শিল্পের মজুরিপ্রদানের ক্ষমতা (capacity of the industry to pay). এই মানদণ্ড অনুযায়ী শিল্পের মজুরী প্রদানের ক্ষমতা অনুসারে সর্বনিম্ন মজুরি শ্রমিকদিগের গ্রহণ করা উচিত কারণ শিল্পের মুনাফাঅনুযায়ী সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ না করিলে মালিকেরা উৎপাদন কমাইয়া দিতে পারে ফলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইবে। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে শিল্পের স্বল্পকালে মজুরিপ্রদানের ক্ষমতা এক আর দীর্ঘকালে মজুরিপ্রদানের ক্ষমতা অন্যরূপ।

বহুকাল ধরিয়া ভারতীয় শ্রমিকেরা সর্বনিম্ন মজুরি হার নির্ধারণের জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। কাণপুর শ্রম অনুসন্ধান কমিটি এবং বোম্বে শ্রমঅনুসন্ধান কমিটি সর্বনিম্ন মজুরী হার নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করেন। ১৯২৮ সালের আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের সুপারিশ অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র সর্বনিম্ন মজুরি হার নির্ধারণে সম্মত হইলেও, বাস্তব অসুবিধা থাকার জন্য ভারত সরকার ঐ সুপারিশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ভারতীয় শিল্পপতিগণও এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন। রয়েল কমিশন অন লেবার ধীরে ধীরে শিল্পে সর্বনিম্ন মজুরিহার নির্ধারণের পরামর্শ দেন।

১৯৪৮ সালের সর্বনিম্ন মজুরী আইন (Minimum Wages Act, 1948) পাশ হওয়ায় এই বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ বলিয়া গণ্য করা যায়। এই আইনে সেই সকল শিল্পে সর্বনিম্ন মজুরি হার নির্ধারণ করা হয় যেখানে মালিক কর্তৃক শ্রমিক শোষিত হইবার সম্ভাবনা সর্বাধিক। সমগ্র এশিয়ায় এই ধরণের ইহাই প্রথম আইন।

এই আইনের মূল বিধানগুলি এইরূপ : এই আইনানুসারে কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য-সরকার তালিকাভুক্ত কতকগুলি নির্দিষ্ট শিল্পে সর্বনিম্ন মজুরীর হার প্রবর্তন করিতে পারিবেন। এই সকল শিল্পগুলির মধ্যে আছে চালের কল, ময়দার কল, তামাকের কারখানা প্রভৃতি বারোটি শিল্প এবং কৃষি। যে শিল্পে রাজ্যে ১০০০-এর কম শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে সেই সকল শিল্পে এই আইন প্রযুক্ত হইবে না। কিভাবে সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারিত হইবে তাহাও এই আইনে বলা হইয়াছে। রাজ্যসরকার নিজে কোনো শিল্পে সর্বনিম্ন মজুরী ঠিক করিয়া দিতে পারেন অথবা একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া নিম্নতম মজুরী হারের সুপারিশ করিতে বলিতে পারেন এবং কমিটি রায় দিবার তিন মাস পরে ঐ আইন কার্যকরী হইবে। এই আইনে (১) সর্বনিম্ন সময়গত মজুরী (minimum time rate) (২) সর্বনিম্ন কার্যগত মজুরী (minimum piece rate) (৩) গ্যারান্টিযুক্ত সময়গত মজুরী এবং (৪) উপযুক্ত ওভার টাইম (overtime rate) হারের নির্ধারণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিভিন্ন কাজের জন্য ও বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য এবং বয়স্ক শ্রমিক, স্ত্রী-শ্রমিক, বালক এবং শিক্ষানবীশ প্রভৃতির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মজুরীর হার

* The minimum wage must provide not merely for the bare sustenance of life. but also for the preservation of the efficiency of the worker by providing some measure of education, medical requirements and social amenities.

এক নাও হইতে পারে। সর্বনিম্ন মজুরী হারে মূলমজুরীর সহিত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ভাতা যুক্ত থাকিতে পারে (cost of living allowance) অথবা মূল মজুরির সহিত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ভাতা যুক্ত নাও থাকিতে পারে অথবা ইহা সকল অন্তর্ভুক্ত ব্যাপক হার (all-inclusive rate) হইতে পারে। এ পর্যন্ত ২০টি শিল্পে সর্বনিম্ন মজুরী আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে।

১৯৪৮ সালে Fair Wage Committee বা ন্যায্য মজুরী কমিটি নিযুক্ত হয় এবং পর বৎসর এই কমিটি তাহার রিপোর্ট পেশ করে। এই কমিটির মতে সর্বনিম্ন মজুরী এরূপ হওয়া চাই যাহার দ্বারা নিছক জীবন রক্ষা ব্যতীতও কিছু পরিমাণ শিক্ষা, চিকিৎসা এবং অন্যান্য সামাজিক সুবিধা রক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু কমিটি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে যে এই ধরণের সর্বনিম্ন মজুরী শীঘ্র প্রবর্তন করা সম্ভবপর নয়। এই কমিটির মতে ন্যায্য মজুরী প্রবর্তনের সময় এই সকল বিষয়গুলিও বিবেচনা করিতে হইবে: শিল্পের মজুরী প্রদানের ক্ষমতা, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা, জাতীয় আয়, প্রচলিত মজুরী হার এবং দেশের অর্থনীতিতে সংশ্লিষ্ট শিল্পের স্থান।

Fair Wage Committee

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোর্ট, ট্রাইব্যুন্যাল প্রভৃতির বাঁটোয়ারা ফল হিসাবে বেশ কিছু পরিমাণ সংগঠিত শিল্পে সর্বনিম্ন মজুরী হার বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের Central Pay Commission-এর রিপোর্ট এই দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত শিল্পের ক্ষেত্রে এই কমিটি অদক্ষ শ্রমিকের ত্রিশ টাকা সর্বনিম্ন মূল বেতনের হার হিসাবে সুপারিশ করিয়াছিল। একই ধরণের কাজের জন্য স্ত্রী-শ্রমিক এবং পুরুষ-শ্রমিকের সমান বেতন হউক এই ধরণের মতবাদই অধিক লোক পছন্দ করেন। অবশ্য কিছু সংখ্যক লোক পার্থক্যকরণও সমর্থন করেন।

শিল্পে সর্বনিম্ন মজুরী হার প্রবর্তনের কিছু অসুবিধাও আছে। অকস্মাৎ এবং বাধ্যতামূলকভাবে সকল শিল্পে সর্বনিম্ন মজুরী আইন প্রয়োগ করা হইলে ব্যক্তিগত মূলধন বিনিয়োগের ইচ্ছা কমিয়া যাইতে পারে। ইহা দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী। সুতরাং সর্বনিম্ন মজুরী আইন দেশের শিল্পায়নের সহিত ধাপে ধাপে এবং ধীরে ধীরে প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এমন একটি মজুরিনীতি অবলম্বনের কথা বলা হইয়াছিল যাহার দ্বারা শ্রমিকেরা বর্ধিতহারে মজুরী পাইবে অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের ন্যায্য অংশ পাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ন্যায্য মজুরী পাইতে শ্রমিকের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় উহাকে কার্যকরী করার কথা বলা হইয়াছে।

লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা (Profit Sharing): লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা বলিতে বুঝায় যে নিয়োগকর্তা মজুরী ছাড়াও অতিরিক্ত লাভের (surplus profit) একটি অংশ শ্রমিকদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা সাধারণতঃ মালিক ও শ্রমিকের পূর্ব নির্দিষ্ট চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বোনাসের সহিত লভ্যাংশ

বাঁটোয়ারার পার্থক্য এই যে লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট চুক্তির ফল, অপরপক্ষে বোনাস দেওয়া মালিকের খেয়াল এবং শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে।

লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা সামাজিক সম-বিচারবোধ জাগ্রত করে, শ্রমিক-মালিকের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করে এবং শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা শিল্পে গণতান্ত্রিকতার প্রসার ঘটায়। ১৮২০ সালে প্রথম লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা ফ্রান্সে প্রবর্তিত হয়। পরে ১৮৭০ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইহা প্রচলিত হয়। ভারতে ১৯৩৭ সালে প্রথম টাটালৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ইহা প্রবর্তিত হয়।

১৯৩১ সালের রয়েল কমিশন (Royal Commission on Labour) ভারতীয় শিল্পে লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা সমর্থন করেন নাই। স্বাধীনতার পরে জাতীয় সরকার লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা-কমিটি নিয়োগ করেন—ওই কমিটি ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাহার রিপোর্ট দাখিল করে। এই কমিটি লভ্যাংশ বাঁটোয়ারাকে তিন দিক হইতে বিচার করিয়াছে—উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক, শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি এবং শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণের পদক্ষেপ হিসাবে।

রয়েল কমিশনের সুপারিশ

মূলধনের উপর ৬% হারকে মূলধনের ন্যায্য আয় (fair return to capital) বলা যায়। শ্রমিকের অংশ হইবে শিল্পের উদ্বৃত্ত লাভের ৫০%; উদ্বৃত্ত লাভ (surplus profit) পাওয়া যাইবে নীট লাভ হইতে ১০% সংরক্ষণ তহবিলের এবং ৬০% মূলধনের প্রাপ্য সুদ বাদ দিলে। কোনো শ্রমিকের লাভের অংশ হইবে পূর্বের বারো মাসের মূল বেতনের আনুপাতিক হার হিসাবে।

উৎপাদনের পরিমাণের হার হিসাবে লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা এই কমিটি সমর্থন করে নাই। যদিও ভেনেজুয়েলা, মেক্সিকো, প্যালেস্তাইন এবং নিউজিল্যাণ্ডে লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা আইন দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছে কিন্তু এতো অল্প সময়ের মধ্যে ঐ সকল দেশের অভিজ্ঞতা হইতে কিছু উপকার আশা করা যায় না। পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কমিটি ছয়টি বৃহদায়তন শিল্পে—কার্পাস শিল্প, পাটশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, টায়ারনির্মাণ শিল্প, সিগারেট শিল্প এবং সিমেণ্ট শিল্প—এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। এই কমিটির সকল সদস্য একমত হইতে পারেন নাই বলিয়া কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে কোনো স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

লভ্যাংশ বাঁটোয়ারার বৈশিষ্ট্য : প্রথমতঃ, ইহা সাধারণ মজুরীর একটি অতিরিক্ত ব্যবস্থা; দ্বিতীয়তঃ, ফার্মের মুনাফা নির্ধারণের বহু পূর্বেই শ্রমিকদের অংশ বরাদ্দ করা হয়; তৃতীয়তঃ, মালিকদের মূলধনের উপর লভ্যাংশ বরাদ্দের পর নীট মুনাফার যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাই পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

শ্রমিকগণ মুনাফার অংশ তিনভাবে পাইতে পারে : (১) নগদ টাকায় (২) শেয়ারে এবং (৩) ডিপোজিট অর্থাৎ প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সূত্রগুলির যে কোনো একটি প্রয়োগ করিয়া শ্রমিকদের প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করা হয়: (১) প্রতিটি শ্রমিকের বাৎসরিক মোট আয়ের অনুপাত; (২) প্রতিটি শ্রমিকের বাৎসরিক মোট কাজের সময়ের অনুপাত অথবা (৩) প্রতিটি শ্রমিকের মোট কার্যকালের অনুপাত।

লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা ব্যবস্থার কতকগুলি ত্রুটি রহিয়াছে: প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থা শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা কতোখানি বাড়াইবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। বৎসরের শেষে কিছু পরিমাণ লভ্যাংশ পাওয়া অপেক্ষা বর্ধিত হারে মজুরী পাইতেই শ্রমিকেরা অধিক পরিমাণে ইচ্ছুক। ইহা বোঝা কঠিন, যে শ্রমিক জীবনধারণের মতো মজুরী পাইতেছে না সে যদি বৎসরের শেষে কিছু পরিমাণ লাভের অংশ পায় তাহাতে তাহার অসন্তোষ করিবার সম্ভাবনা কোথায়? দ্বিতীয়তঃ, শিল্পে মুনাফার পরিমাণ অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে—শুধুমাত্র শ্রমিকের কর্মদক্ষতাই মুনাফা নির্ধারণ করে না। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেই মুনাফার পরিমাণ বাড়ে না, উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত সুদক্ষ পরিচালনা যুক্ত হইলে তবেই অধিক মুনাফা অর্জিত হয়। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত আর যে সকল বিষয়ের উপর মুনাফা নির্ভর করে সেই সকল বিষয় শ্রমিকের আয়ত্তের বাহিরে। শ্রমিক উৎপাদন বাড়াইল কিন্তু পরিচালকগণের দক্ষতার অভাবে কোনোরূপ মুনাফা হইবে না ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে শ্রমিকেরা। তৃতীয়তঃ, লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা হইতে লাভবান হয় উচ্চবেতনভোগী কর্মচারীরা কিন্তু সাধারণ মজুরেরা লাভবান হয় না। সাধারণ শ্রমিকেরা অশিক্ষিত এবং তাহারা লাভক্ষতির হিসাব বুঝিতে পারে না বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই তাহারা ন্যায্য প্রাপ্য মুনাফা হইতে বঞ্চিত হয়। শ্রমিকগণ অভিযোগ করিয়া থাকে যে লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা মালিকপক্ষের এমন একটি কৌশল যাহার দ্বারা তাহারা শ্রমিকদের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করে, শ্রমের গতিশীলতা হ্রাস করে এবং শ্রমিকের স্বাধীনতা খর্ব করে। ইহাছাড়া লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা প্রবর্তনের ফলে মূলধনের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাওয়ায় মূলধন শিল্প হইতে জমি এবং বিনিয়োগের অন্যান্য ক্ষেত্রে সরিয়া যাইবে।

লভ্যাংশ বাঁটোয়ারার অসুবিধা

কিন্তু এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা যে একটি শুভ আদর্শ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা কতখানি বাস্তবে প্রযোজ্য তাহা পরীক্ষা হইতে জানা যাইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনে এই ব্যবস্থা ইচ্ছামূলক এবং সেখানে ইহা বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। বর্তমানে কতকগুলি অনুন্নত দেশে ইহা বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার গুণ হইতেছে যে (১) ইহা উৎপাদন বৃদ্ধির একটি সহায়ক উপায়, (২) ইহা শ্রমিক এবং মূলধন-মালিকের স্বার্থের বিভেদ দূর করে; (৩) ইহা সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করে এবং শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক, (৪) ইহা ব্যয় সংকোচকে উৎসাহিত করে

এই ব্যবস্থার গুণ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা নীতি নির্ধারণ আরো অনুসন্ধানসাপেক্ষ এবং তাহার পর সকলের গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

১৯৬৭ সালে এম. আর. মেহেরের সভাপতিত্বে একটি বোনাস কমিশন গঠন করা হয় এবং ১৯৬৫ সালে এই কমিশন তাহার রিপোর্ট পেশ করে। এই কমিশনের প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নলিখিত রূপ :

(১) এতদিন পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মানুসারে শিল্পে মুনাফা হইলেই শ্রমিকেরা বোনাস পাইত। কিন্তু এই আইনে কোম্পানীর লাভ না হইলেও শ্রমিকের বাৎসরিক বেতনের ৪% বা ৪০ টাকা (যাহা বেশী হইবে) সর্বনিম্ন বোনাস হিসাবে পাইবে। বোনাসের সর্বোচ্চ সীমা হইবে বার্ষিক মূলবেতন এবং মহার্ঘ ভাতার ২০ ভাগ। যে শ্রমিক এক বৎসরের কম সময় কাজ করিয়াছে সে কার্যগত সময়ের অনুপাতে বোনাস পাইবে।[1]

(২) বোনাস নির্ধারণের জন্য কোম্পানীর মোট মুনাফা হইতে (ক) অবক্ষয়জনিত ব্যয় (depreciation costs) ও আয় কর (খ) সংরক্ষিত তহবিলের ৪% আয় এবং (গ) বিনিয়োজিত মূলধনের ৭% আয় বাদ দিতে হইবে। কোম্পানীর মোট মুনাফা হইতে ওই তিনটি খাতে প্রদেয় অর্থ বাদ দিলে অবশিষ্ট যে মুনাফা কোম্পানীর হাতে থাকিবে তাহার ৬০% শ্রমিকদের মধ্যে বোনাস হিসাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে আর বাকী ৪০% হইবে উদ্যোক্তাদের মুনাফা।

(৩) যেখানে শ্রমিকের মাসিক বেতন ৭৫০ টাকা অপেক্ষা অধিক সেই ক্ষেত্রে এরূপভাবে বোনাসের হিসাব করিতে হইবে যেন তাহার বেতন ৭৫০ টাকা। মাসিক ১৬০০ টাকা পর্যন্ত যাহাদের আয় তাহাদের মধ্যে বোনাস বণ্টন করিতে হইবে।

(৪) এই বোনাস আইন বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে এবং কিছু সংখ্যক সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য হইবে। নূতন প্রতিষ্ঠানকে প্রথম ছয় বৎসর বোনাস প্রদানের দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

শিল্পশ্রমিকের গৃহ সমস্যা (Problems of Industrial Housing) : অল্প ভাড়ায় শিল্প-শ্রমিকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা আজ সকলেই উপলব্ধি করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেও বড় বড় শিল্পোন্নত শহরে বাসগৃহের সমস্যা ছিল। শ্রমিকেরা বস্তির অস্বাস্থ্যকর, আলোবাতাসহীন পরিবেশের মধ্যে জীবন যাপন করিত। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া, বিশেষ করিয়া দেশ

1. Every employer shall be bound to pay to every employee who has worked in the establishment for all the working days in an accounting year a minimum bonus which shall be 4 per cent of the salary of the employee for the accounting year or Rs. 40 whichever is higher, whether there are profits in the accounting year or not.

বিভাগের পর হইতে শহরে বাসস্থানের অভাব তীব্রতর হইয়া দেখা দিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। ১৯৪১ সালের আদম সুমারীতে জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.৩% এবং ১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে উহার হার ছিল ১৩.৪% কিন্তু নগরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৩২% এবং ৫৪%. এই পরিসংখ্যান হইতে দেখা যাইতেছে যে তুলনামূলকভাবে গ্রাম অপেক্ষা নগরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক ছিল। দ্বিতীয়তঃ, দেশবিভাগের পর শরণার্থী সমস্যা দেখা দেয়। দেশ বিভাগের পর এক কোটি উদ্বাস্তু পাকিস্তান হইতে ভারতে আসেন এবং ইহাদের অধিকাংশই রুজি রোজগারের সুবিধার জন্যে নগরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত উদ্যোগে গৃহনির্মাণের সংখ্যা হ্রাস পায়। গৃহনির্মাণের মালমসলার অভাব ও দুর্মূল্যের জন্য এবং বাড়ী ভাড়ায় নানারকম সরকারী বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ায় বেসরকারী উদ্যোগে গৃহনির্মাণ হ্রাস পায়। বাসগৃহের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে কিন্তু যোগান স্থির থাকায় সমস্যা তীব্রতর রূপে দেখা দিয়াছে।

গৃহনির্মাণকারীদের পাঁচভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়ঃ (১) সরকার ও তাহার বিভিন্ন এজেন্সী, (২) শিল্পপতি, (৩) সমবায় গৃহ নির্মাণ সমিতি, (৪) বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং (৫) ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক গৃহ-নির্মাণ। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক গৃহনির্মাণ বর্তমানে হ্রাস পাইয়াছে অপরপক্ষে সরকার, শিল্পপতি এবং সমবায় সমিতির গৃহনির্মাণ কার্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গৃহনির্মাণ উৎসাহিত করিবার পথে নানারূপ বাধা রহিয়াছে। প্রথমতঃ, সর্বত্র জমির দাম এবং ইট, লোহা, সিমেণ্ট প্রভৃতি গৃহ নির্মাণের মালমসলার দাম অসম্ভব-রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। এই সকল দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধিতেও গৃহ-নির্মাণ কার্য অব্যাহত থাকিত যদি বেশী ভাড়ায় বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইত। কিন্তু গৃহনির্মাণ বৃদ্ধির আসল উদ্দেশ্য হইল শ্রমিক এবং অন্যান্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগণের জন্য ন্যায্যভাড়ায় বাসগৃহের ব্যবস্থা করা। গৃহনির্মাণ সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন গৃহনির্মাণের মালমসলার দাম কমানো, সুলভ পরিবর্ত দ্রব্যের ব্যবহার করা, কম খরচে গৃহ নির্মাণ করা এবং কম জায়গায় বেশী লোকবাস করিতে পারে এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

গৃহনির্মাণের অসুবিধা

রাজ্য সরকার বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নানা প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করিতেছেন। সরকার, শিল্প-মালিক এবং সমবায় সমিতি মুনাফার প্রতি কোনরূপ নজর না দিয়াই গৃহ নির্মাণ করেন কিন্তু যাহারা ভাড়া দিবার উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মাণ করে তাহারা সরকারের নিয়ন্ত্রণের দরুণ গৃহনির্মাণে অর্থ বিনিয়োগ করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছে না।

গৃহসমস্যার সহিত শ্রমিকের দক্ষতা বিশেষ ভাবে জড়িত। বাসগৃহের শোচনীয় অবস্থা নব জাগরিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের

মনোভাব সৃষ্টি করে। মনুষ্যবাসের অনুপোযোগী গৃহে বাস করিলে প্রথমে শ্রমিকেরা নিজেদের বিড়ম্বিত ভাগ্যকে অভিশাপ দেয় কিন্তু কিছুকাল পরে তাহারা সামাজিক বিচারবোধের জন্য মরিয়া হইয়া সংগ্রাম করে।

শ্রমিককে গ্রামাঞ্চল হইতে শিল্পাঞ্চলে লইয়া আসার জন্য শিল্প মালিকেরা দায়ী, সেইজন্য এই সকল শ্রমিকদের বাসগৃহের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব মালিকদের। মালিকেরা অদক্ষ শ্রমিক পছন্দ করে না। কিন্তু শ্রমিকের দক্ষতা বহুল পরিমাণে বাসগৃহের উপর নির্ভরশীল। গৃহ এবং স্বাস্থ্য পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর, আলোহীন এবং বায়ুহীন কক্ষে বাস করার জন্য কলেরা, বসন্ত, যক্ষা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ দেখা দেয় এবং এই সকল রোগ শ্রমিকের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া তাহাকে অদক্ষ করিয়া তোলে। উপযুক্ত বাসগৃহের অভাবে শ্রমিকেরা পরিবার গ্রামে রাখিয়া আসে এবং শহরে একা বাস করে। ইহার ফলে পরিবার দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায় এবং শিল্পাঞ্চলে স্ত্রী-পুরুষ অনুপাতে চরম বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে শহরে দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা, গণিকাবৃত্তি এবং যৌন ব্যাধির প্রসার হইতেছে এবং উহা ক্রমে নগর হইতে গ্রামে বিস্তার লাভ করিতেছে। জীবনীশক্তির অভাবে শ্রমিকেরা অদক্ষ হয়, ইহা ছাড়া গ্রামে পরিবার থাকার ফলে শ্রমিকেরা পরিবারের সহিত মিলিত হইবার জন্য মাঝে মাঝে গ্রামে যায় এবং কাজে অনুপস্থিত হয়। যদি ভালো বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে শ্রমিকদের কাজে অনুপস্থিতির হার কমানো যাইবে এবং উহাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। ছোট ছোট শিল্পপতিগণ তাহাদের শ্রমিকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে অক্ষম কিন্তু বড় বড় শিল্পপতিদের সম্পর্কে ইহা সত্য নয়। নগরাঞ্চলে কোনো কারখানা স্থাপিত হইলে কারখানার মালিকেরা তাহাদের সুদক্ষ শ্রমিকের জন্য গৃহ নির্মাণ করে কিন্তু সাধারণ মজুরদের জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করেনা।

বাসস্থান ও দক্ষতা

শ্রমিকদের বাসস্থানের সুব্যবস্থা করার দায়িত্ব মালিকেরা স্বীকার করেন। আবার ট্রেড ইউনিয়নও পছন্দ করে না যে মালিক শ্রমিকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করুক এই যুক্তিতে যে, যদি শ্রমিকেরা মালিক নির্মিত গৃহে বাস করে তাহা হইলে শ্রমিক আন্দোলনের উপর নানারূপ বিধিনিষেধ আসিয়া পড়িবে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সরকারের দায়িত্ব হইতেছে সুলভ ভাড়ায় শ্রমিকের বাসস্থানে সুব্যবস্থা করা। ১৯৪৯ সালে শ্রমমন্ত্রী একটি পরিকল্পনা তৈয়ারী করেন যাহার সাহায্যে গৃহ নির্মাণ ব্যয়ের ২/৩ ভাগ সুদবিহীন টাকা রাজ্য সরকার এবং রাজ্যসরকারে অনুমোদিত শিল্পপতিদের ধার দিবার ব্যবস্থা করা হয়। অবশিষ্ট ১/৩ অংশ রাজ্য সরকার এবং মালিকদিগকে দিতে হইবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সাবসিডাইজড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল হাউসিং স্কীম (Subsidised Industrial Housing Scheme) চালু করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তিন ধরণের গৃহ নির্মাণ-কারীগণ সরকারী সাহায্য ও ঋণ পাইবার অধিকারী (১) যে সকল গৃহ রাজ্য

সরকার অথবা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কর্তৃক নির্মিত হইবে (২) যে সকল গৃহ শ্রমিকদের সমবায় সমিতি কর্তৃক নির্মিত হইবে এবং (৩) যে সকল গৃহ শিল্প-মালিকগণ কর্তৃক তাহাদের শ্রমিকদের জন্য নির্মিত হইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার জন্য ৩৮·৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণ খাতে ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে বাগিচা শিল্পশ্রমিক আইন অনুসারে বাগিচাশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য এবং কয়লাখনিশিল্প কল্যাণ আইন, ১৯৭১ অনুসারে কয়লা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা মালিকের দায়িত্ব।

নগরাঞ্চলে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তৃতীয় এবং তৎপরবর্তী পরিকল্পনাসমূহে গৃহনির্মাণ নীতির তিনটি লক্ষ্য থাকিবে। প্রথমতঃ, গৃহনির্মাণ নীতি দেশের আর্থিক উন্নয়ন এবং শিল্পায়নের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হইবে। শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ গৃহসমস্যার সমাধানে সাহায্য করিবে। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী, বেসরকারী সকলপ্রকার গৃহনির্মাণ সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, দরিদ্র জনসাধারণের গৃহসমস্যা সমাধানের মূল লক্ষ্যে গৃহনির্মাণ পরিকল্পনাকে চালিত করিতে হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পশ্রমিক এবং স্বল্প আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহা বিস্তৃত হয় এবং বাগিচা শিল্প শ্রমিকদের জন্য গৃহনির্মাণ, গ্রামাঞ্চলে গৃহনির্মাণ এবং বস্তি উন্নয়ন ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ওই সকল কার্যক্রম আরোও বিস্তৃত করার নীতি গ্রহণ করা হয়। ইহা ছাড়া ডকশ্রমিক, রাস্তায় বসবাসকারী ব্যক্তি এবং সমাজের দরিদ্রতম ব্যক্তিদের জন্যও গৃহনির্মাণ কর্মসূচী এই পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা এবং শহরাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ১৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আশা করা হইয়াছে যে জীবনবীমা কর্পোরেশন গৃহনির্মাণ উন্নয়নের জন্য ৬০ কোটি টাকা দিবে।

এই সকল ব্যবস্থা ছাড়া কয়লা এবং অভ্র শিল্পের শ্রমিকদিগের জন্য, তপশীলভুক্ত এবং অনুন্নতশ্রেণীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন গৃহনির্মাণ কর্মসূচী অনুসারে তৃতীয় পরিকল্পনায় ৯০০০০০ গৃহ নির্মিত হইবে। আর এই সময় গৃহ নির্মাণখাতে বেসরকারী ব্যয় হইবে ১১২৫ কোটি টাকা।

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে শ্রমনীতি (Labour Policy under the Plans) ঃ সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে শ্রমনীতির উদ্দেশ্য হইবে একদিকে শ্রমিকের মঙ্গলবিধান ও অপরদিকে দেশের উন্নতিতে শ্রমিকের অবদান স্বীকার করা। শ্রমনীতির নিম্নলিখিত পাঁচটি উদ্দেশ্যে থাকা উচিত : (১) সর্বনিম্নমজুরী আইন প্রবর্তন করিয়া মালিকের শোষণ হইতে শ্রমিককে রক্ষা করা, (২) উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের ভূমিকাকে স্বীকার করা; (৩) শ্রমিকের প্রতি উপযুক্ত আচরণ, (৪) সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়া শ্রমিককে বিপদ এবং দায়ের হাত হইতে রক্ষা করা এবং

(৫) কার্য কমিটি ও যুক্ত পরিচালনা কাউন্সিল (Joint Management Council) সৃষ্টি করিয়া শিল্পে গণতান্ত্রিকতার প্রসার করা।

পরিকল্পনাধীন সময়ে শ্রমনীতি নির্ধারণের দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনের। শ্রমনীতির মূল উদ্দেশ্য হইল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এক গণতান্ত্রিক শিল্প সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা।

জাতির বৈষয়িক উন্নয়নে শ্রমিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনাকে সফল করিতে শ্রমিকের সহযোগিতা এবং অবদান অনস্বীকার্য। যাহাতে শ্রমিক জাতীয় অর্থনীতির উন্নতিতে পূর্ণসহযোগিতা করে সেই উদ্দেশ্যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমিকের প্রাপ্য অংশ তাহাকে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় শ্রমিকের অধিকার, শ্রমিকের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার এবং তাহার অভাবের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে শিল্প বিরোধ এরূপভাবে সমাধান করিতে হইবে যাহাতে শ্রমিক ন্যায় বিচার লাভ করে। প্রথম পরিকল্পনাধীনে সময়ে বিভিন্ন শ্রমসংক্রান্ত আইনগুলিকে কার্যকরী-করার উপর জোর দেওয়া হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় শ্রমনীতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহে ওই নীতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন হইবে না। তবে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠনের আদর্শ স্বীকৃত হওয়ায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শ্রমনীতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। শিল্পে গণতান্ত্রিকতার প্রসার সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ সংগঠনের অপরিহার্য সর্ত। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে শ্রমিকনীতির লক্ষ্য হইবে উৎপাদন অব্যাহত রাখা। শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা এবং উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হইবার জন্য ট্রেডইউনিয়নকে শক্তিশালী করিতে হইবে। শিল্পবিরোধ দেখা দিলে উহা যতদূর সম্ভব পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শ্রমিককে শিল্প পরিচালনায় অধিকতর অংশ দিবার অনুকূলে মত দেওয়া হইয়াছে। সকল সরকারী শিল্পে যুক্তপরিচালনা কাউন্সিল গঠন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী পাইবার অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে এবং যাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত মজুরী হারও বাড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মজুরীসংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য নির্দলীয় মজুরী বোর্ড গঠন করিতে হইবে। শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড পরিকল্পনাকে যতদূর সম্ভব নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

বিভিন্ন রাজ্যে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের (Labour Welfare Centre) প্রসার করিতে হইবে এবং কারখানায় কাজের পরিবেশের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শ্রমনীতিতে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনা হইল নিয়মানুবর্তিতা বিধি (Cole of Discipline) এবং আচরণ বিধি (Code of Conduct) প্রণয়ন এবং গ্রহণ।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে র‍্যাশানালাইজেশন যদি বেকার সমস্যার সৃষ্টি না করে তবেই উহা প্রবর্তন করা হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার শ্রমনীতিকেই অনুসরণ এবং দৃঢ় সংবদ্ধ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পনীতিতে নিয়মানুবর্তিতা বিধির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই সকল বিধি মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন অব্যাহত রাখা, মামলা পরিহার করা, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শিল্পবিরোধের মীমাংসা করা প্রভৃতি কতকগুলি দায়িত্ব আরোপ করিয়াছে।

শিল্পে কার্যকমিটি (Works Committee) এবং যুক্ত পরিচালনা কাউন্সিল গঠনকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে। সকল শিল্পে অভিযোগ জ্ঞাপক কার্যক্রম (grievance procedure) প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হইবে।

ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনকে জোরদার করিতে হইতে এবং বহিরাগত ব্যক্তিদের যতদূর সম্ভব ট্রেডইউনিয়ন হইতে অপসারিত করিতে হইবে। শ্রমিকদের শিক্ষার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা আরও সম্প্রসারিত করিতে হইবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য একটি কর্মদক্ষতা এবং কল্যাণবিধি (Code of Efficiency and Welfare) প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে মজুরীবোর্ড গঠনের জন্য প্রয়াস তৃতীয় পরিকল্পনার একটি লক্ষ্য। বোনাস সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসার জন্য ১৯৬৩ সালে একটি কমিশন নিয়োগ করা হয় এবং ওই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৬৫ সালে বোনাস আইন পাশ করা হইয়াছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করিতে হইবে। রাজ্য বীমা কর্পোরেশনকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে যাহাতে অধিক পরিমাণে শ্রমিক এই আইনের আওতায় আসিতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ৩০ লক্ষ শ্রমিক এই আইনের সুবিধা লাভ করিবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। বর্তমানে যাহাদের মাসিক বেতন অনধিক ৪০০ টাকা তাহারাই এই আইনের সুবিধা ভোগ করিতে পারে। যাহাদের মাসিক বেতন অনধিক ৫০০ টাকা তাহাদের ক্ষেত্রেও যাহাতে এই আইন প্রযোজ্য হইতে পারে তাহার জন্য আলোচনা চলিতেছে। ইহা ছাড়া শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্মাণ, আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা, সমবায়ের মাধ্যমে ঋণদান, গবেষণার প্রসার প্রভৃতি তৃতীয় পরিকল্পনার শ্রমনীতির অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় পরিকল্পনার শ্রমনীতিতে শুধুমাত্র শিল্পশ্রমিকের কথাই বলা হয় নাই, কৃষি-শ্রমিকও রহিয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিশ্রমিকদের অভাব এবং সমস্যা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইবে। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নতির প্রাপ্য অংশ যাহাতে কৃষিশ্রমিক পায় তাহারও ব্যবস্থা করার কথা পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বৈদেশিক মূলধন (Foreign Capital)

[**বিষয়বস্তু :** ভারতে বৈদেশিক মূলধনের বৈশিষ্ট্য, পরিমাণ, প্রকৃতি, প্রকারভেদ—বৈদেশিক মূলধনের স্বপক্ষে যুক্তি—বৈদেশিক মূলধনের বিপক্ষে যুক্তি—সরকারী নীতি]

ভারতে বৈদেশিক মূলধন সংক্রান্ত সাধারণ আলোচনা (General Discussion of Foreign Capital in India) : উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতে যে শিল্পায়ন স্বরু হয় তাহাতে বৈদেশিক মূলধনও উদ্যোগের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। চা, রবার, কফি, রেল পরিবহণ, খনি, পাট প্রভৃতি শিল্প বৈদেশিক মূলধন এবং উদ্যোগেই গড়িয়া ওঠে। এমন কি বর্তমান কালেও বৈদেশিক মূলধন দেশের বিভিন্ন শিল্পে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে।

বৈশিষ্ট্য : ভারতে বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের মোটামুটি তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, এদেশে বিনিয়োজিত মূলধনের প্রায় ৮০ ভাগ প্রত্যক্ষ মূলধন অর্থাৎ এই মূলধনের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্পের নিয়ন্ত্রণক্ষমতাও জড়িত থাকে। ১৯৬০ সালে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪৪৮ কোটি টাকা। দ্বিতীয়ত, এই বৈদেশিক মূলধনের অতি সামান্য অংশই প্রত্যক্ষ-উৎপাদন কার্যে বিনিয়োজিত হয়। অবশ্য বর্তমানে ভারী শিল্পেও বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োজিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ মোট বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের অধিকাংশই হইল বৃটিশ মূলধন।

পরিমাণ : প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতে বৃটিশ মূলধনের (মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রাক স্বাধীনতাযুগে ভারতে বৈদেশিক মূলধনের প্রায় সবটাই বৃটিশ মূলধন) আনুমানিক পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ কোটি পাউণ্ড। ১৯৩৩ সালে উহার পরিমাণ দাড়ায় ১০০ কোটি পাউণ্ডে। ১৯৭৮ সালের জুন মাসে, রিজার্ভব্যাঙ্কের হিসাবানুযায়ী, ভারতে মোট বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬৯০ কোটি টাকা। ১৯৭৮ সালে ভারতে বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের শতকরা ৮০ ভাগের মতো ছিল বৃটিশ মূলধন। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের হিসাবে দেখা যায় যে ভারতে বেসরকারী খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫৭১ কোটি টাকা—ইহার মধ্যে বৃটিশ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৯৮ কোটি টাকা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছিল ৬০ কোটি টাকা।

প্রকৃতি : পূর্বে বৈদেশিক মূলধন খনিশিল্প, বাগিচা শিল্প এবং রেলপথেই অধিক পরিমাণে বিনিয়োজিত হইয়াছিল। বৈদেশিক মূলধন প্রধানতঃ সেই সকল শিল্পে বিনিয়োজিত হইত যাহার উৎপাদিত সামগ্রী কাঁচামাল হিসাবে নিজের দেশে রপ্তানী করা হইত। বর্তমানে অবশ্য বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের প্রকৃতি দ্রুত রূপান্তরিত

হইতেছে। ১৯৫৮ সালে বিভিন্ন শিল্পে কত টাকা বিনিয়োগ করা হইয়াছিল তাহা জানিলে বৈদেশিক বিনিয়োগের স্বরূপ জানিতে পারা যাইবে।

(১) যন্ত্রশিল্প	৩৩৯ কোটি টাকা
(২) বাণিজ্য	৩০ " "
(৩) বাগিচা (plantation)	৯৬ " "
(৪) অর্থসম্বন্ধীয় ব্যবসা (financial)	২৩ " "
(৫) পরিবহন	৪৭ " "
(৬) খনি	১২ " "
(৭) বিবিধ	২৪ " "
মোট	৫৭১ " "

প্রকারভেদ : বৈদেশিক মূলধনের হিসাব করিবার সময় উহাকে পোর্টফোলিও (Portfolio) ও প্রত্যক্ষ (Direct)—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যে মূলধনের সহিত পরিচালনার ক্ষমতা জড়িত থাকে তাহাকে প্রত্যক্ষ মূলধন বলা হয়; আর যাহার সহিত পরিচালনার ক্ষমতা জড়িত থাকেনা তাহাকে পোর্টফোলিও মূলধন বলে। পোর্টফোলিও মূলধনকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়—ইকুইটি মূলধন (Equity Capital) এবং ক্রেডিটার মূলধন (Creditor Capital). ইকুইটি মূলধন ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করে কিন্তু ক্রেডিটর মূলধন ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করেনা। সাম্প্রতিককালে বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক মূলধনের অনুপাত হ্রাস ও সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত পোর্টফোলিও মূলধনের অনুপাত বৃদ্ধি পাইতেছে। বৈদেশিক মূলধনকে নানানীতি অনুসারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। নিম্নে একটি শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হইল :

বৈদেশিক মূলধন

- প্রত্যক্ষ (Direct) — পোর্টফোলিও
- ইকুইটি মূলধন — ক্রেডিটার মূলধন
- সরকারী ক্ষেত্রে নিযুক্ত মূলধন (Capital for Official Sector) — বেসরকারী ক্ষেত্রে নিযুক্ত মূলধন (Capital for Non Official Sector)
- ঋণ (Loans) — সাহায্য (Grants) — বিনিয়োগ (Investment)
- বৃটিশ — মার্কিন — রাশিয়ান (দেশগত বিভাগ)

বর্তমানে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বৈদেশিক ঋণ এবং মূলধন গ্রহণ করা হইতেছে। প্রথম পরিকল্পনায় ১৫৬ কোটি টাকা (৬·৬%) এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮০০ কোটি টাকা (১৬·৫%) ছিল বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ। তৃতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ। চতুর্থ পরিকল্পনায়ও বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ হইবে ৪৭০০ কোটি টাকা অর্থাৎ সরকারী খাতে মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ।

বৈদেশিক মূলধনের স্বপক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of Foreign Capital): সোভিয়েত রাশিয়া ব্যতীত প্রায় আর সকল অনুন্নত দেশ শিল্পোন্নয়ণের প্রাথমিক পর্যায়ে বৈদেশিক মূলধনের উপর নির্ভর করিয়াছে। অর্ধোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য সঞ্চয়ের স্বল্পতা, মূলধনী দ্রব্যের স্বল্পতা এবং কারিগরী দক্ষতার স্বল্পতা। ভারত অর্ধোন্নত দেশ এবং অর্ধোন্নত দেশের সকল বৈশিষ্ট্য তাহার রহিয়াছে। ভারতে সঞ্চয়ের পরিমাণ অতি অল্প। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবানুযায়ী ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে জাতীয় আয়ের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ সঞ্চয় হইয়াছিল অপরপক্ষে, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে সঞ্চয়ের অনুপাত জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ ভাগের মতো। ভারতে সঞ্চয় কম বলিয়া মূলধনও কম তাই দেশের দ্রুত উন্নতি সাধন করিতে হইলে বিদেশ হইতে মূলধন আমদানী করিয়া আভ্যন্তরীণ ঘাট্‌তি পূরণ করিতে হইবে। দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর থাকিতে পারে, প্রয়োজনীয় শ্রমিকও থাকিতে পারে কিন্তু মূলধনের অভাবে দ্রুতহারে শিল্পায়ন হইতে পারে না। ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, পাট শিল্প, রেলপথ নির্মাণ, এবং চা, কফি প্রভৃতি বাগিচা শিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে বৈদেশিক মূলধন।

দ্বিতীয়তঃ, বৈদেশিক মূলধন আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধির সহায়ক। বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে উৎপাদিত সম্পদের বৃহত্তর অংশ সুদ এবং মুনাফা হিসাবে বিদেশে চলিয়া যায়, ফলে জনসাধারণের মনে মূলধন গঠনের ইচ্ছা দৃঢ় হয়।

তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ সময়ে বৈদেশিক মূলধনের সহিত উন্নত ধরণের কারিগরী জ্ঞান (Technical Knowledge) দেশে আসিয়া থাকে। মূলধন অপেক্ষা বৈদেশিক কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কোনো অংশে কম নয়। প্রখ্যাত অথনীতিবিদ্‌ শ্রীভবতোষ দত্ত বলেন যে শিল্পজ্ঞানের অভাব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি রোধ করিয়া দিতে পারে।

চতুর্থতঃ, বৈদেশিক মূলধন শিল্পায়নের প্রাথমিক ঝুঁকি (Pioneering risk) বহন করে। প্রাথমিক অবস্থায় লাভ না হইয়া ক্ষতি হইতে পারে এবং বৈদেশিক মূলধন এই ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করিয়া শিল্পের ভিত্তি দৃঢ়তর করে।

পঞ্চমতঃ, শিল্পোন্নতির জন্য যন্ত্রপাতি আমদানী করিলে রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া উহার মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। ভারতে যে বিপুল পরিমাণ রপ্তানীর প্রয়োজন তাহার ফলে ভোগ্যবস্তুর সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিবে এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ,

বৃদ্ধি পাইবে। বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য গ্রহণ করিলে এই অসুবিধা লাঘব করা যায়।

বৈদেশিক মূলধনের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments Against Foreign Capital) ঃ বৈদেশিক মূলধনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুক্তি রাজনৈতিক। বৈদেশিক মূলধনের সঙ্গে আসে বৈদেশিক কর্তৃত্ব। বৈদেশিক মূলধন কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি করিয়া দেশীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়—দেশের সামগ্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উপর তাহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। চীনে বৈদেশিক মূলধন রাষ্ট্রশাসনকে করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য শিল্পোন্নতি ঘটিলে মোট উৎপাদিত সম্পদের একটি বৃহৎ অংশ সুদ এবং মুনাফা হিসাবে দেশের বাহিরে চলিয়া যায়। আবার বিদেশীরা কেবলমাত্র মুনাফার দিকে নজর রাখিয়া যথেচ্ছভাবে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে, ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষিত হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মূল শিল্পগুলি বিদেশীদের আয়ত্বে আসিলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে। রাষ্ট্রীয় অগ্রগতি ব্যাহত হইবার ভয়ে ভারতীয়েরা বৈদেশিক মূলধন সুনজরে দেখে নাই।

চতুর্থতঃ, সাধারণতঃ এই যুক্তি দেখানো হয় যে বৈদেশিক মূলধনের সহিত উন্নত কারিগরী শিল্পজ্ঞান দেশে আসে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিদেশীরা উন্নত শিল্পজ্ঞান নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে। দেশীয় লোকদিগকে উন্নত শিল্প শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিবার জন্য তাহারা অছিলা খোঁজে। পরাধীন ভারতে বৈদেশিক মূলধন দ্বারা পরিচালিত সকল প্রতিষ্ঠানেই ভারতীয়দের প্রতি বিভেদমূলক ব্যবহার করা হইত। ভারতীয়দের কোনো উচ্চপদ দেওয়া হইত না। মনে রাখা প্রয়োজন যে সোভিয়েত রাশিয়া তাহার শিল্পায়নের যুগে বিদেশ হইতে শিল্পজ্ঞান গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করে নাই। ফিসক্যাল কমিশন সেই কারণেই বলিয়াছে যে বিদেশ হইতে যেন কেবলমাত্র শিল্পজ্ঞানই আমদানী করা হয়।

ভারতে বৈদেশিক মূলধন আসিয়াছে বৈদেশিক প্রভুত্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ। ইহা পাট, কয়লা, চা, রেলপথ নির্মাণ ইত্যাদিতে বিনিয়োজিত হইয়াছে। বৃটিশেরা সেই সকল শিল্পে তাহাদের মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছিল যেখানে দ্রুত মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা ছিল এবং যে সকল শিল্পকে উন্নত করিলে এই দেশে তাহাদের প্রভুত্ব দৃঢ়তর হয়। ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তাহাদের লক্ষ্য বা কাম্য ছিল না এবং যেটুকু উন্নতি করিয়াছিল তাহা নিজেদের স্বার্থ বুঝিয়াই করিয়াছিল। তবে একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে ভারতে যেটুকু শিল্পায়ন হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে বৃটিশ মূলধন। কিন্তু যদি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৃটিশ মূলধন বিনিয়োজিত হইত তাহা হইলে দেশে শিল্পোন্নতি দ্রুততর হইত।

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের জনসাধারণ বৈদেশিক মূলধনকে সুনজরে দেখে নাই তাহার কয়েকটি যুক্তিপূর্ণ কারণ রহিয়াছে।

প্রথমতঃ, দেশের লোক দেখিল বিদেশীগণ, বিশেষ করিয়া বৃটিশেরা এদেশে প্রচুর মুনাফা অর্জন করিতেছে এবং বিদেশীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ভারত সরকার তাঁহাদিগকে নানাধরণের সুযোগ সুবিধা দিতেছে কিন্তু সরকার দেশীয় শিল্প-উদ্যোগের প্রতি উদাসীন।

দ্বিতীয়তঃ, বৈদেশিক মূলধন-পুষ্ট শিল্পের বড়বড় পদ বিদেশীরাই পাইত, ফলে স্বভাবতই দেশীয় লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়। ভারতীয়েরা দেখিল তাহাদের দেশে বিদেশীরা সকল সুযোগসুবিধা পাইতেছে—অথচ এ সকল তো তাহাদেরই পাইবার কথা, ফলে অসন্তোষ ঘনীভূত হইতে থাকে।

তৃতীয়তঃ, ডাঃ জ্ঞানচাঁদের মতানুসারে বৈদেশিক মূলধন ভারতের বহু শিল্পের উন্নতি করিয়াছে সত্য কিন্তু ইহাই আবার অতি পরিমাণে শিল্পক্ষমতার কেন্দ্রীভূত (extreme centralisation of industrial power) হওয়ার কারণ। বিদেশীদের নিকট হইতে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ ইহা শিখিয়াছে এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ দেশের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে।

চতুর্থতঃ, বৈদেশিক মূলধন ১৯২৩ সালের শুল্ক সংরক্ষণের (tariff protection) সকল সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যে (India) Limited কোম্পানী গঠন করিয়াছে। এই সংরক্ষণ ভারতীয় উদ্যোগকে দেওয়া হয় এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি ইহার সুযোগ গ্রহণ করে তবে দেশের লোক স্বভাবতই অসন্তুষ্ট হইবে।

কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর বৈদেশিক মূলধনের প্রতি আমাদের বিরূপ মনোভাব চলিয়া গিয়াছে এবং দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়াছে। ইহার কয়েকটি কারণ রহিয়াছে।

প্রথমতঃ, রাজনৈতিক ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। বৈদেশিক মূলধন এখন আর দেশে বৈদেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না। ইহার ক্ষতিকারক সম্ভাবনা বর্তমানে অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ইহা বর্তমানে সকলেই বুঝিতেছে যে দেশের শিল্পায়ন দ্রুততর করিতে হইলে শুধুমাত্র দেশীয় সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। দেশীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ সহসা দ্রুতহারে বাড়ানো যাইবে না কারণ ভারতে জীবনমাত্রার মান অত্যন্ত নীচু; সুতরাং শিল্পোন্নতির জন্য বৈদেশিক মূলধনের উপর কিছু পরিমাণে নির্ভর করিতেই হইবে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭৯০ কোটি টাকা – মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ৭·৩% মাত্র।

তৃতীয়তঃ, আধুনককালে বৈদেশিক মূলধন বিশ্বব্যাংকে (IBRD) অথবা আন্তর্জাতিক মনিটারী ফাণ্ড (IMF) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া দেশে আসে—উহা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, উহার রাজনৈতিক চরিত্র নাই।

চতুর্থতঃ, বৈদেশিক মূলধন আমদানীর প্রয়োজন রহিয়াছে কারণ উহার সহিত আসিবে উন্নততর শিল্প কৌশল। উন্নততর শিল্পকৌশল প্রয়োগ করিতে না পারিলে শিল্পোন্নতি দ্রুতহারে হইতে পারে না।

পঞ্চমতঃ, বৈদেশিক মুদ্রা সংকট অতিক্রম করিবার জন্য বৈদেশিক মূলধন প্রয়োজন। শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের সময় যদি বৈদেশিক মূলধন রপ্তানী শিল্প বা আমদানীশিল্প উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সংকট হ্রাস হইতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্ধোন্নত দেশের উন্নতির জন্য যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে বৈদেশিক মূলধন-বিনিয়োগ সম্পর্কে পূর্বে যে সন্দেহ এবং সংশয় ছিল তাহা দূর হইয়াছে।

বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি (Government's Policy towards Foreign Capital) বর্তমানে সরকার এবং শিল্পপতিদের চেষ্টা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন ভারতে আসিতেছে না তাহার কতকগুলি কারণ রহিয়াছেঃ (১) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা রহিয়াছে এবং বৈদেশিক-বিনিয়োগকারীগণ এ বিষয়ে নিশ্চিত নয় যে ভারতে তাহাদের মূলধন এবং স্বার্থ নিরাপদ থাকিবে। বিনিয়োগের ব্যাপারে নিরাপত্তা এবং মুনাফা এই দুইটি প্রধান বিবেচ্য এবং বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণ ওই দুই বিষয়েই সন্দিহান; (২) ভারতে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া যে পরিমাণ আয় হয় অন্যদেশে বিনিয়োগ করিলে বেশী আয় হয়, সেই কারণে বৈদেশিক মূলধন ভারতে আসিতে খুব আগ্রহশীল নয়; (৩) অতীতে ভারতে বৃটিশ মূলধনের পরিমাণই বেশী ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেনের আর্থিক অনটনের সৃষ্টি হয় ফলে ভারত এবং পৃথিবীর অন্যসকল দেশেই বৃটিশ মূলধনের পরিমাণ কমিতে থাকে। এখন ভারতের উন্নয়নের জন্য প্রচুর পরিমাণে মূলধন যোগান দেওয়া বৃটিশের পক্ষে সম্ভবপর নয়। বর্তমান পৃথিবীতে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ করিবার সামর্থ্য আছে আমেরিকার কিন্তু আমেরিকা এখনো ভারতে বিনিয়োগের অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে পারে নাই।

প্রাক-স্বাধীনতা-যুগে বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা হইল উহার নিসর্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত আগমন। প্রথম ফিসক্যাল কমিশন (১৯২১-২৩) এই মন্তব্য পোষণ করে যে, যদিও জনসাধারণ বৈদেশিক মূলধনকে সন্দেহের চোখে দেখে তথাপি দেশের উন্নতির জন্য বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মতে কেবলমাত্র সরকারী উদ্যোগেই বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োজিত হইবে, বে-সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে উহা বিনিয়োজিত হইবে না। দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের (১৯৪৯-৫০) মতে যে ক্ষেত্রে নূতন শিল্পোদ্যোগের জন্য আভ্যন্তরীণ মূলধন প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প সেই ক্ষেত্রেই বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করা যাইতে পারে।

১৯৪৮ এবং ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে সরকার বৈদেশিক মূলধন বাড়াইবার নীতিগ্রহণ করিয়াছেন। সকল ক্ষেত্রেই বৈদেশিক মূলধন দেশীয় মূলধনের পরিপূরক (supplementary) হইবে—পরিবর্ত (substitute) নয়। ইহা

স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হইয়াছে যে বৃহদায়তন শিল্পে নীতিগত ভাবে মালিকানা এবং পরিচালনার ভার থাকিবে ভারতীয়দের হাতে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ধরণের শিল্প পরিচালনার ভার বিদেশীদের হাতে দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু এই সর্ত থাকিবে যে ইহারা ভারতীয়গণকে শিখাইয়া তুলিবে এবং যাহাতে ভবিষ্যতে ভারতীয়েরাই এই সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রধান মন্ত্রী তাঁহার ঘোষণায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে (১) ভারতীয় এবং বিদেশী সকল শিল্পকেই ভারতের শিল্পনীতি মানিয়া চলিতে হইবে; (২) বিদেশী শিল্পের উপর সেই ধরণের কোনো বাধানিষেধ আরোপ করা হইবে না যাহা অনুরূপ ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়; (৩) দেশী এবং বিদেশী সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মের মধ্যে থাকিয়া বিদেশী শিল্প মুনাফা অর্জন করিতে পারিবে; (৪) যদি কোনো বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয়করণ করা হয় তাহা হইলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে এবং (৫) ভারত হইতে বিদেশে মুনাফা পাঠাইবার জন্য বর্তমানে যে সকল সুবিধা আছে তাহা সংকুচিত করা হইবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেসরকারী শিল্পে পরিচালনা এবং মূলধন সরবরাহ
(Industrial Management and Finance in the Private Sector)

[বিষয়বস্তু: ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা—ম্যানেজিং এজেন্টদের কার্যাবলী—ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার ত্রুটি—ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্কার—ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার ভবিষ্যৎ]

বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহ: ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা (Managing Agency System): ভারতীয় শিল্পের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা। বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ তিন উপায়ে পরিচালিত হয়—ব্যক্তিগত পরিচালনা, অংশীদারী পরিচালনা এবং যৌথ মূলধনী পরিচালনা। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান শেয়ার হোল্ডারদিগের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত ডিরেক্টার সভা কর্তৃক পরিচালিত হয় না—পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে ম্যানেজিং এজেন্ট নামে অভিহিত এক বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উপর। ম্যানেজিং এজেন্ট কোনো ব্যক্তি বা ফার্ম বা কোম্পানী যাহা চুক্তির বলে কোম্পানী পরিচালনা করিয়া থাকে এবং কোম্পানী ডিরেক্টারদিগের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। 1

1 "A managing agent is a person, firm or company entitled to the management of the whole affairs of the company and the control and direction of the directors except to the extent, if any, otherwise provided for in the agreement and includes anp person, firm or companyoccupying such pasition, by whatever name called."

ম্যানেজিং এজেণ্টরা নিজেরা মালিক না হইয়াও চুক্তির বলে কোনো কোম্পানী পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে। ("A managing agent is a person, firm or company in charge of the whole of the management of a company, but deriving his or its authority by virtue of an agreement with the company.") ম্যানেজিং এজেণ্টের মূল বৈশিষ্টাগুলি হইল (১) ম্যানেজিং এজেণ্ট কোম্পানীর একজন এজেণ্ট এবং কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীন, (২) তিনি কোম্পানীর কার্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত এজেণ্ট এবং (৩) তিনি এবং কোম্পানীর চুক্তির ফলে এজেন্সির সৃষ্টি হয়। কার্যতঃ দেখা যায় যে ম্যানেজিং এজেণ্টই আসল কর্মকর্তা এবং কোম্পানীর ডিরেক্টরদিগের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।

ম্যানেজিং এজেন্সির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

ভারতে দুই ধরণের ম্যানেজিং এজেণ্ট দেখিতে পাওয়া যায়—ইংরাজ ও ভারতীয়। এই দুই ধরণের প্রথার উৎপত্তি একভাবে হয় নাই। বৃটিশেরা আমাদের দেশে শিল্পের পথিকৃৎ এবং সেই কারণে তাহারাই ইহার উৎপত্তি ঘটায়। যখন বৃটিশ মূলধন মালিকেরা এদেশে মূলধন খাটাইতে লাগিল তখন একটা সমস্যা দেখা দিল—দৈনন্দিন পরিচালনার সমস্যা। ইংলণ্ড হইতে ভারতে মূলধন পাঠানো যায় কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা যায় না। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির দৈনন্দিন পরিচালনা ভার পড়িল ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভূতপূর্ব কর্মচারীবৃন্দ দ্বারা গঠিত এজেন্সি হাউস (Agency House) নামক প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর। এই এজেন্সি হাউস হইতেই ম্যানেজিং এজেন্সি কথাটির উৎপত্তি। ইউরোপীয়গণ সংখ্যায় অল্প এবং স্থায়ীভাবে এদেশে বসবাসের ইচ্ছা না থাকায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হইত। এই সমস্যা সমাধান করিবার জন্য ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথায় সৃষ্টি। ক্রমে মূলধন সরবরাহের দায়িত্বও ইহারা গ্রহণ করে। সুসংগঠিত মূলধন বাজারের অভাব, উদ্যোগ ও সুযোগ্য পরিচালকের অভাব এবং প্রোমোটিং হাউস (Promoting House), ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট প্রভৃতির অভাব হইতে ভারতীয় ম্যানেজিং এজেণ্টের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঠিক কোন্ সময় হইতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সঠিক জানা যায় না, তবে অনুমান করা হয় যে ১৮৩৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক অধিকার বিলোপ হইলে ইহাদের কার্যসুরু হয়।

দুই ধরণের ম্যানেজিং এজেণ্ট

ম্যানেজিং এজেণ্ট, ব্যক্তি, অংশীদারী কারবার অথবা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হইতে পারে। সাম্প্রতিককালে অংশীদার কারবারকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে পরিবর্তিত করিবার প্রবণতা দেখা যায়। বর্তমানে বিড়লা ব্রাদার্স লিমিটেড, সাহু-জৈন লিমিটেড, ডালমিয়া জৈন লিমিটেড প্রভৃতি প্রখ্যাত ম্যানেজিং হাউসগুলি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী।

স্থানগত বিচারে তিন ধরণের ম্যানেজিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠান আছে—বোম্বাই-প্রচলিত, কলিকাতা-প্রচলিত এবং আমেদাবাদ-প্রচলিত। এই তিন ধরণের

প্রতিষ্ঠানে মধ্যে যে পার্থক্য তাহা সংগঠনের খুঁটিনাটি লইয়া। আমেদাবাদে ম্যানেজিং এজেণ্ট সাধারণতঃ একজন ব্যক্তি, বোম্বাই-এ ম্যানেজিং এজেণ্ট অংশীদারী কারবার অথবা প্রাইভেট কোম্পানী এবং কলিকাতায় ম্যানেজিং এজেণ্ট সাধারণতঃ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী। বর্তমানে অবশ্য এই ধরণের পার্থক্যের বিশেষ মূল্য নাই কারণ তিন ধরণের ম্যানেজিং এজেণ্ট সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

স্থানগত শ্রেণীবিভাগ

ম্যানেজিং এজেণ্টদের কার্যাবলী (Functions and Merits of the System) ম্যানেজিং এজেণ্টদের কার্যাবলীকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ, ইহারা নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে এবং উদ্যোক্তার কাজ করিয়াছে। পরিকল্পনা, পরিচালনা, ঝুঁকিবহন, অর্থসংগ্রহ এবং ভবিষ্যৎসাফল্যের বিচার—উদ্যোক্তার এই পাঁচটি কাজই ইহারা করিয়াছে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় যে ধরণের প্রোমোটিং হাউস দেখিতে পাওয়া যায় ভারতে তাহা নাই। যখন কোনো নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে তখন বিনিয়োগকারীর মনে এই সন্দেহ এবং সংশয় থাকে যে ব্যবসায় ফেল হইলে তাহার মূলধন বিনষ্ট হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্যদেশে ইস্যু হাউস (Issue House) রহিয়াছে, ইহারা ঠিক সময়ে বাজারে শেয়ার উপস্থিত করে এবং আণ্ডার রাইটার (Under writer) রহিয়াছে যাহারা ভবিষ্যতে বিনিয়োগকারীর কাছে বিক্রয়ের আশায় শেয়ার ক্রয় করে।

কিন্তু ভারতে এই ধরণের কোনো সংগঠন নাই, ইহাদের কাজগুলি ম্যানেজিং এজেণ্টরাই করিয়া আসিয়াছে। এই ম্যানেজিং এজেণ্টদিগের প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগেই কার্পাস, লৌহ-ইস্পাত, সিমেণ্ট প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রতিককালে ইহারা ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল এবং অটোমোবিল শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। ভারতীয় শিল্পোন্নয়নে ম্যানেজিং এজেণ্টদের ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া ফিসক্যাল কমিশন বলিয়াছে যে বিগত ৭৫ বৎসরে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা ভারতীয় শিল্পায়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। শিল্পায়নের প্রাথমিক যুগে যখন মূলধন এবং উদ্যোগ কোনোটাই পর্যাপ্ত ছিল না, সেই সময় ম্যানেজিং এজেণ্টরাই মূলধন এবং উদ্যোগ দুইই সরবরাহ করিয়াছে এবং ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি ম্যানেজিং এজেণ্টদের উৎসাহ এবং সযত্ন লালনের জন্যই বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছে। (1)

বর্তমানে অবশ্য কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ম্যানেজিং এজেণ্টদের ভূমিকার গুরুত্ব ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। ১৯৫৬ সালে এদেশে নূতন প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীগুলির মধ্যে মাত্র শতকরা ২ ভাগ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ছিল ম্যানেজিং এজেণ্টগণ।

1."The managing agency system has rendered signal service to Indian industries during the last 75 years. In the early days of industrialisation when neither enterprise nor capital was plentiful,the managing agents provided both and Inda's well established industries owe their present position to the pioneering zeal and fostering care of several well known managing agency houses."

দ্বিতীয়তঃ, ম্যানেজিং এজেন্টগণ শিল্পে স্থায়ী এবং চলতি মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকে। ভারতে সুসংগঠিত মূলধন বাজার ছিল না,জনসাধারণের বিনিয়োগের ক্ষমতাও অতি কম ছিল। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পের প্রয়োজনীয় মূলধনের একটি বিরাট অংশ ম্যানেজিং এজেন্সিগুলি দিয়াছে। ঋণ এবং শেয়ার ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া ইহারা মূলধনের যোগান দিয়াছে। ম্যানেজিং এজেন্টরা তাহাদের বন্ধু এবং আত্মীয়দের কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিতে উৎসাহিত করিয়াছে। ইহারা ঋণের গ্যারান্টি দেওয়ায় জনসাধারণের আমানত লগ্নীর পথ সহজ হয়। নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ডিবেঞ্চার বিক্রয় ক'রয়া দিয়া ম্যানেজিং এজেন্টগণ বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করিয়াছে। ম্যানেজিং এজেন্টদের বাজারে সুনাম থাকায় আজও কোনো ম্যানেজিং এজেন্টের নাম জড়িত থাকিলে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা সহজ হয়। শিল্পে র‍্যাশানালাইজেশন করার প্রয়োজনীয় অর্থও ম্যানেজিং এজেন্টগণ দিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ম্যানেজিং এজেন্টগণ সরাসরি শিল্পের ⅙ অংশ অর্থ যোগান দিত।

দুইজন জামিন না থাকিলে সাধারণতঃ ব্যাংক ঋণ দিতে চায় না, ম্যানেজিং এজেন্ট-গণ দ্বিতীয় জামিন থাকেন। মন্দার সময় যখন অন্য কোনো উৎস হইতে মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয় না, তখন ম্যানেজিং এজেন্টরাই মূলধনের যোগান দিয়া থাকে। কোম্পানী ল কমিটি (Company Law Committee) যথার্থ বলিয়াছে যে জন-সাধারণের সঞ্চয় শিল্পে আকৃষ্ট করিতে ইহারা এখনো সক্ষম ('they are still a potent instrument for tapping the spring of private enterprise.")

অবশ্য সাম্প্রতিককালে মূলধন বাজারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে ঋণদাতা হিসাবে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার গুরুত্ব ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে।

তৃতীয়তঃ, দৈনন্দিন শিল্প পরিচালনায় ম্যানেজিং এজেন্টগণ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ম্যানেজিং এজেন্টগণ শুধুমাত্র শেয়ার বিক্রয় করিয়া একটি কোম্পানীকে দাঁড় করাইয়া দিবার দায়িত্বই গ্রহণ করে না, শিল্প প্রতিষ্ঠানটির সুষ্ঠ পরি-চালনার ভারও গ্রহণ করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে সুষ্ঠ পরিচালনা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। এই কারণে বহুক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্টগণ মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ উভয়ই করায়ত্ত করিয়াছে। অনেকগুলি শিল্প ম্যানেজিং এজেন্টদের হাতে থাকায় প্রত্যেকটি ফার্মে-ই পরিচালনাগত ব্যয় সংকোচন সম্ভব হয়। ম্যানেজিং এজেন্টগণ তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানীর দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে। অনেক সময় ম্যানেজিং এজেন্টরা অনেক দ্রব্যসামগ্রী আমদানি ও রপ্তানি করিয়া থাকে এবং পাইকারী ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধা পাইয়া থাকে। ইহা ছাড়া এক ম্যানেজিং এজেন্ট যখন একাধিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিয়া থাকে, প্রতিযোগিতাজনিত অপচয় দূর হয়। কোনো ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিশেষজ্ঞ (expert) রাখা ব্যয়বহুল বলিয়া সম্ভবপর হয় না কিন্তু যেহেতু ম্যানেজিং এজেন্টরা একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে সেই কারণে তাহারা প্রথমশ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার এবং

টেকনিসিয়ান রাখিতে সক্ষম হয় এবং অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যয়ভার ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া প্রতিটি কোম্পানীর ব্যয় কম হয়।

ম্যানেজিং এজেন্সির ত্রুটি (Defect of the Managing Agency System)ঃ এই ব্যবস্থার ত্রুটিও অনেক। দেশের প্রাথমিক অবস্থায় ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা শিল্পোন্নয়নকে সহায়তা করিলেও ক্রমে এই পদ্ধতিতে নানাপ্রকার দোষ ত্রুটি দেখা দিতে থাকে। সমালোচকদের মতে এক সময় হয়ত ইহার প্রয়োজন ছিল কিন্তু আজ আর নাই ("the system has outlived its utility.")। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির ভাষায় "the system is rotton, root and branch, leaf and bark and blossom." ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি উল্লেখ করা হয়ঃ

প্রথমতঃ, ম্যানেজিং এজেন্টগণ যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন তীব্রভাবে তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়। ম্যানেজিং এজেন্টগণ দুইভাবে অর্থ পাইয়া থাকেন—কোম্পানীর বাৎসরিক নীট মুনাফার উপর নির্দিষ্ট হারে কমিশন পান এবং অফিস পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পান। কর অনুসন্ধান কমিশন (১৯৫৫) দেখাইয়াছেন যে ১৯৫১ সালে ম্যানেজিং এজেন্টরা কোম্পানীর মুনাফার অর্ধেক আত্মসাৎ করিয়াছে। উপযুক্ত পরিমাণ মুনাফা না হইলে ম্যানেজিং এজেন্টগণ চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন কমিশন পাইয়া থাকেন। কোম্পানী ল কমিটির মতে কখনো কখনো এই সর্বনিম্ন পারিশ্রমিক প্রয়োজনাতিরিক্ত এবং ইহা কখনো ৫০,০০০ টাকার বেশী যাহাতে না হইতে পারে এই কমিটি তাহার নির্দেশ দিয়াছে। ইহা ছাড়া অফিস পরিচালনার নাম করিয়া ম্যানেজিং এজেন্টগণ প্রকৃত ব্যয় অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা আদায় করিত। কোম্পানী ল কমিটি নির্দেশ দিয়াছেন যে ম্যানেজিং এজেন্টরা অফিস এলাওয়েন্স পাইবেন না—কোম্পানীর জন্য যে পরিমাণ টাকা তাহারা খরচ করে তাহাই মাত্র পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, একই ম্যানেজিং এজেন্সীর অধীনে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকায় এক প্রতিষ্ঠানের মূলধন অপর প্রতিষ্ঠানে লগ্নী করা হইয়া থাকে। এইরূপ করিবার ফলে অনেক দক্ষ কোম্পানীও দুর্বল হইয়া পড়ে। দক্ষ প্রতিষ্ঠানের মূলধনের একাংশ দুর্বল প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের ফলে যদি ক্ষতি হয় তাহা হইলে সেই ক্ষতি দক্ষ প্রতিষ্ঠানকেও দুর্বল করিয়া তোলে। ইহা ছাড়া নিজেদের স্বার্থে কোম্পানীর অর্থ লইয়া ফটকাবাজী করিতেও ম্যানেজিং এজেন্টগণ ইতস্ততঃ করে নাই।

তৃতীয়তঃ, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার দরুণ শিল্পক্ষেত্রে লগ্নীকৃত মূলধনের এক বিশাল অংশ এবং বহুসংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভার কয়েকটি লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের নয় দশটি ম্যানেজিং এজেন্ট অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিজেদের আয়ত্বে রাখিয়াছে। ফলে শিল্পে গণতন্ত্র প্রসারে ইহা একটি বিরাট বাধার সৃষ্টি করিয়াছে।

চতুর্থতঃ, অধ্যাপক লোকনাথন বলিয়াছেন যে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার দরুণ অর্থ শিল্পের ভৃত্য না হইয়া প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ম্যানেজিং এজেন্সির হাতে শিল্প

পরিচালনার ভার তুলিয়া দেওয়া হয় তাহার কারণ তাহারা দক্ষ বলিয়া নয়—অর্থের যোগানদার বলিয়া।

পঞ্চমতঃ, ম্যানেজিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার অধিকার সাধারণতঃ উত্তরাধিকার সূত্র ধরিয়া চলিয়াছে। দক্ষ পরিচালকের পুত্র যে পিতার পরিচালনার যোগ্যতা লাভ করিবে তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। ফলে ক্রমশই এই প্রথায় দক্ষতার মান নামিয়া যাইতেছে।

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার সংস্কার (Reform of the Managing Agency System) : ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার উল্লিখিত দোষসমূহ দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন ১৯৩৬ সালে সংশোধন করা হয়। এই সংশোধিত আইন অনুসারে ২০ বৎসরের অধিককালের জন্য কোনো ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত করা যাইবে না। কোম্পানীর ডিরেক্টর সভার মোট ⅓ অংশের বেশী সভ্য ম্যানেজিং এজেন্টগণ কর্তৃক মনোনীত করা যাইবে না, এক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োজিত মূলধন অপর প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা যাইবে না, কোনো ব্যাংকিং বা বীমা কোম্পানীতে কোনো ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত করা চলিবে না—প্রভৃতি বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া ম্যানেজিং এজেন্সির নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই আইন কাম্য সংস্কার সাধন করিতে পারে নাই। স্বাধীনতালাভের পর ভারত সরকার কোম্পানী ল কমিটি (Company Law Committee) নামে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। ইহা ভাবা কমিটি নামেও খ্যাত। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার ভাবা কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া কোম্পানী আইন (Companies Act, 1956) পাশ করেন। এই আইনের সর্তানুসারে কবে হইতে কোন্ শিল্পে আর ম্যানেজিং এজেন্ট থাকিতে পারিবে না তাহা কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করিতে পারিবেন। ১৯৬০ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারতে যে সকল ম্যানেজিং এজেন্ট আছে, তাহাদের পুনর্নিয়োগ না হইলে মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে। সরকার নির্দেশিত বিশেষ বিশেষ ব্যবসায় এবং শিল্পে ম্যানেজিং এজেন্সি থাকিবেই না। যে সকল প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং এজেন্সি থাকিতে পারিবে সেখানে নূতনভাবে ম্যানেজিং এজেন্টস নিয়োগ করিতে হইলে একসঙ্গে ১৫ বৎসরের অধিককালের জন্য কোনো ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগ করা যাইবে না। ১৯৬০ সালের ১৫-ই আগস্টের পর কেহ ১০টির বেশী কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট থাকিতে পারিবে না অথবা ম্যানেজিং এজেন্ট এক কোম্পানীর মূলধন অপর কোম্পানীতে ব্যয় করিতে পারিবে না। ম্যানেজিং এজেন্টদের পারিশ্রমিক কোম্পানীর নীট মুনাফার ১০%-এর বেশী হইতে পারিবে না। আলাদা করিয়া কোনো আফিস এ্যালাওয়েন্স পাইবে না, প্রকৃত খরচ পাইবে। ১৯৫৬ সালের আইনে কোম্পানীগুলির পরিচালনা সম্পর্কেও নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। বোর্ড অব ডিরেক্টরদের হাতেও পরিচালনার আংশিক ক্ষমতা এই আইনে স্বীকার করা হইয়াছে। বোর্ড অব ডাইরেক্টর-এর সভ্যসংখ্যা ৫ হইলে একজন এবং উহার

বেশী হইলে দুইজন সদস্য ম্যানেজিং এজেন্টগণ কর্তৃক মনোনীত হইতে পারিবে। ম্যানেজি এজেন্টগণ অন্যূন ৫০,০০০ টাকা ও সর্বাধিক কোম্পানীর মুনাফার শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত পারিশ্রমিকের অধিকারী হইবে। ম্যানেজিং এজেন্ট অধীনস্থ কোনো কোম্পানীর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না। উত্তরাধিকারী সূত্রে ম্যানেজিং এজেন্সি লাভ করিতে হইলে এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইতে হইবে।

ম্যানেজিং এজেন্সির প্রথার ভবিষ্যৎ (Future of the Managing Agency System): ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার দোষ ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াই জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি এই প্রথার অবসান চাহিয়াছে ("The system must be abolished at the first opportunity so that no ground can remain for any preposterious claims being made by its advocates on the ground of industrial finance.") রুফ কমিটির মতে অতীতে দেশের শিল্পায়নে এই প্রথার যথেষ্ট অবদান থাকিলেও এই ব্যবস্থার কুফলের জন্য বিনিয়োগকরীর আস্থা কমিয়া গিয়াছে এবং ইহা মূলধন গঠনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে। এই ব্যবস্থাকে শিল্পগত সামন্ততন্ত্র (industrial feudalism) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং জমিদারী প্রথার সহিত ইহাকেও দেশ হইতে উচ্ছেদ করার কথা বলা হইয়াছে--"The system should go lock, stock and barrel".

বর্তমানে ম্যানেজিং এজেন্টদের ত্রিবিধ কার্যাবলীর গুরুত্বই হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে সরকারের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্য উদ্যোক্তার কাজের জন্য ম্যানেজিং এজেন্টদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। আবার ভারতে মূলধন বাজারের প্রসারের সাথে সাথে ঋণদাতা হিসাবেও ম্যানেজিং এজেন্টদের গুরুত্ব কমিয়া যাইতেছে।

এইরূপ অবস্থায় ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার ভবিষ্যতের দুইটি পথ খোলা রহিয়াছে —হয় কাম্যসংস্কারের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সমাজের সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া টিঁকিয়া থাকিতে হইবে নতুবা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে হইবে। উচ্ছেদের চরম নীতি অবলম্বন না করিয়া প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন করিয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমাদের মনে হয়।

বোম্বাই মিলমালিক এসোসিয়েসনের মতে বর্তমানে এই ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখা প্রয়োজন।[1] কোম্পানী ল কমিটি (১৯৫০) যথার্থই সুপারিশ করিয়াছেন যে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার উপর নির্ভর করিয়া থাকা সুবিধাজনক। ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার কুফল দূর করিতে পারিলে এই

1 "The necessity of Managing Agency System arises from the fact that it is impossible in the present state of banking in this country to find either the share capital at the start or the other finance necessary to run a particular concern, unless it is backed up by a firm of substantial resources."

প্রথার দ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইবে। ম্যানেজিং এজেন্সির উপর নূতন কোম্পানী আইনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে যতদিন পর্যন্ত না কোনো পূর্ণাঙ্গ বিকল্প ব্যবস্থার সৃষ্টি করা যায় ততদিন পর্যন্ত এই প্রথাকে আমরা বাতিল করিয়া দিতে পারি না।

সপ্তম অধ্যায়

শিল্প-মূলধন (Industrial Finance)

[বিষয়বস্তু : ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন—রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন—জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন—শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন—জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন—পুনঃ অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন—ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া—ভারতীয় শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক]

বে-সরকারী শিল্পের মূলধন (Industrial Finance in the Private Sector) : শিল্পোন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক মূলধনের দুষ্প্রাপ্যতা। সাম্প্রতিককালে দেশের বে-সরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধনের অভাব দূর করিবার জন্য সরকার কতকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। ক্ষুদ্রশিল্প, মাঝারিশিল্প এবং বৃহদায়তন শিল্পসমূহকে দীর্ঘকালীন এবং মধ্যমেয়াদী ঋণ দিবার জন্য অনেকগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা হইল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন, শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন, জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন, রি-ফিনান্স কর্পোরেশন, ইউনিট ট্রাস্ট এবং শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক। নিম্নে ইহাদের প্রত্যেকটির বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

[এক] ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন (Industrial Finance Corporation) : দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাওয়া না যাইলে দ্রুত শিল্পায়ন প্রায় অসম্ভব, ভারতীয় জয়েণ্ট স্টক ব্যাংকগুলি সাধারণতঃ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয় না। ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট বা ইস্যু হাউস ভারতে নাই বলিলেই চলে, স্বাধীনতার পর শিল্পের মূলধন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে একটি আইন পাশ করিয়া ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন নামক একটি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী ঋণসরবরাহের উদ্দেশ্যেই ইহা গঠিত হয়। এই সংস্থা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণসরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করে না কারণ ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে।

গঠন (Constitution) : এই কর্পোরেশনটির অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা। ইহা পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের ২০ হাজার শেয়ারে সমানভাবে বিভক্ত। বর্তমানে আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ পাঁচ কোটি টাকা। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানসমূহই (institutions) ইহার শেয়ার কিনিতে পারে। আইননির্দিষ্ট অনুপাত অনুযায়ী

কেন্দ্রীয়সরকার, রিজার্ভব্যাংক, বীমা কোম্পানী, ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট ও কো-অপারেটিভ মিলিয়া ইহার শেয়ার ক্রয় করিবে। যে অনুপাতে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি শেয়ার ক্রয় করিয়াছে তাহা এইরূপ : কেন্দ্রীয় সরকার ২০%; রিজার্ভ ব্যাংক ২০%; তপশীলভুক্ত ব্যাংক ২৫%, বীমা কোম্পানী, ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট এবং অনুরূপ সংগঠন ২৫%; সমবায় ব্যাংক ১০%। কেন্দ্রীয় সরকার শেয়ার মূলধনের মূল্য ফেরৎ এবং শেয়ারগুলির উপর ২½% হারে (করমুক্ত) ডিভিডেণ্ড দিতে জামিন থাকেন। আদায়ীকৃত মূলধন ও সঞ্চিত অর্থের দশগুণ পর্যন্ত ঋণ করিবার ক্ষমতা কর্পোরেশনের রহিয়াছে। এই ঋণ সাধারণতঃ বণ্ড ও ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে করা হইবে। ইহাদের সম্বন্ধেও কেন্দ্রীয় সরকার জামিন দিয়া থাকেন এবং এই বণ্ড ও ডিবেঞ্চার সাধারণেও ক্রয় করিতে পারেন।

এই কর্পোরেশনের পরিচালনার ভার ১২ জন পরিচালক লইয়া গঠিত একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকে। এই পরিচালকমণ্ডলী কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশানুসারে কাজ করিয়া থাকেন।

কার্যাবলী (Functions) : এই কর্পোরেশন তিন ধরণের কাজ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ, ইহা ঋণদান, অগ্রিম অর্থ সাহায্যদান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া বৃহদায়তন শিল্পগুলিকে সাহায্য করে। কর্পোরেশন কেবলমাত্র পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, জাহাজী কোম্পানী অথবা সমবায় সমিতিকেই ঋণ দিবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি ২৫ বৎসরের মধ্যে এই সকল ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ টাকার বাজার হইতে যে ঋণসংগ্রহ করে তাহার মেয়াদ ২৫ বৎসরের অধিক না হইলে কর্পোরেশন সেই ঋণ সম্পর্কে গ্যারাণ্টি দিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, যদি কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বাজারে ছাড়িতে চায় তাহা হইলে কর্পোরেশন উহার আণ্ডাররাইট (underwrite) কার্য সম্পাদন করিতে পারে। এই সকল কাজের ফলে যে সকল শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইহার হস্তগত হইবে সাত বৎসরের মধ্যে তাহা হস্তান্তরিত করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, ১৯৫৮ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে ভারতীয় আমদানীকারীগণ বিদেশ হইতে মাল কিনিলে কর্পোরেশন এই সম্বন্ধেও জামিন থাকিতে পারে। এই কর্পোরেশন কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হইতে পারিবে না এবং ইহা কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিক মূলধন বা equity capital ঋণ হিসাবে দিতে পারিবে না। কর্পোরেশন প্রথমে ঋণের উপর ৫½% হারে সুদ লইত। বর্তমান সুদের হার ৭%।

পঞ্চমতঃ, এই কর্পোরেশন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে উহার প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে।

১৯৫১, ১৯৫৩, ১৯৫৫ এবং ১৯৫৮ সালে ১৯৪৮ সালের IFC আইনের সংশোধন করা হইয়াছে। প্রথম সংশোধনের ফলে ইহার কার্য-পরিধি বিস্তৃত হয়। প্রথমতঃ, পূর্বে জাহাজী কোম্পানীগুলি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সংশোধনী আইনে জাহাজী কোম্পানীগুলিকে ঋণ দেওয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পূর্বে ইহা কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ দিতে পারিত না, বর্তমানে উহা বৃদ্ধি করিয়া এক কোটি করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, কর্পোরেশনকে বিশ্ব-ব্যাংক ৮০ লক্ষ ডলার ঋণগ্রহণ করিবার এবং রিজার্ভ ব্যাংক হইতে মোট তিন কোটি টাকা ঋণগ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থতঃ, ১৯৫৮ সালের সংশোধনী আইনের দ্বারা কর্পোরেশনের ঋণগ্রহণের ক্ষমতা আদায়ীকৃত মূলধন ও সঞ্চিত তহবিলের ৫ গুণ হইতে বাড়াইয়া ১০ গুণ করা হইয়াছে। ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৮ সালের মার্চমাস পর্যন্ত এই কর্পোরেশন প্রায় ৫৮ কোটি টাকা ঋণদান করিয়াছে।

সমালোচনা (Criticism): কর্পোরেশনের কার্য সম্পাদনে নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যুতির অভিযোগ আসিলে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর সভাপতিত্বে ১৯৫২ সালে একটি 'অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৯৫৩ সালে ঐ কমিটি তাহার রিপোর্ট' দাখিল করে। এই কমিটির সুপারিশগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—শাসনবিষয়ক (Administrative), কার্যক্রমবিষয়ক (Procedural) এবং নীতি বিষয়ক (Policy matters).

শাসনবিষয়ক: পুরা সময়ের (full time) জন্য একজন বেতনভোগী চেয়ারম্যান রাখিতে হইবে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরদের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে ক্ষমতা বণ্টিত থাকিবে এবং তাহাদের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা চলিবে না। শিল্পপতিগণ যাহাতে কর্পোরেশনে প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে তাহা দেখিতে হইবে। কর্পোরেশনের বোর্ডে একজন অর্থনীতিবিদ, একজন অভিজ্ঞ ম্যানেজার ও একজন চার্টার্ড একাউনট্যাণ্ট রাখিতে হইবে।

কার্যক্রমবিষয়ক: কর্পোরেশনের ডিরেক্টরগণ যে সকল কোম্পানীর সাধারণ ডিরেক্টর বা অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডার সেই কোম্পানী ঋণ পাইবে না। কিন্তু কর্পোরেশনের ডিরেক্টর যদি কোনো কোম্পানীর সাধারণ ডিরেক্টর বা শেয়ারহোল্ডার হয় তাহা হইলে ⅔ অংশের উপস্থিতিতে সর্বসম্মত ভোটে প্রস্তাব পাশ হইলে সেই কোম্পানী ঋণ পাইবে। ঋণদানের ব্যাপারে অযথা বিলম্ব দূর করিতে হইবে এবং ঋণের অন্ততঃ ৫০% মূল্য বন্ধক রাখিতে হইবে।

নীতিবিষয়ক: পরিকল্পনায় শিল্প উন্নয়নের যে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া কর্পোরেশনের নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে। যে সকল শিল্পে উন্নতি চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে সেই সব শিল্পে কোনো ঋণ দেওয়া হইবে না। কোন্ নীতি কর্পোরেশন কর্তৃক অনুসৃত হইবে সে সম্পর্কে সরকার কর্পোরেশনকে নির্দেশ দিবে। ৫০ লক্ষ টাকার বেশী ঋণ হইলে উহা কেন্দ্রীয়

সরকারের মন্ত্রীদের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠাইতে হইবে। পার্লামেন্টের সদস্যগণ কর্তৃক কর্পোরেশনের দৈনন্দিন কাজে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ কমাইতে হইবে।

মোটামুটিভাবে ভারত সরকার এই কমিটির সুপারিশ মানিয়া লইয়া কর্পোরেশনের সংস্কার করিয়াছেন।

বে-সরকারী মহলে এই কর্পোরেশনের কাজের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করা হয় তাহা এই:—প্রথমতঃ, ঋণদানে অত্যন্ত বিলম্ব হয়; ইহার উত্তরে কর্পোরেশন বলেন যে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাইতে ব্যবসায়ীদের বিলম্বই ইহার কারণ। দ্বিতীয়তঃ, ঋণের জন্য সুদের হার (৭%, অবশ্য চুক্তিমত যথাসময়ে পরিশোধ করিলে ½% টাকা রিবেট দেওয়া হয়) অত্যধিক। কিন্তু বলা যায় যে বাজারে প্রচলিত সুদের হারের তুলনায় ইহা অত্যধিক নয়। তৃতীয়তঃ, ঋণদাণের ব্যাপারে স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতিমূলক নীতি অবলম্বন করা হয়। চতুর্থতঃ, অধিকাংশ ঋণই পশ্চিমবঙ্গ ও বোম্বাই-এর সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেওয়া হইয়াছে এবং এইভাবে অনুন্নত রাজ্যসমূহ ও নূতন প্রতিষ্ঠানগুলির দাবীকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই কর্পোরেশনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির বিরুদ্ধে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ডাঃ সরোজকুমার বসু—কর্পোরেশনের অর্থনৈতিক গবেষণা বিভাগ বলিয়া কিছু নাই। এই ধরণের বিভাগ না থাকিলে শিল্পোন্নয়নের জন্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঋণদান করা উচিত হইবে তাহা বুঝিতে অসুবিধা হইবে। I.F.C. অনুসন্ধান কমিটি ডাঃ বসুর নির্দেশ গ্রহণ করিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই একটি অর্থনৈতিক রিসার্চ বিভাগ খুলিবার জন্য পরিকল্পনা করিয়াছে।

বিরুদ্ধ সমালোচনা

সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে দেশের শিল্পোন্নয়ন, বিশেষ করিয়া অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়নের ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী এই কর্পোরেশনের নাই। ইহার উত্তরে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—তাঁহার মতে এই কর্পোরেশন একটি অর্থ-কর্পোরেশন—উন্নয়ন কর্পোরেশন নয় (the corporation is a finance corporation and not a development corporation.)

[দুই] রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন (State Financial Corporations) ভারতীয় অর্থনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতীয় শিল্পোন্নয়নের যে পন্থা নির্দেশিত হইয়াছে তাহাতে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের ভূমিকা স্বীকার করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় ৪১ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৮০ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ২৬৪ কোটি টাকা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়। বৃহদায়তন শিল্পের ন্যায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্যও তিন ধরণের মূলধনের প্রয়োজন হয়। শিল্প স্থাপনার জন্য প্রাথমিক মূলধন বা ইকুইটিক্যাপিট্যাল, ব্যবসায় চালু রাখার জন্য কার্যকরী মূলধন (working capital) এবং শিল্পের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য উন্নয়নমূলক মূলধন।

আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মালিকদের হাতে প্রয়োজনীয় মূলধন নাই। আমাদের দেশে শিল্প ব্যাংক সবেমাত্র স্বরু হইয়াছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি অবশ্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিয়া থাকে কিন্তু যে ধরণের মূল্যবান জামিন চাহিয়া থাকে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের মালিকেরা তাহা দিতে পারে না, ফলে ঋণ পায় না। আর এই কারণে ইহারা গ্রাম্য মহাজনদিগের নিকট হইতে উচ্চসুদে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের পক্ষে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলিকে মূলধন সরবরাহ করা সম্ভবপর নয় বলিয়া রাজ্যগুলিকে তাহাদের নিজস্ব ফিনান্স কর্পোরেশন গঠন করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য করাই হইল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ১৯৫১ সালে স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন আইন পাশ করিয়া ভারতের সকল রাজ্যে এই ধরণের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত সকল রাজ্যেই একটি করিয়া ফিনান্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উদ্দেশ্য

রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশনের পরিচালনার ভার দশজন ডিরেক্টর লইয়া গঠিত একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত আছে। প্রয়োজন বোধ করিলে কার্যনির্বাহক সমিতি একটি উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

রাজ্যে অবস্থিত এক মালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীগুলিকে ঋণ সরবরাহই হইল রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশনগুলির উদ্দেশ্য।

রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশনের মূলধন কমপক্ষে ৬০লক্ষ টাকা এবং—পাঁচ কোটি টাকার অনধিক হইবে। এই মূলধনের ২৫% জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা চলিবে। অবশিষ্ট ৭৫% মূলধন রাজ্য সরকার, রিজার্ভ ব্যাংক, তপশীলভুক্ত ব্যাংক, কো-অপারেটিভ ব্যাংক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতির নিকট বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ শেয়ার করিতে হইবে। IFC পঁচিশ বৎসরের জন্য ঋণ দেয় আর রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন ২০ বৎসরের জন্য ঋণ দিবে। ইহা কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে পারে। রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশনের মূলধনের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং মূলধন ফেরৎ দেওয়ার জামিন থাকবে। শতকরা ৩ টাকা লভ্যাংশ (dividend) গ্যারাণ্টি দেওয়া আছে এবং কোনো অবস্থায়ই লভ্যাংশ শতকরা ৪ টাকার বেশী হইতে পারিবে না। রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন ঋণ গ্রহণ করিয়া, বণ্ড, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে পারিবে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশনের মোট মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ডের পাঁচগুণের বেশী ঋণ গ্রহণ করা চলিবে না।

মূলধন

রাজ্য সরকার কর্তৃক ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণ দানের ক্ষেত্রে ইহারা প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্য কোথাও হইতে অনধিক ২০ বৎসর মেয়াদী ঋণ সংগ্রহ করিলে কর্পোরেশন ঋণদাতাকে নিশ্চয়তা দান করিতে পারে। ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

১৯৫৬ সালের এক সংশোধনী আইন দ্বারা রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশনের কার্যক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপ যে ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা ঋণদানের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দ্বারা বোঝা যাইবে। ১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই কর্পোরেশনগুলি মোট ৩৬·১৭ কোটি টাকা ঋণদান করিয়াছে।

সমালোচনা (Criticism) ঃ—দেশের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনের তুলনায় ইহাদের ঋণদানের পরিমাণ নগণ্য। দ্বিতীয়তঃ ঋণদানের ব্যাপারে অত্যন্ত বিলম্ব করা হয় এবং অপেক্ষাকৃত বড শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়। ঋণদানের ব্যাপারে যে বিলম্ব হয় তাহার জন্য, কর্পোরেশনের মতে, ব্যবসায়ীরাই দায়ী। ব্যবসায়ীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিসাবপত্র ঠিকভাবে রাখে না এবং ঋণগ্রহীতার প্রকৃত অবস্থা যতক্ষণ না জানা যায় ততক্ষণ ঋণদান করা সম্ভবপর হয় না। এই কারণেই বিলম্ব হয়। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংক, ষ্টেট ব্যাংক এবং পুনঃ অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশনের সহযোগিতায় রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশনগুলি সম্প্রসারিত হইতেছে।

ঋণের স্বল্পতা

[তিন] জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড (National Industrial Development Corporation Ltd.)

১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে এক কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন ও ১০ লক্ষ টাকা আদায়ীকৃত মূলধন লইয়া NIDC গঠিত হয়। ১০ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকার দেন এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে ইহা স্থাপিত হয়। ইহার পরিচালনার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি পরিচালক সমিতি রহিয়াছে। এই সমিতির সদস্য সংখ্যা অনূন্য ১৫ ও অনধিক ২৫ হইবে। এই সমিতির সদস্যরা সকলেই বিশেষজ্ঞ।

যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান অর্থাভাবে উন্নতি করিতে পারিতেছে না অথবা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল করার জন্য যাহাদের গড়িয়া ওঠা একান্ত প্রয়োজন সেই সকল সরকারী ও বেসরকারী শিল্পকে অর্থ সাহায্য দান করা NIDC-র কর্তব্য। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যাহাতে তাহারা মুনাফা অর্জন করিতে পারে সেইরূপ সুদক্ষ করিয়া তোলার কাজও NIDC করিয়া থাকে। যে সকল শিল্প গঠিত হইলে, বে-সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অন্যান্য পরিপূরক শিল্প গড়িয়া ওঠে, এই কর্পোরেশন সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠাও করিতে পারে। দেখা যাইতেছে যে ল্যাতিন আমেরিকান দেশগুলিতে ফোমেণ্টো কর্পোরেশন (Fomento Corporation) যে ধরনের কাজ করিয়া থাকে আমাদের দেশে NIDC-র কার্যও তদনুরূপ। শিল্পোন্নতির জন্য কর্পোরেশন যে ঋণ দিয়া থাকে তাহাতে শতকরা ৭ টাকা সুদ আদায় করা হয়। অবশ্য সময় মত ঋণ পরিশোধ করিলে ৫ টাকা হারে সুদ আদায় করা হয়। অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকি বেশী বলিয়া বে-সরকারী উদ্যোগ যে ধরণের শিল্প গড়িয়া তুলিতে অনিচ্ছুক এই কর্পোরেশন সেই সব শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারে এবং নবগঠিত

শিল্পটি প্রতিষ্ঠিত হইলে কর্পোরেশন উহাকে বে-সরকারী মালিকানার নিকট বিক্রয় করিয়া দিবে।

NIDC শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে আধুনিকীকরণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যদানের মধ্যেই তাহার কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে। দ্বিতীয়-পরিকল্পনায় NIDC-র জন্য ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহার মধ্যে পাটশিল্প ও বস্ত্রশিল্পের জন্য ২০·২৫ কোটি টাকা আর বাকীটা নূতন মূল ও ভারী শিল্প সংগঠনে ব্যয় করার কথা। NIDC-র কাজ একমাত্র বৃহদায়তন ও ভারী শিল্পের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

[চার] শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন (Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd) :

বিশ্বব্যাংক এবং মার্কিন সরকারের প্রতিনিধি দল ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে ভারত সরকারকে এমন একটি সংগঠন স্থাপন করিতে উপদেশ দেন যাহার মারফৎ বিদেশী সরকার ও বে-সরকারী মূলধন মালিকেরা ঋণদান করিয়া ভারতীয় শিল্পকে সাহায্য করিতে পারে। ইহাদের পরামর্শ অনুসারে ১৯৫৫ সালে ICIC প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারী সহায়তা ও উৎসাহ পাইলেও ইহা একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে গঠিত প্রতিষ্ঠান।

ICIC-র অনুমোদিত মূলধন ২৫ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন পাঁচ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে দুই কোটি টাকার শেয়ার বাণিজ্য ব্যাংক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি ক্রয় করিয়াছে। কয়েকটি বিনিময় ব্যাংক ও কমনওয়েলথ বীমা কোম্পানী এককোটি টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছে। আমেরিকার কয়েকটি কোম্পানী ও ব্যক্তি মিলিয়া ৫০ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনিয়াছে। বাকী দেড় কোটি টাকার শেয়ার বাজারে বিক্রয় করা হইয়াছে।

মূলধন

মার্কিন সরকার এই কর্পোরেশনে ৭½ কোটি টাকা জমা রাখিয়াছেন। এই অর্থের জন্য মার্কিন সরকারকে কোনো সুদ দিতে হয় না।

বিশ্বব্যাংক ১৫ বৎসরের জন্য ৪½% সুদে মোট পাঁচ কোটি টাকা এবং ভারত সরকার পাঁচ কোটি টাকা ICIC-র নিকট জমা রাখিয়াছেন।

এই কর্পোরেশন এগারোজন ডিরেক্টর কর্তৃক পরিচালিত। ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের পক্ষ হইতে সাত জন; ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীদের পক্ষ হইতে দুইজন, আমেরিকান বিনিয়োগকারীদের পক্ষ হইতে একজন এবং ভারত সরকারের পক্ষ হইতে একজন সদস্য থাকিবেন। একজন চেয়ারম্যান এবং একজন জেনারেল ম্যানেজারও এই কর্পোরেশনে রহিয়াছেন।

গঠন

ICIC বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘমেয়াদী প্রাথমিক মূলধন দিয়া থাকে। যে সকল নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে সেগুলিকে প্রাথমিক মূলধন এবং যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান অর্থাভাবে উন্নতি করিতে পারিতেছে না সেগুলিকে প্রয়োজনীয় ঋণ দিবে। শিল্পগত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানাকে উৎসাহদান এবং বিনিয়োগ বাজারের সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা ইহার প্রধান কার্য।

এই প্রতিষ্ঠানটি যে কেবল শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণ দেয় তাহা নহে, ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার আণ্ডাররাইট করে এবং ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া সাহায্য করে, তাহাদের ঋণের গ্যারান্টি দেয় এবং পরিচালনা ও শিল্পকৌশল সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। ICIC-ই ভারতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আণ্ডাররাইটিং প্রতিষ্ঠান এবং একমাত্র ইহাই শেয়ার আণ্ডাররাইট করিয়া থাকে।

[পাঁচ] জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন (National Small Industries Corporation) : ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির জন্য এই কর্পোরেশনটি স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা, যন্ত্রপাতি কিনিতে সহায়তা করা এবং ক্ষুদ্রশিল্পের সাধারণ উন্নতিসাধন করা। যে সকল ক্ষুদ্রশিল্পের মূলধন পাঁচলক্ষ টাকার কম এবং যন্ত্রশক্তি ব্যবহার করিয়া ৫০ জনের কম শ্রমিক নিয়োগ করা হয় অথবা যন্ত্রশক্তি ব্যবহার না করিয়া ১০০ জনের কম শ্রমিক নিয়োগ করা হয়– সেই সকল প্রতিষ্ঠানই এই কর্পোরেশনের নিকট হইতে সাহায্য পাইবে। দশলক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। সমগ্র টাকাটাই ভারত সরকার সরবরাহ করিয়াছেন এবং আশা করা যাইতেছে যে- প্রয়োজনমত ভারত সরকার চলতি মূলধন দিয়া ইহাকে সাহায্য করিবেন। ১৯৬০৬১ সালে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে এই কর্পোরেশন এক কোটি ডলার ঋণ পাইয়াছে।

উদ্দেশ্য

সুষম শিল্পোন্নয়নের জন্য অধীন শিল্পগুলির (ancillary industries), উন্নতি করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্রশিল্প সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির (Small-Scale Industries Service Institutes) সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এই কর্পোরেশন কাজ করিবে। এই কর্পোরেশন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকে ছোট ফিডার প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়তঃ, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হইতে ক্রয় করে ইহা তাহার উৎসাহ দিবে। চলমান বিক্রয় ভ্যান (mobile sales van) এবং পাইকারী ডিপোর মাধ্যমে কর্পোরেশন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের দ্রব্যবিক্রয়ের সহায়তা করিতেছে। প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে বৈদেশিক বাজারে ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করা হইতেছে। এই কর্পোরেশন ক্ষুদ্রশিল্পকে কন্ট্রাক্ট পাইতে সাহায্য করে এবং সেই কন্ট্রাক্ট আণ্ডাররাইট করে। ১৯৫৭ সালে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে NSIC-এর চারিটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

কার্যাবলী

[ছয়] পুনঃ অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন (Refinance Corporation) : মার্কিন ও ভারত সরকারের মধ্যে এক চুক্তির ফলে ১৯৫৮ সালের জুন মাসে রিফিনান্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে স্থাপিত হয়। বোম্বাই এ অবস্থিত এই কর্পোরেশনের পরিচালকমণ্ডলী সাতজন বিশেষজ্ঞ লইয়া গঠিত। ইহাদের মধ্যে ৩ জন সদস্য ব্যাংকগুলি দ্বারা নির্বাচিত ও ৪ জন সদস্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। রিজার্ভ

গঠন

ব্যাংকের গভর্ণর এই কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। এই কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ২৫ কোটি টাকা (২৫০০ শেয়ারে বিভক্ত) এবং আদায়ীকৃত মূলধন ১২.৫ কোটি টাকা। রিজার্ভ ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক, জীবনবীমা কর্পোরেশন ও ১৫টি তপশীলভুক্ত ব্যাংক ইহার শেয়ারহোল্ডার।

মাঝারি আকারের বে-সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে নাতিদীর্ঘকালের জন্য (৩ হইতে ৭ বৎসর মেয়াদী) ঋণদান করা এই কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যাংক মাঝারি আয়তনের শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান করিলে সেই ব্যাংক রি ফিনান্স কর্পোরেশন হইতে

উদ্দেশ্য •

সমপরিমাণ অর্থ সাহায্য পাইবে। অবশ্য এই অর্থের জন্য ব্যাংককেই দায়ী থাকিতে হইবে। কোনো একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে মোট ৫০ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ দেওয়া চলিবে না। দেশীয় ও বিদেশীয় মোট ১৫টি ব্যাংকের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করিবে। কর্পোরেশন নিজে ঋণ দিবে না।

কর্পোরেশন উহার সদস্য ব্যাংকগুলিকে দেয় ঋণের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে সুদ আদায় করে। ব্যাংকগুলি ঋণগ্রহণকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে উহার উপর অতিরিক্ত ১½% বেশী সুদ আদায় করে।

এই কর্পোরেশনটির কার্যকলাপ সম্প্রসারিত করিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। প্রথমে ইহা দেশের পরিকল্পনাধীন শিল্পগুলিকেই কেবল সাহায্যদান করিত। বর্তমানে পরিকল্পনাধীন শিল্প ছাড়াও উন্নয়নের লক্ষ্যসম্মত অন্যান্য শিল্পগুলিকেও ইহা ঋণদান করিতেছে। এই কর্পোরেশনটি শুধুমাত্র তাহার অংশীদার ব্যাংকগুলির মারফৎ ঋণদান করিয়া থাকে—অংশীদারী ব্যাংকগুলি ছাড়াও অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে ইহার সাহায্য-দানের ক্ষমতা থাকা উচিত। কর্পোরেশন সাধারণতঃ ৭ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদী ঋণদান করিতে পারে কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উহা ১০ বৎসর মেয়াদী ঋণদানও করিতে পারে। কতকগুলি সর্তপূরণ করিলে ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানও এই কর্পোরেশনের নিকট হইতে ঋণ পাইতে পারে।

এই কর্পোরেশনের প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতা বিতর্কের বিষয়। বহু অর্থ-নীতিবিদের মতে বহুসংখ্যক ফিনান্স কর্পোরেশন স্থাপনের ফলে নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি হইবে। একটি ধরণের কাজের জন্য একাধিক কর্পোরেশন স্থাপনের ফলে এক প্রতিষ্ঠানের কাজের সহিত অপর প্রতিষ্ঠানের কাজ প্রতিযোগী হইবে এবং অযথা ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে।

[সাত] ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া (Unit Trust of India):— ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া গঠিত হয় এবং ১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই হইতে ইহার কার্য সুরু হয়।

নয় জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি বোর্ডের উপর ট্রাস্টের পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংক এই বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত এবং চারজন সদস্য নিয়োগ করে। স্টেট ব্যাংক ও জীবন বীমা কর্পোরেশন প্রত্যেকে একজন করিয়া

সদস্য নিয়োগ করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপর দুইজন সদস্য নিযুক্ত হয়। বোর্ডের চেয়ারম্যান যদি পুরা সময়ের (whole time) জন্য নিযুক্ত না হন তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাংক একজন একজিকিউটিভ ট্রাষ্টীও নিয়োগ করিতে পারে।

অর্ধোন্নত দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন স্বল্প সঞ্চয়কে সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত বিনিয়োগের পথে প্রবাহিত করা। অর্ধোন্নত দেশে জাতীয় আয় স্বল্প বলিয়া সঞ্চয়ও প্রয়োজনের তুলনায় কম। আবার এই স্বল্প সঞ্চয়ের কিছু অংশ ফট্‌কাবাজী প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত থাকে বলিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে ইহাকে নিয়োগ করা যায় না। ভারতে মূলধনের বাজার সুসংগঠিত নয় বলিয়া মূলধনের তারল্য (liquidity) এবং নিরাপত্তা বজায় রাখিয়া উহাকে বিনিয়োগ করা একটি সমস্যা বিশেষ।

দেশের সঞ্চয়কারীদের দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী ও বৃহৎ সঞ্চয়কারী। বৃহৎ সঞ্চয়কারীগণ তাহাদের সকল সঞ্চয় একত্র করিয়া উৎপাদনের কাজে লাগাইতে পারে এবং এ ব্যাপারে তাহাদের নানারূপ সুবিধা রহিয়াছে কিন্তু ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীর সেরূপ কোনো সুবিধা নাই। ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ সামান্য হইলেও মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ সামান্য নয়। ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীর সঞ্চয়ের পরিমাণ সামান্য বলিয়া উহা বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন শিল্পে নিয়োগ করা যায় না। সমগ্র সঞ্চয়কে বিনিয়োগের একটি মাত্র ক্ষেত্রে ব্যয় করার ফলে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ইউনিট ট্রাস্টের উদ্দেশ্য দেশের সমগ্র স্বল্প সঞ্চয়কে একত্র করিয়া বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া। জনগণের সঞ্চয় একত্র করিয়া এই ট্রাস্ট তাহা নানারূপ সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করে। ট্রাস্টের কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, জনসাধারণ তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থ এই ট্রাস্টে নিরাপদে বিনিয়োগ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বিনিয়োগকারী ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট লভ্যাংশ পাইবার সম্পর্কে নিশ্চিত থাকিতে পারে। তৃতীয়তঃ ট্রাস্ট বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত এবং বিনিয়োগযোগ্য মূলধনকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করায় ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা হ্রাস পায়। চতুর্থতঃ, ইউনিট ট্রাস্ট ইউনিটগুলি কেনাবেচার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত বলিয়া বিনিয়োগকারী ইচ্ছানুযায়ী তাহার ইউনিটকে টাকায় রূপান্তরিত করিতে পারে। সুতরাং এই ব্যবস্থায় অর্থের তারল্য রক্ষিত হয়। পরিশেষে, ট্রাস্টের মাধ্যমে সঞ্চয় দেশে আর্থিক উন্নয়নধারার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বিনিয়োজিত হওয়ার ফলে বিনিয়োগকারী তাহার সঞ্চয়কে সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল-সাধনে নিয়োগ করিতে পারে।

সুবিধা

ভারতীয় ইউনিট ট্রাস্ট পাঁচ কোটি টাকার প্রারম্ভিক মূলধন লইয়া তাহার কাজ সুরু করিয়াছে। এই টাকা এইভাবে সংগৃহীত হইয়াছে—রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, জীবনবীমা কর্পোরেশন ৭৫ লক্ষ টাকা, কেন্দ্রীয় সরকার ৭৫ লক্ষ টাকা, তপশীলভুক্ত ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ এক কোটি টাকা।

মূলধন

পূর্বেই দেখিয়াছি যে ট্রাস্টের উদ্দেশ্য হইল ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা। সেই কারণে প্রত্যেকটি ইউনিটের মুদ্রিত মূল্য (face value) মাত্র দশ টাকায় ধার্য করা হইয়াছে এবং সর্বোচ্চ মুদ্রিত মূল্য ১০০ টাকা ধার্য করা হইয়াছে। ইউনিটগুলির উপর বিভিন্ন সময়ে লভ্যাংশের পরিমাণ অনুসারে উহাদের দাম নির্ধারিত হইবে এবং ওই দামে উহাদের বাজারে বিক্রয় করা হইবে। ট্রাস্ট কি দামে ইউনিটগুলিকে কিনিয়া লইবে তাহা সময় সময় ঘোষণা করা হইবে। ক্রেতা যে কোনো পরিমাণ ইউনিট ক্রয় করিতে পারে, ইহাতে কোনোরূপ বাধা নাই। ক্রেতা ইউনিটগুলিকে ব্যাংকে জমা দিয়া ঋণ পাইতে পারিবে। ইউনিট-গুলি হস্তান্তরযোগ্য।

স্টেট ব্যাংক ও উহার অধীনস্থ বাণিজ্য ব্যাংকগুলির ৩৫০০ শাখা অফিসের মাধ্যমে ইউনিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইউনিট বিক্রয় করিয়া যে টাকা সংগৃহীত হইবে তাহা দ্বারা নির্ধারিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করা হইবে। বৎসরান্তে বিনিয়োগ হইতে যে নীট লভ্যাংশ পাওয়া যাইবে উহার শতকরা ৯০ ভাগ ইউনিট ক্রেতাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। ইউনিট ট্রাস্ট আয়কর, সুপার ট্যাক্স্ এবং আয়ের উপর অন্যান্য করসমূহ হইতে মুক্ত। ইউনিট-ক্রেতারা ট্রাস্ট হইতে ১০০০ টাকার লভ্যাংশ আয় পর্যন্ত আয়কর দিবে না।

ইউনিট ট্রাস্ট ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করিয়াছে। যদিও ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এই ধরণের বহু প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু ভারতে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান এই প্রথম। এই ট্রাস্ট সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া বিনিয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে সঞ্চয়কারীর সত্যই উপকার হয়। ইহা সঞ্চয়কে সঠিক পথে পরিচালিত করে। ঘন ঘন ব্যাংক পতনের জন্য স্বল্প সঞ্চয়ী ব্যক্তি নিশ্চিন্তে ব্যাংকে টাকা রাখিতে পারে না। ইউনিট ট্রাস্ট বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত এবং ইহার মূলধন ফটকাবাজীতে বিনিয়োগ করা হয় না বলিয়া সঞ্চয়কারী বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ট্রাস্টের হাতে তাহার কষ্টার্জিত টাকা তুলিয়া দিবে। ট্রাস্ট তাহার লাভের শতকরা ৯০ ভাগ বণ্টন করিয়া দিবে—উহা বিনিয়োজিত অর্থের শতকরা ১০ ভাগের মতো হইবে। সুতরাং এই ব্যবস্থা খুবই লাভজনক। আশা করা যায় ট্রাস্টের কার্যের ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ কমিবে।

বর্তমানে দেশের পরিকল্পনাগুলিকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য জনসাধারণের সঞ্চয় বৃদ্ধি করা আবশ্যক। শুধুমাত্র বৃহৎ সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয়েই কাজ হইবে না, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ের বৃদ্ধি ও সংগ্রহ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনে ইউনিট ট্রাস্ট এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

[আট] ভারতীয় শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক (Industrial Development Bank of India) :

১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই তারিখে শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকটি স্থাপিত হয়। এই ব্যাংকটি সম্পূর্ণরূপে রিজার্ভ ব্যাংকের মালিকানাধীন এবং রিজার্ভ ব্যাংক ইহার

তদারকের ভার গ্রহণ করিবে। এই ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ৫০ কোটি টাকা, পরে উহা বাড়াইয়া ১০০কোটি টাকা করা হইবে।.ইহার বিলিযোগ্য মূলধন দশ কোটি টাকা, অবশ্য পরে ইহা বাড়ানো চলিবে। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ইহাকে ১০ কোটি টাকা সুদবিহীন ঋণ প্রদান করিয়াছে।

মূলধন

এই ব্যাংকের তদারকী ও পরিচালনার ভার একটি বোর্ড অব-ডাইরেক্টরস এর হাতে রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরসই এই প্রতিষ্ঠানটিরও বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর কাজ করিবে। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্ণর ও ডেপুটি গভর্ণর এই ব্যাংকের সভাপতি ও সহ-সভাপতি হইবেন। প্রয়োজন হইলে নির্দিষ্ট সংখ্যক ডাইরেক্টর লইয়া একটি একজিকিউটিভ কমিটি গঠন করা যাইবে।

গঠন

শিল্পে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন (NIDC), শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন (ICIC), প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহারা ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্য পর্য্যাপ্ত মূলধন সরবরাহ করিতে পারে নাই। এইজন্য নব গঠিত এবং সম্প্রসারণশীল শিল্পের ক্রমবর্ধমান অর্থের চাহিদা মিটাইবার জন্য এবং এযাবৎ প্রতিষ্ঠিত শিল্প-ঋণদানকারী সংস্থাগুলি অপেক্ষা অধিকতর আর্থিক সম্বল বিশিষ্ট একটি ঋণদানকারী সংস্থার প্রয়োজন কিছুকাল ধরিয়া অনুভূত হইতেছিল। এই ব্যাংক অন্যান্য ঋণদানকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিবে।

ভারতীয় শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক সরকারী ও বেসরকারী মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প, খনি, পরিবহন, জাহাজী ব্যবসায় প্রভৃতিকে ঋণদান করিবে। এই ব্যাংক প্রত্যক্ষ-ভাবে অথবা পরোক্ষভাবে ঋণদান করিতে পারে। ব্যাংক সরাসরিভাবে ঋণদান করিতে পারে, কোনো প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ডিবেঞ্চার কিনিতে পারে বা উহাদের বিক্রয়ের দায়িত্ব লইতে পারে। কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান তপশীলভুক্ত ব্যাংক হইতে বা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন বা স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন বা অন্য কোনো অনুমোদিত সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক ওই ঋণের জন্য গ্যারান্টি দিতে পারে।

শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক উন্নয়ন সাহায্য ফাণ্ড (Development Assistance Fund) নামে একটি আলাদা ফাণ্ডের সৃষ্টি করিবে। যে সব শিল্পে মুনাফার হার অত্যন্ত কম বলিয়া অর্থ সংগ্রহের অসুবিধা হয় অথচ ওই সব শিল্প দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, ওই ফাণ্ড হইতে তাহাদের অর্থ সাহায্য করা হইবে।

এই ব্যাংকের কার্যাবলী শুধুমাত্র ঋণদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইহা বিনিয়োগ, বাজার এবং কারীগরী ও অর্থ নৈতিক বিষয়ে গবেষণা চালাইয়া যাইবে। কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন অথবা সম্প্রসারণের জন্য ইহা কারিগরী এবং প্রশাসনিক সাহায্য দান করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়

পরিবহন (Transport)

[**বিষয়বস্তু :** ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা—রেলপথ—রেলপথের আয়ব্যয়—রাস্তা পরিবহন—রেল ও রাস্তা পরিবহনের প্রতিযোগিতা ও সমন্বয়—ভারতীয় বিমান পথ—জল পথ পরিবহন : জাহাজ শিল্প]

ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা (Transport System in India) : জাতীয় সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিক ব্যবস্থায় পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনীতিক ব্যবস্থাকে জৈব দেহের সহিত তুলনা করিলে পরিবহনকে স্নায়ু বলিয়া অভিহিত করা চলে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে শিল্পবিপ্লব আসে তাহাকে সফল করিতে পরিবহন ব্যবস্থার অবদান অপরিসীম। ভারতের মতো বৃহদায়তন দেশে অর্থনীতিক, প্রশাসনিক, সামরিক এবং সামাজিক দিক হইতে পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। কাঁচামালের উৎস স্থান হইতে শিল্পাঞ্চলে উহা বহন করিয়া আনার জন্য সুপরিকল্পিত পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন। আবার শিল্পাঞ্চল হইতে দেশের সর্বত্র ক্রেতাদের নিকট শিল্পজাত দ্রব্য প্রেরণ করার জন্যও উন্নত পরিবহনের প্রয়োজন। পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত এবং সীমাবদ্ধ থাকিলে কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রেরণের ব্যয় বাড়িয়া যায় বলিয়া দ্রব্যের দামও বাড়িবে। বহুকাল পূর্বে অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছিলেন যে বাজারের আয়তনের উপরই শ্রম-বিভাগের তথা বৃহদায়তন উৎপাদনের সীমানা নির্ভর করে। আবার বাজারের পরিধি নির্ভর করে পরিবহন ব্যবস্থার উপর। পরিবহন ব্যবস্থা যত উন্নত হইবে বাজারের আয়তন ততই বৃদ্ধি পাইবে আর পরিবহন ব্যবস্থা যত অনুন্নত হইবে বাজারের আয়তন ততই সংকীর্ণ হইবে। অধোন্নত দেশে বাজারের পরিধির সীমাবদ্ধতার কারণ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুন্নতি। বৃটিশ যুগে প্রশাসনিক এবং সামরিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভারতে পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটিয়াছিল। স্বাধীনতার পর, বিশেষ করিয়া পরিকল্পনাধীন সময় হইতে, শিল্প স্থাপনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হইতেছে।

১৯৬১ সালে ভারতে পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় ১৪ লক্ষ ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ৫২২'৮ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ওই খাতে ১৩৮৫'১ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ওই খাতে ১৪৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

পরিবহন ব্যবস্থাকে মূলতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়—স্থল পরিবহন, জল পরিবহন এবং বিমান পরিবহন ব্যবস্থা। স্থল পরিবহন ব্যবস্থাকে পুনরায় দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়—রেল পরিবহন এবং পথ (অর্থাৎ মোটর) পরিবহন। তিন ধরণের পরিবহন ব্যবস্থাই আভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক হইতে পারে।

রেলপথ (Railways) : স্থলপথে আভ্যন্তরীণ পরিবহনের প্রধান অবলম্বন রেলপথ। বিগত ১০০ বৎসরে ইহার অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনের ভাষায় ইহাকে সত্য সত্যই জাতির জীবনরেখা বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। ভারতীয় রেলপথ দৈর্ঘ্যের দিক হইতে পৃথিবীতে চতুর্থ ও এসিয়ায় প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৮৫৩ সালে প্রথম বোম্বাই হইতে থানা পর্যন্ত ২০ মাইল পথে যাত্রী চলাচলের জন্য প্রথম রেলপথ খোলা হয়। ১৯৬০ সালে ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৩৫,২১৩ মাইলে। বর্তমানে এই পরিবহন শিল্পে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ১৪৩৯ কোটি টাকা এবং ইহা বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। নিয়োগের দিক হইতেও রেলপথের গুরুত্ব কম নয়। এগারো লক্ষের বেশী লোক এই শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। ভারতীয় রেলপথ বে-সরকারী বৃটিশ মূলধন ও উদ্যোগে যাত্রা সুরু করে। দেশের মোট মাল পরিবহনের শতকরা ৮০ ভাগ এবং যাত্রী পরিবহনের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ রেলপথ বহন করিয়া থাকে। ১৯৬০ সালে রেলপথগুলি গড়ে প্রতিদিন ৪০ লক্ষ যাত্রী ও ৪৪ লক্ষ টন মাল বহন করিয়াছে। ইহার মোট আয়ের পরিমাণ ৪২৪ কোটি টাকা। ভারতীয় রেলপথের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

ভারতীয় রেলপথের বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রথমতঃ, ভারতের ন্যায় বহুবিস্তৃত ও ঘনবসতিপূর্ণ দেশের আয়তনের তুলনায় রেলপথ অতি সামান্যই। ভারতে প্রতি হাজার বর্গমাইলে মাত্র ২৫ মাইল রেলপথ রহিয়াছে। অপরপক্ষে ইংলণ্ড ও বেলজিয়ামে প্রতিহাজার বর্গমাইলে যথাক্রমে ২২৫ ও ২৫০ মাইল রেলপথ রহিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় রেলপথের প্রায় অর্ধেক গাঙ্গেয় সমভূমিতে বিস্তার লাভ করিয়াছে। হিমালয়ের উচ্চভূমি ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মধ্যবর্তী সমভূমিতে রেলপথগুলি সরলরেখায় প্রসারিত ও স্থানে স্থানে জালের ন্যায় বিস্তৃত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের রেলপথের ঘনত্ব বেশী নহে। ভূমিভাগের বন্ধুরতার জন্য রেলপথ এখানে আঁকিয়া বাঁকিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ ভারতের রেলপথ চওড়া, মিটার এবং সংকীর্ণ এই তিন মাপের হওয়ায় দূরবর্তীস্থানে পণ্য রপ্তানী করিতে হইলে অনেক সময় একমাপের গাড়ী হইতে অন্য মাপের গাড়ীতে মালপত্র বোঝাই করিতে বহু সময় ও অর্থ ব্যয় হয়।

চতুর্থতঃ, এদেশের রেলপথসমূহ প্রধানতঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সৃষ্টি হওয়ায় উহারা প্রায়ই কোনো না কোনো বন্দর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহারা নির্মিত হয় নাই।

ভারতে রেলপথের পত্তন বে-সরকারী উদ্যোগেই হয়। সরকার ইহাদের নানা প্রকার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৮৫৩ সালে ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়। লর্ড ডালহৌসীর সুপারিশ অনুসারে ভারত সরকার আটটি বৃটিশ কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হয় এবং চুক্তির সর্তানুসারে সরকার কোম্পানীর বিনিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ৫% সুদ দিতে প্রতিশ্রুত থাকেন। ইহাকে পুরাতন প্রতিশ্রুতিপ্রথা

(Old Guarantee System) বলা হয়। কোম্পানীগুলি প্রতিশ্রুত হারের অধিক মুনাফা লাভ করিতে না পারায় সরকার গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেইকারণে ১৮৬৯ সালে সরকার নিজ প্রচেষ্টায় রেলপথ নির্মাণের ভার গ্রহণ করেন। নানারূপ অসুবিধা দেখা দেওয়ায় দশ বৎসর পরে এই নীতি পরিত্যক্ত হয় এবং প্রতিশ্রুতি প্রথার পুনঃ প্রবর্তন করা হয়। নূতন চুক্তির সর্ত হিসাবে প্রতিশ্রুত সুদের হার ৩½% ধার্য করা হইল এবং অতিরিক্ত মুনাফার ½ অংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য বলিয়া নির্ধারিত হইল। এই প্রতিশ্রুতিকে নূতন প্রতিশ্রুতি প্রথা (New Guarantee System) বলা হয়।

বিংশ শতাব্দীর সুরু হইতেই ভারতীয় রেলপথ কোম্পানীগুলি প্রচুর মুনাফা অর্জন করিতে থাকে। রেলওয়ে সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের জন্য ভারত সরকার কয়েকটি কমিটি নিযুক্ত করেন। ১৯২১ সালের এ্যাকওয়ার্থ কমিটি (Acwarth Committee) ইহার অন্যতম। জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে রেলপথকে জাতীয়করণ করিতে এই কমিটি নির্দেশ দেয়। ১৯২৫ সাল হইতে এইদিকে কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯৪৪ সালে রেলপথগুলির রাষ্ট্রীয়করণ সম্পূর্ণ হয়। ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় রেলপথসমূহ ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে ছয় হাজার মাইল রেলপথ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কোনো কোনো অঞ্চলের সহিত রেলপথ সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়।

পূর্বে ভারতীয় রেলপথকে সম্পূর্ণরূপে ইঞ্জিন, বয়লার, ওয়াগান এবং বগীর জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইত। ফলে বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হইত। বর্তমানকালে অবস্থার বেশকিছু উন্নতি হইয়াছে এবং এখন দেশেই ইঞ্জিন, রেলগাড়ীর কোচ, ওয়াগন বেশ কিছু পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে।

রেলপথের আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস

১৯৫১ সালে পরিকল্পনার সুবিধার জন্য রেলপথের আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস (Zonal Re-grouping) করা হয়। ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় রেলপথ অপরিকল্পিত পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। পুনর্বিন্যাসের পূর্বে ভারতে ৩৬টি রেলপথ ছিল। ইহার মধ্যে সরকারের অধীনে ছিল ২২টি; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রেলপথের পরিচালনা খরচ বেশী ছিল এবং বিভিন্ন রেলপথের মধ্যে সাধারণ নীতি নির্ধারণে সমতা আনয়ন করা কঠিন ব্যাপার ছিল। পুনর্বিন্যাসের ফলে প্রথম ছয়টি এবং পরে আরও দুইটি অর্থাৎ মোট আটটি জোনের (Zone) সৃষ্টি হয়; (১) উত্তর-রেলপথ, (২) দক্ষিণ-রেলপথ, (৩) পূর্ব-রেলপথ, (৪) পশ্চিম রেলপথ, (৫) মধ্য-রেলপথ, (৬) উত্তর-পূর্ব রেলপথ, (৭) দক্ষিণ-পূর্ব-রেলপথ এবং (৮) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ। এই পুনর্বিন্যাসের বহু সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, ইহার ফলে পরিচালনগত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ ইহা অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা রোধ করিবে; তৃতীয়তঃ ইহার ফলে ব্যয়সংকোচ ঘটিবে; চতুর্থতঃ, মাশুল নির্ধারণে সর্বভারতীয় সমতা আনয়ন করা সম্ভবপর হইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় রেলওয়ে খাতে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় কিন্তু কার্যতঃ ব্যয় হয় ৪২৩.৭৩ কোটি টাকা। এই সময় ৩৮০ মাইল নূতন রেলপথ নির্মাণ ও ৪৩০ মাইল পুরাতন রেলপথের সংস্কার করা হয়। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে মোট ১৩৮৫ কোটি টাকা (অর্থাৎ শতকরা ২৯ ভাগ) বরাদ্দ করা হয়। ইহার মধ্যে রেলপথসমূহের ভাগে পড়ে ৯০০ কোটি টাকা, রেলওয়ে অবপূর্তিফাণ্ডের (Railway Depreciation Fund) ২২৫ কোটি টাকা ধরিলে মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১২৫ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনাকালে ৫০০ মাইলের মতো নূতন রেলপথ পাতা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ১৪৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। এই সময়ে ১২০০ মাইল নূতন রেলপথ স্থাপনের কথা আছে। ইহা ছাড়া কয়লা শিল্প উন্নয়নের জন্য ২০০ মাইল নূতন রেলপথ স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

রেলপথের আয়ব্যয় (Railway Finance): ভারতীয় রেলপথের আয়ব্যয় বলিতে দুইটি বিষয় বোঝায়—প্রথমতঃ রেলপথসমূহের মোট আয় ও মোট ব্যয়, দ্বিতীয়তঃ রেলপথের আয়ব্যয়ের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ব্যয়ের সম্পর্ক। এ্যাকওয়ার্থ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯২৪ সালে রেলপথের আয়ব্যয়কে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ব্যয় হইতে পৃথক করা হয়। এই পৃথকীকরণের স্বপক্ষে এ্যাকওয়ার্থ কমিটি দুইটি প্রধান যুক্তি দেখান। প্রথমতঃ রেলপথ একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সেই কারণে যে নিয়মাবলী সরকারের অন্য সকল বিভাগে প্রযোজ্য, রেলবিভাগে তাহা প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু রেলপথ একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সেই কারণে ইহার একটি অবপূর্তি ফাণ্ড (Depreciation Fund) থাকা প্রয়োজন। সরকারের সাধারণ আয়ব্যয়ের সহিত রেলওয়ে আয়ব্যয় জড়িত থাকিলে ইহা সম্ভবপর হইবে না।

একওয়ার্থ-কমিটির সুপারিশ

পৃথক হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ আয়ব্যয় ও রেলপথের আয়ব্যয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ১৯২৪ সালের পৃথকীকরণ প্রথার (Separation Convention) দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই প্রথা অনুসারে সরকারকে বিনিয়োজিত মূলধনের উপর বার্ষিক ১% হারে ডিভিডেণ্ড এবং তিন কোটি টাকার অতিরিক্ত লাভের ⅕ অংশ প্রদান করিতে হইবে। দেশরক্ষার জন্য যে সব লাইনে ক্ষতি হইবে তাহা সরকারকে বহন করিতে হইবে। এই প্রথার দ্বারা একটি অবপূর্তি ফাণ্ড (Depreciation Fund) ও একটি রিজার্ভ ফাণ্ডের সৃষ্টি করা হয়।

১৯৪৯ সালের কুন্‌জ্‌রু কমিশনের (Kunzru Commission) সুপারিশ অনুসারে ১৯২৪ সালের পৃথকীকরণ প্রথাকে বাতিল করিয়া রেলওয়ে প্রথা (Railway Convention, 1949) নামে এক নূতন প্রথাকে গ্রহণ করা হয়। এই প্রথার প্রধান প্রধান পরিবর্তনগুলি এইরূপ: (১) পূর্বের মতো রেলওয়ে আয় ব্যয় ও সরকারী আয়-ব্যয় আলাদা থাকিবে, তবে রেলওয়েতে বিনিয়োজিত মূলধনের উপর বার্ষিক ৪% হারে ডিভিডেণ্ড কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হইবে।

রেলওয়ে প্রথা

(২) অবপূর্তি ফাণ্ডে (Depreciation Fund) প্রতি বৎসর কমপক্ষে ১৫ কোটি টাকা জমা রাখিতে হইবে। (৩) একটি রেলওয়ে উন্নয়ন ফাণ্ড (Railway Development Fund) গঠন করিতে হইবে এবং ইহার অর্থ যাত্রীদের কল্যাণে ব্যয়িত হইবে। (৪) রাজস্বব্যয় মূলধন ব্যয়ের (revenue and capital expenditure) মধ্যে নূতন করিয়া সম্পর্ক স্থির করিতে হইবে।

১৯৪৯ সালের প্রথা পাঁচ বৎসর কার্যকরী থাকে। ১৯৫৪ সালে ওই প্রথার সামান্য পরিবর্তনসাধন করা হয়। ইহাকে পরিমার্জিত প্রথা (Revised Convention, 1954) বলা হয়। এই পরিমার্জিত প্রথার প্রধান প্রধান ব্যবস্থাগুলি হইল: (১) রেলপথগুলি বিনিয়োজিত মূলধনের উপর ৪% হারে ডিভিডেণ্ড দিলেও যেখানে নূতন লাইন পাতা হইতেছে সেই সব ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম করিতে হইবে: (২) অবপূর্তি ফাণ্ডে ১৫ কোটি টাকা হইতে বাড়াইয়া ২৫ কোটি টাকা রাখিতে হইবে।

বর্তমানে রেলপথ রাষ্ট্রের মালিকানাধীন। পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট রেলওয়ে বোর্ডের উপর রেলপরিবহন ব্যবস্থার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ইহার চেয়ারম্যান।

রাস্তাপরিবহন (Road Transport): রাস্তাকে গতির নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করা হয়। যে দেশে রাস্তার দৈর্ঘ্য বেশী নিঃসন্দেহে সে দেশ উন্নত এবং গতিশীল আর যে দেশে রাস্তার দৈর্ঘ্য তুলনামূলকভাবে কম সে দেশ অনুন্নত এবং গতিহীন।

পরিবহনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পদ্ধতি হইল রাজপথ। প্রাচীন ভারতের রাজা এবং সম্রাটেরা রাজপথ নির্মাণ করিতে আগ্রহশীল ছিলেন। পূর্বে যে রাজপথ নির্মাণ করা হইত তাহার উদ্দেশ্য ব্যবসায় বাণিজ্যের সহায়তা করা অপেক্ষা যুদ্ধকালে সৈন্য চলাচলের সুবিধা করিয়া দেওয়াই মুখ্য ছিল। শেরশাহ বিখ্যাত গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড নির্মাণ করেন তাঁহার সৈন্য চলাচলের সুবিধার জন্য। ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে এদেশে কয়েকটি বড় বড় রাজপথ ছিল। তাহার মধ্যে গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড ও গ্রেট দক্ষিণাপথ রোডই প্রধান। প্রথমটি কলিকাতা হইতে পেশোয়ার এবং দ্বিতীয়টি যুক্তপ্রদেশের মির্জাপুর হইতে নাগপুর হইয়া দক্ষিণাপথে চলিয়া গিয়াছে। বৃটিশরাজ কয়েকটি প্রয়োজনীয় রাজপথ নির্মাণ করেন।

মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য

ভারতের মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য তিন লক্ষ বিশ হাজার মাইল—ইহার মধ্যে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মাইল হইল পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য আর বাকীটা হইল কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য। প্রতি বর্গমাইলে ইংলণ্ডে রাস্তার দৈর্ঘ্য ২ মাইল অপরপক্ষে ভারতে মাত্র ০·২ মাইল। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে প্রয়োজনের তুলনায় ভারতে রাস্তা অনেক কম।

ভারতের মতো বিরাট কৃষিপ্রধান দেশে রাজপথের গুরুত্ব অপরিসীম। রেলপথ সাধারণতঃ বড় শহর, বন্দর এবং শিল্পাঞ্চলের মধ্যেই যোগাযোগের সেতু। অপরপক্ষে রাজপথ গ্রাম এবং শহর ও শিল্পাঞ্চলের মধ্যে সংযোগসাধন করে। গ্রামাঞ্চলের কৃষি-

জাতদ্রব্য শহরে আনিবার এবং শিল্পাঞ্চল হইতে শিল্পজাতদ্রব্য গ্রামে পাঠাইবার জন্য রাস্তার প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাটের উন্নতি না হইলে পচনশীলদ্রব্যাদি শহরে আনিবার পূর্বেই উহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। গ্রামের সহিত শহরের যোগাযোগ যত সহজ হইবে ততই শিক্ষার প্রসার এবং বাজারের বিস্তার ঘটিবে। বর্তমানে জীবিকানির্বাহের জন্য যে কৃষিকার্য হইয়া থাকে তাহাকে লাভজনক কৃষিতে পরিণত করিতে হইলে গ্রামাঞ্চলে রাস্তার প্রসার করিতে হইবেএবং উহাদের সহিত নগরাঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে। আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারে রাজপথের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের বহুস্থান রহিয়াছে যেখানে রেলপথ স্থাপন করা লাভজনক হইবে না, এরূপ স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারের জন্য রাস্তা নির্মাণ করাই বাঞ্ছনীয়। ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজন ছাড়া দেশরক্ষার জন্যও রাজপথের গুরুত্ব অপরিসীম।

অধিক পরিমাণে রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার ১৯২৭ সালে রাজপথ উন্নয়ন কমিটি (Road Development Committee) গঠন করেন। এই কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজপথ উন্নয়ন এবং রক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের সুপারিশ করেন। এই কমিটি পেট্রোলের উপর অতিরিক্ত করধার্যের সুপারিশ করেন এবং এই কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা একটি ফাণ্ড (Road Fund) গঠনের নির্দেশ দেন। এই ফাণ্ড হইতে প্রাদেশিক সরকারগুলকে রাস্তানির্মাণের জন্য সাহায্য দেওয়া হইবে। সরকার এই কমিটির সুপারিশগুলি গ্রহণ করেন এবং একটি ফাণ্ড গঠন করেন।

১৯৪৩ সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে প্রাদেশিক চীফ ইঞ্জিনিয়ারদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে রাজপথ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য একটি দশ বৎসর মেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ইহা নাগপুর পরিকল্পনা (Nagpur Plan) নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনা ভারতের রাস্তাগুলিকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করে: জাতীয় রাজপথ (National Highways), রাজ্যের রাজপথ (State Highways), জেলার রাজপথ (District Roads) এবং গ্রামের রাস্তা (Village Roads).

জাতীয় রাজপথের উন্নয়ন, গঠন এবং রক্ষণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন। বর্তমানে ১৩৪০০মাইল এই ধরণের রাজপথ রহিয়াছে। রাজ্যের রাজপথ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। এই রাস্তাগুলি রাজ্যের বিভিন্ন শহর, রেল-ষ্টেশন এবং শিল্পাঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিবে। জেলার এবং গ্রামের রাস্তাসমূহ গ্রামাঞ্চলের সহিত রাজ্যের রাজপথ এবং রেল ষ্টেশনের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবে। এই সব রাস্তাগুলি মিউনিসিপ্যাল, জেলাবোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, পঞ্চায়েৎ তৈয়ারী করিবে। এই ধরণের অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা এবং বর্ষাকালে মোটর-বাস চলাচলের অনুপোযোগী।

নাগপুর পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে এরূপভাবে রাস্তা নির্মাণ করা হইবে যাহাতে কোনো গ্রামই যেন প্রধান রাস্তা হইতে পাঁচ মাইলের অধিক দূরে না থাকে। এই পরিকল্পনায় ৩৭১'৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩,৩১০০০ মাইল রাজপথ তৈয়ারীর কর্মসূচী

গ্রহণ করা হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে রাস্তা নির্মাণের মালমশলার দুর্মূল্যতার এবং অর্থের অসুবিধার দরুন এই পরিকল্পনার বেশ কিছু কাটছাঁট করা হয়। ভারত সরকার একটি রাস্তা বোর্ড (Road Board) এবং একটি কেন্দ্রীয় রাজপথ গবেষণা ইনষ্টিট্যুট (Central Road Research Institute) গঠন করেন।

প্রথম পরিকল্পনায় রাস্তা উন্নয়নের জন্য ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ওই বাবদ ব্যয় করা হয় ২২৪ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশে মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৩৯৪০০০ মাইল। তৃতীয় পরিকল্পনায় রাস্তা উন্নয়নের জন্য ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় এবং পরিকল্পনাধীন সময়ে ২০,০০০ মাইল রাস্তা নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে একটি বিশ বৎসরের (১৯৬১-১৯৮১) জন্য রাজপথ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনানুযায়ী ১৯৮১ সালে রাস্তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করিয়া ৬,৫৭০০০ মাইল করা হইবে।

পরিকল্পনাধীন সময়ে রাস্তা পরিবহণ

গরুর গাড়ী এবং মোটরযান যাত্রী এবং মাল বহণের জন্য রাস্তা ব্যবহার করে। গরুর গাড়ী স্থল-পরিবহণের অতি প্রাচীন পদ্ধতি এবং বর্তমানে ভারতে প্রায় ৮৭০ লক্ষ গরুর গাড়ী রহিয়াছে। ইহারা প্রায় এক কোটি লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা করিতেছে। এখনও পর্যন্ত মাল বহনে গরুর গাড়ী শহর ও গ্রামাঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

বর্তমানে ভারতীয় রাজপথসমূহের ত্রুটিগুলি এইরূপ : (১) অধিকাংশ রাস্তাই অপ্রশস্ত এবং রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটার একটি বড় কারণ ইহা ; (২) অধিকাংশ গ্রাম এবং জেলার রাস্তাগুলি কাঁচা, ইহাদের মধ্যে কম সংখ্যক রাস্তাই মোটরযানের উপযোগী। (৩) গ্রাম এবং জেলার রাস্তাগুলি বর্ষাকালে মোটরযান চলাচলের অনুপোযোগী হইয়া পড়ে ; (৪) গ্রামাঞ্চলের রাস্তাগুলি উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না এবং একবার উহা ভাঙ্গিয়া গেলে সত্বর উহার পুনর্নির্মাণ করা হয় না।

পথ পরিবহনের উৎকৃষ্ট উপায় মোটরযান। নমনীয়তাই হইল ইহার সর্বাপেক্ষা সুবিধা। ইহারা প্রতি গৃহ হইতে মাল এবং যাত্রী সংগ্রহ ও বণ্টন করিতে সক্ষম এবং ইহাতে প্রভূত মূলধনের প্রয়োজন হয় না! কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশে জনসংখ্যার তুলনায় মোটরের সংখ্যা খুবই কম। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি তিনজন লোকের জন্য একটি মোটর গাড়ী অপরপক্ষে ভারতে প্রতি ২২০০ লোকের জন্য একটি মোটরগাড়ী। বর্তমানে ভারতে ৫,৫০,০০০-এর মতো মোটরযান রহিয়াছে।

সাম্প্রতিককালে রাজ্যসরকার মোটর পরিবহন জাতীয়করণের নীতি অনুসরণ করিতেছেন। এই পরিকল্পনা প্রথম ১৯৪৬ সালে বোম্বাই-এ চালু করা হয়। ইহার পর যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং বিহারে কতকগুলি রাস্তায় সরকারী বাস সার্ভিস চালু করা হইয়াছে। পশ্চিমবংগ এবং মাদ্রাজ সরকার রাজধানীতে সরকারী বাস সার্ভিস চালু করিয়াছেন।

রেল ও রাস্তা পরিবহনের প্রতিযোগিতা ও সমন্বয় (Rail-Road Competition and Co-ordination).

১৯৩০ সাল হইতে রেলপথ এবং রাজপথের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হইয়া দেখা দেয়। এই প্রতিযোগিতার ফলে উভয়প্রকার যানেরই আয় হ্রাস এবং ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ওয়েজউড (Wedgewood) কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় যে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্যের অর্ধেকাংশে রেলপথ এবং পাকা রাস্তা সমান্তরালভাবে চলিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে রেলপথ বহুল পরিমাণে স্বল্প দূরগামী যাত্রী এবং মাল হারাইয়াছে। মোটরযান ভাড়া হ্রাস করিয়া রেলপথ দ্বারা পরিবাহিত মাল হস্তান্তরিত করিয়া লইয়াছে।

রেল-পরিবহণ অপেক্ষা মোটর পরিবহণের প্রসারের কয়েকটি কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ ইহা দ্রুত, নমনীয় এবং ব্যক্তিগত সেবা প্রদানে সক্ষম। মোটরযান মাল প্রেরণকারীর দরজায় উহা পৌঁছাইয়া দিতে পারে। রেলপরিবহনে ইহা সম্ভবপর নয়। অনেকক্ষেত্রে ইহা রেলপথ অপেক্ষা দ্রুত পরিবহণের ব্যবস্থা করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, স্বল্প দূরগামী পরিবহণের জন্য রাজপথ রেলপথ অপেক্ষা শ্রেয়। ইহা প্রয়োজন মত পথ পরিবর্তন করিতে পারে কিন্তু রেলপথের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নয়। তৃতীয়তঃ, একসঙ্গে বহু মাল স্থানান্তরে লইয়া যাইতে রেলপথ সুবিধাজনক কিন্তু সামান্য পরিমাণ মাল পাঠাইতে মোটরযানই সুবিধাজনক। আমাদের দেশের কৃষকেরা সাধারণতঃ ছোট আয়তনের জমি চাষ করে বলিয়া তাহারা কম পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়া থাকে।

মোটর পরিবহনের আপেক্ষিক সুবিধা

চতুর্থতঃ মোটরযান নির্মাণে অনেক কম পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয় অপরপক্ষে রেলপথ নির্মাণের ব্যয় অনেক বেশী। রেলপথ নির্মাণের দায়িত্ব রেলকোম্পানীর, সেই কারণে রেলের ভাড়া বেশী হয় অপরপক্ষে রাজপথ নির্মাণের কোনো দায়িত্ব মোটরযানের মালিকের নয় বলিয়া পথ পরিবহনে ব্যয় রেলপরিবহন অপেক্ষা তুলনামূলক ভাবে কম হয়। পঞ্চমতঃ রেলপরিবহনে মালের ক্ষতি হইবার বা চুরি হইবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। কিন্তু ট্রাকে করিয়া মাল পরিবহণ করিলে উহার মালিকও সেই ট্রাকে থাকিয়া তাহার মালের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিবে। ফলে চুরি বা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনাও এখানে অনেক কম।

রেলপথ ও রাজপথের মধ্যে প্রতিযোগিতার বিষয়টি দুইটি কমিটি কর্তৃক আলোচিত হইয়াছিল; ইহাদের একটি ১৯৩২ সালে নিযুক্ত মিচেল-কার্কনেস কমিটি (Michel-Kirkness Committee) এবং অপরটি ১৯৩৭ সালে নিযুক্ত ওয়েজউড রেলওয়ে এনকোয়ারী কমিটি (Wedgewood Railway Enquiry Committee)। রেলপরিবহন এবং মোটর পরিবহন সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয়করণ ব্যতীত ইহাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা কঠিন কিন্তু ওই সময় পথপরিবহন রাষ্ট্রীয়করণ করা সম্ভবপর ছিল না। সেই কারণে ওয়েজউড কমিটির সুপারিশ অনুসারে মোটর পরিবহনের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৩৯ সালে মোটরযান আইন (Motor Vechicles Act) পাশ করা হয়।

মোটরযান আইন

মোটর পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করিয়া সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। ইহা অনস্বীকার্য যে রেলপরিবহন ও মোটর পরিবহন উভয় প্রকার যানেরই পরিবহন ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। এই দুই প্রকার পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে এরূপভাবে মালপত্র ভাগ করিয়া দিতে হইবে যাহাতে জনসাধারণ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকৃত হয়। স্বল্প দূরবর্তী অঞ্চলে অথবা দ্রুত মাল প্রেরণের জন্য মোটরযান অধিকতর উপযোগী। গ্রামের সহিত শহরের যোগসূত্র স্থাপনের ইহাই একমাত্র উপায়। অপরপক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলে অথবা ভারী মাল প্রেরণের জন্য রেলপরিবহন অধিকতর উপযোগী। এইভাবে দেখা যায় যে প্রত্যেকেরই একটি পৃথক কার্যক্ষেত্র রহিয়াছে এবং একে অন্যের প্রতিযোগী না হইয়া পরিপূরক হইতে পারে।

বর্তমানে পরিবহনের চাহিদা বৃদ্ধি, পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি এবং পথপরিবহনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয়করণের ফলে রেলপরিবহন এবং পথপরিবহনের প্রতিযোগিতার তীব্রতা কমিয়া গিয়াছে। পথপরিবহন সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী নীতিনির্ধারণের জন্য ভারত সরকার ১৯৫৯ সালে পথপরিবহন পুনর্গঠন কমিটি (Road Transport Reorganisation Committee) গঠন করেন এবং ১৯৬১ সালে ওই কমিটি তাহার রিপোর্ট পেশ করে। পথপরিবহনের ক্ষেত্রে যে সকল অসুবিধা দেখা দিয়াছে তাহা এই কমিটি নির্দেশ করিয়াছে। এই কমিটির মতে রেলপথ ও মোটরযানের মধ্যে সমন্বয়ের ফলে পথ-পরিবহনকে সংকুচিত করা হইতেছে। এই কমিটি মোটরযানকে পারমিট দেওয়ার নীতির এবং প্রশাসনিক পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করিয়াছে।

ভারতীয় বিমানপথ (Civil Air Transport): বর্তমান যুগ গতির যুগ এবং বিমান পরিবহন সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী পরিবহন। ভারতের মতো সুবৃহৎ দেশে বিমানপথের গুরুত্ব অপরিসীম। বিমানপথ বহু সময় ও অসুবিধা লাঘব করে এবং ব্যবসায়ী, সরকারী অফিসার প্রভৃতি লোকের দ্রুত যাতায়াতে সহায়তা করে। বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিমানপথের গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। বিমানপথের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত থাকিতে পারে না।

দুঃখের বিষয় ভারতে বিমান পরিবহন আজও শৈশবাবস্থায়। যদিও ১৯১১ সাল হইতে ভারতে বিমান চলাচল সুরু হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছু উন্নতি হয়, সত্যকার উন্নতি হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তীকাল হইতে। বিমান পরিবহনের ক্রম বিবর্তনের পথে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে: (১) ১৯২৭ সালে সিভিল এ্যাভিয়েসন ডিপার্মেণ্ট খোলা হয় এবং ১৯২৮ সালে কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই এবং করাচীতে ফ্লাইং ক্লাব খোলা হয়। ওই সময় হইতেই পাইলট এবং টেকনিসিয়ানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২৯ সালে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ সারভিস নিউ দিল্লী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়; (২) ১৯৩২ সালে এলাহাবাদ, কলকাতা, এবং কলম্বোর মধ্যে টাটা এয়ারওয়েজ লিমিটেড আভ্যন্তরীণ পরিবহণের ব্যবস্থা করে; (৩) ১৯৩৮ সালে এম্‌পায়ার এয়ারমেল পরিকল্পনা সুরু হয় কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় ইহা বন্ধ হইয়া যায়; (৪) ১৯৪৬ সালে ভারত সরকার যে

বিমানপথ নীতি নির্ধারণ করেন তদনুসারে কয়েকটি প্রাইভেট কোম্পানীর মধ্য দিয়া আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহনকে উৎসাহিত করা হয়। ১৯৪৬ সালে বিমান পরিবহণ লাইসেন্সিং বোর্ড (Air Transport Licensing Board) স্থাপিত হয়। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা এই বোর্ডকে দেওয়া হয়। (৫) টাটার সহযোগিতায় ভারত সরকার আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহনের জন্য এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশন্যাল স্থাপন করেন।

১৯৫১ সালে ভারত সরকার বিমান পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজ্যাধ্যক্ষ কমিটি (Rajadhyaksha Committee বা Air Transport Enquiry Committee) নিয়োগ করেন। এই কমিটি বে-সরকারী বিমান চলাচল জাতীয়করণ করার সুপারিশ করেন। জাতীয়করণের স্বপক্ষে প্রধান প্রধান যুক্তিগুলি এইরূপ: (১) বে-সামরিক বিমান চলাচলকে দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার অংশ হিসাবে দেখাই উচিত—সেই কারণে ইহা পরিচালনার ভার রাষ্ট্রের হাতেই থাকা সমীচীন; (২) ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিমান চলাচলের যথাযোগ্য উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণ করা সম্ভবপর নয়-সেই কারণে ইহার পরিচালনা ভার রাষ্ট্রের হাতে থাকাই সমীচীন; (৩) বিভিন্ন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে হইলে জাতীয়করণ করা প্রয়োজন; (৪) কয়েকটি বিমান কোম্পানী এরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল যে তাহারা বিমান চলাচল বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল।

রাজ্যাধ্যক্ষ কমিটি

রাজ্যাধ্যক্ষ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৩ সালে বিমান পরিবহন কর্পোরেশন আইন (Air Transport Corporation Act, 1953) পাশ করিয়া ভারত সরকার বে-সামরিক বিমান চলাচল জাতীয়করণ করেন। জাতীয়করণের পর বিমান চলাচলের ভার দুইটি নব গঠিত কর্পোরেশনের উপর দেওয়া হয়। একটির নাম হইল ভারতীয় বিমানপথ কর্পোরেশন (Indian Air Lines Corporation)—ইহা আভ্যন্তরীণ বিমানপথগুলির পরিচালনা করিবে, অপরটি নাম হইল ভারতীয় আন্তর্জাতিক বিমান পথ (Air India International)—ইহা ভারত ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বিমান চলাচল পরিচালনা করিবে। ১৯৫৫ সালে বিমান পরিবহন পরিষদ (Air Transport Council) স্থাপিত হইয়াছে।

দমদম, সান্তাক্রুজ এবং পালাম ভারতের প্রথম শ্রেণীর বিমান বন্দর। দেশের বিভিন্ন স্থানে ৮৫টি বিমান ঘাঁটি সরকারের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। টেকনিক্যাল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে এলাহাবাদে। ১৯৪০ সালে যুদ্ধের তাগিদে ব্যাঙ্গালোরে "হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফট্ কর্পোরেশন" স্থাপিত হয়।

১৯৩৮ সালে ২১০৪ জন যাত্রী এবং ২৪ টন মাল বিমানপথে পরিবাহিত হইয়াছিল। ১৯৪৭ সালে ১৩৬,৮০৬ জন যাত্রী, ১১২০ টন মাল বিমানপথে পরিবাহিত হয়। ১৯৫৮ সালে ভারতীয় বিমান পথে ৭ লক্ষ যাত্রী পরিবাহিত হইয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনায় বে-সামরিক বিমান পরিবহণ খাতে ৯'৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩০'৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়—ভারতীয় বিমানপথ কর্পোরেশনের জন্য ১৬ কোটি টাকা এবং ভারতের আন্তর্জাতিক বিমানপথের জন্য ১৪'৫ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিমান পরিবহন খাতে ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

জলপথ পরিবহন : জাহাজ শিল্প (Water Transport : Shipping) : ভারতীয় জলপথ পরিবহনকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—আভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহন এবং সামুদ্রিক পরিবহন। ভারতের আভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথের দৈর্ঘ্য পাঁচ হাজার মাইলের মতো। গংগা, ব্রহ্মপুত্র, কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী, মহানদী এবং ইহাদের শাখা প্রশাখার মধ্য দিয়া নৌকা ও ষ্টীমার যাতায়াত করিয়া থাকে। দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ইহাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামুদ্রিক পরিবহনকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—উপকূলীয় পরিবহন (Coastal Shipping) এবং গভীর সমুদ্র পরিবহন (Marine Shipping). ভারতের উপকূলভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬০০ মাইল। সামুদ্রিক পরিবহনের প্রসার শুধুমাত্র বাণিজ্যের জন্যই প্রয়োজন নয়, প্রতিরক্ষার জন্যও উহাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

পূর্বে যখন কাঠের তৈয়ারী জাহাজের প্রচলন ছিল তখন জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ভারতের এক গৌরবময় স্থান ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ইস্পাত নির্মিত এবং বাষ্প-চালিত জাহাজের আবিষ্কার ও বৃটিশের বিরুদ্ধাচরণ এই ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস সাধন করে। গান্ধীজী যথার্থই বলিয়াছেন যে নিজেদের জাহাজশিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য বৃটিশ ভারতীয় জাহাজ শিল্পকে বিনষ্ট করিয়াছে।

এই শিল্পের ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন নিম্নলিখিত কারণে : প্রথমতঃ, ভারতের সৈকতরেখা প্রায় ৩৬০০ মাইল দীর্ঘ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারত ষষ্ঠস্থান অধিকার করে। ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানতঃ জলপথের উপর নির্ভরশীল। দেশ-বিভাগের পূর্বে ভারতের মোট বহির্বাণিজ্যের শতকরা ৯৮ ভাগ জলপথে চলিত। এইরূপ অবস্থায় নৌবহরের বিশেষ প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতের সমুদ্রবাহিত এবং উপকূল বাণিজ্যের যথাক্রমে ৫% এবং ২১% ভারতীয় নৌবহর দ্বারা পরিচালিত হয়। বাকী অংশ বৈদেশিক জাহাজ দ্বারা পরিবাহিত হয়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রনৈতিক নিরাপত্তার দিক হইতেও উন্নততর ও শক্তিশালী নৌবহর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিশ্বের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তেজনাপূর্ণ এবং এরূপ অবস্থায় শক্তিশালী নৌবহর গড়িয়া তুলিতে না পারিলে নবলব্ধ স্বাধীনতা বিপন্ন হইবার যথেষ্ট আশংকা রহিয়াছে।*

* "A mercantile marine is a second line of defence in times of crisis. It serves not only as an auxiliary force but also as a training ground for the navy besides being indispensable for the carriage of essential supplies from overseas in times of war"

চতুর্থতঃ, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের ৩% কিন্তু মোট ভারতীয় (জাহাজী) টনের পরিমাণ পৃথিবীর মোট টনের মাত্র ½%; আন্তর্জাতিক জগতে ভারতীয় জাহাজ ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের মাত্র ৫০% বহন করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভারতের নিজস্ব বাণিজ্য পরিচালনার জন্যও জাহাজ শিল্পের উন্নয়ন প্রয়োজন।

পঞ্চমতঃ, দেশে জাহাজ নির্মাণের উপযোগী কাঁচামাল (যেমন লৌহ, কাঠ, কয়লা জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি) এবং সুলভ শ্রমিকের অভাব নাই। এই সকল দ্রব্যসামগ্রীর যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া আমরা উন্নততর জাহাজশিল্প গড়িয়া তুলিতে পারিব।

ষষ্ঠতঃ, যদি আমরা নিজস্ব জাহাজশিল্প গড়িয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে ভারতীয় শিল্পের পরিবহন খরচ হ্রাস পাইবে এবং বৈদেশিক বাজারে ইহার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়িবে। যদি দ্রব্যসামগ্রী ভারতীয় জাহাজে পরিবাহিত হয় তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার খরচ বাঁচিয়া যায়।

ভারতীয় জাহাজ শিল্প ধীরে ধীরে উন্নতি করিতেছে। এই উন্নয়নের পথে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। (১) ভারতে বৃটিশ শাসনের সময় বৃটিশ ও বৈদেশিক প্রতিযোগিতা ভারতীয় জলযান শিল্পকে মাথা তুলিতে দেয় নাই। বিদেশী কোম্পানীগুলি ভাড়া ও মাশুল কমাইয়া ভারতীয় জাহাজশিল্পকে দাবাইয়া রাখে; (২) বৃটিশ শাসনকালে সরকার ভারতীয় জাহাজশিল্পকে কোনো সাহায্য দেয় নাই এবং অবাধ বাণিজ্যের নামে ভারতীয় উদ্যোগকে অবহেলা করা হয়। এই অবস্থায় ভারতীয় জাহাজশিল্প বিশেষ উন্নতি করিতে পারে নাই। স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার এই শিল্পকে সাহায্যদান (subsidies) করিয়াছেন; ১৯৪৮ সালে লাইসেন্স প্রথার প্রবর্তনের দ্বারা উপকূল বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং ১৯৫২-৫৩ সালে সম্পূর্ণ উপকূলবাণিজ্য ভারতীয় জাহাজ দ্বারা পরিবাহিত হয়; (৩) পূর্বে ভারতীয় জাহাজ দ্বারা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য কিছু পরিমাণে চলিত কিন্তু এই সকল জাহাজ আয়তনে অতি ক্ষুদ্র ছিল; (৪) জাহাজ শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজন পোতাশ্রয় এবং বন্দর কিন্তু ভারতে ইহাদের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। ভারতের ৩৬০০ মাইল দীর্ঘ উপকূল রেখায় বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কোচিন, বিশাখাপত্তম এবং কান্দালা—মাত্র এই ছয়টি প্রধান বন্দর রহিয়াছে।

১৯৪৭ সালে সরকার জাহাজ পরিবহণ নীতি কমিটি (Shipping Policy Committee) নামে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নলিখিতরূপ:

(১) ভারতীয় জাহাজের মালবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ২০ লক্ষ টন করিতে হইবে; (২) ভারতীয় বাণিজ্যের ১০০% ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলির থাকিবে; (৩) বার্মা, সিংহল ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের ৭৫% ভারতীয় জাহাজ দ্বারাই পরিবাহিত হইবে, (৪) দূরবর্তী দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের ৫০% ভারতীয় জাহাজগুলির দ্বারাই পরিবাহিত হইবে; (৫) অক্ষশক্তিগুলি (Axis) প্রাচ্যদেশসমূহে যে

পরিমাণ বাণিজ্য করিত তাহার ৩০% ভারতীয় জাহাজ দ্বারা পরিবাহিত হইবে; (৬) সরকারী নীতি জাহাজ শিল্প সম্প্রসারণের অনুকূল হইবে এবং মাশুল কমাইয়া প্রতিযোগিতার হাত হইতে ইহাকে রক্ষা করিবে।

প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাতে ভারতীয় জাহাজের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টন। প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ইহাকে বাড়াইয়া ৭ লক্ষ টনে পরিণত করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল আরও ৩ লক্ষ টন জাহাজী শক্তি বৃদ্ধি করা। প্রথম পরিকল্পনায় জাহাজ শিল্পের উন্নয়নের জন্য ২৬'৩ কোটি টাকা ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৫ কোটি বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় জাহাজশিল্প, বন্দর এবং লাইটহাউস উন্নয়নের জন্য ১৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে কোচিনে পোতাশ্রয় নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৯৫৮ সালের জাহাজ চলাচল আইন অনুসারে (Merchant Shipping Act) একটি জাহাজ পরিবহণ বোর্ড (National Shipping Board) গঠন করা হইয়াছে। জাহাজ পরিবহনের ব্যাপারে ইহা সরকারকে পরামর্শ দিবে এবং একটি জাহাজ উন্নয়ন ফাণ্ড (Shipping Development Fund) গঠন করা হইয়াছে।

EXERCISE

প্রথম অধ্যায়

1. Discuss the role that Cottage and Small Industries can play in the economic development of India. [পৃষ্ঠা ১৬৭-৭১]

2. Explain the difficulties faced by the small scale industries in India and comment on the measures adopted by the Government to deal with them. [পৃষ্ঠা ১৭২-৭৩]

3. Give a critical estimate of the measures adopted by the Government of India for the development of Small Scale Industries. [পৃষ্ঠা ১৭৪-৭৮]

4. Write a short note on Industrial Estates. [পৃষ্ঠা ১৭৯-৮০]

দ্বিতীয় অধ্যায়

5. Consider the present position and future prospects of the Jute Industry in India. [পৃষ্ঠা ১৮০-৮১]

6. What problems have been faced by the Indian Cotton mill Industry ? What measures would you suggest to improve the present position of the Industry. [পৃষ্ঠা ১৮২-৮৬]

7. Give a short account of the Iron and Steel Industry in India. What steps are being taken by the Government to develop it and increase its targets of production. [পৃষ্ঠা ১৮৬-৮৯]

8. Give an account of the present position and future prospects of Paper Industry in India. [পৃষ্ঠা ১৯২-৯৩]

9. Trace the growth and the present position of the Coal Mining Industry. What problems and being faced by the industry at present ? [পৃষ্ঠা ১৯৩-৯৫]

10. Trace the development of Tea Plantation Industry in India and consider the problems that are being faced by the Industry at present. [পৃষ্ঠা ১৯৬-৯৭]

তৃতীয় অধ্যায়

11. Examine the cause for rationalisation of industries in India under present conditions. What safeguards would you like to adopt in introducing schemes of rationalisation in Indian Industries ? [পৃষ্ঠা ২০২-৬]

12. Discuss the main features of the Industrial Policy of the Government of India as enunciated from time to time. (C. U. B. Com. 1955, 59) [পৃষ্ঠা ২১১-১৩]

13. Comment on the present Industrial Policy of the Government of India. (C U. 1955) [পৃষ্ঠা ২১৪-১৯]

14. Write a short note on the Industries (Development and Regulation Act) 1951. [পৃষ্ঠা ২১৩-১৪]

15. "The Indian Fiscal Commission 1949-50 approached their task from a new angle of vision and laid down new principles of protection." Elucidate this statement. [পৃষ্ঠা ১৯৮-২০১]

চতুর্থ অধ্যায়

16. Discuss the causes of low efficiency of Indian labour and suggest measures for improving it. [পৃষ্ঠা ২২১-২৫]

17. Trace the growth of the Trade Union Movement in India What obstacles have stood in the way of the development of the movement ? [পৃষ্ঠা ২২৫-২৭]

18. Point out the main features of the growth of Trade Union Movement in India. What are its major drawbacks ? [পৃষ্ঠা ২২৮-৩১]

19. Discuss the causes of Industrial Disputes in India. What measures have been taken to promote industrial peace in the country.
(C. U. B. A. 1951, '52, '57, '58, '60, B. Com. 1954) [পৃষ্ঠা ২৩১-৩৩]

20. Describe and comment on the measures adopted by the Government to settle industrial disputes in India. [পৃষ্ঠা ২৩৩-৩৪]

21. Discuss the causes of Industrial disputes in recent years in India. How far would you favour compulsory arbitration as a means of settling such disputes at the present time ? (C.U B. Com. 1953, '56, B. A. 1954, '57) [পৃষ্ঠা ২৩৪-৩৫]

22. Examine the existing machinery for the settlement of Industrial Disputes in India. [পৃষ্ঠা ২৩৫-৩৬]

23. What measures have been taken in recent years to provide social security to Industrial workers ? Give your answer with special referance to Employees' State Insurance Scheme. (C. U. B. A. 1953) [পৃষ্ঠা ২৩৯-৪১]

24. Describe and comment critically on the industrial dispute legislation in India. [পৃষ্ঠা ২৩১-৩৩]

25. Explain the present position of the legal machinery for the settlement of industrial disputes in India. How far would you think compulsory arbitration would be an effective measure for settling industrial disputes in the country ?
[পৃষ্ঠা ২৩৩-৩৪]

26. Would you advocate minimum wages for Industrial workers in India ? Discuss the principles that may be followed in fixing minimum wages.
(C. U. B. Com. 1958, '59) [পৃষ্ঠা ২৩৬-৩৭]

27. Write a note on profit sharing in India. [পৃষ্ঠা ২৩৭-৪০]

28. Examine the main features of the Minimum Wages Act, 1948. Discuss the principles that have been followed in fixing minimum wages in 'ndia.
(C. U. B. Com. 1948) [পৃষ্ঠা ২৪০-৪১]

29. Analyse the causes of growing unemployment in India. Suggest remedies to tackle the same. (C. U. B. Com. 1954) [পৃষ্ঠা ২৪১-৪৫]

30. Describe the principal measures adopted in recent years by the Government of India to promote the welfare of industrial labour. [পৃষ্ঠা ২১০-২৩]

31. Examine the causes and extent of unemployment existing at present in this country. What provisions have been made in the Second and Third Five Year Plan to solve the problem ? [পৃষ্ঠা ২৪১ ৪৮]

32. What measures would you advocate for solving the present day problem of unemployment in India ? [পৃষ্ঠা ২৪৬-৫৪]

33. Write a note on the Labour Policy under the Third Five Year Plan.
[পৃষ্ঠা ২৫৭-৫৯]

পঞ্চম অধ্যায়

34 Examine the case for and against encouraging the flow of foreign capital into India under existing circumstances. [পৃষ্ঠা ২৬০-৬৪]

35. Discuss fully the economic effect of the employment of foreign capital in India. (C. U. B. Com.'48,'54) [পৃষ্ঠা ২৬০-২৬১]

36. Give a critical estimate of the Government of India's policy regarding Foreign Capital (C. U. B. A. 1920, B. A. (Hons) 1958) [পৃষ্ঠা ২৬৫-২৬৬]

ষষ্ঠ অধ্যায়

37. "The Managing Agency System has outlived its utility." Discuss this statement. (C. U. B. Com. 1951) [পৃষ্ঠা ২৬৬-৬৭]

38. Give your own evaluation of the part played by the Managing Agency System in India's economic development. (C. U. B. Com. 1959, B. A. 1960)
[পৃষ্ঠা ২৬৮-৭০]

39. How far is it necessary to do away with the system of managing agency system in this country ? Give full reasons. (C. U. B. Com. 1955) [পৃষ্ঠা ২৬৬-৬৮]

সপ্তম অধ্যায়

40. Describe the organisation and functions of the Industrial Finance Corporation of India and comment upon its working.

[পৃষ্ঠা ২৭৩-৭৬]

41. Examine the main financial requirements of large scale industries in India. What part has been played by the Industrial Finance Corporation in meeting these requirments. [পৃষ্ঠা ২৭৫-৭৬]

42. Give an account of the special agencies that have been set up in India after World War II for providing long term finance to private industry.

[পৃষ্ঠা ২৭৬-৮০]

43. Consider the financial problems of small and medium scale industries in India and discuss the measures that have been adopted in recent years to solye these problems. [পৃষ্ঠা ২৮০-৮৪]

44. Give a critical account of the working of the institutions set up in India for long term financing of industries. [পৃষ্ঠা ২৭৩-৭৬]

অষ্টম অধ্যায়

45. Write a note on Railway Finance. [পৃষ্ঠা ২৭৮-৮৯]

46. Write a short note on rail-road co-ordination [পৃষ্ঠা ১৯২-৯৫]

47. Point out the importance of the transport system under planned economic development, [পৃষ্ঠা ২৮৯-৯৩]

48. Write a note on the Ship-building Industry of India. [পৃষ্ঠা ২৯৫-৯৭]

যে শিক্ষায় শুধু মেরুদণ্ডহীন গ্র্যাজুয়েট তৈরী হয়, মনুষ্যত্বের সঙ্গে পরিচয় হয় না, যে শিক্ষা আমাদের করে খেতে শেখায় না, দুর্বল অসহায় শিশুর মত সংসারপথে ছেড়ে দেয়, সে শিক্ষার প্রয়োজন কি? তাই আমি জীবনে কঠোরতার আশ্রয় করে বাঙ্গালী যুবকদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষা করতে আহ্বান করছি।

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

তৃতীয় খণ্ড

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্ধং কৃষিকর্মণি
তদর্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থা

(Indian Banking System)

[বিষয়বস্তু : ভারতীয় টাকার বাজার ও উহার বৈশিষ্ট্য—দেশীয় ব্যাংকার—ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক—রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী—ভারতের যৌথ পুঁজিব্যাংক—বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক—ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক—ভারতীয় টাকার বাজারের উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ—রিজার্ভ ব্যাংক ও ঋণনিয়ন্ত্রণ—রিজার্ভ ব্যাংকের কাজের মূল্যায়ন : সাফল্য ও ব্যর্থতা—বিলবাজার পরিকল্পনা—আমানতবীমা কর্পোরেশন—বাণিজ্যব্যাংকের জাতীয়করণ—ব্যাংক আইন—ভারতীয় ব্যাংক ব্যবস্থার ত্রুটি]

ভারতীয় টাকার বাজার ও তাহার বৈশিষ্ট্য (Indian Money Market and its Characteristics) : টাকার বাজার এবং ব্যাংকব্যবস্থা দেশের অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অংশ। উন্নত এবং সুসংগঠিত টাকার বাজার ও ব্যাংক ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির চিহ্ন। ব্যবসা-বাণিজ্যে সব সময়ই স্বল্পকালীন ঋণের প্রয়োজন হয়। ঋণ ব্যতীত আধুনিক বৃহদায়তন ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতে পারে না। আবার অনেক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যাহারা ঋণদান করিয়া সুদ উপার্জন করিতে আগ্রহী। যে বাজারে স্বল্পমেয়াদী ঋণের আদান প্রদান হয় তাহাকেই টাকার বাজার (Money Market) বলে।

উন্নত টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য

সুসংগঠিত এবং সম্প্রসারণশীল টাকার বাজার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রয়োজনীয় সর্ত। উন্নত টাকার বাজারে এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।* প্রথমতঃ দেশে সুসংগঠিত ব্যাংক ব্যবস্থা থাকা চাই। ব্যাংকই স্বল্পমেয়াদী ঋণের প্রধান কারবারী। টাকার বাজারকে সুসংগঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, সকল সংগঠিত টাকার বাজার বিশেষ বিশেষ ধরণের ঋণদান কার্যে পারদর্শী উপবাজার (sub-markets) সৃষ্টি করে। যেমন, বাণিজ্যবিল বাজার, ট্রেজারী বিল বাজার, বা কললোন (call-loans) বাজার ইত্যাদি। এই ধরণের উপবাজারের সংখ্যা যত অধিক হইবে টাকার বাজার তত বিস্তৃত এবং উন্নত হইবে। তৃতীয়তঃ, এই সকল উপবাজার মোটামুটি প্রতিযোগিতামূলক হইবে। চতুর্থতঃ, প্রত্যেকটি উপ-বাজার সক্রিয় হইবে এবং ইহাদের সম্বল চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত হইবে। পঞ্চমতঃ, সমগ্র টাকার বাজারের কাঠামো সুসম্বদ্ধ হইবে এবং ইহার প্রত্যেকটি উপ-বাজার অপর উপ-বিভাগের উপর নির্ভরশীল হইবে। পরিশেষে, উন্নত টাকার বাজার

---

1. Dr. S. N. Sen. Central Banking in Undeveloped Money Market.

এরূপভাবে সংগঠিত হইবে যাহাতে আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

ভারতের টাকার বাজার প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—সুসংগঠিত এবং অসংগঠিত বাজার। সুসংগঠিত টাকার বাজারকে ইউরোপীয় টাকার বাজার (European Money Market) এবং অসংগঠিত টাকার বাজারকে ভারতীয় টাকার বাজার (Indian Money Market) বলা হয়। রিজার্ভ ব্যাংক, স্টেট-ব্যাংক, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক, ভারতীয় যৌথমূলধনী ব্যাংক, জমিবন্ধকী ব্যাংক, শিল্পব্যাংক প্রভৃতি লইয়া ভারতীয় সুসংগঠিত টাকার বাজার গঠিত। ভারতীয় টাকার অসংগঠিত বাজার দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ীদের লইয়া গঠিত। মহাজন, সাহুকর, স্রফ, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি ব্যাংক ব্যবসায়ীগণ এই শ্রেণীতে পড়ে। ইহারা সনাতন পদ্ধতিতে ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। ভারতের এই দুইটি টাকার বাজার—সুসংগঠিত ও অসংগঠিত তথা ভারতীয় ও ইউ-রোপীয়—পরস্পরের সহিত সম্পর্কবিহীন। বর্তমানে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, রাজ্য ফিনান্সকর্পোরেশন, শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন (NIDC) এবং শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন (ICIC) স্থাপিত হইয়াছে এবং ভারতীয় টাকার বাজারে ইহারা উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতেছে।

ভারতীয় টাকার বাজারের দুইটি অংশ

ভারতীয় টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উহার ত্রুটির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, ভারতীয় টাকার বাজার সুসংগঠিত নয় এবং ইহা অসমজাতীয় উপাদানে গঠিত। বাজারের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সহিত সম্পর্কবিহীন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। ভারতে ৮৬,৭৭২ জন লোক পিছু একটি করিয়া ব্যাংক প্রতিষ্ঠান পড়ে। অপরপক্ষে ইংলণ্ডে ৪৮১৬ জন লোক পিছু একটি করিয়া ব্যাংক পড়ে। ভারতে মাথাপিছু ব্যাংক আমানতের পরিমাণ মাত্র ৫২ টাকার মতো। তৃতীয়তঃ, ভারতের গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয় নাই। যেটুকু উন্নতি হইয়াছে তাহা নগরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রীয় ব্যাংক আধুনিক কালে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছে। চতুর্থতঃ, টাকার বাজার সুসম্বদ্ধ নয় বলিয়া দেশের বিভিন্ন অংশে বহু প্রকার সুদের হার প্রচলিত রহিয়াছে। সুদের হার ৭ টাকা হইতে ১৫ টাকার মধ্যে উঠানামা করে। পঞ্চমতঃ, ভারতে এখনো পর্যন্ত বিলবাজার সুসংগঠিত ভাবে গড়িয়া ওঠে নাই। ১৯৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাংক বিল বাজার পরিকল্পনার দ্বারা ভারতে বিল বাজারের অভাব পূরণে যত্নবান হইয়াছে। ষষ্ঠতঃ, আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে টাকার বাজার একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত কিন্তু ভারতের টাকার বাজার দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া রহিয়াছে। বোম্বাই এবং কলকাতা ভারতের দুইটি প্রধান টাকার বাজার। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক টাকা বাজার বিভিন্ন-স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। দেশের আয়তনের বিশালতা এবং পরিবহন ও অর্থপ্রেরণ ব্যবস্থার অনুন্নতির জন্য টাকার বাজার কেন্দ্রীভূত হইতে পারে নাই।

টাকার বাজারের ত্রুটি

এই কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে সুদের হারের পার্থক্য হইয়া থাকে। সপ্তমতঃ, রিজার্ভ ব্যাংক এখনো পর্যন্ত টাকার বাজারের উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন ক'রতে পারে নাই। ভারতীয় টাকার বাজারের অসংগঠিত অংশ রিজার্ভ ব্যাংকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। অষ্টমতঃ, ভারতের টাকার বাজারে বিদেশী ব্যাংকের প্রভাব খুবই বেশী। ইহা ভারতীয় টাকার বাজারের অন্যতম ত্রুটি। পরিশেষে, ভারতে ব্যাংক ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার না হওয়ার ফলে ইহাদের আর্থিক সম্বল প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। ব্যাংকের পুর্ণবাট্টাযোগ্য সম্পত্তির (assets) পরিমাণ কম।

দেশীয় ব্যাংকার (Indigenous Bankers) ঃ ভারতের টাকার বাজারকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—সংগঠিত বাজার এবং অসংগঠিত বাজার। ভারতীয় টাকার অসংঠিত বাজার দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ীদের লইয়া গঠিত। মহাজন, সাহুকর, স্রফ, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি ব্যাংক ব্যবসায়ীগণ এই শ্রেণীতে পড়ে। ইহারা সনাতন পদ্ধতিতে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। ভারতীয় টাকার বাজারে এই দেশীয় ব্যাংকারগণ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ১৯৬২ সালে ভারতে ৩০১৮টি শহর এবং ৫৫৮০৪৯টি গ্রাম ছিল আর ওই সময় ব্যাংককার্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫১৬০টি। অধিকাংশ ব্যাংকই শহরাঞ্চলে অবস্থিত, গ্রামাঞ্চলে পূর্ণভাবে এবং নগরাঞ্চলে আংশিকভাবে দেশীয় ব্যাংকারগণই ব্যাংকব্যবসা পরিচালনা করিয়া থাকে। ইহারা এখনো ভারতের টাকার বাজারের শতকরা ৫০ ভাগ অধিকার করিয়া আছে।

শ্রেণী বিভাগ

দেশীয় ব্যাংকারদিগকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, সেই সকল ব্যক্তি যাহাদের প্রধান কারবার ব্যাংকিং। দ্বিতীয়তঃ, সেই সকল ব্যক্তি যাহারা ব্যাংক কারবারের সহিত অন্যান্য কারবারও করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, সেই সকল ব্যক্তি যাহারা প্রধানতঃ ব্যবসায়ী কিন্তু উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাংক কারবারে নিয়োগ করে। অধিকাংশ দেশীয় ব্যাংকার দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।

দেশীয় ব্যাংকারগণ সাধারণতঃ নিজস্ব মূলধন লইয়া কারবার পরিচালনা করে। যৌথপুঁজি ব্যাংকগুলির মতো ইহারা সাধারণতঃ জনসাধারণের কাছ হইতে আমানত সংগ্রহ করে না। অবশ্য কেউ কেউ আত্মীয় এবং বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে।

[…]দের কার্যাবলী

দেশীয় ব্যাংক-কারবারীদের প্রধান কার্য হইল ব্যবসায়ী, কৃষক, এবং কারিগরদের ঋণ প্রদান করা। সোনা, অলংকার, জমি, হুণ্ডি বা প্রমিসারী নোটের জামিনে ইহারা ঋণ দিয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত জামিনে ঋণ দেওয়া হয়। ইহাদের ঋণদান পদ্ধতি যৌথ পুঁজি ব্যাংক অপেক্ষা অনেক সরল এবং ইহারা এমন বহু ঋণপত্র গ্রহণ করে যাহা যৌথ পুঁজি ব্যাংক জামিন হিসাবে গ্রহণ করিবে না। দ্বিতীয়তঃ ইহারা হুণ্ডি লইয়া

কারবার করে এবং টাকা স্থানান্তর করণে সহায়তা করে। তৃতীয়তঃ গ্রামাঞ্চল হইতে শহর বা নগরের পণ্যবিক্রয়কেন্দ্রে পণ্য পরিবহণে ইহারা ঋণদান করিয়া থাকে। চতুর্থতঃ, দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ীগণ অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক কারবারের সহিত অন্যান্য কারবারও করিয়া থাকে। সোনারূপার ব্যবসায়, কৃষিজ পণ্য লইয়া কারবার, ফটকা কারবার ইত্যাদি ইহারা করিয়া থাকে।

এই দেশীয় ব্যাংকব্যবস্থায় নানারূপ দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। ইহারা পারিবারিক ভিত্তিতে, সনাতন পদ্ধতিতে ব্যাংকব্যবসায় পরিচালনা করিয়া থাকে। এখনো পর্যন্ত ইহাদের মধ্যে চেক পদ্ধতি এবং আমানত ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ দেশীয় ব্যাংকার ব্যাংক ব্যবসার সহিত অন্যান্য কারবার মিশাইয়া ফেলে; ব্যাংক-কারবারের সহিত অন্যান্য কারবারের সংমিশ্রণ অকাম্য। তৃতীয়তঃ দেশীয় ব্যাংকারদের কারবারে হুণ্ডি এখনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। সেই কারণে বিল-বাজারও সংগঠিত হইতে পারে নাই। চতুর্থতঃ, দেশীয় ব্যাংকারগণ সাধারণতঃ নিজস্ব মূলধনে কারবার গঠন করে বলিয়া যে ধরণের সুদের হার ধার্য করে তাহা সংগঠিত টাকার বাজারে সুদের হারের সহিত সম্পর্কবিহীন। ভারতীয় টাকার বাজারের এই অসংগঠিত অংশ রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে রহিয়া গিয়াছে। অবশ্য বর্তমানে টাকার বাজারের সংগঠিত অংশ এবং অসংগঠিত অংশের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশই ঘনিষ্ঠতর হইতেছে।

দোষত্রুটি

ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of India): ১৯২১ সালে বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাংকের একত্রিকরণের ফলে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার সৃষ্টি হয়। রিজার্ভ ব্যাংক গঠনের পূর্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবেও কাজ করিত। ইহা সরকারের ও অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কাজ করে। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইলে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংক্রান্ত কাজের অবসান হয়। অবশ্য যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাংকের কোন শাখা ছিল না এই ব্যাংকটি সেই সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাংকের এজেন্ট হিসাবে কাজ করিত। এই ব্যাংকটি ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাণিজ্য ব্যাংক এবং বিদেশী কর্তৃত্বে পরিচালিত হইত। ইহা ভারতের টাকার বাজারে বে-সরকারী নেতৃত্ব করিত।

স্বাধীনতা লাভের পর এই ব্যাংকটির বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ আনয়ন করা হয়। ইহা একটি বিদেশী পরিচালিত ব্যাংক এবং ইহার ফলে ভারতীয় টাকার বাজারে বৈদেশিক একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, ঋণদানের ব্যাপারে ইউরোপীয় ফার্মের প্রতি ইহা পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহার করে, ব্যাংকের উচ্চপদে কোনো ভারতীয়কে গ্রহণ করা হইত না, অন্যান্য ভারতীয় বাণিজ্য ব্যাংকগুলি ইহার সহিত প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে পারে না—এই সকল অভিযোগ ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের বিরুদ্ধে আনা হয়। অবশেষে ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে সারাভারত গ্রাম্য ঋণ জরিপ

জাতীয়করণের স্বপক্ষে যুক্তি

কমিটির সুপারিশ অনুসারে ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে জাতীয়করণ করিয়া উহার ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া নামকরণ করা হয়। জাতীয়করণের সময় ইহার ৭২২টি শাখা ছিল।

রাষ্ট্রীয় ব্যাংক আইনানুসারে ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে ২০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন এবং ৫.৬ কোটি টাকা আদায়ীকৃত মূলধন লইয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাংক কাজ শুরু করে। এই ব্যাংকের পরিচালনা ভার ২০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় বোর্ডের উপর ন্যস্ত আছে। এই বোর্ড এইভাবে গঠিত হইয়াছে: (১) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতি, (২) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত দুইজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর, (৩) শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নির্বাচিত ছয়জন সদস্য, (৪) রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আটজন সদস্য, (৫) রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত একজন সদস্য এবং (৬) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য। কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে একটি করিয়া লোকাল বোর্ড আছে।

গঠন

যদিও রাষ্ট্রীয় ব্যাংক একটি সাধারণ বাণিজ্য ব্যাংক, কিন্তু ভারতীয় টাকার বাজারে ইহা এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রথমতঃ, অন্যান্য ভারতীয় ব্যাংকসমূহ ভারতীয় কোম্পানী আইনানুসারে (Indian Companies Act) সংগঠিত কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের গঠন এবং কার্যাবলী একটি পৃথক আইনানুসারে নির্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ প্রথম হইতেই ইহা সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ইহা ততদিন সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কাজ করিয়াছিল এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যান্য কয়েকটি কাজও করিত। কিন্তু অন্য কোনো ব্যাংক এই ধরনের কাজ করে নাই। তৃতীয়তঃ, যে অঞ্চলে রিজার্ভ ব্যাংকের কোনো শাখা নাই সেখানে ইহা রিজার্ভ ব্যাংকের এজেণ্ট হিসাবে কাজ করে। চতুর্থতঃ, ইহা ভারতের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য ব্যাংক। ইহার মোট আমানতের পরিমাণ ২৩০ কোটি টাকা অর্থাৎ সকল তপশীলভুক্ত ব্যাংকের মোট আমানতের শতকরা ২৬ ভাগ। অন্যান্য ব্যাংকের টাকার প্রয়োজন পড়িলে উহারা রাষ্ট্রীয় ব্যাংক হইতে টাকা ধার করে।

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী: রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কার্যসমূহকে চারভাগে ভাগ করা যায়—বাণিজ্য ব্যাংকের কাজ, গ্রাম্য ঋণদান সংক্রান্ত কাজ, ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদান সংক্রান্ত কাজ এবং রিজার্ভ ব্যাংকের এজেণ্ট হিসাবে কাজ।

[এক] **বাণিজ্য ব্যাংকের কাজ:** ইম্পিরিয়াল ব্যাংক বাণিজ্য ব্যাংক হিসাবে যে সকল কাজ করিত, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক সেই সকল কাজ পূর্বের মতো করিয়া থাকে। শিল্প এবং ব্যবসায় বাণিজ্যক্ষেত্রে এই ব্যাংক আগের মতো স্বল্পমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করিবে।

[দুই] গ্রাম্য ঋণদান সংক্রান্ত কাজ: গ্রামাঞ্চলে ঋণ ব্যবহার উন্নয়নের জন্যই রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করা হয়। গ্রামাঞ্চলে ঋণব্যবস্থা প্রসারের জন্য ১৯৬০ সালের ১লা জুলাই তারিখের মধ্যে ৪০০ টি নূতন শাখা খুলিবার কথা ছিল। কার্যতঃ ওই সময়ে ইহা ৪১৬ টি শাখা স্থাপন করে। ১৯৬০ সাল হইতে ১৯৬৪

সালের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও উহার অধীনস্থ ব্যাংকসমূহ ২৭৪ টি শাখা স্থাপন করিয়াছে। তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৯ সালের মধ্যে আরও ৩১৯ টি শাখা স্থাপন করা হইবে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের শাখা প্রসারের ফলে ঋণদান সমিতিগুলি সস্তায় এবং বেশী পরিমাণে ঋণ পাইবে এবং গ্রামের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় একত্রিত হইবার সুযোগ ঘটিবে। এই ব্যাংক সমবায় সমিতিগুলিকে অধিক পরিমাণে ঋণ মঞ্জুর করিবে এবং কৃষকগণ সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিবে। ১৯৬০ সাল হইতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সমবায় ব্যাংকসমূহ রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ২৯০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ইহা সরকারী ঋণপত্রের জামিনে ইহার সুদের হার অপেক্ষা ½% কম হারে সমবায় ব্যাংকগুলিকে ঋণদান করে। ইহা সমবায় ঋণদান সমিতি ও জমি বন্ধকী ব্যাংকগুলিকে এবং সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলিকে ঋণদান করে। ইহা ছাড়া কৃষিপণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নকে সহায়তা করিবার জন্য ইহা কেন্দ্রীয় গুদাম ঘর কর্পোরেশনের শেয়ার কিনিয়াছে এবং গুদামে রক্ষিত দ্রব্যের রসিদের জামিনে (warehousing receipts) অধিক পরিমাণে ঋণদান করিতেছে। ইহা সমবায় ব্যাংকগুলিকে অধিক পরিমাণে অর্থ প্রেরণের সুযোগ সুবিধা দান করিতেছে। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক সমবায় ব্যাংকগুলিকে বিনা খরচে সপ্তাহে তিনবার অর্থ স্থানান্তরের সুযোগ দিতেছে। সমবায় সমিতি ছাড়া কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংকগুলিও রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে বিনা খরচে প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাংকগুলির কাছে টাকা পাঠাইতে পারে।

[তিন] ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদান সংক্রান্ত কাজ : ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লইয়াছে। ক্ষুদ্রশিল্পকে সাহায্য দিবার জন্য এই ব্যাংক ১৯৫৬ সালে একটি পথনির্দেশক পরিকল্পনা (Pilot Scheme) প্রবর্তন করে। এই পরিকল্পনা অনুসারে ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণের জন্য রাষ্ট্রীর ব্যাংকের এজেন্টের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করিতে হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উহাকে ঋণদানের ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংক নিজে অথবা রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রশিল্পকে ঋণদান করিয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের এই পরিকল্পনা সাফল্য অর্জন করিলে ইহাকে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সকল শাখাতেই প্রসারিত করা হইয়াছে। বর্তমানে ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদান কর্মসূচীকে আরো ব্যাপক করিবার জন্য উদারনীতি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সুদের হার অনধিক শতকরা ৬ টাকা করা হইয়াছে। ঋণ গ্রহণের সর্তসমূহ অনেক সহজ করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে বিশেষ ক্ষেত্রে সাত বৎসরের জন্য মধ্যমেয়াদী ঋণদান করিতেছে। ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যাংক পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই, অন্ধ্র, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশনের সহিত চুক্তি করিয়া স্থির করিয়াছে, যে সকল স্থানে রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন কার্যালয় নাই তথায় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক উহাদের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিবে। ১৯৬৪ সালের শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ৩০ কোটিরও অধিক টাকা ঋণদান করিয়াছিল।

[চার] রিজার্ভ ব্যাংকের এজেণ্ট হিসাবে কাজঃ যে সকল অঞ্চলে রিজার্ভ ব্যাংকের কোনো শাখা নাই কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কার্যালয় আছে সেখানে ইহা রিজার্ভ ব্যাংকের এজেণ্ট হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

ভারতের যৌথ পুঁজিব্যাংক (Indian Joint Stock Bank): ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ কর্তৃক যে এজেন্সি হাউসের উদ্ভব হয় তাহা হইতেই ভারতে আধুনিক পদ্ধতিতে বাণিজ্যব্যাংকের সৃষ্টি হয়। এই এজেন্সি হাউসগুলি একাধারে বাণিজ্যব্যাংকের কাজ এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজ করিতে থাকে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় পরিচালনায় হিন্দুস্তান ব্যাংক নামে প্রথম যৌথ পুঁজিব্যাংক কলকাতায় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮২৯-৩৭-এর সংকটে এই ব্যাংকটির পতন ঘটে। ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যা বাণিজ্যব্যাংক (Oudh Commercial Bank) ভারতীয় পরিচালনাধীনে গঠিত প্রথম বাণিজ্য ব্যাংক।

বিবর্তন

১৮৯৪ সালে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক এবং ১৯০১ সালে পিপল্‌স ব্যাংক (People's Bank) গঠিত হয়। ইহা ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা বোম্বাই এবং মাদ্রাজে তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাংক স্থাপিত হয় এবং ইহারাই ১৯২১ সালে একত্রিত হইয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার সৃষ্টি করে। ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে এই ব্যাংকটিকে জাতীয়করণ করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গঠন করা হয়। এই বিদেশী পরিচালিত ব্যাংকটির জাতীয়করণের দাবী প্রবল হইলেও ইহার জাতীয়করণের বিরুদ্ধেও যুক্তিপ্রদর্শন করা হয়। অর্থনীতিবিদ ডঃ সরোজকুমার বসু ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ সমর্থন করেন নাই। তাঁহার মতে ইহাকে জাতীয়করণ করিলে অন্যান্য ব্যাংকের জাতীয়করণের আশংকা দেখা দিবে ফলে ব্যাংক-কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং দেশের শিল্পবাণিজ্য ব্যাহত হইবে। নিখিল ভারত গ্রাম্য ঋণদান জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে জাতীয়করণ করা হয়। ইহা ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাণিজ্যব্যাংক। ইহার সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

যে সকল বাণিজ্যব্যাংক ভারতীয় কোম্পানী আইনানুসারে ভারতে গড়িয়া উঠিয়া ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ব্যাংক-ব্যবসায় পরিচালনা করে তাহাদের ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক বলে। এই যৌথপুঁজি ব্যাংকগুলিকে দুটিভাগে ভাগ করা যায়—তপশীলভুক্ত (Scheduled) এবং তপশীলবহির্ভূত (Non-Scheduled)। যে সকল ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত তাহাদের তপশীলভুক্ত ব্যাংক বলে। যে সকল ব্যাংকের আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ টাকা তাহারাই কতকগুলি সর্তপূরণ করিলে তপশীলভুক্ত ব্যাংক হইতে পারে। ১৯৬২ সালের রিজার্ভ ব্যাংক সংশোধনী

যৌথ পুঁজি ব্যাংক

নানুসারে (Reserve Bank (Amendment) Act 1962), তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলিকে তাহাদের মোট চল্‌তি ও মেয়াদী (demand and time deposits) নতের শতকরা ৩ ভাগ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। ইহা

শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইনানুসারে তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলিকে উহাদের আমানতের অনুরূপ অনুপাত নগদ টাকায় নিজেদের কাছে অথবা রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। ১৯৬৫ সালে তপশীলভুক্ত ব্যাংকের সংখ্যা ছিল—৬১ এবং তপশীলবহির্ভূত ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ৯৭।

ইহাদের কার্যাবলী

যৌথপুঁজি ব্যাংকগুলি বাণিজ্য ব্যাংকের সকল কাজই করিয়া থাকে। ইহারা জনগণের নিকট হইতে চল্‌তি এবং মেয়াদী উভয় আমানতই গ্রহণ করে এবং ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদিগকে স্বল্পমেয়াদী ঋণদান করিয়া থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যে ইহাদের কোনো ভূমিকা নাই। সম্প্রতি কয়েকটি যৌথপুঁজি ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় কারবার সুরু করিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে বিদেশে কার্যালয় স্থাপন করিয়াছে। অবশ্য এখনো পর্যন্ত বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলিই বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ সরবরাহ করার একচেটিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। আবার গ্রাম্য অর্থনীতিতে দেশীয় ব্যাংকারদের প্রাধান্যের ফলে গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্য ব্যাংকগুলির কাজের পরিধি সম্প্রসারিত হইতে পারে নাই।

ইহার ত্রুটি

ভারতে যৌথ পুঁজি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের হইলেও ইহার প্রসার সন্তোষজনক। অবশ্য ইউরোপের উন্নতদেশের তুলনায় ভারতে উহা এখনো নগণ্য এবং দেশের বিশালত্বের তুলনায় ব্যাংকের সংখ্যা খুবই কম। ব্যাংক ব্যবস্থার যেটুকু প্রসার হইয়াছে উহা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, গ্রামাঞ্চলে উহা বিস্তারলাভ করে নাই। গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবসায় প্রসারে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক অগ্রণী হইয়াছে। যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির কতকগুলি ত্রুটি রহিয়াছে। প্রথমতঃ এই ব্যাংকগুলি সামান্য মূলধন লইয়া কারবার সুরু করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের কোনোরূপ রিজার্ভ নাই। মুনাফা হইতে রিজার্ভ সংগঠন না করিয়া লভ্যাংশ বণ্টনেই ইহারা বেশী আগ্রহী। ১৯৫৩ সালে একটি তপশীলভুক্ত এবং ২৮টি তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকের কোনোরূপ রিজার্ভ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ ব্যাংক-ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ কর্মচারীর অভাব একটি বড় ত্রুটি। ১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন (Banking Companies Act, 1949), পাশ হওয়ার পূর্বে দেখা গিয়াছিল বহু ব্যাংকের ডাইরেক্টারগণ ব্যাংক-কারবার পরিচালনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইহা ছাড়া হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তৃতীয়তঃ, ইহাদের বিনিয়োগ পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ। মোট বিনিয়োগের অতিসামান্য অংশই সরকারী ঋণপত্রে আবদ্ধ থাকিত। আর ডাইরেক্টারগণ যে কোম্পানীর সহিত জড়িত সেইসব কোম্পানীর শেয়ারই অধিক পরিমাণে ক্রয় করিত কিন্তু এই সকল শেয়ারের বিক্রয়যোগ্যতা মোটেই ছিল না। চতুর্থতঃ, অযথা শাখা স্থাপন করাও ত্রুটিপূর্ণ। সাধারণতঃ এই ধারণা রহিয়াছে যে, যে ব্যাংকের শাখা যত বেশী তার মর্যাদাও তত বেশী। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া যথেচ্ছভাবে শাখা স্থাপন করা হয় এবং আমানত আকর্ষণ করিবার জন্য কখনো কখনো উচ্চ সুদের হার ঘোষণা করা হয়। ফলে আমানত

গ্রহণের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। ১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাশ হইবার পর এই সকল ত্রুটি কিছু পরিমাণে সংশোধিত হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক-কারবারীদের প্রতিযোগিতার কাল ভারতীয় যৌথপুঁজি ব্যাংক প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ষষ্ঠতঃ, স্বাধীনতার পূর্বে সরকার এবং বিদেশী ব্যবসায় সম্প্রদায় বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকের সহিত ব্যাংক-কারবার করিতেছে কিন্তু যৌথপুঁজি ব্যাংক ইহাদের নিকট হইতে কোনোরূপ সহায়তা পায় নাই। পরিশেষে, ভারতে বিলবাজার সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া না ওঠায় যৌথপুঁজি ব্যাংকগুলির কাজের পরিধি সম্প্রসারিত হইতে পারে নাই। এই সকল ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের অতি সামান্য অংশই বিলে আবদ্ধ থাকে বলিয়া প্রয়োজনমত রিজার্ভ ব্যাংক হইতে বিল ভাঙ্গাইয়া ঋণ সংগ্রহ করিবার সুযোগ সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। যৌথপুঁজি ব্যাংকের এই সকল দোষ ত্রুটি দূর করিবার জন্যই ১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাশ এবং পরবর্তী-কালে উহার কয়েকবার সংশোধন করা হয়।

বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক (Foreign Exchange Banks): এই ব্যাংকগুলি বৈদেশিক ব্যাংক অথবা বৈদেশিক ব্যাংকের শাখা। ইহারা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঋণ সরবরাহ করিয়া থাকে। ১৯৬৫ সালে ভারতে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ১৫। এই বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যাহাদের মোট আমানতের ২৫ ভাগ বা তাহার অধিক ভারতে রহিয়াছে এবং যাহাদের মোট আমানতের শতকরা ২৫ ভাগের কম ভারতে রহিয়াছে। ন্যাশনাল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া, মারকেনটাইল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি প্রথমশ্রেণীভুক্ত ব্যাংক আর ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাংক, ন্যাশনাল এণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাংক প্রভৃতি দ্বিতীয়শ্রেণীতে পড়ে।

এই সকল ব্যাংকের কার্যাবলীকে চারভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ, ইহারা ভারতের বহির্বাণিজ্যে অর্থ সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহারা ভারতীয় বন্দর হইতে বিদেশী বন্দরে এবং বিদেশের বন্দর হইতে ভারতীয় বন্দরে মাল পরিবহনে অর্থ সরবরাহ করে। আবার ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রীকে বন্দরে লইয়া যাওয়া এবং বন্দর হইতে আমদানীকৃত পণ্যসামগ্রীকে দেশের বিভিন্ন স্থানে পৌছাইবার ব্যাপারে ইহারা সহায়তা করিয়া থাকে। অবশ্য দ্বিতীয় ধরণের কাজ যৌথপুঁজি ব্যাংকও কিছু পরিমাণে করিয়া থাকে।

ইহাদের কার্যাবলী

দ্বিতীয়তঃ, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহও সাম্প্রতিককালে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও অংশগ্রহণ করিতেছে। পশ্চিমবাংলার পাট, কানপুরের চামড়া এবং দিল্লীর কাপড়ের কারবারে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিনিময় ব্যাংকগুলি অর্থ সরবরাহ করিতেছে। তৃতীয়তঃ, সাধারণ বাণিজ্য ব্যাংকের মতো ইহারাও চলতি ও মেয়াদী আমানত গ্রহণ করিয়া থাকে এবং ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান করে। চতুর্থতঃ, ইহারা বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমোদিত এজেন্ট

হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। ইহারা বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে এবং অনুমোদিত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে।

এই সকল বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকের আদায়ীকৃত মূলধন এবং রিজার্ভের পরিমাণ খুববেশী বলিয়া ইহারা রিজার্ভ ব্যাংকের প্রথম তালিকাভুক্ত ব্যাংক এবং তপশীলভুক্ত ব্যাংকের সুযোগসুবিধা ইহারা লাভ করিয়া থাকে। বর্তমানে ইহাদের মোট চল্‌তি এবং মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ রিজার্ভ ব্যাংকে জমা রাখিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট নিয়মিতভাবে ইহাদের ভারতীয় কারবার সংক্রান্ত হিসাব দাখিল করিতে হয়। পরিবর্তে ইহারা রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে তপশীলভুক্ত ব্যাংক হিসাবে ঋণ এবং পুনর্বাট্টার সুবিধা পাইয়া থাকে।

১৯৪৯ সালের পূর্বে এই সকল ব্যাংকের উপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাশ হইবার পর ইহাদের উপর বহুপ্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছে। ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধন এবং রিজার্ভের পরিমাণ ভারতীয় যৌথ-পুঁজি ব্যাংক অপেক্ষা অধিক হওয়া চাই। প্রতি বৎসরের শেষে ইহাদের ভারতীয় আমানতের শতকরা ৭৫ ভাগ ভারতেই রাখিতে হইবে। এই ব্যাংকগুলিকে উহাদের ভারতীয় কারবারের হিসাব আলাদাভাবে দেখাইতে হইবে। কোনো বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক ফেল পড়িলে উহার সম্পত্তিতে ভারতীয় আমানতকারীর দাবির অগ্রাধিকার থাকিবে। এই ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা সন্দেহাতীত যে ইহাদের ভারতীয় কারবার সংক্রান্ত ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। রিজার্ভ ব্যাংক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইনানুসারে ইহাদের বৈদেশিক বিনিময় কারবার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

এই ব্যাংকগুলি বৈদেশিক ব্যাংক এবং ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে একচেটিয়া কর্তৃত্ব ভোগ করিতেছে। সম্প্রতি ইহারা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও অংশ গ্রহণ করিবার জন্য যৌথপুঁজি ব্যাংকের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছে। ইহা অকাম্য। ভারতের বহির্বাণিজ্যে ইহাদের একচেটিয়া অধিকার থাকার ফলে কমিশন, দালালী এবং ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম হিসাবে বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে আমরা প্রভূত অর্থ প্রতি বৎসর দিতেছি। সম্প্রতি কতকগুলি ভারতীয় ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশে কার্যালয় স্থাপন করিয়াছে। ১৯৬২ সালে ভারতের বাহিরে ভারতীয় ব্যাংকসমূহের ১০৩টি শাখা-অফিস ছিল। এই ব্যাংকগুলি ভারতীয়দের উচ্চপদে নিযুক্ত না করিয়া নিজের দেশের লোকদেরই উচ্চপদ দিয়া থাকে। ফলে ভারতীয়গণ অভিজ্ঞতালাভে বঞ্চিত থাকে। ইহারা জাতীয় স্বার্থের বিরোধী কাজ করিয়া থাকে এবং ঋণপ্রদানের ব্যাপারে ইউরোপীয় বণিকগণকে যে সুবিধা দেয় ভারতীয় ব্যবসায়ী-দিগকে তাহা দেয় না। এই সকল বিনিময় ব্যাংকের লভ্যাংশ বিদেশে চলিয়া যায়, এবং উহা দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী। এই বিনিময় ব্যাংকগুলির বিশেষ কার্যপদ্ধতির জন্যই লণ্ডনের টাকার বাজারের স্বল্পকালীন মূলধন ভারতের

ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ

বহির্বাণিজ্যকে পরিচালনা করিয়া থাকে। লর্ড কেন্‌সের ভাষায় ইহা ভারতীয় ব্যাংক ব্যবস্থার একটি বিপদস্থল।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক (Reserve Bank of India) : রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাংক আইনানুসারে ১৯৩৫ সালে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা প্রথমে শেয়ার হোল্ডারদের যৌথ ব্যাংক হিসাবে গঠিত হয় এবং ইহার আদায়ীকৃত মূলধন পাঁচ কোটি টাকা। ইহার প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ছিল ১০০ টাকা।

ইহার গঠন

১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণ করা হয়। দেশের বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্বার্থে সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পূর্ণ সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন। ইহার অধিকাংশ শেয়ার কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল। ইহা ব্যতীত পরিকল্পিত অর্থনীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর যে দায়িত্ব আসিয়া পড়িবে তাহা পালন করার জন্যও জাতীয়করণ প্রয়োজন। ব্যাংক অব ইংলণ্ডের জাতীয়করণের পর ভারতেও রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণ করা হয়। বর্তমানে ইহার সকল শেয়ার সরকারের।

রিজার্ভ ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় বোর্ড অব ডাইরেক্টারস-এর উপরে ন্যস্ত আছে। ১৯৪৮ সালের আইনানুসারে এই ব্যাংকের গভর্ণর এবং পরিচালক (Directors) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। একজন গভর্ণর, তিনজন ডেপুটি গভর্ণর, স্থানীয় বোর্ড কর্তৃক মনোনীত চারজন পরিচালক, অপর ছয়জন পরিচালক এবং একজন

পরিচালনা

সরকারী কর্মচারী—এই পনেরোজন সদস্য লইয়া কেন্দ্রীয় বোর্ড অব ডাইরেক্টরস গঠিত। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং নয়াদিল্লীতে রিজার্ভ ব্যাংকের চারিটি লোকাল বোর্ড আছে। প্রত্যেক লোকাল বোর্ডের পাঁচজন সদস্য। ইহারা সকলেই সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। কেন্দ্রীয় বোর্ড এবং স্থানীয় বোর্ডের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ চার বৎসর। ব্যাংকের নীতি সম্পূর্ণভাবে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্ণর সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিয়া থাকেন।

রিজার্ভ ব্যাংকের মূলবিভাগ দুইটি—নোট প্রচলন বিভাগ (Issue Department) এবং ব্যাংক বিভাগ (Banking Department), ব্যাংক বিভাগের আবার কয়েকটি উপবিভাগ রহিয়াছে—কৃষি-ঋণ বিভাগ (Agricultural Credit Department), ব্যাংক পরিচালনা বিভাগ (Department of Banking Operations), বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (Exchange Control Department), শিল্প-মূলধন বিভাগ (Industrial Finance Department), পরিদর্শন বিভাগ (Inspection Department) এবং ব্যাংক উন্নয়ন বিভাগ (Department of Banking Development).

রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সেই কারণে ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সকল কাজ করিয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাংকের কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হইল।

কার্যালয়

প্রথমতঃ, নোট প্রচলন কার্য। রিজার্ভব্যাংক এক টাকার নোট ছাড়া অন্য সকল প্রকার নোট প্রচলনের একক অধিকারী। কেবলমাত্র একটাকার নোটগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রীর দপ্তরের দায়িত্বে ছাপানো হইয়া থাকে। ১৯৩৪ সালের আইনানুসারে রিজার্ভ ব্যাংক নোট প্রচলনে Proportional Reserve পদ্ধতি অনুসরণ করিত। রিজার্ভ ব্যাংক যে পরিমাণ কাগজী মুদ্রা চালু করিত তাহার পিছনে শতকরা ৪০ ভাগ সোনা ও বিদেশী মুদ্রা স্টার্লিং জমা রাখা হইত। ১৯৪৭ সালে ভারত I M F-এর সদস্য হওয়ায় ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাংক আইনের পরিবর্তন করিয়া রিজার্ভ ব্যাংককে বাধ্যতামূলক ভাবে বিলাতী স্টার্লিং ব্যতীত অন্যান্য দেশের মুদ্রাও আমানত রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাংকের সংশোধিত আইনানুসারে নোট প্রচলন পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া বলা হয় যে ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাও ১১৫ কোটি টাকার সোনা—এই মোট ৫১৫ কোটি টাকা জমা রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাংক নোট ছাপাইতে পারিবে। ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সংশোধনী আইনানুসারে মোট ২০০ কোটি টাকা মূল্যের আমানত রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাংক যে কোন পরিমাণ কাগজীমুদ্রা চালু করিতে পারে। ইহার মধ্যে ১১৫ কোটি টাকার সোনা ও ৮৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা রাখিলেই চলিবে।

নোট প্রচলন

দ্বিতীয়তঃ, রিজার্ভব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসাবে কাজ করেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের টাকা রিজার্ভ ব্যাংকে জমা থাকে। ইহা সরকারকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দিয়া থাকে। সরকারের পক্ষ হইতে কাহাকেও টাকা দেওয়া অথবা সরকারের জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করার কাজও ইহা করিয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাংক সরকারী ঋণ ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া থাকে। ইহা সরকারের প্রয়োজনানুসারে অর্থ স্থানান্তরে প্রেরণ করে এবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করে। ইহা ব্যাংকিংসংক্রান্ত সকল বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিয়া থাকে।

সরকারের ব্যাংক

তৃতীয়তঃ, রিজার্ভ ব্যাংক অপরাপর ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবেও কাজ করে। যে সকল বাণিজ্য ব্যাংকের মোট আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ টাকা রিজার্ভব্যাংক সেই সকল ব্যাংককে নিজ তালিকাভুক্ত করিয়া থাকে। এই সকল ব্যাংককে তাহাদের চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। প্রয়োজনবোধ করিলে রিজার্ভ ব্যাংক এই রিজার্ভ অনুপাত পাঁচগুণ পর্যন্ত বাড়াইতে পারে। তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ দাখিল করিতে হয়। ইহার পরিবর্তে বিপদের দিনে রিজার্ভ ব্যাংক ইহাদিগকে ঋণ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। বাণিজ্য ব্যাংকগুলি যখন তাহাদের

অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার

ঋণপত্র জমা দিয়া অন্য কোথাও ঋণ পাইতে অসমর্থ হয়, সেই সংকটজনক পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাংক তাহাদিগকে ঋণ দিয়া থাকে। এই কারণে রিজার্ভ ব্যাংককে lender of the last resort বলা হয়। ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইনানুসারে তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলিকেও উহাদের মোট চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ নগদ টাকায় নিজেদের কাছে অথবা রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। সাধারণ বাণিজ্য ব্যাংক ছাড়াও রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন অথবা রাজ্য সমবায় ব্যাংকগুলিকে ঋণ দিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংকের রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংক বিনা ব্যয়ে তপশীলভুক্ত ব্যাংকের অর্থ স্থানান্তরে প্রেরণ করে।

টাকার বিনিময় মূল্য রক্ষার কাজ

চতুর্থতঃ, রিজার্ভ ব্যাংক আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সহযোগিতায় টাকার বিনিময়-মূল্য রক্ষা করিয়া থাকে (maintain the foreign value of the Indian Rupee). এই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে।

নিকাশী ঘরের কাজ

পঞ্চমতঃ, রিজার্ভ ব্যাংক দেশের বাণিজ্য ব্যাংকসমূহের নিকাশী ঘরের (Clearing House) কাজ করিয়া চেকের মাধ্যমে লেনদেনের সুবিধা করিয়া দেয়। ইহার মাধ্যমে অতি সহজেই বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে দেনা পাওনার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

রিজার্ভ ব্যাংক ও কৃষিঋণ

ষষ্ঠতঃ, পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে রিজার্ভ ব্যাংকের একটি কৃষি-ঋণ বিভাগ রহিয়াছে। এই বিভাগের মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সমবায় ব্যাংকগুলিকে ঋণ দেয়। ১৯৫৪ সালে গরওয়ালা কমিটির সুপারিশ অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে দুইটি তহবিল গঠন করা হইয়াছে। প্রথমটির নাম হইল জাতীয় কৃষিঋণদান ফাণ্ড (দীর্ঘকালীন) [National Agricultural Credit (Longterm Operations Fund)]. এই ফাণ্ড হইতে রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য-সরকারগুলিকে সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদার হইবার জন্য ঋণদান করিবে। রাজ্য সরকার এই ঋণের অর্থ কৃষকদিগকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের জন্য সমবায় সমিতির হাতে দিবেন। দ্বিতীয় ফাণ্ডটির নাম হইল জাতীয় কৃষি ঋণ (স্থায়িত্ব বিধানকারী) ফাণ্ড [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund]. দুর্ভিক্ষ, অজন্মা, বন্যা ইত্যাদি সংকট সময়ে রাজ্য সরকার সমবায় ব্যাংক-গুলিকে এই ফাণ্ড হইতে মধ্যমেয়াদী ঋণ দিবে।

টাকার মূল্য স্থির রাখা

সপ্তমতঃ, আভ্যন্তরীণ মূলস্তর স্থির রাখাও রিজার্ভ ব্যাংকের অন্যতম কাজ। সরকারী ঋণপত্রের কেনা-বেচা, ব্যাংকরেট পরিবর্তন, জমার অনুপাত পরিবর্তন ইত্যাদি পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া রিজার্ভ ব্যাংক টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য স্থির রাখে।

ইহা ব্যতীত সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংক আর্থিক ব্যাপারে নানা প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া থাকে, দেশের এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করিয়া মাসিক বুলেটিন প্রকাশ করে ও অর্থ নৈতিক গবেষণা কার্য

পরিচালনা করে। বর্তমানে ব্যাংকিং আইনানুসারে [Banking Laws (Miscellaneous Provisions) Act 1963] ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও রিজার্ভ ব্যাংক হিসাব দাখিল করিবার জন্য আদেশ করিতে পারে। পরিকল্পনাকালে ঘাটতি ব্যয়ের (deficit financing) দায়িত্বও রিজার্ভ ব্যাংকের উপর অর্পিত রহিয়াছে।

অন্যান্য কার্য

ভারতীয় টাকার বাজারের উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ (Control of the Reserve Bank over the Indian Money Market): রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৩৫ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাশ হইবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের টাকার বাজারে রিজার্ভ ব্যাংক একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। ইহার কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, রিজার্ভ ব্যাংক সবে ১৯৩৫ সালে স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু অন্যান্য ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংক অপেক্ষা পুরাতন এবং ব্যাংক কারবারে অভিজ্ঞ। স্বভাবতই উহারা রিজার্ভ ব্যাংকের নেতৃত্বকে সুনজরে দেখে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইম্পিরিয়াল ব্যাংক ছিল সর্ববৃহৎ বাণিজ্য ব্যাংক; ইহা রিজার্ভ ব্যাংককে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিত বলিয়া ইহার সহিত সহযোগিতার মনোভাব লইয়া আগাইয়া আসে নাই। তৃতীয়তঃ, বাণিজ্য ব্যাংকগুলি নিজেদের কাছে অধিক পরিমাণে নগদ টাকা রাখিত এবং প্রয়োজন দেখা দিলে অন্য বাণিজ্য ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ করিত। সহজে ইহারা রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণের জন্য যাইত না। চতুর্থতঃ, টাকার বাজার অসংগঠিত ও অসম্বদ্ধ ছিল বলিয়া রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক হইতে পারে নাই। ইহাছাড়া টাকার বাজারে ঋণপত্রেরও যথেষ্ট অভাব ছিল।

টাকার বাজারে রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

কিন্তু আধুনিককালে অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। বর্তমানে সুসংগঠিত টাকার বাজার রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিয়াছে যদিও উহার অসংগঠিত অংশ এখনো রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে।

বর্তমান অবস্থা

১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাশ হইবার পূর্বে টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের প্রধানতঃ দুইটি অস্ত্র ছিল—ব্যাংকরেট এবং খোলা বাজারের কারবার। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে এ পর্যন্ত কয়েকবার ব্যাংকরেটের পরিবর্তন করা হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে ব্যাংকরেট ৩½% হইতে কমাইয়া ৩% করা হয়। ১৯৫১ সালে নভেম্বর মাসে পুনরায় ইহাকে বাড়াইয়া ৩½% এবং ১৯৫৭ সালের মে মাসে ৪% করা হয়। ব্যাংকরেটের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রতিবারই টাকার বাজারে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে।

খোলা বাজারের কারবার (অর্থাৎ ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য বাজারে সরকারী ঋণপত্রের ক্রয়বিক্রয়) করিবার অধিকার রিজার্ভ ব্যাংকের রহিয়াছে। ঋণপত্রের মূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করিবার জন্য লেনদেন উদ্বৃত্তের (balance of payments) পরিবর্তন যাহাতে টাকার বাজারে কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে সেই

উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাংক খোলাবাজারের মাধ্যমে কারবার করিয়া আসিতেছে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর সময় হইতে রিজার্ভ ব্যাংক তপশীলভুক্ত ব্যাংকের নিকট হইতে সরাসরি ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি অবলম্বন করে। ১৯৫১ সালে নভেম্বর মাসে ব্যাংকরেট বৃদ্ধির সহিত ইহা ঘোষণা করা হয় যে রিজার্ভ ব্যাংক আর তপশীলভুক্ত ব্যাংকের নিকট হইতে সরাসরি ঋণপত্র কিনিবে না—ইহাদের জামিনে ঋণ দিবে মাত্র।

রিজার্ভ ব্যাংকের নৈতিক প্রভাব (Moral suasion) আমাদের দেশে বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। তবে ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই অস্ত্রের উপর কিছু আস্থা স্থাপন করা হইতেছে।

ভারতীয় ব্যাংকব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে ব্যাপক। ১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন (Banking Companies Act, 1949) পাশ করিয়া বাণিজ্য ব্যাংকগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রত্যেক ব্যাংককেই ব্যাংকিং এর কাজ করিতে হইলে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যাংক শাখা স্থাপন করিতে পারিবে না। যে সকল ব্যাংকের শাখা কলিকাতা ও বোম্বাই ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে স্থাপিত হইয়াছে সেই সকল ব্যাংক মাত্রেরই আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকা হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তপশীল-ভুক্ত এবং তপশীল-বহির্ভূত সকল ব্যাংককেই তাহাদের চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হইবে (অবশ্য তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংক ওই অংশ নগদ টাকায় নিজের কাছে রাখিতে পারে)। তৃতীয়তঃ, প্রতিমাসে সকল ব্যাংককে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট উহার দেনাপাওনার হিসাব দাখিল করিতে হইবে এবং বৎসরে একবার করিয়া ব্যালান্সসীট দাখিল করিতে হইবে। সকল ব্যাংককেই প্রতি তিন মাস অন্তর রিজার্ভ ব্যাংককে দেখাইতে হইবে যে তাহার সম্পত্তির ৭৫ ভাগ ভারতে রহিয়াছে। চতুর্থতঃ, প্রত্যেক ব্যাংককেই উহার মোট ঋণের (liabilities) অন্ততঃ শতকরা ২০ ভাগ সোনা অথবা নগদ টাকা অথবা ঋণপত্রে রাখিতে হইবে। ইহা ব্যতীত কি হারে সুদ লইবে রিজার্ভ ব্যাংক সে সম্বন্ধে ব্যাংকগুলিকে নির্দেশ দিবে এবং নৈতিক প্রভাব দ্বারা ব্যাংকগুলিকে বিশেষ কোন নীতি অনুসরণে বাধ্য করিতে পারে।

১৯৫৬ সালে ব্যাংকিং কোম্পানীর সংশোধন আইন (Banking Companies' Amendment Act, 1956) দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতা ব্যাপকতর করা হইয়াছে। এই সংশোধনী আইনের দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল: ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংস্থান করা এবং বাণিজ্য ব্যাংকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

১৯৫৬ সালের সংশোধন আইন

এই সংশোধনী আইনানুসারে ৫১৫ কোটি টাকা (১১৫ কোটি টাকার সোনা ও ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণপত্র) জমা রাখিয়া যে কোনো পরিমাণ নোট চালু করা চলিবে। বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সংশোধনী আইনে নিয়ম করা

হয় যে মোট ২০০ কোটি টাকা (১১৫ কোটি টাকার সোনা ও ৮৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা) জমা রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাংক যে কোন পরিমাণ নোট ছাপাইতে পারিবে। রিজার্ভ ব্যাংককে এই ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে যে উহা কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমতি লইয়া কোনো বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণপত্র জমা না রাখিয়াও নোট প্রচলন করিতে পারে।

১৯৫৬ সালের সংশোধনী আইনে রিজার্ভ ব্যাংককে তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলির রিজার্ভ অনুপাত (reserve ratio) পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট বাণিজ্য ব্যাংকগুলির আমানতের পরিমাণ স্থায়ী আমানতের ক্ষেত্রে শতকরা ২ ভাগ হইতে ৮ভাগ এবং চলতি আমানতের ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ হইতে ২০ ভাগ বাড়াইবার ক্ষমতা এই আইন দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংককে দেওয়া হইয়াছে।

১৯৬২ সালের রিজার্ভব্যাংক আইনানুসারে তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলিকে তাহাদের মোট চল্‌তি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। প্রয়োজন বোধে রিজার্ভব্যাংক এই জমার পরিমাণ পাঁচগুণ পর্যন্ত বাড়াইতে পারে।

রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতা মোটামুটি তিনভাবে সীমাবদ্ধ। ভারতের টাকার বাজারের অসংগঠিত অংশ এখনো রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। ভারতীয় টাকার বাজারের প্রায় ৫০ ভাগ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে এই দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ীগণ এবং ইহারা রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে থাকায় রিজার্ভব্যাংকের ঋণনিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা কখনোই সম্পূর্ণরূপে ফলপ্রসূ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণের পরিবর্তন হইলে রিজার্ভ ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ সরকারী আয়-ব্যয়ের যে নীতি পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয় রিজার্ভ ব্যাংককে তাহার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হয়।

সীমাবদ্ধতা

রিজার্ভ ব্যাংক ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Reserve Bank and Credit-Control): ঋণনিয়ন্ত্রণ বলিতে বুঝায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিমাণের সহিত ঋণের পরিমাণের সামঞ্জস্যবিধান। স্বল্পমেয়াদী ঋণের অভাবে যাহাতে ব্যবসায়বাণিজ্যের প্রসার ব্যাহত না হয় বা অত্যধিক ঋণ প্রদানের ফলে মূলস্তর বৃদ্ধি না পায় সেজন্য ঋণনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। দেশে মোট ঋণের পরিমাণ নির্ভর করে ব্যাংকগুলির ঋণপ্রদান নীতির উপর। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকঋণের নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

১৯৪৯ সালে রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণ এবং ব্যাংকিং কোম্পানী আইন প্রবর্তনের পর ভারতীয় ব্যাংক ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি হইয়াছে।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে এই সকল অস্ত্র রহিয়াছে—(১) ব্যাংক-রেট, (২) খোলাবাজারের কারবার, (৩) জমার অনুপাতের পরিবর্তন (variable

reserve ratio), (৪) নৈতিক উপরোধ (morals' uasion), (৫) নির্বাচনমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ (selective credit control) ইত্যাদি।

পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক কাজ কারবার বৃদ্ধির সহিত মোট ঋণের পরিমাণও যাহাতে পরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধি পায় তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, আবার ঋণের যোগান প্রয়োজনাতিরিক্ত হইয়া যাহাতে মুদ্রাস্ফীতি না ঘটায় তাহাও দেখিতে হইবে।

ব্যাংক রেট

প্রথম পরিকল্পনাকালে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে উহা রোধ করিবার জন্য ১৯৫১ সালে ব্যাংকরেটকে ৩% হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৩½% করা হয়। ইহার ফলে ঋণের পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসর হইতে মূল্যস্তর আবার বৃদ্ধি পাইতে স্নরু করে। ১৯৫৭ সালে রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকরেটকে ৩½% হইতে বাড়াইয়া ৪% করে। ১৯৬২ সালে রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকরেট শতকরা ৫ টাকা হারে ধার্য করে। মূল্যস্তরের অবনতির জন্যই ব্যাংকরেট বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ঋণ নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৬৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকরেট বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৬% হারে ধার্য করে। ব্যাংকরেটের পরিবর্তন প্রতিবারই সংগঠিত টাকার বাজারে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যাংকরেটের বৃদ্ধির সহিত অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে হয়।

খোলা বাজারের কারবার

রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার স্নরু হইতেই ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উহা খোলাবাজারে সরকারী ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয় করিয়া আসিতেছে। ঋণের পরিমাণ হ্রাস করিবার প্রয়োজন হইলে রিজার্ভ ব্যাংক খোলা বাজারে সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করে আর ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইলে রিজার্ভ ব্যাংক ঋণপত্র ক্রয় করে। বর্তমানে অবশ্য এই পদ্ধতির কার্যকারিতা হ্রাস পাইয়াছে।

জমার অনুপাত পরিবর্তন

১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাংক সংশোধন আইনের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংককে তপশীল-ভুক্ত ব্যাংকগুলির জমার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতা দেওয়া হয়। তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট উহাদের চলতি ও মেয়াদী আমানতের যথাক্রমে শতকরা ৫ ভাগ ও ২ ভাগ রাখিতে হইত। এই সংশোধনী আইনের বলে রিজার্ভ ব্যাংক তপশীলভুক্ত ব্যাংক-গুলির চলতি ও মেয়াদী আমানতের জন্য চারগুণ পর্যন্ত (অর্থাৎ চলতি আমানতের শতকরা ২০ ও ভাগ মেয়াদী আমানতের শতকরা ৮ ভাগ) বৃদ্ধি করিতে পারিবে। ১৯৬২ সালের সংশোধনী আইনানুসারে প্রত্যেক তপশীলভুক্ত ব্যাংককে তাহার চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাংক এই জমার পরিমাণ পাঁচগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১২০০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় করা হয়। এই বিরাট ঘাটতি ব্যয়ের অনুপাতে যদি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে শুধুমাত্র ব্যাংক রেটের পরিবর্তন বা খোলা

বাজারের কারবারের মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে না আশংকা করিয়া রিজার্ভ ব্যাংককে নগদ জমা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন ও উহার পরবর্তী সংশোধনসমূহ হইতে রিজার্ভ ব্যাংক নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী হয়। এই ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হইল খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের কারবার নিয়ন্ত্রণ করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর হইতে রিজার্ভ ব্যাংক নির্বাচন মূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে। ১৯৫৬ সালে ধান ও চালের জামিনে ৫০,০০০ টাকার অনধিক ঋণ দিবার জন্য ব্যাংকগুলিকে নির্দেশ দেয়। ১৯৫৭ সালে চিনির জামিনে ব্যবসায়ীদিগকে ঋণদানের ক্ষেত্রে মার্জিন রাখিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৫৯ সালে চিনা বাদামের ক্ষেত্রে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৬০ সালে শেয়ারের জামিনে যাহাতে অত্যধিক ঋণ না দেওয়া হয় সেইজন্য শেয়ারের মার্জিন শতকরা ৫০ ভাগ করা হয়। ১৯৬৫ সালে তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলি ধান চালের জন্য যে ঋণ দিবে তাহার মার্জিন শতকরা ৫০ ভাগ করা হয়। ১৯৬০ সালে রিজার্ভ ব্যাংক তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কোটা (quota) নির্ধারণ করিয়া দেয়। ব্যাংকগুলি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত ঋণ ব্যাংক-রেটেই পাইবে কিন্তু কোটার অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করিলে ব্যাংক রেট অপেক্ষা অতিরিক্ত সুদ দিতে হইবে। ব্যাংকগুলিকেও উহাদের সুদের হার বাড়াইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ

১৯৫৭ সাল হইতে রিজার্ভ ব্যাংক বহুবার ব্যাংকগুলিকে ঋণ সংকোচনের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছে। যদিও রিজার্ভ ব্যাংকের অনুরোধ মানিতে ব্যাংকগুলি বাধ্য নয় তথাপি রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে অসময়ে যে সুবিধা পাইয়া থাকে তাহা চিন্তা করিয়া ব্যাংকগুলি সাধারণতঃ রিজার্ভ ব্যাংকের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে সাহস করে না।

নৈতিক উপরোধ

সাম্প্রতিক কালে রিজার্ভ ব্যাংক যে ঋণ নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে টাকার নিয়ন্ত্রণমূলক সম্প্রসারণ (Controlled Monetary Expansion) নীতি বলা চলে। ইহা একদিকে ফাটকা ঋণকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করিবে অপর দিকে তেমনি উন্নমূলক ঋণকে সম্প্রসারিত করিবে। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি বহুল পরিমাণে স্থিতিস্থাপক হইয়াছে। অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য-শস্য লইয়া যাহাতে ফাটকা কারবার না চলে বা ওই সকল ক্ষেত্রে ব্যাংকঋণ যাহাতে ব্যবহার না করা হয় সেজন্য রিজার্ভ ব্যাংক কঠোরভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। আবার কঠোর ঋণ নিয়ন্ত্রণের ফলে যাহাতে উন্নয়নমূলক কাজে ঋণের ঘাটতি না পড়ে তাহাও লক্ষ্য করিতেছে। ইহা যেমন একদিকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছে তেমনি অপরদিকে মুদ্রাসংকোচ রোধ করিতেছে।

অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতীয় টাকার বাজারের সংগঠিত অংশই রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন কিন্তু টাকার বাজারের অসংগঠিত অংশ রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের

বাহিরে। অবশ্য সংগঠিত টাকার বাজার ক্রমশই প্রসারিত হইতেছে বলিয়া রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে।

রিজার্ভ ব্যাংকের কাজের মূল্যায়ন (Evaluation of the Working of the Reserve Bank of India): ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে রিজার্ভ ব্যাংক তাহার কার্য সুরু করে। বিগত ৩১ বৎসরে ইহা বেসরকারী সংস্থা হইতে সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে সুরুতেই মৃদু মন্দার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তীকালের মুদ্রাস্ফীতির অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে, দেশবিভাগ ও তজ্জনিত সমস্যা এবং দুইবার মুদ্রামান হ্রাসের ধাক্কা সহ্য করিতে হইয়াছে। বর্তমানে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ইহা উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থ সরবরাহের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ ইহার নীতিদীর্ঘ জীবন বিচিত্র ঘটনার ঘনঘটায় পরিপূর্ণ। নিম্নে রিজার্ভ ব্যাংকের সফলতার বিভিন্ন ক্ষেত্র বর্ণনা করা হইল।

বৈচিত্র্যময় জীবন

সাফল্য (Achievements): প্রথমতঃ, রিজার্ভ ব্যাংক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত এবং অল্প ব্যয়ে টাকা স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিয়া সুদের হার হ্রাস করিয়াছে, সুদের হারে অত্যধিক উঠানামা বন্ধ করিয়াছে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উহার সমতা বিধানে সমর্থ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, রিজার্ভ ব্যাংক অতি সাফল্যের সহিত সরকারী ঋণ পরিচালনা করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, রিজার্ভ ব্যাংক ভারতীয় ব্যাংকগুলির কার্যকলাপ এবং নীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া ব্যাংকব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছে এবং ব্যাংক ফেলের সংখ্যা হ্রাস করিয়াছে। চতুর্থতঃ, বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংক টাকার সংগঠিত বাজারের উপর তাহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহা টাকার নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করায় ঋণের যোগ্য বণ্টন সম্ভবপর হইয়াছে এবং পরিকল্পনা কালে মুদ্রাস্ফীতির চাপ প্রবল হইতে দেয় নাই। পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে ইহা সরকারকে সহায়তা করিয়া আসিতেছে। পঞ্চমতঃ, কৃষিঋণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংকের বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংকের যে কৃষি-ঋণ বিভাগ রহিয়াছে তাহার মাধ্যমে ইহা সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণদান করিয়া কৃষি-ঋণ সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯৫৫ সালে নিখিল ভারত গ্রাম্য ঋণ দান স্বরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে দুইটি তহবিল গঠন করা হয়। ইহা হইতে সমবায় সমিতিগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী ঋণ দান করা হয়। ষষ্ঠতঃ, ১৯৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাংক বিল বাজার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ইহাকে কার্যকর করিয়াছে; ভারতীয় টাকার বাজারের একটা বহুদিনের অনুভূত অভাব দূর হইয়াছে। সপ্তমতঃ, বর্তমানে বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদানের ক্ষেত্রেও রিজার্ভ ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংক ফিনান্সকর্পোরেশন, রাজ্য ফিনান্সকর্পোরেশন, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করিয়া দেশের শিল্পায়নকে সহায়তা করিতেছে। পরিশেষে রিজার্ভ ব্যাংকের অর্থনৈতিক গবেষণা বিভাগ রহিয়াছে এবং

সাফল্য

ইহা গবেষণার তথ্যসমূহ প্রকাশ করিয়া সরকার ও জনগণকে দেশের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করে।

ব্যর্থতা (Failures) : রিজার্ভ ব্যাংক একেবারে দোষত্রুটির উর্ধ্বে নয়। ইহার বিরুদ্ধেও নানা বিরূপ সমালোচনা করা হয়। প্রথমতঃ, রিজার্ভ ব্যাংক দেশীয় ব্যাঙ্ক-কারবারীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে পারে নাই। ইহার কর্তৃত্ব শুধুমাত্র টাকার সংগঠিত বাজারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহা টাকার বাজারের অসংগঠিত এবং সংগঠিত অংশের মধ্যে সংহতি সাধন করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রাস্ফীতি দমন করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ ব্যর্থ হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর হইতে মূল্যস্তর ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে, রিজার্ভ ব্যাংক উহা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, রিজার্ভ ব্যাংক ভারতীয় ব্যাংকব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছে বলিয়া যে দাবি করা হয় তাহা সত্য নয়। রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরও ভারতে ব্যাংক ফেলের সংখ্যা হ্রাস পায় নাই। চতুর্থতঃ, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলির অস্তিত্ব ভারতীয় টাকার বাজারের অন্যতম ত্রুটি বলিয়া পরিগণিত হয়। যদিও এই সকল ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন কিন্তু ইহাদের প্রতিযোগিতার হাত হইতে ভারতীয় ব্যাংকগুলিকে রক্ষা করিতে বিশেষ সচেষ্ট হয় নাই। পঞ্চমতঃ, কৃষিঋণের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা আশাপ্রদ নয়। রিজার্ভ ব্যাংক কৃষিঋণদানে নিযুক্ত থাকা সত্তেও দেখা যাইতেছে যে সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকগণ তাহাদের মোট ঋণের ৩১% পাইয়া থাকে। ষষ্ঠতঃ, রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকসমূহের ব্যাংকার এবং তাহাদের বিপদের সময় সত্বর সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিবে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণদান নীতি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ, ব্যাংকগুলির বিপদের সময় ঋণদানে অহেতুক বিলম্ব করায় ইহা বহু ব্যাংকের পতনের কারণ হইয়াছিল। পরিশেষে রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৫২ সালের পূর্বে কোনরূপ বিল বাজার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয় নাই। আবার ১৯৫২ সালের রিজার্ভ ব্যাংক যে বিল বাজার পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাহাকে প্রকৃত বিল বাজার বলা চলে না। এই পরিকল্পনায় বিল রিডিসকাউন্ট করা হয় না। রিজার্ভ ব্যাংক মেয়াদী হুণ্ডির জামিনে ঋণ দেয় মাত্র।

ব্যর্থতা

রিজার্ভ ব্যাংক অবশ্যই সমালোচনার উর্ধ্বে নয় কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে ইহার অধিকাংশ ত্রুটিই পরিকল্পনা পূর্বযুগের। আর একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে রিজার্ভ ব্যাংকের এই ত্রিশ বৎসর জীবনকালে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সময় লোকে এই আশংকা করিয়াছিল যে ভারতের মতো অর্ধোন্নত দেশে রিজার্ভ ব্যাংক সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই রিজার্ভ ব্যাংক তাহার দক্ষতার পরিচয় দিয়া জনগণের আশংকা যে অমূলক তাহা প্রমাণ করিয়াছে। ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী-আইন ও তাহার পরবর্তী সংশোধন সমূহের মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাংককে যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে

উপসংহার

আস্থা করা যায় উহা অধিকতর দক্ষতার সহিত স্বীয় কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে। নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন এই উভয় প্রকার কার্যেই পরিকল্পিত অর্থনীতিতে রিজার্ভ ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহা বলিলে বোধ হয় অতিরঞ্জিত করা হইবে না যে রিজার্ভ ব্যাংক ভারতীয় টাকার বাজারের মানোন্নয়নে এবং পুনর্গঠনের ব্যাপারে এক নবতর অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

বিলবাজার পরিকল্পনা (Bill Market Scheme) : বিলবাজার পরিকল্পনা আলোচনার পূর্বে জানা প্রয়োজন কি ভাবে বাণিজ্যবিলের সৃষ্টি হয়। একটি উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাক একজন চিনি উৎপাদক তিন মাসের ক্রেডিটে একজন পাইকারী ব্যবসায়ীকে চিনি বিক্রয় করিল এবং চিনি উৎপাদক তাহার নামে একটা বিল বা ড্রাফট তৈয়ারী করিল। যখন চিনি উৎপাদকের নগদ টাকার প্রয়োজন হইবে সে তাহার ব্যাংকে গিয়া বিলটি ডিস্কাউন্ট করার অনুরোধ করিবে। যদি চিনি উৎপাদক নামকরা ব্যবসায়ী হয় এবং বিল গ্রহণকারীর যদি বাজারে সুনাম থাকে তাহা হইলে ব্যাংক এই বিল বাট্টা করিবে। আবার ব্যাংকের টাকার প্রয়োজন দেখা দিলে সে ওই বিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট বিক্রয় করিতে পারে। এইভাবে বিল পুনর্বাট্টা করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যব্যাংক এবং ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী ঋণের যোগান দেয়।

একটি সুসংগঠিত বিলবাজারের অভাব ভারতীয় টাকার বাজারের অন্যতম ত্রুটি বলিয়া গণ্য করা হয়। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপনের পরেও কতকগুলি বিশেষ কারণের জন্য ভারতে বিলবাজার গড়িয়া ওঠে নাই। প্রথমতঃ, বিলবাজার গড়িয়া তুলিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক বিশেষ যত্ন লয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপনের পূর্বে ভারতে বিলবাজার গড়িয়া না উঠার কারণ তখন ইম্পিরিয়াল ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল এবং ইহা বাণিজ্যব্যাংক হিসাবেও কাজ করিত এবং অপরাপর বাণিজ্য-ব্যাংক কোন প্রতিবেশী সমগোত্রীয় ব্যাংকের কাছে ঋণ লইতে এবং বিল সম্পর্কে তাহাদের অবস্থা জানাইতে অনিচ্ছুক ছিল। তৃতীয়তঃ, নগদ টাকা ও ওভার ড্রাফটের মাধ্যমে বাণিজ্যব্যাংকগুলি কর্তৃক খাতককে ঋণ দিবার ব্যবস্থা থাকায় বিলবাজারের অসুবিধা বিশেষ অনুভূত হয় না। চতুর্থতঃ, ভারতে বিলের দুষ্প্রাপ্যতা রহিয়াছে। গোলাঘরের অভাবে অধিক সংখ্যক কৃষি বিল তৈয়ারী করাও সম্ভবপর নয়। পঞ্চমতঃ, স্থানীয় ভাষায় লিখিত বহুপ্রকার হুণ্ডির অস্তিত্ব বিলবাজারের প্রসারে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। পরিশেষে বিলের উপর উচ্চহার ষ্ট্যাম্প উদ্দিষ্ট বিলবাজার প্রসারের অন্যতম বাধাস্বরূপ।

১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে ব্যাংকরেট ৩% হইতে ৩½%এ বৃদ্ধির সাথে সাথে রিজার্ভ ব্যাংক ঘোষণা করে যে উহা আর তপশীলভুক্ত ব্যাংকের নিকট হইতে সরাসরি ঋণপত্র কিনিবে না, উহার জামিনে ঋণ দিবে মাত্র। এই ঘোষণার ফলে ঋণব্যবস্থা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকায় ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে রিজার্ভ ব্যাংক একটি বিলবাজার পরিকল্পনা করে। প্রথমে এই পরিকল্পনা

পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত হয়, পরে ইহাকে ভারতীয় টাকার বাজারের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত করা হয়। বিলবাজার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ঋণদানের ব্যাপারে সম্প্রসারণশীলতার সৃষ্টি করা।

তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলি তাহাদের খাতকদের ঋণ দিবার সময় তাহাদের নিকট হইতে যে সকল চলতি প্রতিশ্রুত পত্র (Demand Promissory notes) গ্রহণ করে উহার একাংশকে ৯০ দিনের মেয়াদী প্রতিশ্রুতি পত্র (usance Promissory notes) রূপান্তরিত করিতে পারে। ইহার পর ব্যাঙ্ক ওই দুই প্রকার প্রতিশ্রুতি পত্র জামিন হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিয়া স্বল্পমেয়াদী ঋণগ্রহণ করিতে পারিত। বিলবাজারকে জনপ্রিয় করিবার জন্য রিজার্ভব্যাংক বিলের পরিবর্তে প্রচলিত ব্যাংকরেট অপেক্ষা ½% হার কম সুদে ঋণ দিতে রাজী হয়। প্রথমে এই বিলবাজার পরিকল্পনার সুবিধা সকল ব্যাংককে দেওয়া হয় নাই। যে সকল তপশীলভুক্ত ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ অন্ততঃ দশ কোটি টাকা কেবলমাত্র তাহারাই এই পরিকল্পনায় রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিত। কোনো ব্যাংক এইভাবে ২৫ লক্ষ টাকার কম ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং প্রত্যেক বিলের অর্থের পরিমাণ অন্ততপক্ষে এক লক্ষ টাকা হওয়া চাই।

বিল বাজার পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় ১৯৫৩ সালের জুনমাসে ইহাকে সম্প্রসারিত করা হয়। যে সকল তপশীলভুক্ত ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ অন্ততঃ পাঁচ কোটি টাকা তাহাদেরও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫৪ সালের এই পরিকল্পনাকে অধিকতর সম্প্রসারিত করা হয় এবং সকল তপশীলভুক্ত ব্যাংককেই বিল-বাজার পরিকল্পনার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। শ্রফ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ২৫ লক্ষ টাকা ঋণের পরিবর্তে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ এবং প্রত্যেক বিলের অর্থের ন্যূনতম পরিমাণ এক লক্ষের পরিবর্তে কমাইয়া ৫০ হাজার টাকা করা হয়। এইভাবে ক্ষুদ্র ব্যাংকগুলিকে এই পরিকল্পনার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। বিলবাজার জনপ্রিয় হইয়া উঠিলে ১৯৫৬ সাল হইতে স্বল্পতর সুদের হার এবং রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক স্ট্যাম্প ডিউটি অর্ধেক বহনের সুবিধাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৯৬০ সালে এই পরিকল্পনাধীনে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি টাকা।

১৯৫৮ সালে রপ্তানী প্রসারে সহায়তা করিবার জন্য রপ্তানী বিলগুলিকেও (export bills) বিলবাজার পরিকল্পনার অধীনে আনা হয়। বর্তমানে রপ্তানী বিলের মেয়াদ ৯০ দিন হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১৮০ দিন করা হইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাই ছাড়াও পুনর্বাট্টা সুবিধাদানের জন্য অন্যত্র কার্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

যদিও এই পরিকল্পনাকে বিলবাজার পরিকল্পনা বলা হইয়াছে তথাপি ইহা যথার্থ বিলবাজার নয়। রিজার্ভ ব্যাংক শুধুমাত্র মেয়াদীহুণ্ডির জামিনে ঋণ দান করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এই পরিকল্পনায় দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ীগণ অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ফলে ইহা ব্যাপক হইতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ, বিদেশী ব্যাংকগুলি এই পরিকল্পনার সুযোগ পুরামাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু

সমালোচনা

ক্ষুদ্র ভারতীয় ব্যাংকগুলি এই পরিকল্পনার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। পরিশেষে, বিলবাজারের সুবিধা দিবার পূর্বে রিজার্ভ ব্যাংক আবেদনকারী ব্যাংক সম্পর্কে যেসব খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করে তাহা ব্যাংকগুলি আপত্তিজনক বলিয়া মনে করে। যাহা হউক এই পরিকল্পনা যে শুভ সূচনা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহার দ্রুত সম্প্রসারণ প্রয়োজন এবং কাম্য।

আমানত-বীমা-কর্পোরেশন (Deposit Insurance Corporation) : আমেরিকার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতে আমানত-বীমা পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে আমেরিকায় ব্যাংক ফেল পড়িতে সুরু করে এবং ১৯৩০ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় ব্যাংক ফেলের সংখ্যা আতংকজনক হইয়া ওঠে। আমানতকারীগণের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ সালে ২৮৯·৩ মিলিয়ন ডলার মূলধন লইয়া ফেডারাল ডিপোজিট ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন গঠিত হয়। সেখানে বর্তমানে আমানতকারীর শতকরা ৯৮ জনকে এই বীমা পরিকল্পনার অধীনে আনয়ন করা হইয়াছে। আমানত বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর আমেরিকায় ব্যাংক ফেল বন্ধ হয়।

ব্যাংক বিপর্যয়ের প্রতিবিধান হিসাবে আমানত বীমা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব ভারতেও বহুবার উত্থাপন করা হইয়াছে। ১৯৫০ সালে গ্রামীণ ব্যাংকিং তদন্ত কমিটি (Rural Banking Enquiry Committee) নীতিগত ভাবে ইহা সমর্থন করিলেও ইহা এদেশে প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করে নাই। ১৯৫৪ সালে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহ কমিটি (Committee on Finance for Private Sector) বা শ্রফ কমিটি আমানত বীমা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। কিন্তু ১৯৫৪ সালের পর মোটামুটি ভাবে ব্যাংক ফেলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় এবং ব্যাংক ব্যবস্থা উপযুক্তভাবে পরিচালিত হওয়ায় আমানত-বীমার প্রশ্নটি সাময়িক-ভাবে চাপা পড়ে। কিন্তু ১৯৬০ সালে লক্ষ্মী ব্যাংক এবং কেরলের পালাই সেণ্ট্রাল ব্যাংকের পতন ঘটিবার পর সরকার আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

গঠন

১৯৬২ সালে ভারতে আমানত-বীমা কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ এক কোটি টাকা। ইহার সবটাই বিলি করা হইয়াছে এবং রিজার্ভ ব্যাংক উহা ক্রয় করিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে পাঁচ কোটি টাকা ঋণ করিবার ক্ষমতা এই কর্পোরেশনকে দেওয়া হইয়াছে। এই কর্পোরেশনের পরিচালনা ভার অর্পণ করা হইয়াছে পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট একটি বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর উপর। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর, রিজার্ভ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্ণর, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যবসাবাণিজ্য এবং শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞ দুইজন বেসরকারী সদস্য। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্ণর এই বোর্ডের চেয়ারম্যান। বেসরকারী সদস্যদ্বয় কোনো ব্যাংকের সহিত জড়িত থাকিবে না এবং ইহাদের কার্যকাল হইবে চার বৎসর। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য বোর্ড অব ডাইরেক্টরস নিজেদের মধ্য হইতে একটি কার্যকরী কমিটি (Executive Committee) গঠন করিবে। রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত পরামর্শ

করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার যে কার্যক্রম নির্ধারণ করিবে কর্পোরেশন তাহা অনুসরণ করিয়া চলিবে।

ব্যাংক ফেলের কুফল সর্বজনবিদিত। ব্যাংক ফেল পড়িলে যেন আমানতকারীর সঞ্চয় বিনষ্ট না হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়াই আমানত বীমা কর্পোরেশন গঠন করা হইয়াছে। সাধারণ মানুষ খরচ বাঁচাইয়া অতি কষ্টে যে টাকা সঞ্চয় করিয়াছে তাহা নষ্ট হইলে সে সর্বস্বান্ত হইবে। ছোট আমানতকারীর আমানত নষ্ট হইলে সে ভোগব্যয় হ্রাস করিবে যাহার ফলে মন্দা দেখা দিবে, এবং সমগ্র সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ব্যাংক ফেল পড়িলে ব্যাংক যদি আমানতকারীদের আমানত ফেরৎ দিতে না পারে তাহা হইলে বীমা তহবিল ওই টাকা মিটাইবে। ইহাতে আমানতকারীগণের আস্থা এবং বিশ্বাস বাড়িবে এবং আমানতকারীগণ অহেতুক গুজবে ভীত হইয়া ব্যাংক হইতে আমানত তুলিবার জন্য ছুটিবে না (run)। এই ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাংকে টাকা জমানোর অভ্যাস গড়িয়া উঠিবে এবং দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে। এই অবস্থার ফলে বীমাকৃত ব্যাংকগুলির প্রিমিয়াম বাবদ পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যাহা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আয় বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবে কারণ ভবিষ্যতে তাহাদের আমানত বৃদ্ধি পাইবে। আমানত বীমা ব্যবস্থায় ভারতে কার্যরত সকল বাণিজ্য ব্যাংককেই রেজেষ্ট্রি করিয়া এই পরিকল্পনায় যোগদান করিতে দেওয়া হইয়াছে। ভবিষ্যতে যে সকল ব্যাংক গঠিত হইবে তাহারাও রেজিষ্ট্রিভুক্ত হইয়া এই পরিকল্পনায় যোগদান করিবে।

উদ্দেশ্য

কার্যাবলী

বর্তমানে ব্যাংকের প্রত্যেক আমানতকারীর ১৫০০ টাকা পর্যন্ত আমানতের বীমা ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় কোনো কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের আমানত বা ব্যাংকের আমানত বীমা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্তমানে প্রতি ১০০ টাকার আমানত বীমার বাৎসরিক প্রিমিয়ামের হার ৫ পয়সা। কিন্তু কর্পোরেশনকে ইহা ১৫ পয়সা পর্যন্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

কোনো বীমাকৃত ব্যাংক ফেল পড়িলে উহা তিন মাসের মধ্যে তাহার আমানতকারীগণ ও তাহাদের অমানতের পরিমাণের একটা হিসাব কর্পোরেশনের নিকট পেশ করবে। এই তালিকা পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে কর্পোরেশন আমানতকারীদিগকে বীমাকৃত টাকা (অর্থাৎ ১৫০০ টাকা) ফিরৎ দিবে।

এই কর্পোরেশনের দুইটি ফাণ্ড আছে—আমানত বীমা তহবিল (Deposit Insurance Fund) এবং সাধারণ তহবিল (General Fund)। প্রিমিয়াম বাবদ যে টাকা পাওয়া যায় তাহা আমানত বীমা তহবিলে জমা হয় এবং ব্যাংক ফেল পড়িলে উহা হইতে আমানতকারীর পাওনা মেটানো হয়। মূলধন বিনিয়োগ করিয়া যে আয় হয় তাহা লইয়া সাধারণ তহবিল গঠিত হইয়াছে।

কর্পোরেশন কোনো ব্যাংকের কার্যাবলীর তদন্ত করিতে পারে না। রিজার্ভ ব্যাংকই অন্যান্য ব্যাংকের কার্যাবলী তদারক করিতে পারে। রিজার্ভ ব্যাংক

কর্পোরেশনের ব্যাংকার বলিয়া কর্পোরেশনকে আর এই ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। তবে অবশ্য কর্পোরেশন রিজার্ভ ব্যাংককে কোনো বীমাকৃত ব্যাংক সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিতে অনুরোধ করিতে পারে। কর্পোরেশন আমানত সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনীয় সংবাদ বীমাকৃত ব্যাংকের নিকট হইতে দাবী করিতে পারে। ১৯৬৪ সালের শেষে বীমাকৃত ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ১৫৭।

ভারতের আমানত বীমার বিরুদ্ধে বলা হয় যে উহা প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। আমেরিকায় পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত আমানত বীমা পরিকল্পনাভুক্ত কিন্তু ভারতে মাত্র ১৫০০ টাকা পর্যন্ত এই পরিকল্পনাভুক্ত। শ্রুফ কমিটি সুপারিশ করিয়াছিল যে পাঁচ কোটি টাকা মূলধন লইয়া আমানত বীমা কর্পোরেশন গঠিত হইবে এবং প্রত্যেক আমানতকারীর পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত বীমা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। বীমাভুক্ত আমানতকে ১৫০০ টাকার অধিক করা উচিত ছিল। অবশ্য এই ব্যবস্থার প্রবর্তন যে একটি সঠিক পদক্ষেপ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই এবং কালক্রমে ইহাকে প্রসারিত করার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে বর্তমানে প্রতি পাঁচজন আমানতকারীর মধ্যে চারজনের আমানত এবং মোট ব্যাংক আমানতের শতকরা ২৫ ভাগ বিপদমুক্ত হইল। অবশ্য এই ব্যবস্থা ব্যাংক ফেল রোধ করিবার মহৌষধ নয়। ইহা আমানতকারীদিগের স্বার্থরক্ষা করিবে মাত্র। বহু অর্থনীতিবিদের মতে ব্যাংক ফেল প্রতিরোধ করিতে হইলে বাণিজ্য-ব্যাংকগুলির জাতীয়করণ করা প্রয়োজন।

বাণিজ্য-ব্যাংকের জাতীয়করণ (Nationalisation of Commercial Banks): বর্তমানে বাণিজ্যব্যাংকের জাতীয়করণের প্রশ্ন লইয়া দেশব্যাপী আলোড়ন দেখা দিয়াছে। অবশ্য ব্যাংক জাতীয়করণের বিষয়টি একেবারে নূতন নয়। ১৯৪৮ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ভারতের ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থার জাতীয়করণের নীতি গ্রহণ করিলেও কার্যতঃ ইহাকে বাস্তবে রূপ দিবার কোনো চেষ্টা করা হয় নাই। ১৯৪৯ সালে রিজার্ভ ব্যাংককে জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৫৫ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে জাতীয়করণ করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গঠন হয়। বর্তমানে সকল বাণিজ্য-ব্যাংককে জাতীয়করণ করিবার জন্য আন্দোলন দেখা দিয়াছে। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে বাণিজ্যব্যাংক জাতীয়করণ করা হইলে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং দেশ হইতে ব্যাংক ফেলের আতংক দূর হইবে।

বাণিজ্যব্যাংক জাতীয়করণের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখানো হয়।

জাতীয়করণের স্বপক্ষে যুক্তি

প্রথমতঃ বাণিজ্যব্যাংক জাতীয়করণ করা হইলে ব্যাংকব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ব্যাংক বিপর্যয়ের আশংকা সম্পূর্ণভাবে দূর হইবে। ফলে আমানতকারী জনসাধারণের মনে আস্থার সঞ্চার হইবে, সঞ্চয় নিরাপদ মনে করিয়া তাহারা অধিক সঞ্চয়ে আগ্রহী হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, বাণিজ্যব্যাংকের জাতীয়করণের ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি অধিকতর কার্যকরী হইবে। টাকাকড়ি প্রচলন করা রাষ্ট্রের একচেটিয়া ক্ষমতা। কিন্তু ব্যাংকগুলিও পরোক্ষভাবে টাকাকড়ি সৃষ্টি করিতে পারে। টাকাকড়ি সৃষ্টির ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংকের একচেটিয়া অধিকার বলবৎ রাখিতে হইলে বাণিজ্য-ব্যাংকগুলিকে জাতীয়করণ করা প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, বাণিজ্যব্যাংকগুলির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া ফট্‌কা কারবারীগণ ফট্‌কায় টাকা খাটায়। ফট্‌কা কারবারীরা কৃত্রিমভাবে দাম বাড়াইয়া প্রচুর মুনাফা লাভ করে এবং মূল্যস্তর বৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগায়। ব্যাংক জাতীয়করণ করা হইলে এই সমাজবিরোধী ফট্‌কা কারবার বন্ধ করা যায়।

চতুর্থতঃ, ভারত সরকারের বিঘোষিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সহিত ব্যাংক ব্যবস্থার জাতীয়করণ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমাজে ধনবৈষম্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করা অর্থনৈতিক নীতির উদ্দেশ্য। ব্যাংকশিল্পের মধ্যে একচেটিয়া মালিকানা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হইতেছে এবং কয়েকব্যক্তির মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা অবাঞ্ছিতভাবে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। ১৯৬২ সালে পাঁচটি বড় ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ছিল মোট আমানতের শতকরা ৪৬ ভাগ। ব্যাংক জাতীয়করণ অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবে।

পঞ্চমতঃ, বর্তমানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকর করিবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। ব্যাংক জাতীয়করণ করিলে সরকার প্রয়োজনমত ব্যাংক আমানত অর্থনৈতিক উন্নয়নকার্যে ব্যবহার করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া প্রতিবৎসর বে-সরকারী ব্যাংকগুলি প্রায় ৪০ কোটি টাকার মতো মুনাফা অর্জন করিয়া থাকে। জাতীয়করণ করা হইলে এই মুনাফা সরকার পাইবে এবং উহা পরিকল্পনার কাজে নিয়োগ করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে পারিবে।

ষষ্ঠতঃ, ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে কর ফাঁকি হ্রাস পাইবে। কর ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে একই ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাংকে টাকা রাখে। ইহার ফলে প্রকৃত আয় গোপন করিয়া কর ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর হয়। ব্যাংক জাতীয়করণ হইলে ইহা বন্ধ করা সম্ভবপর হইবে।

সপ্তমতঃ, ব্যাংক ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করিবার জন্যও জাতীয়করণ করা প্রয়োজন। ব্যাংক অত্যধিক মুনাফার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিনিয়োগনীতি নির্ধারণ করে বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন এবং যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বহু প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ পায় না। ব্যাংক জাতীয়করণ হইলে ঋণ বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি হইবে।

অষ্টমতঃ, ভারতে শিল্পপতিদের সহিত ব্যাংকের অবাঞ্ছিত যোগাযোগ থাকায় এদেশে ব্যাংক ব্যবসায় শিল্পপতিদের স্বার্থে পরিচালিত হয়, সর্বাধিক সমাজ কল্যাণের আদর্শে নয়। ফলে একদিকে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটিতেছে এবং

অপরদিকে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের ঘাট্‌তি পড়িতেছে ফলে দেশে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হইতেছে।

ব্যাংক জাতীয়করণের বিপক্ষে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করা হয়। প্রথমতঃ বলা হয় যে ব্যাংক জাতীয়করণ করা হইলে আমলাতন্ত্রের প্রসার হইবে এবং পরিচালন দক্ষতা হ্রাস পাইবে। বেসরকারী মালিকানাতে পরিচালন নৈপুণ্য বজায় থাকে।

জাতীয়করণের বিপক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাংক জাতীয়করণ করা হইলে ক্ষতিপূরণ দিবার সমস্যা রহিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ব্যাংক জাতীয়করণের জন্য ১০০ কোটি টাকার মতো ক্ষতিপূরণ লাগিবে। বর্তমানে সরকারের আর্থিক অনটনের দিনে এই পরিমাণ ক্ষতি-পূরণ দেওয়া বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করিবে।

তৃতীয়তঃ, ব্যাংক জাতীয়করণ করা হইলে ঋণগ্রহীতার হিসাব সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করা যাইবে না।

চতুর্থতঃ, ভারতের ব্যাংকব্যবস্থার মোট আমানতের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ রিজার্ভ ব্যাংক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাংক মারফৎ রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়াছে। আর বাণিজ্য ব্যাংকগুলি তাহাদের আমানতের এক-চতুর্থাংশ সরকারী ঋণপত্রে লগ্নী করিতেছে। এরূপ অবস্থায় জাতীয়করণের পথে আর অগ্রসর হইবার কোনো যুক্তি নাই।

পঞ্চমতঃ, ভারতের শিল্পনীতি মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অর্থনীতিতে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ধরনের উদ্যোগকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। বেসরকারী শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি। ব্যাংক জাতীয়করণ করা হইলে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহে ঘাট্‌তি দেখা দিবে।

যষ্ঠতঃ বলা হয় যে, ব্যাংক-ব্যবসায়ে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়াছে তাহা জাতীয়-করণ ছাড়া অন্য উপায়ে দূর করা যায়। সরকার ও রিজার্ভ ব্যাংকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যাংকগুলির গলদ এবং অবাঞ্ছিত কাজ কারবার নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সুতরাং জাতীয়করণ অনাবশ্যক। অনেকে এই আশংকাও করেন যে ব্যাংক জাতীয়করণ ভারতের গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী এবং ইহা করা হইলে ভারতে বেসরকারী উদ্যোগ ধ্বংস হইবে এবং পরিপূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ব্যাংক জাতীয়করণ সম্পর্কে সরকার এখনো কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

. **ব্যাংক আইন (Banking Legislation):** ব্যাংক বিপর্যয় প্রতিরোধ এবং ব্যাংক ব্যবস্থাকে সুগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাংক আইন পাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৩০-৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং তদন্ত কমিটি বাণিজ্য ব্যাংকগুলির কার্যাবলী রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার সুপারিশ করেন। ১৯৪৯

সালে বাণিজ্য ব্যাংকগুলির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাংকিং কোম্পানীজ আইন পাশ (Banking Companies Act, 1949) করা হয়। এই আইন পাশ হইবার পূর্বে ব্যাংকগুলি ভারতীয় কোম্পানী আইন (Indian Companies Act) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত।

ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৪৯

এই ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের দ্বারা (১) ব্যাংকিং কোম্পানিগুলির উপর কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় এবং (২) রিজার্ভ ব্যাংকের উপর কতকগুলি ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। মূল আইনের ৫৫টি ধারার মধ্যে ২৮টি ধারা হইল ব্যাংকিং কোম্পানীসংক্রান্ত এবং বাকী ২৭টি ধারা হইল রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সংক্রান্ত। এই আইনটি ১৯৫০, '৫১, '৫৬, '৫৯, '৬০, '৬১, '৬২ এবং '৬৩ সালে নানাভাবে সংশোধিত হইয়াছে।

(১) এই আইনে ব্যাংকিং কোম্পানী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য 'ব্যাংকিং' শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। বিনিয়োগ বা ঋণদানের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছ হইতে আমানত গ্রহণ করাই হইল ব্যাংকিং। যে কোম্পানী ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করে তাহাই ব্যাংকিং কোম্পানী। রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীত কোনো কোম্পানী 'ব্যাংক', 'ব্যাংকার' বা 'ব্যাংকিং' শব্দগুলি ব্যবহার করিতে পারিবে না।

ব্যাংকের উপর বিধিনিষেধ

(২) নূতন ও পুরাতন সকল ব্যাংককেই রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া ব্যবসা করিতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া কোনো পুরাতন শাখার স্থান পরিবর্তন বা কোনো নূতন শাখা স্থাপন করা চলিবে না।

(৩) প্রতিটি ব্যাংকিং কোম্পানীর অন্ততপক্ষে ৫০ হাজার টাকার মূলধন থাকা চাই। ১৯৬২ সালের সংশোধিত আইনানুসারে ১৯৬২ সাল বা তৎপরবর্তীকালে যে সকল ব্যাংকিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাদের আদায়ীকৃত মূলধন অন্ততঃপক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা হইতে হইবে। কোনো ব্যাংক যদি ভারতের বাহিরে সংঘবদ্ধ (incorporated) হয় তাহা হইলে ভারতে ইহার আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ অন্ততঃ পনেরো লক্ষ টাকা হইতে হইবে। যদি ওই ব্যাংকের কলকাতা বা বোম্বাই শহরে কার্যালয় থাকে তবে ওই মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ অন্ততঃ বিশ লক্ষ টাকা হইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক তপশীলভুক্ত ব্যাংককে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট তাহার চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ জমা রাখিতে হইবে। তপশীল বহির্ভূত ব্যাংকগুলিকেও তাহাদের মোট চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ নগদ টাকায় নিজেদের কাছে অথবা রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়।

(৫ প্রত্যেক ব্যাংক তাহার নীট মুনাফা হইতে শতকরা ২০ ভাগ রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা রাখিবে। রিজার্ভ ফাণ্ড আদায়ীকৃত মূলধনের সমান না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলিবে।

(৬) ব্যাংককে তাহার মোট চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ২৫ ভাগ নগদ টাকা, সোনা বা অনুমোদিত ঋণপত্রে নিজের কাছে মজুত রাখিতে হইবে।

(৭) রিজার্ভ ব্যাংক-এর অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যাংক অন্য কোনো প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিবে না। কোনো ম্যানেজিং এজেন্সি দ্বারা ব্যাংক পরিচালিত হইতে পারিবে না। অন্য কোনো কোম্পানীর ডিরেক্টরও ব্যাংক পরিচালনা করিতে পারিবে না। ডিরেক্টরগণকে জামিন ব্যতীত কোনো প্রকার ঋণ দেওয়া চলিবে না।

(৮) কোনো ব্যাংকের বিলিকৃত মূলধন (Subscribed capital) অবশ্যই তাহার অনুমোদিত মূলধনের শতকরা ৫০ ভাগ হইবে এবং আদায়ীকৃত মূলধন (paid-up capital) বিলিকৃত মূলধনের অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ হইবে।

১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইনে রিজার্ভ ব্যাংকের উপর কতকগুলি ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতা

রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকগুলির কার্যকলাপ তদারক এবং হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবে। প্রত্যেক ব্যাংককে নিয়মিতভাবে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হিসাবপত্র দাখিল করিতে হইবে। বিভিন্ন ব্যাংকের সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব মঞ্জুর অথবা বাতিল করিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংকের রহিয়াছে। পুরাতন শাখার স্থানান্তর বা নূতন শাখা স্থাপন করিতে হইলে ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া ব্যাংকিং কোম্পানী ব্যাংকব্যবসা ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিবে না। কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যাংক ঋণ দিবে, সুদের হার কিরূপ হইবে ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশ দিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংকের থাকিবে। ব্যাংকের কারবার গুটাইতে হইলে, রিজার্ভ ব্যাংক যদি আবেদন করে তবে উহাকে সম্পত্তির মীমাংসাকারী (liquidator) হিসাবে নিয়োগ করা চলিবে।

এ পর্যন্ত ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের বহুবার সংশোধন করা হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন সংশোধনের দ্বারা সংযুক্তিকরণের এবং কারবার গুটাইবার পদ্ধতিকে সহজ করা হইয়াছে। কৃষিবিলের মেয়াদ ৯ মাস হইতে বাড়াইয়া ১৫ মাস করা হইয়াছে, সমবায় ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে আনা হইয়াছে। ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ডাইরেক্টর জেনারেল, ম্যানেজার বা অন্য কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করিবার পূর্বে রিজার্ভ ব্যাংকের সম্মতি লইতে হইবে। ব্যাংকের চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর বা কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংকের রহিয়াছে। কোনো ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন অত্যধিক বলিয়া মনে করিলে রিজার্ভ ব্যাংক উহা কমাইয়া দিবার নির্দেশ দিতে পারে। ব্যাংকগুলির হিসাবপত্র যাহাতে শ্রম আদালতের নিকট দাখিল করিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রিজার্ভব্যাংক ভারতীয় ব্যাংকগুলির বৈদেশিক শাখাসমূহ তদারক করিতে পারে।

ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে ইহার দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতের ব্যাংক কারবার ব্যাহত হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই আইনের বলে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হইলেও ইহা ব্যাংক বিপর্যয় রোধ করিতে পারে নাই। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংক অতীতে কোনো দিনই তাহার ক্ষমতার অপব্যবহার করে নাই এবং ব্যাংকিং আইন পাশ হওয়ার পরবর্তী যুগে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাংক ফেল হ্রাস পাওয়ায় এই আইনের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইয়াছে।

সমালোচনা

ভারতীয় ব্যাংক ব্যবস্থার ত্রুটি (Defects of the Indian Banking System) : প্রাচীনকালে ভারতে ব্যাংক-ব্যবস্থা (অর্থাৎ টাকা খাটাইয়া সুদ গ্রহণ করা) প্রসার লাভ করে নাই। ইহার কারণ হিন্দুধর্ম এবং দার্শনিকেরা ইহাকে ঘৃণাজনিত ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন। হিন্দুশাস্ত্র মনুসংহিতায় কুসীদজীবিদের নিন্দা করা হইয়াছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে "কুসীদ" শব্দের অর্থ কুৎসিতভাবে জীবন-যাপন করা। ইহা হইতে বোঝা যায় যে সে যুগে কুসীদজীবিদের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব কিরূপ নিন্দনীয় ছিল। মধ্যযুগে মুসলমান ধর্মও সুদ গ্রহণকে তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছে। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ভারতে ব্যাংকব্যবস্থার নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমতঃ, সকল অর্ধোন্নত দেশের মতো ভারতেও ব্যাংক ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিতকর। ভারতে একলক্ষ লোক পিছু ১.৫টি করিয়া ব্যাংক কার্যালয় পড়ে অপরপক্ষে ইংলণ্ডে উহার সংখ্যা ২৩। ভারতে মাথাপিছু ব্যাংক আমানতের পরিমাণ মাত্র ৫১ টাকা।

দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় টাকার বাজার সুসংগঠিত নয় এবং ইহা অসমজাতীয় উপাদানে গঠিত। বাজারের সংগঠিত ও অসংগঠিত অংশ পরস্পর সম্পর্কবিহীন। এখনো পর্যন্ত অসংগঠিত অংশ টাকার বাজারের ৫০ ভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, ভারতের গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থা প্রসারিত হয় নাই। গ্রাম্য ব্যাংকিং তদন্ত কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় যে ৫০০ জেলা সদরে কোনো বাণিজ্য ব্যাংকের কার্যালয় নাই। আবার সমবায় ব্যাংক এবং পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকের সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। কৃষিক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহ এবং গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য ব্যাংক ব্যবস্থার প্রসার প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, বাজারে বহুপ্রকার সুদের হার প্রচলিত রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং তদন্ত কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় যে সুদের হার ৪ টাকা হইতে ১৫ টাকার মধ্যে উঠানামা করে। বাজারের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কবিহীন এবং তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অভাবের দরুণ সুদের হারে এই বিশৃঙ্খলা দেখা যায়।

পঞ্চমতঃ, ব্যাংকফেল ভারতীয় ব্যাংক ব্যবস্থার একটি বিশেষ ত্রুটি। ১৯১৩-১৫ সালের সংকট, ১৯২২-৩৩ সালের সংকট এবং ১৯৪৭-৫১ সালের সংকট বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে ভারতে ১৮৫টি ব্যাংক ফেল পড়িয়াছে। বর্তমানে অবশ্য ব্যাংক বিপর্যয় বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে।

ষষ্ঠতঃ, ভারতীয় ব্যাংকগুলি স্বল্প পরিমাণ মূলধন লইয়া ব্যবসায় করে এবং রিজার্ভের পরিমাণও অত্যন্ত কম। সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগের তুলনায় যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ঋণপত্রে ইহারা অধিক বিনিয়োগ করে। ব্যাংক তাহার ডিরেক্টরকে অনেক সময় বিনা জামিনে ঋণদান করে এবং অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক ব্যাংক পরিচালনা করা হয়। এই সকল আভ্যন্তরীণ ত্রুটির জন্য এদেশে ব্যাংক বিপর্যয় এতো বেশী।

সপ্তমতঃ, বিলবাজারের অভাব ভারতের ব্যাংকব্যবস্থা প্রসারের পথে একটি বিরাট বাধাস্বরূপ। ১৯৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাংক বিল বাজার পরিকল্পনা চালু করে। কিন্তু প্রকৃত বাণিজ্য বিলের পরিবর্তে ঋণ দেওয়া হয় না বলিয়া ইহাকে প্রকৃত বিল বাজার বলা চলে না।

অষ্টমতঃ, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলির অস্তিত্ব ভারতীয় ব্যাংক ব্যবস্থার একটি বিরাট ত্রুটি। ইহারা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে একচেটিয়া কর্তৃত্ব ভোগ করিতেছে। লর্ড কেনসের কথায়, ইহারা ভারতীয় ব্যাংক ব্যবস্থার একটি বিপদস্থল।

পরিশেষে ভারতীয় টাকার বাজারের দোষত্রুটির জন্য উহার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যাপক হইতে পারে নাই। অসংগঠিত টাকার বাজার রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। আবার বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলিও রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্ব মানিত না।

ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ দূর করিবার জন্য তিন ধরণের পন্থার উল্লেখ করা হয়। প্রথমতঃ, ভারতীয় ব্যাংক ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যাংক আইন পাশ করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাংক বিপর্যয়ের ফলে যাহাতে স্বল্প সঞ্চয়কারী ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই উদ্দেশ্যে আমানত বীমা পরিকল্পনা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ চরমপন্থীরা দাবী করে যে প্রথম দুইটি পদ্ধতিতে ভারতীয় ব্যাংক ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করা সম্ভব নয় তাহারা সমগ্রভাবে বাণিজ্য ব্যাংকের জাতীয়করণ দাবী করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুদ্রা, বিনিময় ও মূল্যান্তর

(Currency, Exchange and Prices)

[বিষয়বস্তু : ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থার বিবর্তন—বর্তমান মুদ্রা ব্যবস্থা—ষ্টার্লিং পাওনা—মুদ্রামান হ্রাস : ১৯৪৯—মুদ্রামান হ্রাসের ফলাফল—মুদ্রামান হ্রাস : জুন, ১৯৬৬—ফলাফল—মূল্যায়ন—ভারতের মূল্যান্তর ও বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি—যুদ্ধকালীন মূল্যের গতি—যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যের গতি—প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যান্তরের গতি—দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যান্তরের গতি—তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যান্তরের গতি]

ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থার বিবর্তন (Evolution of the Indian Currency System) : ভারতীয় ইতিহাসের হিন্দু ও মুসলমান যুগে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র মুদ্রা প্রচলিত ছিল। মহম্মদ বিন্‌তোগলক তামার নোট প্রচলনের প্রচেষ্টাও করিয়াছিলেন। কাগজী মুদ্রার প্রচলন স্বরু হয় ইংরেজ শাসনের যুগ হইতে; মুদ্রা ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রসার বৃটিশযুগের ব্যাপার। ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থার বিবর্তনকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

[এক] ১৮০০-৩৫ সাল—দ্বিধাতুমানের যুগ (Bimetallic Standard) : ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সময় ভারতবর্ষে দ্বিধাতুমান প্রবর্তনের চেষ্টা করে। দেশে দুইটি ধাতু নির্মিত (যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্য) মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে তাহাকে দ্বিধাতুমান বলে। কিন্তু কিছুকাল পরে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে বিনিময় হার রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। ১৮৩৫ সালে দ্বিধাতুমান পরিত্যাগ করিয়া একধাতু রৌপ্যমান প্রবর্তন করা হয়।

[দুই] ১৮৩৫-৯৩ সাল—এক ধাতু রৌপ্যমানের যুগ (Silver Mono-metallic Standard) : ১৮৩৫ সালে মুদ্রা সম্পর্কে প্রথম আইন প্রবর্তন করা হয়। এই আইনের বলে ইংরাজ শাসিত ভারতের বিভিন্ন অংশে নানা প্রকার স্থানীয় মুদ্রার পরিবর্তে এক ওজনের একপ্রকার রৌপ্য মুদ্রাকে বিহিত মুদ্রা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই ব্যবস্থায় রৌপ্যের সহিত স্বর্ণের নির্দিষ্ট সরকারী হার ছিল কিন্তু ১৮৪৮ সালে অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যালিফোর্ণিয়ায় স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইলে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে বিনিময় হার (একটি স্বর্ণমুদ্রা = ১৫টি রৌপ্য মুদ্রা) রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। দেশের সর্বত্র স্বর্ণমান প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন দেখা দেয়।

[তিন] ১৮৯৩-৯৮ সাল—রূপান্তরযুগ (Transition Period) : আন্তর্জাতিক বাজারে এই সময় রৌপ্যের মূল্য হ্রাস পাইতে থাকে। জার্মানী, নরওয়ে, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ রৌপ্য মুদ্রামান পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণমান গ্রহণ করিতে থাকে। ভারতেও

স্বর্ণমান প্রবর্তন সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য ১৮৯২ সালে হার্সেল কমিটি (Herschell Committee) গঠিত হয় এবং এই কমিটি ভারতে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। ১৮৯৮ সালে ফাউলার কমিটি (Fowler Committee) নামে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি ভারতে পর্যায়ক্রমে স্বর্ণমান প্রবর্তনের সুপারিশ করে।

[চার] ১৮৯৮-১৯১৭ সাল—স্বর্ণ বিনিময়মান (Gold Exchange Standard) **:** ১৮৯৮ হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত দেশে স্বর্ণ বিনিময়মান প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় দেশে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকে না কিন্তু দেশের মানমুদ্রার সহিত বিদেশের কোনো একটি মুদ্রার সম্পর্ক থাকে ও সেই বৈদেশিক মুদ্রা স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই ব্যবস্থাকে স্বর্ণ মুদ্রা ব্যতীত স্বর্ণমান বলা চলে। অবশ্য এই ব্যবস্থায় দেশের মানমুদ্রার সহিত স্বর্ণের একটা পরোক্ষ সম্পর্ক বর্তমান থাকে। স্বর্ণ বিনিময় হারের অধীনে ১ টাকা = ১ শি. ৪ পে.—টাকা ও ষ্টার্লিং-এর মধ্যে এই বিনিময় হার স্থির হয়। স্বর্ণের তুলনায় রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রেসামনিয়ম কার্যকরী হয় এবং টাকা ও ষ্টার্লিং-এর বিনিময় হার বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

[পাঁচ] ১৯১৭-৩১ সাল—স্বর্ণপিণ্ড মানের (Gold Bullion Standard) যুগ : রৌপ্যের আপেক্ষিক মূল্য বৃদ্ধি, অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত প্রভৃতি কারণে ১৯১৭ সালে ভারতে স্বর্ণ বিনিময় হারের পতন ঘটে। এই সময় চরম বিশৃঙ্খলা চলিতে থাকে। অবশেষে ১৯২৫ সালে ভারতের উপযুক্ত মুদ্রামান সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য হিল্টন ইয়ং-কমিশন (Hilton Young-Commission) নিযুক্ত হয় এবং কমিটি দেশে স্বর্ণপিণ্ডমান প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এই কমিশন ভারতে রিজার্ভ ব্যাংক নামে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থাপনের সুপারিশও করে। ১৯২৭ সালে সরকার দেশে স্বর্ণ পিণ্ডমান প্রবর্তন করেন। দেশের ভিতরে রৌপ্যমুদ্রাও কাগজী মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এই সময়ে এক টাকা = ১ শি. ৬ পে.—এই বিনিময় হার প্রচলিত ছিল।

[ছয়] ১৯৩১-৪৭ সাল—ষ্টার্লিং বিনিময় মান : মন্দার চাপে ১৯৩১ সালে বৃটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। স্বর্ণের বহির্গমন রোধ করাই ছিল স্বর্ণমান পরিত্যাগের উদ্দেশ্য। তখন ভারতও স্বর্ণের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সরাসরি ষ্টার্লিং-এর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে। ভারতের অভ্যন্তরে রৌপ্য মুদ্রা এবং কাগজী মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কিন্তু পাউণ্ডের সহিত বিনিময় হার নির্দিষ্ট থাকায় বৈদেশিক প্রয়োজনে টাকাকে ষ্টার্লিং-এ ভাঙ্গানো যাইত। এক টাকা = ১ শি. ৬ পে.—টাকার সহিত পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এর এই বিনিময় হার বজায় ছিল। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইলে রিজার্ভ ব্যাংকের উপর টাকা ও ষ্টার্লিং-এর বিনিময় হার রক্ষা করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

[সাত] ১৯৪৭ হইতে অদ্যাবধি ; ১৯৪৭ সালে এপ্রিল মাসে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সদস্য হয়। অর্থ ভাণ্ডারের সদস্য দেশগুলিকে তাহাদের মুদ্রার সহিত স্বর্ণের বিনিময় হার ঘোষণা করিতে হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতের এক টাকা ০·২৬৮৬৯১ গ্রেণ বিশুদ্ধ স্বর্ণের সমান। ১৯৪৯ সালে মুদ্রামান

হ্রাস করার ফলে একটি টাকা ০·১৮৬৬২১ গ্রেণ বিশুদ্ধ স্বর্ণের সমান হয়। ১৯৬৬ সালে মুদ্রামান হ্রাসের ফলে একটি টাকা বর্তমানে ০·১১৮৫১৬ গ্রেণ বিশুদ্ধ স্বর্ণের সমান। ভারত অর্থ ভাণ্ডারের সদস্যভুক্ত হওয়ার ফলে ষ্টার্লিং-এর সহিত টাকার দীর্ঘকালের বন্ধন ছিন্ন হয় এবং ভারতীয় মুদ্রা একটি স্বাধীন মুদ্রায় পরিণত হয়। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের অধীনস্থ দেশগুলির যে মুদ্রা ব্যবস্থা সংক্ষেপে তাহাকে ফাণ্ড ব্যবস্থা (Fund System) বা স্বর্ণ সমতামান (Gold Parity Standard) বলে। এই ব্যবস্থার ফলে স্বর্ণের সহিত বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্থির থাকায় এক দেশের সহিত অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্থির থাকে। এই ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক বহুমুখীন স্বর্ণ বিনিময় মান (International Multilateral Gold Exchange Standard) বলা হয়। বর্তমানে ভারতের মুদ্রাব্যবস্থা হইল এই আন্তর্জাতিক মান।

বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থা (Present Currency System): ১৯৪৭ সালে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের সদস্য হয়। অর্থ-ভাণ্ডারের সকল সদস্যকেই উহার মুদ্রার স্বর্ণ-বিনিময় হার ঘোষণা করিতে এবং বজায় রাখিতে হয়। ভারতকেও তাহার একটি টাকা কতটুকু স্বর্ণের সমান তাহা ঘোষণা করিতে হয়। ভারতের একটি টাকার মূল্য ছিল ০·২৬৮৬৯১ গ্রেণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ। ১৯৪৯ সালে ভারতীয় মুদ্রামান হ্রাসের পর টাকার স্বর্ণমূল্য দাঁড়ায় ০·১৮৬৬২১ গ্রেণ স্বর্ণ। বর্তমানে ১৯৬৬ সালের মুদ্রামান হ্রাসের পর উহা দাঁড়াইয়াছে, ০·১১৮৫১৬ গ্রেণ স্বর্ণ।

স্বর্ণসমতামান

ভারতের বর্তমান যে মুদ্রা ব্যবস্থা তাহাকে ফাণ্ড ব্যবস্থা (Fund System) বা স্বর্ণ-সমতামান (Gold Parity Standard) বলা হয়। ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সদস্য হওয়ার ফলে ভারতের টাকার সহিত ষ্টার্লিং-এর বন্ধন ছিন্ন হয় এবং ভারতীয় টাকা একটি স্বাধীন মুদ্রায় পরিণত হয়।

কাগজীমুদ্রা ব্যবস্থা

ভারতের বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থাকে কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থা (Paper Currency System) বলা চলে। অন্য সকল দেশের মতো ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থায় দুই ধরণের মুদ্রা আছে ধাতবমুদ্রা (coins) এবং কাগজী মুদ্রা (paper notes)। এক টাকার কাগজী মুদ্রা হইতেছে দেশের আইনগত মুদ্রা (Legal Tender Money) এবং এক টাকার ধাতুমুদ্রা হইল মান মুদ্রা (Standard Money)। বর্তমানে এক টাকার ধাতুমুদ্রা ছাড়াও ৫০, ২৫, ১০, ৫, ৩, ২ এবং ১ পয়সার ধাতুমুদ্রা চালু আছে। ভারতের মুদ্রামান আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কাগজী মুদ্রামান হইলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহা স্বর্ণ সমতামান।

১৮৬১ সালের কাগজী মুদ্রা আইন (Paper Currency Act, 1861) দ্বারা সরকার বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাংকের নিকট হইতে কাগজী মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করে। ১৯৩৫ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা কাগজী মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে।

১৯৩৫ সাল হইতে রিজার্ভ ব্যাংক তাহার কাজ সুরু করে। এক টাকার নোট ছাড়া আর সকল প্রকার নোট প্রচলন করার একক অধিকার রিজার্ভ ব্যাংকের। ভারত সরকারের অর্থদপ্তর এক টাকার নোট প্রচলন করে।

আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি

১৯৩৪ সালের আইনানুসারে নোট প্রচলনে রিজার্ভ ব্যাংক আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি (Proportional Reserve System) অনুসরণ করিত। এই ব্যবস্থা অনুসারে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক মোট প্রচলিত কাগজী মুদ্রার শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ এবং ষ্টার্লিং ঋণপত্রে জমা রাখিত আর বাকী শতকরা ৬০ ভাগ ভারত সরকারের ঋণপত্র, হুণ্ডি ও রৌপ্য-মুদ্রায় জমা রাখা হইত। অবশ্য মোট স্বর্ণের মূল্য ৪০ কোটি টাকার কম হইতে পারিবে না। ১৯৪৭ সালে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের সদস্য হইবার পর কাগজী মুদ্রার জামিন হিসাবে ষ্টার্লিং ঋণপত্র ছাড়াও অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণপত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়।

সুবিধা

নোট প্রচলনের এই আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতির কতকগুলি সুবিধাদাবি করা হয়। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় কাগজী মুদ্রার সহিত স্বর্ণের সম্পর্ক থাকে বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক যথেষ্ট নোট প্রচলন করিতে পারে না। ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রাও ঋণপত্র জমা রাখার ব্যবস্থা থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা পরিচালনার সুবিধা হয়।

কিন্তু এই ব্যবস্থার অসুবিধা এই যে এই পদ্ধতির দরুণ যে স্বর্ণ জমা রাখা হইত তাহা অর্থ-নৈতিক উন্নতির কোনো কাজে আসে না।

সর্বনিম্ন রিজার্ভ পদ্ধতি

দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট চরম আকারে দেখা দিলে ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইনের সংশোধন করিয়া আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতির পরিবর্তে সর্বনিম্ন রিজার্ভ পদ্ধতির (Minimum Reserve System) প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে ৪৩০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণপত্র এবং ১১৫ কোটি টাকার স্বর্ণ এই মোট ৫১৫ কোটি টাকা জমা রাখিয়া যত্রখুশী কাগজী মুদ্রা প্রচলন করা চলিবে। প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়া রিজার্ভ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাও ঋণপত্রের জমার পরিমাণ ৪০০ টাকা হইতে কমাইয়া ৩০০ টাকা করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় সংশোধনী আইন

১৯৫৭ সালে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট আশংকাজনক হইয়া দেখা দিলে ওই বৎসর রিজার্ভ ব্যাংকের দ্বিতীয় সংশোধনী আইন [Reserve Bank (Second Amendment) Act] দ্বারা নোট প্রচলন পদ্ধতির আরও একদফা পরিবর্তন করিতে হয়। এই সংশোধনী আইনের বলে স্থির হয় যে মোট ২০০ কোটি টাকার স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাংক যে কোনো পরিমাণ কাগজী মুদ্রা প্রচলন করিতে পারিবে। ইহার মধ্যে অবশ্য স্বর্ণের মূল্য অন্ততপক্ষে ১১৫ কোটি টাকা হইবে। এই নূতন নিয়মানুসারে

১১৫ কোটি টাকার স্বর্ণ জমা রাখিতে গিয়া রিজার্ভ ব্যাংককে নূতন করিয়া স্বর্ণ কিনিতে হয় নাই। রিজার্ভ ব্যাংকের নোট প্রচলন বিভাগে যে স্বর্ণ জমা ছিল তাহার মূল্যই দাঁড়ায় ১১৫ কোটি টাকার মতো।

আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতিকে বিদায় দিয়া যে নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে ইহার বিরুদ্ধে নানারূপ সমালোচনা করা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংক মাত্র ২০০ কোটি টাকার স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখিয়া যে কোনো পরিমাণ টাকা প্রচলন করিতে পারে, ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা দেখা দিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থায় জনসাধারণের বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতে পারে।

এই পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা সুবিধা, ইহা নোট প্রচলন ব্যবস্থাকে স্থিতিস্থাপকতা দান করে। যে সকল অনুন্নত দেশ দ্রুত উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে এই পদ্ধতি বিশেষ সুবিধাজনক। ভারতে এই পদ্ধতি গ্রহণ করার কারণ বৈদেশিক মুদ্রা (যাহা নোট প্রচলনে রিজার্ভ হিসাবে রাখা হইয়াছিল) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কাজে লাগানো অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই পদ্ধতি ঘাটতি ব্যয়কে সহায়তা করে। বর্তমানে কোনো দেশেই স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন নাই। এরূপ অবস্থায় স্বর্ণের পরিমাণের সহিত নোট প্রচলন ব্যবস্থার গাঁট ছড়া বাঁধিয়া রাখা অর্থহীন। আজকাল কোনো দেশেই কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার রীতি নাই। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ তাহাদের প্রচলিত কাগজী মুদ্রার পিছনে স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখার ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের অবাধ ক্ষমতা রহিয়াছে। বর্তমান জগতের আর্থিক কাঠামোয় কাগজী মুদ্রার তুলনায় ঋণের পরিমাণ ও গুরুত্ব অনেক বেশী। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে নোট প্রচলনের উপর কতকগুলি বাধানিষেধ আরোপ করার কোন যুক্তি থাকে না।

লর্ডকেনসের অভিমত এই যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর জনসাধারণের আস্থা থাকিলে কাগজী মুদ্রার পিছনে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ জমা রাখার কোনো প্রয়োজন নাই। অপরপক্ষে যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর জনসাধারণের আস্থা হারাইয়া যায় তাহা হইলে কাগজী মুদ্রার পিছনে শতকরা ১০০ ভাগ স্বর্ণ ও বৈদেশিক জমা রাখিলেও জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিবে না। তথাপি জনসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জনের জন্য, বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির রাখিবার জন্য এবং যুদ্ধ ইত্যাদি আকস্মিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কিছু পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখা উচিত। কি পরিমাণে স্বর্ণ জমা রাখা হইবে এ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না করিয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ভারতের কাগজী মুদ্রা প্রচলন নীতি সমানুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেয়।

দশমিক মুদ্রা প্রচলন ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে ভারতে দশমিক মুদ্রার প্রবর্তন করা হয়। দীর্ঘকাল হইতেই

ভারতীয় মুদ্রার এই সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। ১৮৬৭ সালে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং সরকার সিদ্ধান্ত করেন যে ধীরে ধীরে দশমিক মুদ্রার প্রবর্তন করিতে হইবে। ১৮৭১ সালে দশমিক মুদ্রা চালু করিবার জন্য একটি আইন পাশ করা হয় কিন্তু উহা কার্যকরী হয় নাই। ১৯৬৪ সালে পুনরায় দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা হয় কিন্তু ইহা কার্যকরী করিতে কতকগুলি বাধা উপস্থিত হয়, (১) গান্ধীজীর আপত্তি, (২) দেশের প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থা এবং (৩) জনগণের মধ্যে এরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন গ্রহণের উপযোগী মনোভাবের অভাব। ১৯৫৫ সালে লোকসভায় একটি বেসরকারী প্রস্তাবে অবিলম্বে দশমিক মুদ্রা এবং মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপ প্রচলনের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়। এই প্রস্তাবের ফলেই ভারতে দশমিক মুদ্রা প্রবর্তন করা হয়।

দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা

পৃথিবীতে ১৪০টি মুদ্রা প্রচলনকারী দেশ রহিয়াছে; ইহাদের মধ্যে ১০৫টি দেশ ইতিমধ্যে এই মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে ভারতীয় টাকাকে ১০০ সমানভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং একভাগের প্রত্যেকটি একককে নয়া পয়সা (বর্তমানে পয়সা) বলা হয়। প্রচলিত টাকা ১০০ পয়সার সমান, আধুলি ৫০ পয়সার সমান এবং সিকি ২৫ পয়সার সমান। দশমিক মুদ্রায় এক পয়সা ভিন্ন অপরাপর মুদ্রা তামা ও নিকেল দ্বারা (২৫ ভাগ নিকেল ও ৭৫ ভাগ তামা) নির্মিত। এক পয়সা ব্রোঞ্জ দ্বারা নির্মিত। বর্তমানে এক পয়সাও নিকেল দ্বারা নির্মিত হইয়াছে।

হিসাবের সরলতা দশমিক মুদ্রা প্রচলনের সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা। বর্তমান ব্যবসায় বাণিজ্য জগতে দ্রুত এবং সরল হিসাব পদ্ধতির প্রয়োজন। দশমিক মুদ্রা প্রচলনের ফলে হিসাব রাখা সহজ হইয়াছে। ভগ্নাংশের জটিলতা ইহাতে নাই। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে শুধুমাত্র দ্রুত এবং সরল হিসাব রাখাই প্রয়োজন নয়, সঠিক হিসাব রাখারও প্রয়োজন রহিয়াছে। দশমিক মুদ্রাব্যবস্থাতে ইহা সম্ভব। তৃতীয়তঃ, ১৪০টি দেশে এই মুদ্রার প্রচলন রহিয়াছে। দশমিক ব্যবস্থায় ইহাদের সহিত বাণিজ্যে ভারতের সুবিধা হইবে।

ইহার সুবিধা

ষ্টার্লিং পাওনা (Sterling Balances): ষ্টার্লিং পাওনা বলিতে বুঝায় ইংলণ্ডের নিকট হইতে ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং (অর্থাৎ বৃটেনের মুদ্রা); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারত ছিল বৃটেনের দেনাদার কিন্তু যুদ্ধের পর ভারত তাহার নিকট পাওনা ষ্টার্লিং বৃটেনকে শোধ করিল, উপরন্তু দেখা গেল ভারত পাওনাদার দেশে পরিণত হইয়াছে এবং বৃটেনের নিকট তাহার বিপুল পরিমাণ ষ্টার্লিং পাওনা হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ ছিল মাত্র ৬৪ কোটি টাকা; ১৯৪৫-৪৬ সালে ইংলণ্ডের নিকট হইতে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৩৩ কোটি টাকা।

ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ

নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য ইংলণ্ডের নিকট হইতে ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রথমতঃ, ভারত তাহার কাগজী মুদ্রা প্রচলনের পিছনে সবসময়ই কিছু পরিমাণ ষ্টার্লিং ব্যাংক অব লণ্ডনে জমা রাখিত। ১৯৩৯ সালে এই জমার পরিমাণ ছিল ৬৪ কোটি।

কারণ

দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের সময় ভারত সরকার ইংলণ্ড ও অন্যান্য মিত্রশক্তিকে প্রভূত পরিমাণে সামরিক ও বেসামরিক দ্রব্য সরবরাহ করিয়াছিল। এই সকল দ্রব্যের মূল্য হিসাবে যে পাওনা হয় তাহা রিজার্ভ ব্যাংকের নামে ব্যাংক অব ইংলণ্ডে জমা হইতে থাকে।

তৃতীয়তঃ, যুদ্ধকালে ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অনুকূল হয়। ইহার দরুণও ইংলণ্ডে ভারতের পাওনা অর্থ জমা হইতে থাকে।

চতুর্থতঃ, যুদ্ধের সময় ভারত সরকারকে প্রচুর ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু ভারত ও বৃটেনের মধ্যে চুক্তি অনুসারে বৃটিশ সরকার ভারত সরকারের যুদ্ধব্যয়ের একাংশ বহন করিতে রাজী হয়। ইহার ফলেও বৃটেনের নিকট ভারতের বেশ কিছু পাওনা জমা হয়।

পঞ্চমতঃ, ভারতীয়গণের হাতে যে ডলার ও অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা (ষ্টার্লিং বাদে) সঞ্চিত ছিল ষ্টার্লিং জমা রাখিয়া তাহা গ্রহণ করা হইয়াছিল।

যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের এই দেনা পরিশোধের প্রশ্ন ওঠে। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দল নানা অজুহাতে এই পাওনা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। যুক্তি দেখানো হয় যে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ডকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এই পাওনার একাংশ ভারতের বহন করা উচিত। এমন কি ষ্টার্লিং পাওনা অস্বীকার করিবার গুজবও শোনা যায়। ষ্টার্লিং পাওনা হ্রাসের যে যুক্তি ইংলণ্ড দেখায় তাহা অর্থহীন। ভারত যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই সুতরাং ভারতের পক্ষে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করিবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। ইংলণ্ড এই যুক্তিও দেখায় যে যুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতির দরুণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ভারত সরকার উচ্চ মূল্যে দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়াছে। বেশী দাম লওয়ার ফলেই ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ এতো বেশী হইয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার প্রমাণ করেন যে নিয়ন্ত্রিত দামেই ইংলণ্ডকে দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছে। উপরন্তু, ইংলণ্ড ও মিত্রশক্তি ভারতে তাহাদের যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করার ফলে দেশে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং দেশবাসীকে সীমাহীন দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয়।

যাহা হউক, ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে এবং শ্রমিকদল সরকার গঠন করেন। নূতন সরকার ভারতের দাবীকে স্বীকার করেন এবং ঘোষণা করেন যে ভারতের পুরা ষ্টার্লিং পাওনাই মিটানো হইবে।

একসঙ্গে সব পাওনা মিটানো ইংলণ্ডের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না তাই চুক্তি দ্বারা স্থির হয় যে কিস্তিতে এই দেনা পরিশোধ করা হইবে। ১৯৪৭ সালের চুক্তি অনুসারে এক নম্বর হিসাব ও দুই নম্বর হিসাব নামে ব্যাংক অব ইংলণ্ডে রিজার্ভ ব্যাংকের দুইটি

হিসাব খোলা হয়। এক নম্বর হিসাব হইল চলতি হিসাব আর দুই নম্বর হিসাব হইল আটক হিসাব (Blocked or Frozen Account)। এক নম্বর হিসাব হইতে প্রয়োজনমত ষ্টার্লিং উঠাইয়া লওয়া চলিবে এবং চলতি বাণিজ্যের লেনদেন উদ্বৃত্ত উহাতে জমা হইবে। দুই নম্বর হিসাবে যে পাওনা ষ্টার্লিং জমা থাকিবে তাহা বৃটিশ সরকারের সম্মতি ব্যতীত তোলা যাইবে না। ১৯৫১ সালে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং উহার দ্বারা স্থির হয় যে ১৯৫৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত দুই নম্বর হিসাব হইতে ৩৫·০০ কোটি পাউণ্ড এক নম্বর হিসাবে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৫৭ সালে দেশ বিভাগ হইলে মোট প্রাপ্য ষ্টার্লিং-এর একাংশ পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। পাকিস্তানের প্রাপ্য, বৃটিশ কর্মচারীদের পেনসন ও বৃটিশ সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত সাজসরঞ্জামের মূল্য বাদে ভারতের প্রাপ্য ষ্টার্লিং-এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১০১০ কোটি টাকায়। উহা হইতে টাকা তোলার ফলে প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে পাওনা ষ্টার্লিং-এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৮৪ কোটি টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সালে উহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৭১৪ কোটি টাকা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ষ্টার্লিং পাওনা হইতে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল কিন্তু কার্যতঃ ব্যয় হয় ৫৭৯ কোটি টাকা; ফলে ১৯৬১ সালে ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ কমিয়া ১৩৫ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। বর্তমানে ইহাকে কাগজী মুদ্রার জামিন হিসাবে গণ্য করা হয়। এইভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়।

মুদ্রামান হ্রাস: ১৯৪৯ (Devaluation—1949): ১৯৪৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় টাকার মূল্য শতকরা ৩০·৫ ভাগ হ্রাস করা হয়। স্বর্ণ এবং বিদেশী মুদ্রার হিসাবে কোনো দেশের মুদ্রার বিনিময় মূল্য সরকারীভাবে হ্রাস করা হইলে তাহাকে মুদ্রামান হ্রাস বলে। বর্তমানে কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবে লেনদেন উদ্বৃত্তে সমতা সব সময় প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই কারণে কখনো কখনো দেশের মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস করিয়া প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের সংশোধন করা হয়। এই ব্যবস্থায় মুদ্রামান হ্রাসকারী দেশে বিদেশী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশে ওই দেশের রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়। এইভাবে আমদানী হ্রাস ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়া লেনদেন উদ্বৃত্তের অসমতা দূর হয়।

মুদ্রামান হ্রাস

ভারতে ১৯৪৯ সালে প্রথম মুদ্রামান হ্রাস করা হয়, পরে ১৯৬৬ সালে দ্বিতীয় বার উহা করা হয়। টাকার ডলার মূল্য ৩০·২২৫ সেন্ট হইতে হ্রাস পাইয়া ২১ সেন্ট আসিয়া দাঁড়ায় এবং স্বর্ণমূল্য ০·২৬৮৬০১ গ্রাম হইতে হ্রাস পাইয়া ০·১৮৬৬২১ গ্রাম আসিয়া দাঁড়ায়। ওই সময় ষ্টার্লিং-এর মূল্য একই অনুপাতে হ্রাস করায় টাকার সহিত ষ্টার্লিং-এর বিনিময় হার (একটাকা = ১টা. ৬পে) অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ মুদ্রামান হ্রাসের ফলে ডলারের হিসাবে টাকার দাম হ্রাস হইল এবং টাকার হিসাবে ডলারের দাম বৃদ্ধি পাইল।

নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য ১৯৪৯ সালে টাকার মুদ্রামান হ্রাস করা হয়। প্রথমতঃ, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য, বিশেষ করিয়া ডলার অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যে ক্রমাগত ঘাটতি হইতেছিল। প্রথম প্রথম এই ঘাটতি ভারতের প্রাপ্য ষ্টার্লিং পাওনা হইতে মিটানো হইতেছিল; কিন্তু ১৯৪৭ সাল হইতে ষ্টার্লিং পাওনার অধিকাংশ আটক হিসাবে (Blocked Account) জমা থাকায় ঘাটতি মিটাইতে ভারতকে বারবার অর্থভাণ্ডারের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইতেছিল। ১৯৪৮ সালে মোট লেনদেন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১২২ কোটি টাকা।

কারণ

দ্বিতীয়তঃ, ১৯৪৯ সালে সমগ্র ষ্টার্লিং অঞ্চল, বিশেষ করিয়া বৃটেন ডলার সংকটের সম্মুখীন হয়। ডলার অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যে ইংলণ্ডের ক্রমাগত ঘাটতি হইতে থাকে। ইংলণ্ডের ডলার অঞ্চলে রপ্তানী কমিয়া গিয়াছিল অপরপক্ষে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্যের আমদানী প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অর্থ ভাণ্ডারের নিকট হইতে সাহায্য এবং আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া বৃটেন এই ঘাটতি মিটাইতেছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা অধিক দিন চলিতে পারে না এবং বৃটেনের এই যে আন্তর্জাতিক দেনাপাওনার হিসাবে ঘাটতি তাহা স্বল্পস্থায়ী নয়—দীর্ঘস্থায়ী মৌলিক ভারসাম্যহীনতা উপলব্ধি করিয়া ডলারের তুলনায় ষ্টার্লিং-এর মূল্য শতকরা ৩০.৫ ভাগ হ্রাস করা হয়। বৃটেন ষ্টার্লিং-এর বিনিময় হার হ্রাস করায় ষ্টার্লিং-এলাকার সহিত ব্যবসায়বাণিজ্য অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য ভারত সরকারকেও টাকার ডলার মূল্য শতকরা ৩০.৫ ভাগ হ্রাস করিতে হয়। ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ডাঃ জনমাথাই ঘোষণা করেন যে বৃটেন ও ষ্টার্লিং-অঞ্চলের অন্যান্য দেশ যখন মুদ্রামান হ্রাস করিয়াছে ভারতকেও বাধ্য হইয়া উহাদের পথ অনুসরণ করিতে হইল।

তৃতীয়তঃ, প্যাটারসনের (Patterson) মতে ডলার এবং ষ্টার্লিং-এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল। এই উভয় প্রকার মুদ্রার মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য ষ্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাস করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

মুদ্রামান হ্রাসের ফলাফল: [এক] রপ্তানীর উপর প্রভাব। ডলারের সহিত টাকার বিনিময় হার হ্রাস পাওয়ায় ডলার অঞ্চলে ভারতের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। তুলাবস্ত্র, চর্ম, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। ষ্টার্লিং অঞ্চলেও মুদ্রামান হ্রাসের ফলে রপ্তানী বৃদ্ধি পায় কারণ যে সকল দেশ মুদ্রামান হ্রাস করে নাই, (যেমন জাপান) তাহাদের তুলনায় প্রতিযোগিতায় ভারতের সুবিধা হয়। মুদ্রামান হ্রাসের পরবর্তী ছয়মাসে মোট রপ্তানী শতকরা ৪৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

ফলাফল

[দুই] আমদানীর উপর প্রভাব: মুদ্রামান হ্রাসের ফলে দেশের আমদানী হ্রাস পায়। কিন্তু মুদ্রামান হ্রাসের ফলে ভারতের ক্ষেত্রে আমাদানী বিশেষ হ্রাস পায় নাই কারণ ভারত বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য এবং মূলধনী দ্রব্যাদি আমাদানী করিত এবং উহাদের চাহিদা দেশে অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় আমদানী হ্রাস পাইল না।

এই সময় ভারত মুদ্রামান হ্রাস করিলেও পাকিস্তান উহা করে নাই ফলে পাট, তুলা প্রভৃতি কাঁচামাল পাকিস্তান হইতে আমদানীর জন্য ভারতকে উচ্চ মূল্য দিতে হইল।

[**তিন**] বাণিজ্য-ব্যালান্সের উপর প্রভাব : রপ্তানী বৃদ্ধি ও আমদানী হ্রাসের ফলে বাণিজ্য-ব্যালান্সের প্রতিকূলতা হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২৮৩ কোটি টাকা কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ২২ কোটি টাকায় পরিণত হয়। অবশ্য এই উন্নতি স্থায়ী হয় নাই। ১৯৫১-৫২ সালে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের প্রতিকূলতা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৩ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

[**চার**] আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের উপর প্রভাব : মুদ্রামান হ্রাসের ফলে ভারতে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৯ সাল হইতে ১৯৬০ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতে মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫০০-এ পরিণত হয়। মুদ্রামান হ্রাসের ফলে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহা আশংকা করিয়া সরকার আটদফা কর্মসূচী (8 Point Programme) গ্রহণ করেন। অবশ্য কিছুদিনের জন্য মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ইহা দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইলেও ১৯৫০ সাল হইতেই উহা বৃদ্ধি পাইতে সুরু করে।

মুদ্রামান হ্রাসের অনুকূল প্রভাব স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। উহা দীর্ঘস্থায়ী সুফল প্রদান করিতে পারে না। ডাঃ সরোজকুমার বসুর মতে ভারতের রপ্তানী ও আমদানী দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক বলিয়া মুদ্রামান হ্রাসে ভারতের কোনো সুবিধাই হইবে না উপরন্তু ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে ও জনগণের অশেষ দুঃখদুর্দশার সৃষ্টি হইবে। উপরন্তু মুদ্রামান হ্রাস করার ফলে মুদ্রা হিসাবে টাকার আন্তর্জাতিক খ্যাতি বিনষ্ট হইবে।

মুদ্রামান হ্রাসের ফলে দেশের কোনো স্থায়ী মঙ্গল হয় নাই। বাণিজ্য-ব্যালান্সে যে প্রতিকূলতা হ্রাস পায় তাহার একমাত্র কারণ রপ্তানী বৃদ্ধি নয়—আমদানী হ্রাসের কঠোর সরকারী ব্যবস্থাসমূহও ইহার জন্য দায়ী। মুদ্রামান হ্রাসের ফলে দেশের কোনো মঙ্গল হয় নাই উপরন্তু যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল।

মুদ্রামান হ্রাস : জুন ১৯৬৬ (Devaluation : June, 1966) : বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্বর্ণের তুলনায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্য হ্রাস করা হইলে তাহাকে মুদ্রামান হ্রাস বলে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাসের দরুণ আমদানী হ্রাস ও রপ্তানীর বৃদ্ধি ঘটিয়া লেনদেন উদ্বৃত্তে অসমতা দূর হয়। মুদ্রামান হ্রাস করিলে মূল্য হ্রাসকারী দেশের বাজারে বিদেশী আমদানী দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং বৈদেশিক বাজারে মূল্য হ্রাসকারী দেশের রপ্তানী দ্রব্যের দাম হ্রাস পায়। এইভাবে লেনদেন উদ্বৃত্ত দেশের অনুকূলে আসিতে থাকে।

মুদ্রামান হ্রাসের কার্যকারিতা নির্ভর করে প্রধানতঃ আমদানী-রপ্তানী চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। মুদ্রামান হ্রাস হইলে আমদানীর মূল্য বৃদ্ধি এবং রপ্তানীর মূল্য হ্রাস হয়। এখন যদি আমদানী দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে মুদ্রামান হ্রাসের পরও আমদানী বিশেষ হ্রাস পাইবে না ফলে বৈদেশিক দেনার পরিমাণ

বৃদ্ধি পাইবে। আবার যদি রপ্তানী চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে মুদ্রামান হ্রাসের ফলে মোট রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে না। ইহার ফলে বৈদেশিক পাওনা হ্রাস পাইবে। সুতরাং আমদানী ও রপ্তানীর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে মুদ্রামান হ্রাসের ফলে সুবিধা না হইয়া গুরুতর অসুবিধাই দেখা দিবে। পক্ষান্তরে উভয় দেশের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে মুদ্রামান হ্রাসের ফলে অধিক পরিমাণে আমদানী হ্রাস ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে।

১৯৬৬ সালের ৫ই জুন তারিখে ভারতের তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরী টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের কথা ঘোষণা করেন। ভারতীয় টাকার মূল্য শতকরা ৩৬·৫ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে। একটি মার্কিন ডলারের বিনিময়ে এখন ৭·৫০ টাকা (পূর্বের হার ১ ডলার = ৪·৭৬ টাকা) এবং একটি ষ্টার্লিং পাউণ্ডের পরিবর্তে ২১ টাকা পাওয়া যাইবে (পূর্বের হার ছিল ১ পাউণ্ড = ১৩·৩৩) আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভারতীয় ১০০ টাকার তুল্যমূল্য (Par value) হইবে ১১·৮৫ গ্রাম স্বর্ণ, পূর্বে উহা ছিল ১০০ টাকা = ১৮·৬৬ গ্রাম স্বর্ণ।

কি দামে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাইবে মুদ্রার বিনিময় হার তাহা নির্দেশ করে। ওই বিনিময় হারে যদি বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত না হয় তাহা হইলে বিনিময় মূল্যের আসল যাহা ভূমিকা অর্থাৎ উৎপাদন-উপাদানের যথাযোগ্য বণ্টন তাহা পালন করা যাইবে না।

মুদ্রামান হ্রাসের কারণ (Causes of Devaluation): প্রথমতঃ, বিগত দশ বৎসরে আমাদের দেশে সাধারণ মূল্যস্তর শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু যেসব দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক সেই সকল দেশে অনুরূপ পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি ঘটে নাই। অথচ টাকার সরকারী বিনিময় মূল্য ১৯৪৯ সাল হইতে অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের রপ্তানী দ্রব্য প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে পারিতেছে না। মুদ্রামান হ্রাসের ইহা একটি প্রধান কারণ।

আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি

দ্বিতীয়তঃ, বিগত পনেরো বৎসরে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দরুণ বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়ের উপর অত্যন্ত চাপ পড়িয়াছে। বৈদেশিক সাহায্য সত্ত্বেও ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় আশংকাজনক হইয়া পড়ে। ১৯৬৬ সালের মার্চের শেষে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ছিল মাত্র ১৮৭ কোটি টাকা। এই অবস্থায় মুদ্রামান হ্রাস করা অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়।

বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতা

তৃতীয়তঃ, বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের লেনদেন উদ্বৃত্ত অনুকূল করা অর্থাৎ আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বৃদ্ধি করবার জন্য মুদ্রামান হ্রাস করা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রপ্তানী সম্প্রসারণের জন্য নানাপ্রকার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু রপ্তানী বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। দেশের আভ্যন্তরীণ মূল্য বৃদ্ধির দরুণ একদিকে রপ্তানী শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি পাইয়াছে আর অন্যদিকে যোগানের এক বৃহৎ অংশ ক্রমবর্ধমান

রপ্তানী বৃদ্ধি

আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতেই ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় মুদ্রামান হ্রাস করিয়া রপ্তানী বৃদ্ধি করার প্রয়োজন স্বাভাবিক।

আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির পরও দেখা গিয়াছে অনেকক্ষেত্রে আমদানীজাত দ্রব্য অনুরূপ ভারতীয় দ্রব্যের তুলনায় সস্তা। ইহার দরুণ আমরা দেশে বৈদেশিক দ্রব্যের পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদনের দিকে তেমন মনোযোগ দিই নাই।

চতুর্থতঃ, ভারতের বাজারে বৈদেশিক দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা খুব বেশী থাকায় বিদেশে ডলার ও ষ্টার্লিং খোলাবাজারে চড়াদামে বিক্রয় হইতেছিল। মুদ্রামান হ্রাসের পূর্বে টাকা ও ডলারের সরকার নির্ধারিত বিনিময় হার ছিল ১ ডলার = ৪·৭৬ টাকা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি ডলারের জন্য ১০ টাকা দাম দিতে হইত। ইহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টাকার মর্যাদা এবং সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। বলা হয় যে মুদ্রামান হ্রাস করিয়া সরকার প্রকৃতপক্ষে টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস করেনি—বেসরকারী বাজারে টাকার যে বিনিময় মূল্য ছিল তাহাকেই সরকারী বিনিময় হারে নূতন করিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

বৈদেশিক মুদ্রার অত্যধিক চাহিদা

পঞ্চমতঃ, এই যুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে যে মুদ্রামান হ্রাসের ফলে ভারতের আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি ও বৈদেশিক সাহায্যের উপর ভারতের নির্ভরশীলতা হ্রাস পাইবে। ইহার ফলে ভারতীয় রপ্তানীকারকগণের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে এবং স্বর্ণের চোরা চালান লাভজনক না হওয়ায় উহা বন্ধ হইয়া যাইবে।

আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্ণর শ্রী পি, সি ভট্টাচার্যের মতে এই নূতন পদক্ষেপ দেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ রচনা করিবে কারণ অধিক পরিমাণ বৈদেশিক সহযোগিগণ ভারতে টাকা বিনিয়োগ করিতে উৎসাহবোধ করিবে আর ইহার ফলে দেশে মূলধন প্রবাহ বৃদ্ধি পাইবে।*

বিনিয়োগ বৃদ্ধি

ষষ্ঠতঃ, কোনো কোনো সমালোচকের মতে ভারত স্বইচ্ছায় মুদ্রামান হ্রাস করে নাই, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তথা আমেরিকার চাপে পড়িয়া বাধ্য হইয়া ইহা করিয়াছে। বৃটিশ অর্থনীতিবিদ পল ব্যারোর মতে ভারত আমেরিকা হইতে অধিক পরিমাণ সাহায্য পাইবার সর্ত হিসাবে মুদ্রামান হ্রাস করিয়াছে। অবশ্য অর্থমন্ত্রী ইহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

বৈদেশিক চাপ

এই সকল কারণে ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাস করা হয়।

ফলাফল (Effects)ঃ টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে আমরা উহাকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিতে পারি: (১) টাকার

* "The new measures would create a favourable investment climate in the country as more and more foreign collaborators would be enthused to invest money ensuring a greater inflow of capital." P C. Bhattacharjya.

মূল্যহ্রাস ও রপ্তানী বাণিজ্য, (২) টাকার মূল্যহ্রাস ও আভ্যন্তরীণ মূল্যমান, (৩) টাকার মূল্যহ্রাস ও কেন্দ্রীয় রাজস্ব, (৪) টাকার মূল্যহ্রাস, আয় বৃদ্ধি ও সঞ্চয়, (৫) টাকার মূল্য হ্রাস ও চতুর্থ পরিকল্পনা, (৬) টাকার মূল্যহ্রাস ও সংশ্লিষ্ট নীতি।

দাবি করা হয় যে ১৯৬৫ সালে মোট ৮০০ কোটি টাকার রপ্তানী বাণিজ্যের মধ্যে ৬৫০ কোটি টাকা রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য কোনোরূপ আর্থিক সাহায্য করা হয়নি, সুতরাং মুদ্রামান হ্রাস করার কি প্রয়োজন ছিল? এই দাবি মিথ্যা না হইলেও বিভ্রান্তিকর। কয়েক ধরণের কাঁচামাল যেমন তামাক, সিগার, লবণ, তৈল, খনিজপদার্থ, চা ও পাট বিভিন্ন মাত্রায় রেল পরিবহণ এবং রপ্তানী সাহায্য পায়।

রপ্তানীর প্রসার

চা, পাট ও গোলমরিচ জাতীয় কয়েক ধরণের কাঁচামালের চলতি মূল্যে বিশ্ব-চাহিদা শীঘ্রই সীমাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। এরূপক্ষেত্রে মূল্য হ্রাস হইলে আমাদের রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। অন্যান্য দ্রব্য আছে যাহাদের চাহিদা বিশ্বে সীমাবদ্ধ নয়। এইরূপ স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে মূল্যমান হ্রাস হইলে আমাদের রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

বর্তমানে যে আমদানী লাইসেন্স ও অন্যান্য সাহায্য ব্যবস্থা চালু আছে সেগুলি একপ্রকার মুদ্রামান হ্রাস ব্যবস্থা। মুদ্রামান হ্রাসের সামিল এই সব ব্যবস্থা স্বল্পমেয়াদী এবং সামঞ্জস্যহীন (অর্থাৎ বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে সরকারী সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে কোনো সামঞ্জস্য নেই)।

মুদ্রামান হ্রাস রপ্তানী বাণিজ্যে উৎসাহদান সুনিশ্চিত করিবে এবং অর্থসাহায্যদানে যে অনিশ্চয়তা আছে তাহা দূর করিবে। ইঁহার ফলে প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাস পাইবে আর যে সব দ্রব্য সাহায্য পাইত না বা রপ্তানী হইত না সেগুলিও রপ্তানীর ব্যাপারে উৎসাহ পাইবে।

পূর্বে চোরাপথে বিদেশ হইতে বহু অর্থ ভারতে আসিত। পরিবর্তিত বিনিময়হার কার্যকরী হওয়ায় চোরাপথে বৈদেশিক মুদ্রার আমদানী আর উৎসাহ পাইবে না। ফলে সোনা বা অন্যান্য দ্রব্যের চোরা কারবার অনেক হ্রাস পাইবে কারণ এই কারবারে মুনাফা এখন খুব সামান্যই থাকিবে। ভারতে পর্যটন অল্প খরচে সম্ভবপর হইবে বলিয়া বিদেশীদের কাছে উহা আকর্ষণীয় হইয়া দাঁড়াইবে। বিদেশী বেসরকারী শিল্প হইতে মুনাফা ও মূলধনের যে অংশ উত্তমর্ণ দেশে পাঠানো হয় বৈদেশিক মুদ্রায় তাহার হ্রাস পাইবে।

মনে রাখা প্রয়োজন পূর্বে আমরা যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতাম এখন সেই পরিমাণ মুদ্রা অর্জন করিতে হইলে আমাদের রপ্তানী শতকরা ৫৭ ভাগ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

টাকার মূল্য হ্রাস জনসাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছে। আশংকা করা হইতেছে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশের অভ্যন্তরে টাকার ক্রয়মূল্য হ্রাস পাইবে। এই

আশংকা যে অমূলক নয়, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। অবশ্য সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহারা আমদানীকৃত খাদ্যদ্রব্য এবং কেরোসিনের মূল্য উপযুক্ত সাহায্য ও পরোক্ষ কর ধার্য করিয়া স্থিতিশীল রাখিবেন। মোটা ও মাঝারি বস্ত্রের দামের কোনোরূপ পরিবর্তন হইবে না কারণ খুব সামান্য আমদানীকৃত কাঁচমাল ইহাতে ব্যবহৃত হয়। খাদ্য, বস্ত্র এবং জ্বালানি জনসাধারণের ভোগ্যপণ্যের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে। সুতরাং আশা করা যাইতেছে যে মুদ্রামান হ্রাস জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উপর খুব সামান্যই প্রভাব বিস্তার করিবে। আমদানীকৃত সারের দামও স্থিতিশীল রাখা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

মুদ্রামান হ্রাস ও মুদ্রাস্ফীতি

কিন্তু বিলাসসামগ্রীর ব্যাপারে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণ হয় সেগুলি আমদানীকৃত অথবা উহাদের অংশবিশেষ—আমদানীকৃত সামগ্রী যেমন ব্লেড, রেবন, বিদেশী পানীয় ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। মুদ্রামান হ্রাসের ফলে এই সকল সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য।

মুদ্রামান হ্রাসের পূর্বে নানাপ্রকার আমদানীকৃত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ বাজারদর আমদানীর ব্যয় অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। রাসায়নিক দ্রব্য, রং, কৃত্রিম রেশমী সূতা, ষ্টেনলেসষ্টিল, শুষ্ক ফল এবং কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যসামগ্রী এই পর্যায়ে পড়ে। এই সকল দ্রব্যের বাজার দাম আমদানীর ব্যয় অপেক্ষা শতকরা ৪০ হইতে ২০০ ভাগ বেশী ছিল। এখন আমদানীকারকগণ যদি আমদানীর ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ তাহাদের মুনাফার হার কমাইয়া ফেলে তাহা হইলে মুদ্রামান হ্রাসের ফলে ওই সকল দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির কোনো কারণ থাকিবে না।

টাকার মূল্যহ্রাসের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় এবং আয় উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে সুতরাং পরিণামে কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। মুদ্রামান হ্রাসের ফলে সরকারী উদ্যোগ বাবদ বৈদেশিক মুদ্রার যা ব্যয় (যেমন কাঁচামাল আমদানী, ঋণ-পরিশোধ, সুদ প্রদান প্রভৃতি) ভারতীয় টাকার অংকে স্পষ্টতঃ তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমদানীকৃত খাদ্য, কেরোসিন ও সারের দাম মুদ্রামান হ্রাসের পূর্বের হারে স্থিতিশীল রাখিবার জন্য সরকারকে যে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে তাহার দ্বারা সরকারী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু রপ্তানী শুল্ক ধার্য ও রপ্তানী বাণিজ্যে শুল্ক সাহায্য ও অর্থ সাহায্য প্রত্যাহার করিলে সরকারী ব্যয় অনেক হ্রাস পাইবে। আশা করা যায় যে কেন্দ্রীয় রাজস্ব সামান্য বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু মুদ্রামান হ্রাসের ফলে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িবে। সুতরাং জাতীয় তহবিলের ভারসাম্য বজায় থাকিবে কিনা তাহা বলা কঠিন।

মুদ্রামান হ্রাস ও কেন্দ্রীয় রাজস্ব

মুদ্রামান হ্রাস আয়, সঞ্চয় এবং নিয়োগের উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। মুদ্রামান হ্রাসের ফলে যদি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন (অথবা সাহায্য) বৃদ্ধি পায়

তাহা হইলে যেসব শিল্প বিদেশজাত কাঁচামালের অভাবের দরুণ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিত না এখন তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে। ফলে আয়, কর্মসংস্থান ও মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে। আয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ও বৃদ্ধি পাইবে যাহার ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে।

মুদ্রামান হ্রাস এবং আয় ও নিয়োগ

মুদ্রামান হ্রাসের ফলে চতুর্থ পরিকল্পনায় কি প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা দেখা যাক।

মুদ্রামান হ্রাসের ফলে আমদানী ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই সঙ্গে যদি দেশে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে পরিকল্পনাবাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে, তবে কি চতুর্থ পরিকল্পনা কাটছাঁট অপরিহার্য ? চতুর্থ পরিকল্পনার সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মুদ্রামান হ্রাস কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে তাহা পৃথকভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

মুদ্রামান হ্রাস ও চতুর্থ পরিকল্পনা

চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ স্থির হইয়া গিয়াছে। দুইটি কারণে টাকার অংকে পরিকল্পনার ব্যয়বৃদ্ধি পাইবেঃ (১) মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে পরিকল্পনাবাবদ আমদানীর ব্যয় টাকার অংকে বৃদ্ধি পাইবে এবং (২) দেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ও মজুরি বৃদ্ধির ফলে ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাইবে।

পরিকল্পনাবাবদ অধিকাংশ আমদানীর ব্যয় বৈদেশিক অর্থসাহায্যে নির্বাহ করা হয়। মুদ্রামান হ্রাসের ফলে আমদানীর ব্যয় টাকার অংকে বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু সেই সঙ্গে পরিকল্পনাবাবদ যে বৈদেশিক সাহায্য এখন আসিবে তাহার মূল্যও টাকার অংকে বৃদ্ধি পাইবে ; সুতরাং ভারসাম্য নষ্ট হইবে না। সরকারী উদ্যোগে অর্থ লগ্নীর ব্যাপারে কিছু রদবদলের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সরকারী উদ্যোগে যেসব দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার হয় তাহার মূল্যবৃদ্ধির ফলে মূলধনের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এখন যদি মূল্যবৃদ্ধির সমস্যাকে যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আয়ত্তে আনা যায় তাহা হইলে মুদ্রামান হ্রাসের দরুণ টাকার অংকে মূলধনের সমস্যা দেখা দিবার কোনো কারণ নাই।

এবার বেসরকারী উদ্যোগের উপর মুদ্রামান হ্রাসের প্রভাব আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহা সত্য যে আমদানীর ব্যয় বৃদ্ধির ফলে টাকার অংকে মূলধনের সমস্যা দেখা দিবে। কিন্তু বেসরকারী উদ্যোগে বৈদেশিক অংশীদারদের অর্থলগ্নী করার দরুণ মূলধন বৃদ্ধির ব্যাপারে কোনো সমস্যা থাকিবে না। মুদ্রামান হ্রাসের ফলে রপ্তানীর মাধ্যমে ও আমদানীকৃত দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্য সরবরাহ বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ নিয়োগ করা সম্ভবপর হইবে। ফলে মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে বেসরকারী উদ্যোগে সামগ্রিক আয় বাড়িবে। ফলে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের এক বৃহৎ পরিধি রচিত হইবে এবং সেখান হইতে বেসরকারী উদ্যোগে মূলধন লগ্নী করার জন্য টাকা পাওয়া যাইবে। অবশ্য ইহা বলা কঠিন যে মূল্যবৃদ্ধিও বেসরকারী উদ্যোগে সঞ্চয়ের মধ্যে ভারসাম্য থাকিবে কিনা। মুদ্রামান হ্রাস কোনোমতেই পরিকল্পনাকে কাটছাঁট

করার কারণ হইতে পারে না। অবশ্য চতুর্থ পরিকল্পনায় যে সকল লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হইয়াছে, মুদ্রামান হ্রাসের পরও তাহা বজায় থাকিবে ইহা ঠিক নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

মুদ্রামান হ্রাসের যে সুবিধা তাহা লাভ করিতে হইলে যথোপযুক্ত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে আমাদের রপ্তানী দ্রব্যের ব্যয়ভার যেন বিশ্ববাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় বৃদ্ধি না পায় কারণ তাহা হইলে মুদ্রামান হ্রাসের ফলে ব্যবসায়ীরা যে সুবিধা পাইত তাহা নষ্ট হইবে। দেখা যায় যে মোট উৎপাদনের মধ্যে শ্রমিকদের মজুরি একটা বিরাট অংশ। এখন যদি মজুরির হার বৃদ্ধি পায় আর সেই সঙ্গে যদি শ্রমের দক্ষতা না বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপারে বাধা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেইসঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধিও রোধ করিতে হইবে। আমরা যদি মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিতে না পারি তাহা হইলে মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে রপ্তানী বাণিজ্য উন্নয়নের আশা দুরাশা মাত্র।

মূল্যায়ন (Evaluation): সরকার মুদ্রামান হ্রাস করার সাথে সাথে দেশের ভিতরে দ্রব্যসামগ্রীর দাম অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। মুদ্রামান হ্রাসের জন্য বই, ঔষধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যে সকল বিদেশী জিনিস আমরা কিনিতেছি, তাহার জন্য অধিক মূল্য দিতেছি। কিন্তু দেশীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ কি? মোটামুটি ইহার চারিটি কারণ রহিয়াছে: (১) গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া জিনিষপত্রের দাম বাড়িতেছে সুতরাং স্বাভাবিক গতিতেই কিছুদাম বাড়িবে; (২) অসাধু ব্যবসায়ীরা সুযোগ বুঝিয়া যে কোনো অজুহাতে দাম বাড়াইতেছে, বর্তমান অজুহাত হইল মুদ্রামান হ্রাস; (৩) বাজারের কোথাও টাকার দাম কমিয়া যাইলে তাহার প্রভাব বাজারের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া সকল দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া দেয়, বর্তমান মুদ্রামান হ্রাসে বিদেশী সামগ্রীর দাম বাড়িয়াছে এবং উহার প্রভাব দেশীয় জিনিষের বাজারেও পরিব্যপ্ত হইয়াছে। (৪) বিদেশী যন্ত্রপাতির দাম বাড়িয়াছে, সেই মূল্য বৃদ্ধির দরুণ সেই যন্ত্রদ্বারা এদেশে যা জিনিষপত্র তৈয়ারী হয় তাহার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

১৯৪৯ সালের মুদ্রামান হ্রাসের পূর্বে একটি ডলারের মূল্য ছিল, ৩.৩০ টাকা, পরে হল ৪.৭৬ টাকা—বর্তমান দাঁড়াইয়াছে ৭.৫০ টাকা। অর্থাৎ গত ১৭ বৎসরে টাকার বিনিময় মূল্য শতকরা ২২৫ ভাগেরও বেশী হ্রাস করা হইয়াছে। ইহা অবশ্য আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের অসহায়তারই লক্ষণ।

১৯৪৯ সালের অবস্থা একটু ভিন্নধরণের ছিল। একটু অন্য কারণে মুদ্রামান হ্রাস করার প্রয়োজন তখন দেখা দিয়াছিল। ১৯৪৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে বৃটিশ সরকার পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এর দাম কমান। ষ্টার্লিং মুদ্রা এলাকাতেই আমাদের মূল-বাণিজ্য সুতরাং ভারতকেও বাধ্য হইয়া মুদ্রামান হ্রাস করিতে হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ভারত সরকার তখনও জনগণকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে ইহার ফলে জিনিষপত্রের দাম বাড়িবে না বা জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটিবে না।

মুদ্রামান হ্রাসের ফলে, জনসাধারণের দুর্গতি বাড়িয়াছে, ভবিষ্যতে আরও বাড়িবার আশংকা রহিয়াছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যস্তর ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে।

সম্প্রতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যে বিতর্ক হয় তাহাতে অনেক সদস্যই জানাইয়াছেন যে টাকার মূল্য হ্রাস করায় দেশের কোনো মঙ্গল হয় নাই। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই বলিয়াছেন যে এই হঠকারিতাপূর্ণ কাজের ফলে টাকার মূল্যই শুধু হ্রাস পায় নাই, দেশের মর্যাদাও হ্রাস পাইয়াছে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ভারত কতোটা উপকৃত হইবে সে সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীও টাকার মূল্য হ্রাসকে 'রাজনৈতিক চাপ' বলিয়া মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন না যে এতে দেশের কোনো লাভ হইবে। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ. এন. দেবরও বিনা দ্বিধায় স্বীকার করিয়াছেন যে ইহার ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীও অবশেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, উপায় ছিল না বলিয়াই টাকার মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে।

১৯৪৯ সালের মুদ্রামান হ্রাসে সময় অর্থমন্ত্রী ছিলেন ডাঃ জন মাথাই। মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া দিবার পর তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন, 'কাজটা ঠিক হয়নি'। ১৯৬৬ সালে আবার একবার মুদ্রামান হ্রাস হয়েছে। শুধু ভাবীকালই বলতে পারে বর্তমান 'কাজটা ঠিক হয়েছে কিনা'।

ভারতের মূল্যস্তর ও বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি (Prices and Present Inflation in India) ঃ মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি জাতির অর্থনৈতিক জীবনে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। আয়ের তুলনায় মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইলে জীবনযাত্রার মান নামিয়া যায় আবার মুদ্রা সংকোচ অর্থনৈতিক প্রসারে বাধার সৃষ্টি করিয়া বিপর্যয় ঘটায়।

চাহিদার তুলনায় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান কম হইলেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। অর্থাৎ কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর পিছনে অত্যধিক অর্থ ধাবিত হইলে ইহা ঘটে। অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব অনুসারে দেশে পূর্ণনিয়োগের অবস্থা থাকিলে অর্থের যোগান বৃদ্ধির সাথে সাথে মূল্যস্তরও সমানুপাতিক হারে বাড়িয়া চলিবে। দেশে টাকার যোগান বাড়িলে সরাসরি মূল্যস্তর বাড়ে না। অর্থের যোগান বাড়িলে কাঁচা টাকার (liquidity preference) চাহিদা কমিয়া যায়, সুদের হার হ্রাস হয়, ফলে বিনিয়োগ ও মূল্যস্তর বাড়ে। কিন্তু অর্থোন্নত দেশে অর্থের যোগান বাড়িলে উহা সরাসরি ভোগের জন্য ব্যয়িত হয় (কারণ জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু) এবং মূল্যস্তর বাড়িয়া যায়। বর্ধিত অর্থ ধনীলোকের হাতে জমা হইলে মূল্যস্তর যতখানি বাড়িবে দরিদ্রলোকের হাতে বর্ধিত অর্থ যাইলে মূল্যস্তর তদপেক্ষা অধিকহারে বৃদ্ধি পাইবে ; কারণ দরিদ্রলোকের তুলনায় ধনীব্যক্তির প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (Marginal Propensity to Consume) কম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতে মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ভারতে মূল্যস্তর বৃদ্ধিকে আমরা ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করিতে পারি—(১) যুদ্ধকালীন মূল্যের গতি (১৯৩৯-৪৫), (২) যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যের গতি (১৯৪৫-৫১), (৩) প্রথম পরিকল্পনাধীনকালে মূল্যের গতি (১৯৫১-৫৬), (৪) দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীনকালে মূল্যের গতি (১৯৫৬-৬১), (৫) তৃতীয় পরিকল্পনাধীনকালে মূল্যের গতি (১৯৬১-৬৬), (৬) চতুর্থ পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যের গতি (১৯৬৬ সালের এপ্রিল ও পরবর্তী কাল)।

যুদ্ধকালীন মূল্যের গতি : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সাথে সাথেই দ্রব্যমূল্য বাড়িতে থাকে। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৫ সালে পাইকারী মূল্যের সূচকসংখ্যা ৩৮২·১-এ আসিয়া দাঁড়ায় (ভিত্তি ১৯৩৯=১০০) জীবনযাত্রার মূল্যের সূচক (Cost of living index) ইহা অপেক্ষা অধিক বাড়িয়াছিল।

যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির দুইটি কারণ—টাকার যোগানের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং দ্রব্যসামগ্রীর যোগান হ্রাস। সরকার কোটি কোটি টাকার নোট ছাপাইয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করেন। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস হইতে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে প্রচলিত কাগজী মুদ্রার প্রচলন ১৬৯ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১৪২ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ নোটের পরিমাণ প্রায় সাতগুণ বৃদ্ধি পায়। ইহাছাড়া এই সময়ে ব্যাংক আমানত এবং টাকাকড়ির প্রচলন বেগও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কারণ

মোট অর্থের বৃদ্ধির অনুপাতে যদি দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত তাহা হইলে মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতি রোধ করা যাইত। কিন্তু এই সময় দ্রব্যসামগ্রীর, বিশেষ করিয়া ভোগ্যবস্তুর সরবরাহ হ্রাস পায়। মোট উৎপাদনের এক বৃহৎ অংশকে সামরিক প্রয়োজনে নিয়োগ করা হইয়াছিল। ইহার ফলে জনসাধারণের জন্য ভোগ্য দ্রব্যের যোগানে ঘাটতি দেখা দেয়। মালবাহী জাহাজের অভাবে এই সময় আমদানীর পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পায়। আভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থার ত্রুটিও মূল্যবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ব্যবসায়ী, ফটকা কারবারী ও মুনাফাশিকারীগণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে মজুত করে এবং এইভাবে মূল্যস্তর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পরিশেষে মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারী প্রশাসনিক দক্ষতার অভাবও মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী।

মুদ্রাস্ফীতির ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান নীচু হইয়া যায়। দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়ীগণ প্রচুর পরিমাণে মুনাফা অর্জন করে। কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকগণের আয় বৃদ্ধি পায় এবং দেনাদার হিসাবেও ঋণভার লাঘব হওয়ায় তাহারা লাভবান হয়। এই সময় ভারতে নিয়োগের পরিমাণ অভূতপূর্ব ভাবে বৃদ্ধি পায়।

ফলাফল

সরকার দাম নিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিং প্রথার প্রবর্তন দ্বারা অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দাম সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করেন। উৎপাদন বৃদ্ধির

জন্য "অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন" সুরু করা হয়। জনসাধারণের হাতে টাকার পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক স্বর্ণ বিক্রয়, সরকারী ঋণ ও করভার বৃদ্ধি, আগাম কারবার নিয়ন্ত্রণ এবং সঞ্চয়ে উৎসাহদান করা হয়।

গৃহীত ব্যবস্থা

যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যের গতি: বহু অর্থনীতিবিদ আশা করিয়াছিলেন যে যুদ্ধশেষে দেশরক্ষা খাতে ব্যয় কমিয়া যাইলেই মূল্যস্তর হ্রাস পাইবে। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ করিয়া যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যস্তর বাড়িয়াই চলিল। ১৯৪৫ সালে পাইকারী মূল্যের সূচকসংখ্যা ছিল ৩৮২·২ (ভিত্তি বৎসর ১৯৩৯) কিন্তু ১৯৫১ সালের এপ্রিলমাসে উহা ৪৬২-তে গিয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৫১ সালে মূল্যস্তর সাড়ে চারগুণেরও অধিক বৃদ্ধি পায়।

যুদ্ধকালে দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং মারফৎ অবাধ মুদ্রাস্ফীতিকে অবদমন করা হয়। যুদ্ধোত্তরকালে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি নূতন চাহিদার সৃষ্টি করে। এই সময় জনগণের ভোগ প্রবণতা যে হারে বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনের পরিমাণ সেই হারে বৃদ্ধি পায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, কাগজী অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে। সরকার তাহার রাজস্ব খাতে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী করিতে থাকে; ফলে ঘাটতি বাজেটের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৫-৫০ সালের মধ্যে কাগজী মুদ্রার যোগান ৫০০ কোটি টাকারও অধিক বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ ও রাজনৈতিক গোলমালের জন্য কাঁচামালের অভাব ও শিল্প বিরোধের দরুণ শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পায়। পাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তুগণ নগদ টাকা লইয়া ভারতে আসায় ভোগ্যদ্রব্যের মোট চাহিদা খুবই বাড়িয়া যায়।

একদিকে ক্রমবর্ধমান চাহিদা আর অপরদিকে ভোগ্যবস্তুর সরবরাহ হ্রাস মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতিতে ইন্ধন যোগাইয়া ছিল। চাহিদার তুলনায় কৃষি ও শিল্পোৎপাদন মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। শ্রমিকের অভাব, কাঁচামালের অভাব এবং শিল্পবিরোধ বৃদ্ধির ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৪৭ সালে সরকার পরীক্ষামূলকভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিলে উহা মূল্যস্তর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ইহার উপর ১৯৪৯ সালে টাকার মূল্য হ্রাস করা হইলে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময় কোরিয়ার যুদ্ধের দরুণ আন্তর্জাতিক বাজারে তেজীভাব সকল দেশেই মূল্যস্তর বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

মূল্যস্তর বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকার নানা ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। প্রথমতঃ, খাদ্য ও বস্ত্রকে পুনরায় সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইল। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী ব্যয় হ্রাস করা হয়। তৃতীয়তঃ, ভোগদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয়। 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের উপর জোর দেওয়া হয়। চতুর্থতঃ, বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে ফটকা ও আগাম কারবার নিষিদ্ধ করা হয়। ইহা ছাড়া ব্যাংক রেট বৃদ্ধি, স্বল্পসঞ্চয়ে উৎসাহ দান, করভার বৃদ্ধি, লভ্যাংশ বণ্টনে সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন

গৃহীত ব্যবস্থা

করা হইয়াছিল। আবার উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিবার জন্য নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট কালের জন্য আয়কর হইতে অব্যাহতি দান, যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামালের উপর আমদানি শুল্ক হ্রাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যস্তরের গতি: প্রথম পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তরে স্থায়িত্ব আসায় দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত পাইকারী মূল্যস্তর ৪৬২ হইতে নামিয়া ৩৬০এ আসিয়া দাড়ায়।

১৯৫১-৫২ সালে মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী নীতি গ্রহণ করার ফলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রুদ্ধ হয়। পরিকল্পনার সুরুতেই রিজার্ভ ব্যাংক ঋণদান সংকোচের উদ্দেশ্যে ব্যাংকরেট ৩% হইতে বাড়াইয়া ৩½% করে। রিজার্ভ ব্যাংক ঘোষণা করে যে ইহা আর তপশীল-ভুক্ত ব্যাংকগুলির নিকট হইতে সরকারী ঋণপত্র কিনিবে না—উহার জামিনে ঋণদান করিবে। ইহাতেও ব্যাংকসমূহের ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা হ্রাস পায়। এই সময় দ্রব্যমূল্য হ্রাসের আরও কতকগুলি কারণ রহিয়াছে: অনুকূল আবহাওয়ার দরুণ কৃষিজ উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, ব্যবসাদারগণ মজুত দ্রব্য বাজারে ছাড়িতে সুরু করে, কোরিয়া যুদ্ধের অবসান হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য মজুত নীতির শিথিলিকরণ। মূল্যস্তরের নিম্নগতি উৎপাদন ব্যবস্থার উপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে আশংকা করিয়া সরকার টাকার যোগান বৃদ্ধি করেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যস্তরের গতি: ১৯৫৫ সালের জুলাই মাস হইতে মূল্যস্তরের গতি পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৫২-৫৩ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরিয়া সরকার যে নূতন সূচকসংখ্যার হিসাব তৈয়ারী করেন তাহাতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে পাইকারী মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা ছিল ৯৮·১। ১৯৬০-৬১ সালের উহা ১২৭·৫ এ আসিয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ মূল্যস্তর ৩০% বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্তর ২৭%, শিল্পের কাঁচামালের মূল্যস্তর ৪৫% এবং শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যস্তর ২৫% বৃদ্ধি পায়।

মূল্যস্তরে ঊর্ধ্বগতি

এই মূল্যস্তর বৃদ্ধির কারণগুলি নিম্নলিখিতরূপ: প্রথমতঃ, দ্বিতীয় পরিকল্পনা অতিশয় উচ্চাকাংক্ষী ছিল। যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা হইতেছে সেই পরিমাণে ভোগ্য বস্তু উৎপাদিত হইতেছে না। ফলে বাজারে যে বিরাট পরিমাণ অর্থ আসিতেছে এবং দ্রব্যসামগ্রীর যে পরিমাণ চাহিদা রহিয়াছে সেই হারে ভোগ্যবস্তুর যোগান নাই, ফলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম পরিকল্পনাকালে ২৯০ কোটি টাকা ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১২০০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় হওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মূল্যস্তর বাড়িয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সেই কারণে অতি-সতর্কতার সহিত ঘাটতি-ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বেশী অংশ অ-কমুনিষ্ট উন্নতিশীল দেশগুলির সহিত হইয়া থাকে। ইউরোপের উন্নতিশীল দেশগুলিতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় ওই সকল দেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যায় ও বিদেশী মুদ্রাস্ফীতি ভারতে প্রবেশ করে। চতুর্থতঃ, দেশে চাহিদার তুলনায়

কারণ

যোগান কম হওয়ায় একশ্রেণীর লোক দ্রব্যসামগ্রী মজুত করিয়া ফট্‌কাবাজী করিয়াছে। চোরা কারবার এবং ফটকাবাজী মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতিতে সহায়তা করিয়াছে। পঞ্চমতঃ, ভারতের সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় সরকার বিদেশ হইতে আমদানী যথাসম্ভব কমাইয়া দিতেছেন, ফলে পণ্যজাত দ্রব্যের মোট যোগান হ্রাস পায়। ষষ্ঠতঃ, শ্রমিক আন্দোলনের চাপে শ্রমকল্যাণকর ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিবার ফলে শ্রমিক-ব্যয় (labour cost) বাড়িয়া গিয়াছে এবং ইহার ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যও বাড়িয়া গিয়াছে। পরিশেষে বিভিন্ন দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ধার্য করার ফলে উহাদের দাম বাড়িয়া যায়।

গৃহীত ব্যবস্থা

একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা আর অপরদিকে অতিরিক্ত চাহিদাকে দমন করার জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমেই মুদ্রাস্ফীতির সত্যকার সমাধান সম্ভবপর।* মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতি রোধ করিবার জন্য সরকার স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। স্বল্প মেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে সরকার অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে মোট দুই কোটি টন খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়। খাদ্যশস্য উপযুক্তভাবে বণ্টনের জন্য ন্যায্যমূল্যের দোকান (fair price shop) খোলা হয়। দেশ হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হয়। চাহিদার অতিরিক্ত চাপ হ্রাস করিবার জন্য আর্থিক এবং ফিসক্যাল নীতিকে প্রয়োগ করা হয়। রিজার্ভ ব্যাংক মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রয়োগ করে। ব্যাংক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৫৭ সালের মে মাসে ব্যাংক রেট ৩½% হইতে ৪% করে। খাদ্যশস্য কিনিয়া মজুত করিবার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যবসায়ী ব্যাংক হইতে ঋণ চাহিলে তাহাকে যেন ঋণ না মঞ্জুর করা হয় রিজার্ভ ব্যাংক এই মর্মে বাণিজ্য ব্যাংকগুলিকে নির্দেশ দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান ও মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য ডাঃ ক্যালডর মূলধন লাভ কর, সম্পদ কর, ব্যয় কর এবং দান কর—এই চারটি কর স্থাপনের সুপারিশ করেন। ভারত সরকার উহা গ্রহণ করেন। মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে ফটকাবাজী ও চোরা কারবার রোধ করা প্রয়োজন। কৃষিপণ্যের বাজারে দালালেরা ফটকাবাজী করিয়া যাহাতে কৃত্রিম উপায়ে দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে সরকার আগাম চুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন (Forward Contract Regulations Act) পাশ করেন এবং এই আইনকে কার্যকরী করিয়া তোলার জন্য ১৯৫৩ সালে আগাম বাজার কমিশন (Forward Markets Commission) স্থাপন করা হয়। ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন গঠন করা হয়। অধ্যাপক সেনয় যথার্থ বলিয়াছেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বেপরোয়া ঘাটতি ব্যয়ই দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। তাঁহার মতে ঘাটতি ব্যয় না কমাইলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যাইবে না।

* "The best way to deal with inflation is to make sure that the country's capacity to produce keeps on growing as far as possible"—Alan Day.

মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের দীর্ঘকালীন ব্যবস্থা হিসাবে মোট উৎপাদনে বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথমে কৃষি-উৎপাদনে যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। পরে কৃষি-উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করা হয়। নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মূল্যস্তর বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভবপর হয় নাই।

তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যস্তরের গতি: ১৯৫৬ সালের তুলনায় ১৯৬১ সালে মূল্যস্তর শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা ৩০% বর্ধিত মূল্যস্তর লইয়া তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে বলিয়া দ্রব্যমূল্যের স্থিতিকরণ তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের একটি অপরিহার্য সর্ত হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে।

মূল্যনীতিকে সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণনা করিতে হইবে। ইহা কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিচ্ছিন্ন নীতি নয়। ভারতে মিশ্র ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্বীকৃত হওয়ায় সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ধরণের উদ্যোগ পাশাপাশি রহিয়াছে। বেসরকারী উদ্যোগ স্বীয়-মুনাফার দ্বারা পরিচালিত হইয়া অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করে। এই কারণে সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য।

আর্থিক উন্নয়নের সহিত কিছু পরিমাণ দামবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। বিনিয়োগ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে এবং কিছু বিনিয়োগ ক্ষেত্র আছে যেখানে অনেক দেরিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। নূতন কার্যে জনশক্তির ব্যবহার করিতে হইলে অতিরিক্ত আর্থিক পুরস্কার দিতে হইবে; ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। বিনিয়োগ ও আয় বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। অপরিহার্য চাহিদা ছাড়া অন্য সকল প্রকার চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। একদিকে ভোগের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে আর অপরদিকে ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন বাড়াইতে হইবে।

কয়েকটি কারণের জন্য দামের উর্ধ্বমুখী চাপকে স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ, আজও কৃষি উৎপাদন মৌসুমীবায়ু প্রবাহের উপর নির্ভরশীল এবং মৌসুমী বায়ু সম্পর্কে সব সময়ই অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। কোনো বৎসর অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিজনিত প্লাবন দেখা দিলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবেই। দ্বিতীয়তঃ, ভোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা পরিপূর্ণরূপে সাফল্য লাভ না করিলে অতিরিক্ত চাহিদা বাজারে দাম বৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগাইবে। তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির সহিত মূল্যস্তর বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

সামান্য পরিমাণ মূল্যস্তর বৃদ্ধিকে স্বীকার করিয়া লইলেও অবস্থা যাহাতে আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া না যায় তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতি রোধ করিতে সরকারের আর্থিক নীতি, ফিসক্যালনীতি এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সহায়তা প্রয়োজন। ফিসক্যাল পদ্ধতির সাহায্যে কর মারফৎ বাজার হইতে

অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা সরাইয়া লইতে হইবে এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতা আনিতে হইবে। আর্থিক পদ্ধতির উদ্দেশ্য হইবে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং ফটকাবাজীর উদ্দেশ্য ব্যাংক যাহাতে ব্যবসায়ীদের কোনোরূপ ঋণ না দেয় তাহা লক্ষ্য রাখা। আর্থিক নীতি এবং ফিস্ক্যাল নীতি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর নাও হইতে পারে, সেই জন্য প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য ইহা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে নয়। ১৯৬২ সালে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রবর্তন করেন।

১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাস হইতে মূল্যস্তর আশংকাজনক ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৬৫ সালে মে মাসে দ্রব্যমূল্য শতকরা ৫৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

সাম্প্রতিক মূল্যস্তর বৃদ্ধির কারণ হিসাবে চাহিদা ও যোগান উভয় প্রকার শক্তিই কাজ করিয়াছে। প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত নগরীকরণ, ঘাটতিব্যয়, আয়বৃদ্ধি এবং হিসাববিহীন অর্থের (unaccounted money) পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে চাহিদার উপর অস্বাভাবিক চাপ পড়িয়াছে। অপরপক্ষে দ্রব্য সামগ্রীর, বিশেষ করিয়া খাদ্য দ্রব্যের যোগান চাহিদার সহিত তাল রাখিয়া বাড়িতে পারে না। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের দরুণ বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর সুযোগ নাই। ইহার উপর ব্যবসায়ীগণ খাদ্যশস্য মজুত করিয়া কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতির সৃষ্টি করিতেছে। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে দ্বিতীয়বার যে টাকার মূল্য হ্রাস করা হয় তাহার প্রভাবও মূল্যস্তর বৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয় বন্ধ, পরিকল্পনায় কৃষির উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, ক্রেতা সমবায় বিপণি স্থাপন, রিজার্ভ ব্যাংকের কঠোরতর ঋণ নিয়ন্ত্রণনীতি, জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপক প্রসার—প্রভৃতি উপায়ে মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতি রোধ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

(Foreign trade of Iidia)

[বিষয়বস্তু : ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য—তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণ—রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন—রপ্তানী-ঝুঁকিবীমা কর্পোরেশন—রপ্তানী ক্রেডিট ও গ্যারান্টি কর্পোরেশন—ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাসংকট—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উদ্বৃত্তের বর্তমান অবস্থা—রপ্তানী সম্প্রসারণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ—আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও ভারত—ইউরোপের সাধারণ বাজার ও ভারত]

অর্ধোন্নত দেশে আয় এবং চাহিদার স্বল্পতার দরুণ উৎপাদন যেমন দ্রুত বাড়িতে পারে না সেইরূপ বহির্বাণিজ্যের পরিধিও সংকুচিত থাকে। প্রাচীন কালে ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। মুসলমান যুগেও বিদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। বৃটিশযুগে ভারত ইংলণ্ডকে সুলভে কাঁচামাল যোগান দিত এবং এই সময় হইতে ভারতের বাণিজ্য ঔপনিবেশিক ধরণের রূপ নেয়।

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (Chief features of Indian Foreign Trade) : ভারতীয় বহির্বাণিজের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায় :—

প্রথমতঃ, কাঁচামাল (খনিজ, বনজ এবং কৃষিজ) রপ্তানীর এবং শিল্পজাত দ্রব্য আমদানীর আধিক্য। ১৯৩৮-৩৯ সালেও মোট আমদানীর মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ ছিল শতকরা ৬৩ ভাগের মতো। যে সমস্ত কাঁচামাল এদেশ হইতে রপ্তানী হইয়া বিদেশে যায় তাহার অধিকাংশই আবার নানাবিধ শিল্পদ্রব্যে রূপান্তরিত হইয়া অধিকমূল্যে এদেশে আমদানী হইত। অর্থাৎ ভারতীয় বাণিজ্যের প্রকৃতি ছিল ঔপনিবেশিক ধরণের। ১৯২১ সালের ফিসক্যাল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বিভেদমূলক সংরক্ষণের (discriminating protection) নীতি গ্রহণ করায় লৌহ ও ইস্পাত, চিনি প্রভৃতি কয়েকটি শিল্প প্রসার লাভ করিতে থাকে এবং ইহার ফলে ইস্পাত দ্রব্যের আমদানী হ্রাস পায়। বর্তমানে ভারতের বহির্বাণিজ্যকে আর ঔপনিবেশিক ধরণের বলা চলে না। সাম্প্রতিক কালে ভারত বিদেশে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে আবার বিদেশ হইতে অনেক কাঁচামালও আজকাল এদেশে আমদানী হইতেছে।

ঔপনিবেশিক ধরণের

দ্বিতীয়তঃ, ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ যুক্তরাজ্যের (U. K.) সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত বৃটেনই ছিল ভারতীয় কাঁচামালের প্রধান ক্রেতা এবং ভারতও তাহার অধিকাংশ শিল্পদ্রব্য বৃটেন হইতে ক্রয় করিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতের আমদানী দ্রব্যের ৪৫ ভাগ যুক্তরাজ্য হইতে, ১৫ ভাগ জাপান হইতে, ১০ ভাগ যুক্তরাষ্ট্র হইতে এবং বাকী অংশ অন্যান্য দেশ হইতে আসিত। গত বিশ্বযুদ্ধের

বৃটেনের সহিত অধিক বাণিজ্য

পর হইতে বৃটেনের প্রাধান্য কমিতেছে এবং আমেরিকা ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রাধান্য লাভ করিতেছে। বিভিন্ন দেশের সহিত বিশেষ করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া এবং অন্যান্য সামাজিক দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ সম্প্রসারিত হইতেছে।

ভিত্তি সংকীর্ণ

তৃতীয়তঃ, ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ভিত্তি ব্যাপক (broad based) নয়। ভারতের বহির্বাণিজ্য মাত্র কয়েকটি রপ্তানী দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। পাট, চা এবং বস্ত্র এই তিনটি মাত্র দ্রব্যের দ্বারাই ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের ৬০% গঠিত। ইহা ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের একটি ত্রুটি।

স্থলপথে বাণিজ্যের স্বল্পতা

চতুর্থতঃ, স্থলপথে ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ অতি অল্প। ভারতের বহির্বাণিজ্যের অধিকাংশই জলপথে পরিচালিত হইয়া থাকে। দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের মোট বহির্বাণিজ্যের ৯৮ ভাগ সমুদ্রপথে সাধিত হইত। অবশ্য পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার ফলে পূর্বে যাহা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল এখন তাহা বহির্বাণিজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই কারণে স্থলপথের বহির্বাণিজ্য পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি এবং রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইলে পাকিস্তান, চীন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির সহিত স্থলপথে ভারতের বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্স

পঞ্চমতঃ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক ছিল অর্থাৎ ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স অনুকূলই (favourable balance of trade) ছিল। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে এইরূপ রপ্তানীর আধিক্য দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক কিন্তু ভারতে তাহা হয় নাই। এই অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্স ইচ্ছা করিয়াই রাখা হইত। কারণ বৃটিশ শাসনকালে ভারত ইংলণ্ডকে প্রতি বৎসর মোট ৩০ হইতে ৫০ কোটি টাকা হোম চার্জ (Home Charge) দিতে বাধ্য ছিল। এই বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হইতে ইংলণ্ডকে টাকা দিতে হইত। বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় বাণিজ্য উদ্বৃত্তের হ্রাস হওয়ায় স্বর্ণ পাঠাইয়া ভারতকে এই হোম চার্জ মিটাইতে হইয়াছিল। পরিকল্পনা সুরু হইতেই ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হইতে আরম্ভ করে। এই প্রতিকূলতার দুইটি কারণ—দেশ বিভাগ এবং তাহার ফলে কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতা (Structural disequilibrium) এবং মুদ্রাস্ফীতির ফলে দাম ভারসাম্যহীনতা (Price disequilibrium)। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানী বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্য ব্যালান্সের প্রতিকূলতা বহু পরিমাণে বাড়িয়াছে।

ডলার ঘাটতি

ষষ্ঠতঃ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতকে ডলার ঘাটতি (dollar shortage) সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স অনুকূলই ছিল। ইহার পর হইতেই, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হয়।

সপ্তমতঃ, দেশ বিভাগের ফলে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়। সাধারণ ভাবে অনুমান করা হয় যে অবিভক্ত ভারতের মোট রপ্তানী বাণিজ্যের ২০ ভাগ এবং আমদানী বাণিজ্যের ১৫ ভাগ পাকিস্তান পাইয়াছে। ভারতের সহিত পাকিস্তানের বাণিজ্য-গতি পাকিস্তানের প্রতিই অনুকূল বলিয়া মনে হয়। দেশ বিভাগের ফলে কিছু পরিমাণ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আন্তজাতিক বাণিজ্যে পরিণত হইয়াছে। দেশ বিভাগের পূর্বে ভারত পাট, তুলা, চামড়া প্রভৃতি রপ্তানী করিত কিন্তু পরে এই সকল উৎপাদক অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্বভাবতই ভারতকে এই সকল কাঁচামাল আমদানী করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন দেশ বিভাগের ফলে খাদ্য উৎপাদক অঞ্চলগুলির বেশ কিছু অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং উদ্বাস্তু আগমনের ফলে ভারত খাদ্যশস্যে ঘাট্‌তি অঞ্চলে পরিণত হয় ও বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। পরিশেষে, দেশ বিভাগের পূর্বে স্থলপথে ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ নগণ্য ছিল। কিন্তু দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্যের ফলে স্থলপথে বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

দেশ বিভাগ ও বৈদেশিক বাণিজ্য

পরিশেষে, ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যের মোট মূল্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩২১ কোটি টাকা। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যের মোট মূল্য ছিল ১১০০ কোটি টাকার কিছু বেশী। ১৯৬০-৬১ সালে উহার মূল্য দাড়ায় ১৬৫১ কোটি টাকা এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে উহার মোট মূল্য হয় ১৭৮৮ কোটি টাকা।

বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি

তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণ (Development of Export during the Third Five Year Plan) :

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে গত দশ বৎসরে আমদানীর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট আমদানীর মূল্য ছিল ৩৬২০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট আমদানীর মূল্য দাঁড়ায় ৫৩৬০ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় ইহা শতকরা ৫০ ভাগ বেশী। মূলধনী দ্রব্য ও কাঁচামাল ইত্যাদি অধিক পরিমাণে আমদানী করার জন্য আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যাপকতর বিনিয়োগ কর্মসূচী এবং মূল ও ভারী শিল্পের উপর অগ্রাধিকারের দরুণ এই সময় দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময় অপেক্ষা অনেক বেশী আমদানীর প্রয়োজন হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট আমদানীর পরিমাণ হইবে ৫৭৫০ কোটি টাকা, ইহা ছাড়াও P. L. 480 সাহায্যানুসারে আরও ৬০০ কোটি টাকার আমদানী হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় আমদানীর পরিমাণ

বিগত দশ বৎসরে ভারতের রপ্তানী মোটেই সম্প্রসারিত হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে ইহার মূল্য ছিল বাৎসরিক ৬০৯ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ইহার বার্ষিক মূল্য ছিল মাত্র ৬১৪ কোটি টাকা। ইহা স্মরণযোগ্য যে এই দশ বৎসরে বিশ্বের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ হয় কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে ইহা ২·১% (১৯৫০ সাল) হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৬০ সালে ১·১% এ আসিয়া দাঁড়ায়।

সাম্প্রতিককালে, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যপর্যায় হইতে রপ্তানী সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কতকগুলি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। প্রথমতঃ, বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের জন্য রপ্তানী সম্প্রসারণ কাউন্সিল গঠন করা হইয়াছে। ঝুঁকি হ্রাসের জন্য রপ্তানী ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন স্থাপিত হইয়াছে এবং অধিকতর প্রচার প্রদর্শনী এবং মেলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, রপ্তানী সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে রপ্তানী এবং কোটা নিয়ন্ত্রণ রদ, রপ্তানী শুল্কের বিলোপ, অন্তঃশুল্কের প্রত্যার্পণ এবং পরিবহণ সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের মাধ্যমে ভারতের বহির্বাণিজ্যে বৈচিত্র্যসাধন এবং সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক বিস্তারের চেষ্টা করা হইতেছে।

রপ্তানী সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে (১) আভ্যন্তরীণ ভোগকে যথাসম্ভব সংকুচিত করিতে হইবে, (২) আভ্যন্তরীণ বাজারের তুলনায় রপ্তানীর মুনাফা অধিক করিতে হইবে, (৩) রপ্তানী শিল্পগুলির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের প্রতিযোগী ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং (৪) রপ্তানীর অনুকূলে জনমত গঠন করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট রপ্তানীর পরিমাণ ৩৭০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে (অর্থাৎ বাৎসরিক ৭৪০ কোটি টাকা)। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ঋণবাবদ সুদপ্রদান ও প্রয়োজনীয় আমদানী বজায় রাখিতে বার্ষিক ১৩০০ হইতে ১৪০০ কোটি টাকার মতো রপ্তানী করিতে হইবে—অর্থাৎ বর্তমানের দ্বিগুণ। ভারতীয় অর্থনীতিকে পঞ্চম পরিকল্পনাকালে স্বয়ংনির্ভরশীল এবং স্বয়ংচালিত করার ইহা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সর্ত।

রপ্তানী সম্প্রসারণের ব্যবস্থাসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—সাধারণ নীতি এবং বিশেষ দ্রব্য সম্পর্কে ব্যবস্থা। রপ্তানী সম্প্রসারণের জন্য দেশে উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করা, আভ্যন্তরীণ চাহিদা নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানী উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা সাধারণ নীতির লক্ষ্য।

রপ্তানী সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় সর্ত হইল পরিকল্পনায় কৃষি এবং শিল্পের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে তাহাকে বাস্তবায়িত করা। আভ্যন্তরীণ ভোগকে নিয়ন্ত্রণ করাও রপ্তানী সম্প্রসারণের একটি প্রয়োজনীয় সর্ত। শুধুমাত্র রপ্তানী উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করিলেই চলিবে না. লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে আন্তর্জাতিক বাজারে ইহার দাম

যেন প্রতিযোগিতামূলক হয়। যাহাতে দাম বেশী না হয় সেজন্য মুদ্রাস্ফীতিকে দমন করিতে হইবে।

দ্রুত সম্প্রসারণশীল আভ্যন্তরীণ চাহিদার ফলে বৈদেশিক বাজার অপেক্ষা দেশীয় বাজারে দ্রব্য বিক্রয় করা অধিকতর লাভজনক হইতে পারে। ফিস্‌ক্যাল পদ্ধতির সাহায্যে আভ্যন্তরীণ চাহিদার এই প্রবণতাকে রোধ করিতে হইবে।

বৈদেশিক মুদ্রাবণ্টনে রপ্তানী দ্রব্য প্রস্তুতকারক শিল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রপ্তানী উদ্‌বৃত্তের জন্য শিল্পের মোট আভ্যন্তরীণ বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। সরকারী শিল্পোদ্যোগ তাহাদের মোট উৎপাদনের একাংশ রপ্তানীর জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রপ্তানী প্রসারে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে।

রপ্তানী সম্প্রসারণ কাউন্সিল বৈদেশিক বাজারের অবস্থা বিশ্লেষণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিবে। সমবায়-সংগঠনের মাধ্যমে রপ্তানী প্রসারে উৎসাহ দিতে হইবে।

রপ্তানীর বৈচিত্র্যসাধন এবং নূতন বাজারের উদ্ভাবনা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের অংশ হিসাবে বিবেচিত হইবে। ভবিষ্যতে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। এই দেশগুলি তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধনী দ্রব্য এবং কাঁচামাল আমদানী করিবে এবং ইহাদের সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হইতে হইবে। ইউরোপীয় কমন-মার্কেট ভুক্ত দেশগুলিতে রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে হইবে। কারণ এই দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য ঘাটতির অনুপাত কম নয়। যুক্তরাজ্যের সহিত দীর্ঘদিন ধরিয়া ভারতের আর্থিক সম্পর্ক রহিয়াছে এবং বর্তমানে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উহাকে আরও সুদৃঢ় করিতে হইবে। যুগোশ্লাভিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্য বাড়িয়া চলিয়াছে এবং উহা আরও বাড়াইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। উত্তর আমেরিকা, বিশেষ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারতের মোট আমদানীর এক চতুর্থাংশ যোগায়। আমেরিকার সমৃদ্ধ অর্থনীতি এবং জনগণের উচ্চ জীবনযাত্রার মানের দরুণ ওই দেশে রপ্তানী বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। সোবিয়েত রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সকল দেশে ভবিষ্যতে রপ্তানী বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন লিমিটেড (State Trading Corporation Private Ltd.).

১৯৫৬ সালের মে মাসে ভারত সরকারের উদ্যোগে ভারতীয় কোম্পানী আইনের অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন স্থাপিত হয়।

গঠন

ইহা একটি প্রাইভেট যৌথ প্রতিষ্ঠান এবং প্রথমে ইহার অনুমোদিত মূলধন ছিল এক-কোটি টাকা আর আদায়ীকৃত মূলধন পাঁচলক্ষ টাকা। পরে কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন বাড়াইয়া পাঁচ কোটি এবং আদায়ীকৃত

মূলধন দুই কোটি টাকা করা হয়। ইহার মূলধনের সমস্তটাই ভারত সরকার দিয়াছেন। কর্পোরেশনের পরিচালনার ভার একটি ডিরেক্টর বোর্ডের উপর ন্যস্ত আছে। বোর্ডের ডিরেক্টরগণ সকলেই ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন।

এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হইল আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালনা করা এবং দেশাভ্যন্তরে বা দেশের বাহিরে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করা। এই কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী বলিয়াছিলেন যে প্রধানতঃ রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্যই এই কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল দেশে বাণিজ্য পরিচালনার একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্রের, এবং লাভজনকভাবে ওই সকল রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য করিতে হইলে ভারতেরও ওইরূপ রাষ্ট্রীয় সংগঠন থাকা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য

দ্বিতীয়:, ভারতের বাহির্বাণিজ্যের পরিচালনা ত্রুটিপূর্ণ। এতদিন পর্যন্ত বে-সরকারী উদ্যোগেই ভারতের বহির্বাণিজ্য পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু বে-সরকারী উদ্যোগের উপর নির্ভরশীলতার জন্য বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটিতেছে না। বহির্বাণিজ্যের কাঠামো শক্তিশালী করিবার জন্য এবং আমদানী নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানী সম্প্রসারণের জন্য একচেটিয়া ব্যবস্থাই অধিকতর কাম্য। বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে হটাইয়া দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য নয়—উহাদের পাশে থাকিয়াই ইহা ভারতের বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করিবে।

ত্রুটি

সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদনের উপাদান মাত্রেই রাষ্ট্রের অধীন। দ্রব্যসামগ্রী বণ্টনের জন্যও সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। ধনতান্ত্রিক দেশে বাণিজ্যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক-কালের ঘটনা। গত মহাযুদ্ধের সময় উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং দ্রব্যসামগ্রী বণ্টনে রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। যে সকল দ্রব্যাদির বণ্টন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হইলে ন্যায্য বণ্টনের অসুবিধা ঘটিবে অথবা যে সকল দ্রব্যের অপ্রাচুর্য হেতু রাষ্ট্র বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ না করিলে কালোবাজার এবং ফাটকাবাজির সৃষ্টি হইতে পারে, ধনতান্ত্রিক দেশে সেই সকল দ্রব্যসামগ্রী রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের অধীনে আনা হয়। স্বাধীনতার সহিত দেশবিভাগের ফলে জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রীর যে অপ্রাচুর্য ঘটিয়াছে তাহাতেই ভারতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বিশেষতঃ খাদ্যশস্য বণ্টনের জন্য রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ভারতের মতো অনুন্নত দেশে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের স্বপক্ষে বহু যুক্তি রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ভারতে খাদ্যশস্যের ঘাটতি রহিয়াছে। এইজন্য রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রয়োজন। এই সংস্থা যদি খাদ্যশস্য বণ্টনের ভার গ্রহণ করে তাহা হইলে অপ্রচুর খাদ্যশস্যের যথাসম্ভব ন্যায্য বণ্টন সম্ভবপর হইবে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যস্তরও স্থির রাখা সম্ভবপর হইবে। এইরূপ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকিলে দেশে

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের স্বপক্ষে যুক্তি

কালোবাজারী, ফটকাবাজী প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় রাষ্ট্র গঠনের নীতিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রের এই আদর্শকে কার্যকর করিয়া তোলার জন্যও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একচেটিয়া অবস্থা ক্রমশই প্রসার লাভ করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় বেসরকারী একমালিকী কারবারের ফলে রাষ্ট্রের এক-চেটিয়া ব্যবসায় অধিকতর কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। চতুর্থতঃ, উন্নতিকামী অর্ধোন্নত দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ফলে যে মুনাফা হইবে সরকার তাহা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করিতে পারিবেন। বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পঞ্চমতঃ সাম্প্রতিককালে দেখা যাইতেছে যে বিভিন্ন দেশ অধিকমাত্রায় দ্বি-পক্ষীয় চুক্তি (Bilateral Trade Agreement) সম্পাদন করিতেছে। চুক্তির সর্ত কার্যকর করিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

বিরুদ্ধে যুক্তি

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের বিরুদ্ধেও যুক্তি রহিয়াছে। প্রথমতঃ, কর অনুসন্ধান কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে বলেন যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের দ্বারা পর্যাপ্ত রাজস্ব আয় ঘটিবে না। অধিকন্তু যদি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে তাহা হইলে বে-সরকারী-প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইতে সাহসী হইবে না এবং বে-সরকারী ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যাহত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনা করিবার মত শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। বাণিজ্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনো অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা বেশী। তৃতীয়তঃ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দক্ষতা এবং উদ্যোগের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং বহির্বাণিজ্যে আমলাতন্ত্র প্রসার লাভ করিবে, ইহার ফলে দ্রব্য-সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইবে। অধ্যাপক ভাইনার (Viner) বলেন যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রাজনৈতিক শক্তিসমূহ প্রভাব বিস্তার করিবে। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তি হইতে একচেটিয়ামূলক ভিত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইবে এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত বিবাদ আন্তর্জাতিক সংঘাতের সৃষ্টি করিবে। দুর্বল দেশগুলিকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী দেশগুলির সহিত প্রচণ্ড অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক মূল্যের বিনিময়ে মিতালি করিতে হইবে।[1]

1 "The substitution of state control for private enterprise in the field of international economic relations would have a series of undesirable consequences ; the injection of a political element into all economic transactions ; the conversion of international trade from a competitive to a monopolistic basis ; a marked increase in the potentiality of business disputes to generate international frictions. Weak countries will have to rely for their economic security primarily on their ability to acquire powerful friends, who will probably be acuirable only at a heavy political or economic price."

১৯৪৯ সালে ডাঃ পি. এস. দেশমুখের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সরকারের খাদ্যশস্য এবং সার সংক্রান্ত কার্যাবলী রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের হাতে অর্পণের সুপারিশ করেন। এই দেশমুখ কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত আমদানী রপ্তানী কার্যাবলী রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের হাতে ন্যস্ত করার নির্দেশ দেন।

ইহার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয়বার মিঃ এস. ভি. কৃষ্ণমূর্তি রাওএর সভাপতিত্বে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য আর একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে খাদ্যশস্য, তুলা এবং সারের আমদানীর প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন গঠন করার দরকার নাই। কিন্তু তাঁতবস্ত্র এবং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানীর জন্য কমিটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন গঠনের সুপারিশ করেন। এই উভয় কমিটিই সীমিতভাবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের পক্ষপাতী।

কর্পোরেশন স্থাপনের পর হইতেই কর্পোরেশন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রপ্তানী প্রসার করিয়া উহাদের নিকট হইতে ইস্পাত, সিমেণ্ট এবং যন্ত্রপাতি আমদানীর চেষ্টা করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈচিত্র্য সাধন এবং সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে চিরাচরিত দ্রব্যগুলির এবং নূতন নূতন বাজার উদ্ভাবনার চেষ্টা করিতেছে। তৃতীয়তঃ, যে সকল দ্রব্যের যোগানে ঘাটতি রহিয়াছে এই কর্পোরেশন সেই দ্রব্যগুলি আমদানী ও দেশাভ্যন্তরে বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া উহাদের দামের উর্ধ্বগতি রোধ করে। চতুর্থতঃ, আমদানী রপ্তানী কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে সেজন্য কর্পোরেশন বন্দরযান এবং পরিবহনের উন্নয়নের জন্য সহায়তা করিতেছে।

কর্পোরেশনের উপর প্রথম সিমেণ্ট, কস্টিক সোডা, এমোনিয়াম সালফেট, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানীর ভার দেওয়া হয়। রপ্তানীর মধ্যে চা, কফি, তামাক, জুতা, উলবস্ত্রাদি, খনিজ আকরিক রহিয়াছে।

স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের কার্যাবলীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে প্রথম দশ বৎসরে উহা দশ কোটি টাকা লেনদেন করিয়াছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে কর্পোরেশন রপ্তানী সম্প্রসারণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য যে আংশিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে ইহা অনস্বীকার্য। ইহা নির্ভুলভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে ইহার এমন এক বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে যাহা বে-সরকারী উদ্যোগ সম্পাদন করিতে পারে না। ১৯৫৯-৬০ সালে ইহার লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৩৬ কোটি টাকা এবং মোট লাভের পরিমাণ ছিল ৩·৬৯ কোটি টাকা। ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত কর্পোরেশনের আমদানী-রপ্তানীর মূল্য ছিল ১৪২ কোটি টাকা। Estimates Committee এই মত পোষণ করেন যে সরকারের অংশ হিসাবে কাজ না করিয়া ক্যানেডিয়ান কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের মতো ইহাকে স্ট্যাটিউটারী কর্পোরেশনরূপে সংগঠিত করা উচিত।

রপ্তানী ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন লিমিটেড (Export Risk Insurance Corporation Private Ltd.) : ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে পাঁচ কোটি টাকা অনুমোদিত এবং আড়াই কোটি টাকা আদায়ীকৃত মূলধন লইয়া রপ্তানী ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন কোম্পানী আইনানুসারে প্রাইভেট কোম্পানীরূপে গঠিত হয়। এই কর্পোরেশনের মূলধনের সমস্তটাই ভারত সরকারের। ইহার পরিচালনার দায়িত্ব সরকার মনোনীত সাতজন ডিরেক্টার লইয়া গঠিত একটি বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর উপর ন্যস্ত। এই কর্পোরেশনকে পরামর্শ দিবার জন্য ২১ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি এ্যাডভাইসারী কাউন্সিল রহিয়াছে। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে এই কর্পোরেশনটি রপ্তানী ক্রেডিট ও গ্যারান্টি কর্পোরেশনের সহিত যুক্ত হইয়া যায় এবং ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকার রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহার মধ্যে রপ্তানী ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন গঠন অন্যতম। রপ্তানী বাণিজ্যে কতকগুলি রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক ঝুঁকি রহিয়াছে যাহা সাধারণ বীমা কোম্পানীগুলি দূর করিতে অক্ষম। অন্যান্য বহু দেশে এই ধরণের ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন রহিয়াছে। ভারতের রপ্তানীকারকের ওই ধরণের সুযোগ সুবিধা না থাকিলে প্রতিযোগিতায় অসুবিধা হইবে। অবশ্য এই কর্পোরেশন রপ্তানী বাণিজ্যের সকল ঝুঁকি নিজে বহন না করিয়া কর্পোরেশন এবং রপ্তানীকারকদের মধ্যে উহা বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছে।

ভারত সরকার রপ্তানী বীমা পরিকল্পনা রচনার জন্য ১৯৫৫ সালে মিঃ টি. সি. কাপুরের সভাপতিত্বে রপ্তানী বাণিজ্যে ঝুঁকি পরিকল্পনা কমিটি (Fxport Credit Guarantee Committee) গঠন করেন। এই কমিটি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত রপ্তানী ঝুঁকি-বীমা কর্পোরেশন গঠনের সুপারিশ করেন। কমিটি এই কর্পোরেশনকে স্বেচ্ছামূলক রাখার নির্দেশ দেন। কমিটি বলেন যে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য অধিকতর অর্থের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলি রপ্তানী বাণিজ্যে ক্রমশই অধিকতর অংশ গ্রহণ করিতেছে এবং ইহাদের জন্য রপ্তানী বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন। রপ্তানী বীমা পরিকল্পনার ফলে রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য অধিকতর অর্থ পাওয়া যাইবে, বীমা ব্যবস্থার সুবিধা ভোগকারী বিদেশী রপ্তানীকারকের অনুরূপ সুবিধা পাইলে ভারতীয় রপ্তানী ব্যবস্থার প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। কমিটির একজন সদস্য, মিঃ এস. সি. রায় পরিকল্পনাটিকে বাধ্যতামূলক রাখিতে অথবা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঝুঁকি গ্রহণের সুপারিশ করেন। কিন্তু কমিটির অধিকাংশ সদস্য তাঁহার বিপক্ষে মতপ্রকাশ করে।

রপ্তানী বাণিজ্যের ঝুঁকিগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—বাণিজ্যিক ঝুঁকি (Commercial risks) এবং রাজনৈতিক ঝুঁকি (Political risks) এই কর্পোরেশন উভয় প্রকার ঝুঁকিই গ্রহণ করে। কর্পোরেশন বাণিজ্যিক ঝুঁকির শতকরা ৮০ ভাগ

এবং রাজনৈতিক ঝুঁকির শতকরা ৮৫ ভাগ গ্রহণ করে। ঝুঁকির বাকী অংশ রপ্তানীকারীকেই বহন করিতে হয়।

বৈদেশিক আমদানীকারী দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে অর্থাৎ মূল্য পরিশোধে অসমর্থ হইতে পারে বা নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য পরিশোধে অসমর্থ হইতে পারে। আমদানীকারীর দেশে যুদ্ধ বা গৃহবিবাদ বা প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থার উদ্ভব আমদানী নীতি বা মুদ্রার বহির্মূল্যের পরিবর্তন, নূতন আইন প্রণয়নের ফলে অর্থপ্রেরণ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে, জাহাজের গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে এই সকল রাজনৈতিক ঝুঁকির শতকরা ৮৫ ভাগ কর্পোরেশন গ্রহণ করে।

কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠার পর হইতে ইহার কাজ ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে ইহার প্রিমিয়ামের রেট অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যায়। ১৯৫৬-৬০ সালে প্রিমিয়ামের হার শতকরা ১০ ভাগ কমানো হইয়াছে। বীমা ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করিলে বীমা এবং কর্পোরেশনের আয়ের পরিমাণ বাড়িবে। ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত কর্পোরেশন প্রায় ৬০ কোটি টাকার বীমাকার্য সম্পাদন করে।

রপ্তানী ক্রেডিট ও গ্যারান্টি কর্পোরেশন (Export Credit and Guarantee Corporation): ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে রপ্তানী ক্রেডিট ও গ্যারান্টি কর্পোরেশন গঠিত হয়। রপ্তানী ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশনের সহিত ইহাকে যুক্ত করা হয়; ফলে রপ্তানী ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশনের অস্তিত্ব আর নাই। এই কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন পাঁচকোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন দুই কোটি টাকা। রপ্তানী বাণিজ্যে ঋণ এবং গ্যারান্টি দেওয়া এবং ঝুঁকি গ্রহণ করা এই কর্পোরেশনের কাজ। রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণে এই কর্পোরেশন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ও বৈদেশিক মুদ্রা সংকট (India's Balance of Payments Position and Foreign Exchange Crisis): আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশের মোট দৃশ্য ও অদৃশ্য দেনা-পাওনাকে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলে। যদি কোনো দেশের দেনা অপেক্ষা বৈদেশিক পাওনা অধিক হয় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অনুকূল হইবে আর যদি কোনো দেশের পাওনা অপেক্ষা বৈদেশিক দেনা অধিক হয় তাহা হইলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কাল পর্যন্ত ভারতের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীই অধিক ছিল অর্থাৎ ভারতের বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত অনুকূল ছিল। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে এইরূপ রপ্তানী আধিক্য দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক হয় কিন্তু ভারতে তাহা হয় নাই। এই অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হইতে ইংলণ্ডকে প্রতিবৎসর হোমচার্জ মিটাইতে হইত। অবশ্য হোমচার্জ মিটাইয়াও ভারত মোটা অংকের স্টার্লিং জমাইতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত ক্রমাগত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য ভারতের

বহির্বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সময়কে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি: ১৯৪৮-৪৯ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল এই আট বৎসর এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্বরু হইতে চতুর্থ পরিকল্পনার সূচনাকাল (১৯৫৫-৫৬ হইতে এপ্রিল ১৯৬৬ সাল)।

১৯৪৮-৪৯ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত এই আট বৎসরে ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৮০২·৭ কোটি টাকা। ১৯৪৭ দেশবিভাগ ঘটিলে খাদ্য, পাট, তূলা প্রভৃতির প্রধান উৎপাদক অঞ্চলগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ফলে ভারতকে স্বভাবতই এই সকল কাঁচামাল আমদানী করিতে হয়। দেশ বিভাগের ফলে ভারত খাদ্যশস্যে ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত হয় এবং উদ্বাস্তুদের আগমনে খাদ্যাভাব অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতকে রপ্তানীর অনুপাতে অধিক আমদানী করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, ১৯৫১ সালে ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বরু হয়। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে বিদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণে কাঁচামাল, মূলধন, দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, যুদ্ধের সময় দেশে একদিকে যেমন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় ঠিক অপরদিকে তেমন ভোগ্যদ্রব্যের যোগান হ্রাস পায়। চাহিদা ও যোগানের প্রতিকূল প্রভাবে দেশে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় এবং ইহার দরুণ রপ্তানী ব্যাহত হয়। চতুর্থতঃ, এই সময় হইতে জনসংখ্যার প্রবল চাপ এবং খাদ্য উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির দরুণ প্রচণ্ড খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। দেশের খাদ্য ঘাটতি মিটাইবার জন্য প্রতিবৎসর ১০০ কোটিরও অধিক টাকার খাদ্য বাহির হইতে আমদানী হইতে থাকে। ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভারতে চল্‌তি হিসাবের খাতে (Current Accounts) লেনদেনের মোট প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হয় ৩৭০ কোটি টাকা। আর মূলধনী খাতের (Capital Accounts) লেনদেন ধরিলে মোট ঘাটতির পরিমাণ হয় ৭৪৫ কোটি টাকা। এই টাকা ষ্টার্লিং, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও ঋণের সাহায্যে পরিশোধ করা হয়।

প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়—(১) উৎপাদন বৃদ্ধি (২) আমদানী সংকোচন (৩) রপ্তানী সম্প্রসারণ (৪) মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ এবং (৫) মুদ্রামান হ্রাস।

খাদ্য দ্রব্য, কৃষিজ দ্রব্য, এবং শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইয়া যাইবার জন্য "অধিক খাদ্য ফলাও" অভিযান চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ডলার এবং ষ্টার্লিং অঞ্চল হইতে আমদানী হ্রাস করিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বিলাস দ্রব্য বা যে সকল দ্রব্য অপরিহার্য নয় তাহাদের আমদানী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। আমদানীসংক্রান্ত পরামর্শ দিবার জন্য আমদানী পরামর্শদাতা কাউন্সিল (Import Advisory Council) গঠিত হয়। স্থগিত-পরিশোধ নীতি অনুসারে (deferred payment system) আমদানী করিতে দেওয়া হইতেছে। তৃতীয়তঃ, রপ্তানী সম্প্রসারণ করিতে হইবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলাকালীন অবস্থায় মোট আমদানীর পরিমাণ অত্যধিক সংকোচ করা

সম্ভবপর হইবে না। ১৯৪৯ সালে সরকার রপ্তানী প্রসার কমিটি (Gorwalla Export Promotion Committee) গঠন করেন এবং এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রপ্তানী সম্প্রসারণের নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ভারত সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিল্পবাণিজ্য মিশন পাঠাইয়া ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করিয়া রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। ইহা ব্যতীত প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতীয় দ্রব্য-সামগ্রীকে বৈদেশিক বাজারে জনপ্রিয় করিবার জন্য প্রদর্শনী ডিরেক্টরেট কাজ করিতেছে। চতুর্থতঃ, রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে হইলে আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা প্রয়োজন এবং সরকার আর্থিক এবং ফিসক্যাল পদ্ধতির সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতি রোধের চেষ্টা করেন। ইহা ছাড়া ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার মুদ্রামান হ্রাস (devaluation) করেন। ডলারের সহিত ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য শতকরা ৩০.৫ ভাগ হ্রাস করা হয়। মুদ্রামান হ্রাস করিলে মূল্যহ্রাসকারী দেশের বাজারে বিদেশী আমদানী দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং বৈদেশিক বাজারে মূল্যহ্রাসকারী দেশের রপ্তানী দ্রব্যের দাম হ্রাস পায়; এইভাবে লেনদেন উদ্বৃত্ত দেশের অনুকূলে আসিতে থাকে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উদ্বৃত্তের বর্তমান অবস্থা : দ্বিতীয় যুগ (Present Balance of Payments Position of India) : দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূচনা হইতে ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত চরম সংকটের আকার ধারণ করে। ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত লেনদেনের মোট প্রতিকূল উদ্বৃত্ত প্রায় ১৯২০ কোটি টাকার মতো। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর আমদানী হইয়াছে ১০৭২ কোটি টাকার দ্রব্যসামগ্রী কিন্তু প্রতি বৎসর রপ্তানী হইয়াছে মাত্র ৬১৪ কোটি টাকার দ্রব্যসামগ্রী। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর মোট আমদানী ও রপ্তানী মূল্য যথাক্রমে ১০৯৩ এবং ৬৬০ কোটি টাকা অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩৩ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে ঘাটতি ছিল ৪৩২ কোটি টাকা কিন্তু তৃতীয় বৎসরে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ২৪৬ কোটি টাকা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে লেনদেন ঘাটতি ২০০০ কোটি টাকাও ছাড়াইয়া যাইতে পারে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে বাণিজ্য লেনদেনের উদ্বৃত্ত কিরূপ হইবে তাহা উহার খসড়ায় আলোচিত হইয়াছে। বাৎসরিক রপ্তানীর মূল্য হইবে ৬৯০ কোটি টাকা। প্রথম দুইটি পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক ঋণের সুদ বাবদ প্রতি বৎসর ১০০ কোটি টাকা লাগিবে। দ্রব্য রপ্তানী করিবার জন্য প্রতিবৎসর ৬১৪ কোটি টাকার মতো বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হইবে। কমিশনের হিসাবানুসারে পুরাতন কার্যসূচী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি বৎসর ৭১৪ কোটি টাকা লাগিবে। সুতরাং অপরিহার্য সামগ্রী আমদানী করিতেই ১০০ কোটি টাকার মতো ঘাটতি হইবে। কমিশনের হিসাবানুযায়ী ১৯৬১-৬২ হইতে ১৯৬৫-৬৬ এই পাঁচ বৎসরে ২১০০ কোটি টাকার মতো মূলধনী দ্রব্য আমদানী করিতে হইবে। সুতরাং এই পাঁচ বৎসরে মোট ঘাটতির পরিমাণ ২৬০০ কোটি টাকা (বাৎসরিক ৫০২ কোটি টাকা) দাঁড়াইবে।

ভারতের ক্রমাগত লেনদেন ঘাটতির কারণ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। লেনদেন উদ্বৃত্তের এই আশংকাজনক অবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের কারণগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়: (১) আমদানী বৃদ্ধি এবং (২) রপ্তানী সম্প্রসারণের অভাব।

আমদানীর আধিক্য: প্রথমতঃ, মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন সম্বন্ধে যে হিসাব করা হইয়াছিল তাহা ভুল। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমান অপেক্ষা আমদানী অনেক বেশী এবং রপ্তানী অনেক কম হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মুল এবং ভারী শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ফলে বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে মূলধনী দ্রব্য আমদানী করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ডঃ সরোজকুমার বসুর মতে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সরককারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে অব্যবস্থা এবং সামঞ্জস্য হীনতার চিত্র পাওয়া যায়; পরিকল্পনা কমিশন, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী দপ্তর এবং রিজার্ভ ব্যাংক—সরকারের এই তিন বিভাগের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় থাকিলে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব এতো তীব্র হইত না।* তৃতীয়তঃ, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল হইতে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং খাদ্য ঘাটতি মিটাইবার জন্য খাদ্যশস্যের আমদানী বৃদ্ধি পায়। চতুর্থতঃ, দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর আমদানী নীতি বেশ উদার ছিল এবং সতর্কতা অবলম্বন না করিয়াই সরকার ১৯৫৬-৫৭ সালে অতিরিক্ত পরিমাণে আমদানী লাইসেন্স দিতে থাকে। পঞ্চমতঃ, আমদানীর মূল্যবৃদ্ধি রপ্তানী হ্রাস হওয়ার ফলে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট চরম হইয়া দেখা দেয়। পশ্চিমী দেশগুলিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেওয়ায় উহাদের কাছ হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে অনুমিত দাম অপেক্ষা অনেক বেশী দাম দিতে হইয়াছে। এই সময় সুয়েজ বিবাদের জন্য আমদানী দ্রব্যের জাহাজ ভাড়া সাময়িক ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ষষ্ঠতঃ, দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকাশের পরও কতকগুলি নূতন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, ইহাতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং ভারতের বাহির্বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়। চীনা আক্রমণের এবং পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সময় ভারত তাহার সামরিক দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং প্রতিরক্ষার জন্য অধিক পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র বিদেশ হইতে আমদানী করিতে বাধ্য হয়।

রপ্তানী সম্প্রসারণের অভাব: বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উপায় রপ্তানী বৃদ্ধি। কিন্তু বিগত দশ বৎসরে রপ্তানী মোটেই সম্প্রসারিত হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে রপ্তানীর বাৎসরিক মূল্য ছিল ৬০৯ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন কালে ইহার মূল্য দাঁড়ায় ৬১৪ কোটি টাকায়। এই দশ বৎসরে বিশ্বের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হয় কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ মোট বিশ্বের রপ্তানী বাণিজ্যের ২.১% হইতে হ্রাস পাইয়া ১.১% এ আসিয়া দাঁড়ায়।

---

*We have a picture of an unplanned behaviour, to an almost incredible degree, among various government departments in a planned economy. Dr. S. K. Basu.

সাম্প্রতিক কালে বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্য পর্যায় হইতে রপ্তানী সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কতকগুলি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। প্রথমতঃ, বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের জন্য রপ্তানী সম্প্রসারণ কাউন্সিল গঠন করা হইয়াছে। ঝুঁকি হ্রাসের জন্য ১৯৫৭ সালে রপ্তানী ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে। সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত ঝুঁকি বহন করে না এই কর্পোরেশন সেইগুলি বহন করিবে। দ্বিতীয়তঃ, রপ্তানী সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কোটানিয়ন্ত্রণ রদ, রপ্তানী শুল্কের বিলোপ, অন্তঃশুল্কের প্রত্যর্পণ এবং পরিবহণ উন্নয়ণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। এই কর্পোরেশনের মাধ্যমে ভারতের বহির্বাণিজ্যে বৈচিত্র্যসাধন এবং সোবিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক বিস্তারের চেষ্টা করা হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট রপ্তানীর পরিমাণ ৩৭০০ কোটি টাকা হইবে। কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ঋণ বাবদ সুদ প্রদান ও প্রয়োজনীয় আমদানী বজায় রাখিতে বার্ষিক ১৩০০ হইতে ১৪০০ কোটি টাকার মতো—অর্থাৎ বর্তমানের দ্বিগুণ রপ্তানী করিতে হইবে।

রপ্তানী সম্প্রসারণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ (Measures adopted for Export Promotion) ঃ রপ্তানী বৃদ্ধির ব্যবস্থাগুলিকে ছয় ভাগ করা হয়। প্রথমতঃ, প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা—ইহার মধ্যে রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন রপ্তানী উপদেষ্টা কাউন্সিল (Export Advisory Council) বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য রপ্তানী উন্নয়ন কাউন্সিল (Export Promotion Council) বৈদেশিক বাণিজ্য বোর্ড (Foreign Trade Board) রপ্তানী ঝুঁকি বীমাকর্পোরেশন ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, অধিক পরিমাণে বৈদেশিক ঋণ, বিনিয়োগ এবং সাহায্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ক্রমাগত প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও ভারত যে তাহার পঞ্চবার্ষিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করিতে পারিতেছে তাহার কারণ বৈদেশিক সাহায্য। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি মিত্র দেশগুলি হইতে ভারত যথেষ্ট পরিমাণে ঋণ পাইতেছে। তৃতীয়তঃ, ১৯৫৭ সালে রিজার্ভ ব্যাংক সংশোধন আইনানুসারে ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাংককে উহার বৈদেশিক সিকিউরিটি পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকার স্থলে প্রয়োজনবোধে ৮৫ কোটিতে নামাইয়া আনার অধিকার দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফলে অতিরিক্ত বৈদেশিক ঋণপত্র লেনদেন ঘাটতি মিটাইবার কাজে ব্যবহার করা হয়। রিজার্ভ ব্যাংক প্রকাশিত বুলেটিনে বলা হইয়াছে যে ভারতে মোট ৫০০০ কোটি টাকার সোনা ও রূপা জনসাধারণের হাতে মজুত আছে। এই সোনারূপার একাংশ সরকার ঋণ হিসাবে কয়েক বৎসরের জন্য লইতে পারেন।

চতুর্থতঃ, বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের উপর যাইতে অধিক চাপ না পড়ে তাহার জন্য ভারত বিভিন্ন দেশের সহিত পণ্য বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করিতেছে। পণ্য বিনিময় চুক্তি অনুসারে একদেশের আমদানীর পরিবর্তে অপর দেশের রপ্তানীর

দ্বারা দেনাপাওনা মিটানো হয়। এই ব্যবস্থায় টাকা লেনদেনের কোনো প্রয়োজন হয় না।

পঞ্চমতঃ, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় (Exchange Control) নিয়ন্ত্রণ করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ইহার ফলে বিদেশ ভ্রমণ এবং বিদেশী মুদ্রার কেনাবেচা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ষষ্ঠতঃ, যাহাতে রপ্তানী দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি না পায় সেইজন্য মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী আর্থিক এবং ফিসক্যাল নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। সপ্তমতঃ, সরকার বৈদেশিক বাজার সৃষ্টির জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাইতেছেন। সরকার পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে শিল্পবাণিজ্য মিশন পাঠাইয়া ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করিয়া রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। ইহা ব্যতীত, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতীয় দ্রব্যসামগ্রীকে বৈদেশিক বাজারে জনপ্রিয় করিবার জন্য একটি প্রদর্শনী ডিরেক্টরেট কাজ করিতেছে। ইহার তত্ত্বাবধানে ১৯৫৮ সালে আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা এবং ১৯৫৯ সালে আন্তর্জাতিক কৃষিমেলার অনুষ্ঠান হয়। পরিশেষে, ১৯৬৬ সালের জুন মাসে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট এড়াইবার জন্য মুদ্রামান হ্রাস করা হয়।*

ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্যউদ্বৃত্ত ইহার কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতার (Structural disequilibrium) এবং মূল্যগত ভারসাম্যহীনতার (Price disequilibrium) ফল এবং লেনদেন ঘাটতি অস্থায়ী বা আকস্মিক নয়, ইহা ভারতের প্রত্যাশিত উন্নয়ন কর্মসূচীর সহিত জড়িত। এই লেনদেন ঘাটতি ধীরে ধীরে মিটাইতে হইবে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও ভারত (IMF and India): দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে বিশ্বের অর্থনৈতিক জীবন বানচাল হইয়া যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ও বিনিয়োগ যাহাতে অবাধগতিতে চলিতে পারে এ সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যুদ্ধকালীন সময়েই আলাপ-আলোচনা করে। ১৯৩১ হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে পৃথিবীর সকল প্রধান দেশই স্বর্ণমান পরিত্যাগ এবং কাগজীমুদ্রা প্রবর্তন করে। স্বর্ণমানের পতনের পর বৈদেশিক বিনিময়হার নির্ধারণের ব্যাপারে যে নানারূপ গোলযোগ দেখা দেয় তাহা সমাধানের জন্যও অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। দ্বিমুখী বাণিজ্য (bilateral trade), কোটা, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং সকল দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে যাহাতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ থাকে তাহারই উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস সম্মেলনে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ১৯৪৭ সাল হইতে তাহার কাজ আরম্ভ করে। ১৯৫০ সালে ইহার সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৯;

অর্থভাণ্ডারের বৈশিষ্ট্য

এই আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার পূর্বকার স্বর্ণমানের পরিবর্তে এক নূতন অর্থব্যবস্থা—স্বর্ণ ও কাগজীমান উভয়ের বৈশিষ্ট্য লইয়া গঠিত ইহা এক মিশ্রমান।

* এ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

লর্ড কেনসের ভাষায় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এক উন্নত ধরণের আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা। ইংলণ্ড প্রস্তাবিত Bancor Plan এবং আমেরিকা প্রস্তাবিত International Stabilisation Fund পরিকল্পনার বাস্তব পরিণতি এই অর্থভাণ্ডার।

এই অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য (1) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে সহায়তা করিয়া সদস্য দেশগুলির জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা; (2) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা; (3) সকলদেশের অর্থের বহুমুখী রূপান্তরযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করা; (4) বৈদেশিক বিনিময়হারের স্থায়িত্ব বজায় রাখা ও প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রামূল্যহ্রাস পরিহার করা এবং (5) মুদ্রার বিনিময় মূল্য হ্রাস না করিয়া সদস্য দেশগুলির লেনদেন উদ্বৃত্ত ভারসাম্যহীনতা দূর করার জন্য সাহায্য করা।

ইহার উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে অবস্থিত। ১২ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি বোর্ড আছে; উহাই এই ভাণ্ডারের কার্য পরিচালনা করে। প্রত্যেক দেশের একজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি বোর্ড অব গভর্ণরস্ আছে। কার্যকরী পরিচালকগণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করেন। সোভিয়েত রাশিয়া অর্থভাণ্ডারে যোগদান করে নাই।

গঠন

৮৮০০ মিলিয়ন ডলার লইয়া আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার গঠিত। সদস্যগণ নিজ নিজ 'কোটা' জমা দিয়া এই তহবিল গড়িয়াছে। প্রত্যেক সদস্যকে যাহা দিতে হইবে তাহাকে কোটা বলে। প্রত্যেক সদস্যকে তাহার কোটার ২৫% স্বর্ণ দিয়া জমা দিতে হইবে, বাকী ৭৫% নিজ মুদ্রায় জমা দিবে।

এই অর্থভাণ্ডারের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হারে যুগপৎ স্থায়িত্ব বজায় রাখা এবং সম্পূর্ণ কাঠিন্য পরিহার করা যায়। স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। আবার অনিয়ন্ত্রিত কাগজী মুদ্রামানের আওতায় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থির থাকে না, ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হ্রাস পায়। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার স্বর্ণমানের অসুবিধা বর্জন করিয়া উহার সুবিধাটুকু গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে। বিনিময় হারে স্থায়িত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সকল দেশের মুদ্রাকেই স্বর্ণের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক সদস্যদেশকে স্বর্ণ অথবা ডলারের সহিত তাহার মুদ্রার মূল্য ঘোষণা করিতে হয়। এখন স্বর্ণের সহিত বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্থির থাকায় একদেশের সহিত অন্যদেশের মুদ্রার বিনিময়হার স্থির থাকে। বিনিময় হারে এইভাবে স্থায়িত্ব রক্ষা করা হইলেও ইহা একেবারে অপরিবর্তনীয় নয়। সরকারীভাবে নির্দিষ্ট বিনিময় হারের শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত অর্থভাণ্ডারের অনুমতি ব্যতীতই যে কোনো দেশ পরিবর্তন করিতে পারে। যদি আন্তর্জাতিক দেনাপাওনার হিসাবে মৌলিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় তাহা হইলে অর্থভাণ্ডারের অনুমতি লইয়া কোনো সদস্যদেশ বৈদেশিক বিনিময়হারের শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত পরিবর্তন করিতে

পারে। "মৌলিক ভারসাম্যহীনতা" বলিতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে অর্থভাণ্ডার কোনো সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করে নাই। তবে যদি কোনো দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেন ক্রমাগত ঘাটতি হইতে থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে মৌলিক ভারসাম্যহীনতা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে সদস্যদেশ ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। এই ঋণের জন্য সুদ দিতে হয়। সময় যত দীর্ঘ ও ঋণের পরিমাণ যত অধিক হইবে সুদের হার তত বেশী হইবে। যদি কোনো দেশের বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি দেখা দেয় তাহা হইলে সেই ঘাটতি মিটাইবার জন্য অর্থভাণ্ডার ওই দেশকে ভাণ্ডার হইতে নিজস্ব মুদ্রার বিনিময়ে অন্য দেশের মুদ্রা কিনিবার অধিকার দেয়। যাহাতে ভাণ্ডারে কোনো দেশের মুদ্রার পরিমাণ নিঃশেষ না হইয়া যায় সেইজন্য মুদ্রা ক্রয়ের উপর নানা ধরণের বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। কোনো দেশ এক বৎসরে তাহার কোটার শতকরা ২৫ ভাগের বেশী বৈদেশিক মুদ্রা কিনিতে পারে না। কোনো দেশের মুদ্রার চাহিদার তুলনায় যোগান কম হইলে অর্থভাণ্ডার সেই দেশের মুদ্রাকে দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা (Scarce Currency) বলিয়া ঘোষণা করিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে সেই দেশের মুদ্রা কিনিবার চেষ্টা করিবে।

ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের একজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। ১৯৪৭ সালে ভারতের চাঁদার (quota) পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি ডলার কিন্তু পরে সকল সদস্যের চাঁদার হার শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়। ইহার ফলে ভারতের পক্ষে অর্থভাণ্ডার হইতে অধিক পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা কেনা সম্ভবপর হইবে। ভারত আন্তর্জাতিক

ভারত ও অর্থভাণ্ডার

অর্থভাণ্ডারের সদস্য হওয়ার ফলে দেশের মুদ্রাব্যবস্থা এবং রিজার্ভ ব্যাংকের কাজের কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইল টাকার সহিত ষ্টার্লিং-এর বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাংক আইনানুসারে রিজার্ভ ব্যাংকের ষ্টার্লিং ব্যতীত অন্য কোনো বৈদেশিক মুদ্রার কেনাবেচার উপর আইনগত বাধা ছিল। কিন্তু ভারত অর্থভাণ্ডারের সদস্য হওয়ার ফলে ওই আইনগত বাধা দূর হয় এবং রিজার্ভ ব্যাংক সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে যে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচা করিতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতের মুদ্রা এক স্বাধীন মুদ্রারূপে পরিগণিত হইতেছে এবং ভারতের বর্তমান মুদ্রা ব্যবস্থাকে স্বর্ণ-সমতামান (Gold Parity Standard) বলা হয়।

১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাংক আইনানুসারে, রিজার্ভ ব্যাংক প্রচলিত নোটের মূল্যের শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ অথবা ষ্টার্লিং ঋণপত্রে জমা রাখিত। ১৯৪৭ সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইনের পরিবর্তন করিয়া ষ্টার্লিং ঋণপত্র ছাড়াও অন্যান্য বৈদেশিক ঋণপত্রও আমানত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারত এই অর্থভাণ্ডার হইতে স্বল্পকালীন ঋণ গ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। চলতি হিসাবে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত পূরণ করিবার জন্য ভারত সময় সময় এই অর্থভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া পরোক্ষভাবেও এই প্রতিষ্ঠান ভারতকে যথেষ্ট সাহায্য

করিয়াছে। উন্নয়ন এবং পুনর্গঠনের কাজে ঋণদান করিবার জন্য আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন এবং উন্নয়ন ব্যাংক রহিয়াছে। কিন্তু অর্থভাণ্ডারের সদস্য না হইলে কোনো দেশ ওই ব্যাংকের সদস্য হইতে পারে না। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে মোট ১৪৩ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা কিনিয়াছে। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা সংকট সমাধানে ইহার অবদান কম নয়। বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতি দূর করিবার ব্যাপারে সাহায্য করা ব্যতীতও ভারতের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই অর্থভাণ্ডার কারিগরী ও বিশেষজ্ঞ দল পাঠাইয়া পরামর্শ দানের সুবিধা দিয়াছে।

ইউরোপীয় সাধারণ বাজার ও ভারত (E. C. M. and India): ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থ নৈতিক স্বার্থের উপর ভিত্তি করিয়া জোট বাঁধার প্রবণতা দেখা গিয়াছে। ১৯৫৭ সালে রোম চুক্তির বলে (Treaty of Rome) ফ্রান্স, ইতালি, পশ্চিম জার্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং লাক্সেমবুর্গ—এই ছয়টি দেশ নিজেদের অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঐক্য সাধনের জন্য ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সমাজ (European Economic Community or E E C) গঠন করে। এই ছয়টি দেশকে "আভ্যন্তরীণ" ছয় (the inner six) বলা হয়। ইহারা সাধারণ বাজার পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ বাজার কমিশন (Common Market Commission) সৃষ্টি করিয়াছে। বৃটেন এই "আভ্যন্তরীণ ছয়" ভুক্ত হইতে পারে নাই। ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে ফ্রান্সের নেতৃত্বে বৃটেন খুশী হয় নাই। উপরন্তু কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলির স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া বৃটেন সাধারণ বাজারের মূল সদস্য হয় নাই। ১৯৫৯ সালে বৃটেন ও সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, অষ্ট্রিয়া, পর্তুগাল ও সুইজারল্যাণ্ড এই সাতটি দেশ লইয়া অনুরূপ একটি ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংগঠন (European Free Trade Association or E F T A) গঠন করে। এই সাতটি দেশকে "বাহিরের সাত" (Outter Seven) বলা হয়। অবশ্য এই সংস্থা দীর্ঘজীবি হইতে পারে নাই।

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলি এইরূপ: প্রথমতঃ, এই সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলিকে একটি অঞ্চল বলিয়া ধরিতে হইবে এবং সদস্য দেশগুলি নিজেদের মধ্যে আমদানী শুল্ক এবং 'কোটা' ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে অপসারণ করিয়া ১৯৭০ সালের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্তন করিবে। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ বাজার বহির্ভূত দেশসমূহ হইতে সাধারণ বাজারে যে আমদানী হইবে সকল সদস্যদেশ তাহার উপর সমান হারে শুল্ক ধার্য করিবে। তৃতীয়তঃ, সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলির মধ্যে শ্রম এবং মূলধনের অবাধ গতিশীলতা থাকিবে। চতুর্থতঃ, সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলির বিনিয়োগ ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য একটি ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক (European Investment Bank) স্থাপন করিতে হইবে। পরিশেষে রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে সকল সদস্য দেশের অভিন্ন আর্থিক নীতি থাকিবে।

সাধারণ বাজারের উদ্দেশ্যসমূহ

এই অর্থ নৈতিক জোটের পিছনে রহিয়াছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এই সাধারণ বাজারের সদস্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে নিবিড় ঐক্যবন্ধন সৃষ্টি করিয়া একটি তৃতীয় ব্লক গঠন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই সাধারণ বাজারের নেতা হইতেছে ফ্রান্স।

বৃটেন ও সাধারণ বাজার

বৃটেন প্রথমে সাধারণ বাজার পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে নাই কিন্তু পরে উহার আশাতীত সাফল্য দেখিয়া এবং সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলি বৃটেনকে সাধারণ বাজারে যোগদান করিতে আহ্বান করিলে ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে বৃটেন উহার সদস্যপদের জন্য আবেদন করে। অবশ্য ১৯৬৩ সালে সাধারণ বাজারের সদস্যগণ বৃটেনকে উহার সর্তে সাধারণ বাজারের পূর্ণ সদস্য করিতে অসম্মত হন।

নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য বৃটেন সাধারণ বাজারের সদস্য হইতে ইচ্ছুক। প্রথমতঃ, ১৯৫৫ সাল হইতে কমনওয়েল্‌থ ভুক্ত দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের তুলনায় "সাধারণ বাজারভুক্ত ছয় দেশের" সহিত বৃটেনের বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণ বাজারের বাহিরে থাকিলে সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে বৃটেনের দেয় শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে অপরপক্ষে ওই সাধারণ বাজারের সদস্য হইলে উহাদের সহিত বাণিজ্যে বৃটেনের কোনরূপ শুল্ক লাগিবে না। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানে আমেরিকা এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত প্রতিযোগিতা করা বৃটেনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এই অবস্থায় যদি ইউরোপীয় সাধারণ বাজার একটি শক্তিশালী তৃতীয় ব্লকে পরিণত হয় তাহা হইলে বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্য এবং আমদানীকৃত কাঁচামাল উভয়েই নিদারুণভাবে ব্যাহত হইবে—ইহাতে বৃটেনের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিবে।

বৃটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থায় কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, অন্যান্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের মতো ভারতও বৃটেনের সহিত বাণিজ্যে কমনওয়েলথ পক্ষপাতিত্বের (Commonwealth preference) সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। ভারতের সকল দ্রব্যই বিনা শুল্কে ইংলণ্ডের বাজারে প্রবেশ করিতে পারে। ভারতীয় রপ্তানী দ্রব্যের উপর ইংলণ্ডে কোনো পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ নাই। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে ইংলণ্ড প্রধান স্থান অধিকার করে। ভারত চা, তুলা বস্ত্র এবং পাটজাত দ্রব্যাদি ইংলণ্ডে শুল্কবিহীন ভাবে রপ্তানী করিতে পারে। কিন্তু ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে ইহাদের উপর যথাক্রমে ১৮%, ১৭% এবং ২৩% শুল্ক ধার্য করা আছে। বৃটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে উহার নিকট উপরোক্ত হারে ওই সকল দ্রব্যের উপর শুল্ক বসিবে ফলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে এবং ভারতে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট চরম আকার ধারণ করিবে।

রপ্তানির এক চতুর্থাংশ ইংলণ্ডে যায়

দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যে ভারতের লেনদেন বাণিজ্য বিশেষ প্রতিকূল নয়। ১৯৬৩ সালে লেনদেন ঘাটতির পরিমাণ ছিল মাত্র দুই কোটি টাকা কিন্তু ওই

বৎসর সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলির সহিত ভারতের লেনদেনের ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৮১ কোটি টাকা। বৃটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের নীতিও ভারতের সহিত বৃটেনের বাণিজ্যে প্রযোজ্য হইবে; ইহার ফলে ভারতের লেনদেন ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

অবশ্য বৃটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে সদস্যপদের জন্য আবেদন করার সময় কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির স্বার্থ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেরূপ সর্তের কথাও উল্লেখ করে। কিন্তু বৃটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে ভারতের অর্থ-নৈতিক স্বার্থ যে ক্ষুণ্ণ হইবে ইহা নিশ্চিত। ভারতের পক্ষ হইতে প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছিল যে সাধারণ বাজারে কতকগুলি ভারতীয় দ্রব্যকে শুল্কবিহীন ভাবে রপ্তানী করিবার অনুমতি দিতে হইবে।

ইহা অনস্বীকার্য যে বৃটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে ভারতের সাময়িক-ভাবে অসুবিধা হইবে কিন্তু পরিণাম মঙ্গলজনকও হইতে পারে। বর্তমানে ইংলণ্ডের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের হার অধিক নয়, আর সেই কারণে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সহিত উহার বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। যদি সাধারণ বাজারে যোগদানের ফলে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ওই দেশে ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর হইলে উহা ভারতকে অধিক পরিমাণে মূলধনীদ্রব্য সরবরাহ করিয়া ভারতের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করিতে সহায়তা করিবে। ইহা ব্যতীত, ইংলণ্ডের মাধ্যমে ভারত সাধারণ বাজারভুক্ত ইউরোপীয় দেশগুলির সহিত সুদৃঢ় বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিবে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে কোনো দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকা ভারতের উচিত নয়। ভারত যাহাতে অন্যান্য দেশের সহিত ন্যায্য ভাবে প্রতিযোগিতা করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করিতে হইবে। রপ্তানী শিল্পগুলিকে জাতীয়করণ করিয়া উহাদের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিতে পারিলে শুধুমাত্র ইংলণ্ডেই নয়, সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলি এবং এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নকামী দেশগুলিতে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ইংলণ্ডের মতো সংরক্ষিত বাজার (Sheltered market) হারানোর ফলে ভারত তাহার আত্মশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে এবং ইহার পরিণাম মঙ্গলজনক হওয়া অসম্ভব নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় কর-ব্যবস্থা

(Indian Tax Structure)

[বিষয়বস্তু :— ভারতীয় কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—কর-ব্যবস্থা উন্নয়নের সুপারিশ—কর-অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্ট—ডাঃ ক্যালডরের প্রস্তাব—আয়কর—সম্পত্তি কর—মূলধন লাভ কর—দান-কর সম্পদ-কর—ব্যয়কর—বাণিজ্য শুল্ক—কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক—বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনা—বাৎসরিক আমানত পরিকল্পনা—বিক্রয় কর—ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় ব্যবস্থা—প্রথম ফিনান্স কমিশন—দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন—তৃতীয় ফিনান্স কমিশন—চতুর্থ ফিনান্স কমিশন—ভারতের সরকারী ঋণ]

ভারতীয় করব্যবস্থা- ইহার ত্রুটি ও প্রতিকার- (Indian Tax Structure : its defects and measures for its improvement) —পৃথিবীর সকল দেশের মতোই ভারতীয় কর-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর লইয়া গঠিত। ভারতের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের বলিয়া কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আয়ের উৎসগুলিকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই কর ধার্য এবং কর-লব্ধ আয় ভোগ করিতে পারে। যে সকল করের ভিত্তি আন্তঃ-রাজ্যীয়, সেইগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে আর যেগুলির ভিত্তি অন্তঃরাজ্যীয়, সেই সকল করকে রাজ্য সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। আয়কর, ব্যয়কর, দানকর, মৃত্যুকর, সম্পদ কর, মূলধন লাভ কর, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, এবং বাণিজ্য শুল্ক—এইগুলি হইল কেন্দ্রীয় সরকারের কর। রাজ্য সরকারের করসমূহ হইল, কৃষি আয়কর, বিক্রয় কর, প্রমোদ কর, স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিষ্ট্রেশান, রাজ্য অন্তঃশুল্ক, ভূমি রাজস্ব, ব্যবসায়ের উপর কর ইত্যাদি।

চার ধরণের কেন্দ্রীয় কর

কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত করগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, কতকগুলি কর আছে যাহা কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য করিবে এবং কর-লব্ধ সব টাকাটাই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য। যেমন বাণিজ্য শুল্ক, কর্পোরেশন ট্যাক্স ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি কর আছে যাহা কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য এবং আদায় করিবে কিন্তু করলব্ধ আয় রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বণ্টিত হইবে। যেমন আয়কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। চতুর্থ ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্য সরকারগুলি আয়করের শতকরা ৭৫ ভাগ এবং কেন্দ্র শতকরা ২৫ ভাগ পাইবে। তৃতীয়তঃ, কতকগুলি কর রহিয়াছে যাহা কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য ও আদায় করিবে কিন্তু সমস্ত টাকাটাই রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

কৃষিজমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির উপর মৃত্যুকর। চতুর্থতঃ, কতকগুলি কর আছে যাহা কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য করিবে কিন্তু রাজ্য সরকার উহা আদায় করিবে এবং কর-লব্ধ সমস্ত অর্থ ই সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার পাইবে। যেমন কেন্দ্রীয় তালিকা ভুক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি।

ভারতীয় কর ব্যবস্থার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ডাঃ ক্যালডর ভারতের করব্যবস্থাকে অসম ও দক্ষতা বিহীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতের করব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে অধ্যাপক ক্যালডরের সমালোচনা সম্পূর্ণ সত্য।

[এক] ভারতীয় করব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইহা গড়িয়া উঠে নাই। ইহা অবিন্যস্ত ও অপরিকল্পিত। মূলতঃ রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা আনয়নের উদ্দেশ্যেই ইহা রচিত হইয়াছিল। দেশের অর্থ-নৈতিক অগ্রগতির উপায় হিসাবে কর ব্যবস্থাকে বিবেচনা করা হয় নাই।

[দুই] ভারতে বহুপ্রকার কর প্রবর্তিত থাকিলেও ডাঃ ক্যালডরের হিসাবানু-যায়ী কর আদায়ের পরিমাণ জাতীয় আদায়ের মাত্রা শতকরা ৭ ভাগ; ব্রহ্মদেশে উহা জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫ ভাগ, বৃটেনে উহা জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উহা জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ ভাগ এবং জাপানে উহা জাতীয় আয়ের শতকরা ২৩ ভাগ। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কর আদায়ের পরিমাণকে জাতীয় আয়ের ১১·৪ ভাগে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে করের বোঝা খুবই কম। জাতীয় আয়, জনসাধারণের মধ্যে আয়ের বণ্টন প্রভৃতি আরো অনেক বিষয়ের উপর করের বোঝা নির্ভর করে। কি ভাবে কর ধার্য করা হয় এবং করলব্ধ আয় ব্যয় হয় তাহার উপর করের ভার নির্ভর করে। অনুন্নত দেশে কর বহনের ক্ষমতা উন্নত দেশের তুলনায় স্বভাবতই অনেক কম হইবে।

[তিন] ভারতীয় কর-ব্যবস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে ইহা পরোক্ষকরের উপর অধিক নির্ভরশীল। কর-অনুসন্ধান কমিশনের হিসাবানুযায়ী ১৯৫৩-৫৪ সালে মোট কর আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ আসিত পরোক্ষ কর হইতে আর বাকী শতকরা ২৫ ভাগ আসিত প্রত্যক্ষ কর হইতে। ভারতে শতকরা মাত্র একজন লোক আয়কর দেয় অপরপক্ষে ইংলণ্ডে শতকরা ·৭০ জন লোক আয়কর দিয়া থাকে। অবশ্য সম্প্রতি আয়কর প্রদানকারী ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়াছে।

[চার] তৃতীয়তঃ, ভারতীয় কর ব্যবস্থা অধোগতিশীল (Regressive)। মোট করের ৪৫ ভাগ সাধারণের ভোগ্যপণ্যের উপর ধার্য কর হইতে পাওয়া যায় ফলে ধনীদের তুলনায় দরিদ্র জনসাধারণের উপর করের চাপ বেশী পড়ে। অধ্যাপক কে. টি. শাহ. যথার্থই বলিয়াছেন, "The poorer classes have to bear the lion's share of the burden with less than the lamb's capacity to shoulder

them". কর প্রদানের ক্ষমতা যাহা গতিশীল কর নীতির প্রয়োজনীয় সর্ত তাহা ভারতীয় কর ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয় নাই।

[পাঁচ] ভারতীয় কর ব্যবস্থার পরিচালনা বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া কর প্রবঞ্চনাও অত্যধিক। ডাঃ ক্যালডরের মতানুসারে ভারতে লোক বৎসরে ১০০ কোটি টাকার উপর আয় কর ফাঁকি দিয়া থাকে। ১৯৫৬ সালে ত্যাগী কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহাতে কর ফাঁকির বিপুলতার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। ধনী ব্যক্তিরা আয়কর ফাঁকি দিলেও দরিদ্র ব্যক্তিদের করভার গ্রহণ করিতে হয়। ফলে কর-ব্যবস্থা আরো অধোগতিশীল হইয়া পড়ে। 'ত্যাগী কমিটি' ইচ্ছাকৃত কর ফাঁকিকে ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া গণ্য করার সুপারিশ করিয়াছিল।

[ছয়] ভারতীয় কর ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত অল্প আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কাছ হইতে কোনো প্রকার আয়কর আদায় না করার ফলে কর ব্যবস্থার ভিত্তি ব্যাপক (broad-based) হইতে পারে নাই। পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি ভারতে শতকরা একজন লোক আয়কর দেয়—বৃটেনে শতকরা ৭০ জন লোক উহা দেয়। অপেক্ষাকৃত অল্প আয় সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে কিছুই আয়কর আদায় করা হয় না কিন্তু যাহাদের আয় বেশী তাহাদের উপর করের ভার এতোই বেশী যে তাহা লোকের কর্মোদ্যোগকে ব্যাহত করিয়া মূলধন সঞ্চয়ে বাধার সৃষ্টি করে এবং কর প্রবঞ্চনায় উৎসাহিত করে।

[সাত] ভারতীয় কর ব্যবস্থা অপরিবর্তনশীল (inelastic)। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সহিত কর রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু গত ৫।৬ বৎসরে জাতীয় আয় বৃদ্ধির অনুপাতে কর আদায়ের পরিমাণ বাড়ে নাই। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য জাতীয় আয় বৃদ্ধির সহিত কর রাজস্ব বৃদ্ধিরও বিশেষ প্রবণতা দেখা যাইতেছে।

[আট] ভারতীয় কর ব্যবস্থা রক্ষণশীল ও গতানুগতিক। নানা বিরূপ সমালোচনা সত্বেও ভূমি-রাজস্ব আজও রাজ্যের কর ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই সেদিন পর্যন্ত মৃত্যুকর, সম্পদকর, দানকর স্পর্শকরা হয় নাই। অনিশ্চিত আয়ের উপর কর ধার্য করার ব্যবস্থাও পূর্বে ছিল না।

[নয়] কর-ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে, কি উদ্দেশ্যে কর-লব্ধ রাজস্ব ব্যয় হইতেছে তাহাও জানা প্রয়োজন। ভারতে সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতি অসন্তোষজনক; কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্বখাতে ব্যয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ উন্নয়ন বহির্ভূত কাজে এবং মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ সমাজ সেবামূলক কাজে ব্যয় হয়। আবার রাজ্যসরকারের ব্যয়ের মধ্যে পুলিশ এবং শাসন সংক্রান্ত ব্যয়ই অধিক। অবশ্য ধীরে ধীরে সরকারের সমাজ কল্যাণমূলক কাজের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিতেছে।

কর ব্যবস্থা উন্নয়নের সুপারিশ (Suggestions for Improvement of Indian Tax System): ভারতীয় কর-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলিকে দূর করিতে হইলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাকে সামগ্রিকভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে

পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। চারিটি উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কর-ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন : (১) কর-ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ও গতিশীল হইতে হইবে ; (২) অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় হিসাবে কর-ব্যবস্থাকে দেখিতে হইবে ; (৩) সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সমাজ গঠনের সহিত ইহাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে এবং (৪) করলব্ধ আয় অধিক পরিমাণে সমাজ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করিতে হইবে।

[এক] কর ব্যবস্থার ভিত্তি আরও ব্যাপক করিতে হইবে যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প আয় সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কাছ হইতেও কিছু কর আদায় করা যায়।

[দুই] প্রত্যক্ষ করের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং আয়করের হারের পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বর্তমানে আয়করের সর্বোচ্চ হার অত্যধিক বলিয়া ইহা উৎপাদন ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া আশংকা করা হয়। আয়করের সর্বোচ্চ হার হ্রাস করা প্রয়োজন। কর-ব্যবস্থাকে এরূপভাবে পুনর্গঠন করিতে হইবে যাহাতে ইহা উৎপাদন কার্যে উৎসাহ সৃষ্টি করে।

[তিন] পরোক্ষ করের পরিমাণগত এবং গুণগত পরিবর্তন প্রয়োজন। দরিদ্র জনসাধারণের ভোগ্য পণ্যের উপর করভার হ্রাস করিতে হইবে এবং বিলাস দ্রব্যাদির উপর অধিকহারে করধার্য করিতে হইবে।

[চার] করব্যবস্থাকে ধন-অসাম্য হ্রাসের উপর হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। ধনী ব্যক্তির উপর অধিক করভার এবং দরিদ্র ব্যক্তির উপর স্বল্প করভার চাপাইয়া এই উদ্দেশ্য সাধন করা যাইবে।

[পাঁচ] কর-পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। ডাঃ ক্যালডর ঠিকই বলিয়াছিলেন যে অধিক হারে কর ধার্য করিয়া আদায় করিতে না পারার তুলনায় কম হারে কর ধার্য করিয়া আদায় করা অধিকতর কাম্য।

ভারতীয় কর ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করিয়া কর পদ্ধতির সংস্কার সাধন করিবার জন্য সুপারিশ করেন করঅনুসন্ধান কমিশন এবং ডাঃ ক্যালডর। আমরা ইহাদের সুপারিশগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

কর অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্ট (Report of the Taxation Enquiry Commission) : ১৯৫৩ সালে ডাঃ জনমাথাই-এর সভাপতিত্বে কর অনুসন্ধান কমিশন গঠিত হয় এবং দুই বৎসর পর ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেন। কমিটির সুপারিশগুলি নিম্নলিখিতরূপ :

[এক] সরকারী আয়ের (Public Revenue) প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া কমিশন বলিয়াছেন যে যুদ্ধ পূর্ব যুগের তুলনায় বর্তমান রাজস্ব বৃদ্ধির একমাত্র কারণ মুদ্রাস্ফীতি। জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে সরকারী আয় বৃদ্ধি পায় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যসরকারগুলিকে নানাভাবে অর্থসাহায্য করিবার ফলে পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে যে প্রতিযোগিতা ও বিরোধিতা ছিল তাহা দূর হইয়াছে।

সরকারী ব্যয়ের (Public Expenditure) প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া কমিশন বলেন যে মোট সরকারী ব্যয়ের মধ্যে উৎপাদনশীল ব্যয়ের অনুপাত ক্রমশঃই বাড়িতেছে। সরকারী ব্যয়ের ফলে অবশ্য আয়-বৈষম্য বিশেষ কমে নাই কারণ মোট জাতীয় আয়ের তুলনায় মোট ব্যয়ের পরিমাণ অত্যন্ত কম—মাত্র ১১%; সরকারী ব্যয় সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করেন যে সরকারের পক্ষে অনুৎপাদনশীল কাজে যথাসম্ভব কম অর্থ ব্যয় করা উচিত হইবে। উন্নয়নমূলক কাজে রাজস্ব ব্যয় করিলে জনসাধারণ কর প্রদানে বিরোধিতা করিবে না।

[দুই] কর ভার (Incidence of Tax) বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করিয়া কমিশন বলিয়াছেন যে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় শহর এলাকার অধিবাসীদের উপর করভার অনেক বেশী। গ্রামের তুলনায় নগরাঞ্চলে পরোক্ষকর অধিকতর গতিশীল (progressive); অবশ্য উভয় অঞ্চলেই করভার বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভূমি-রাজস্বের ভার বর্তমানে উল্লেখযোগ্য নয়। উচ্চ-পর্যায়ের কৃষি-আয়ের উপর বর্ধিত হারে কর ধার্য করার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। কমিশন মনে করেন যে ভারতীয় করভিত্তি (base for taxation) প্রশস্ত করা যাইতে পারে অর্থাৎ অল্প আয় বিশিষ্ট লোকের উপরও অল্প মাত্রায় আয়কর স্থাপন করিয়া মোট রাজস্ব বহুগুণ বাড়ানো যাইতে পারে।

[তিন] কমিশনের মতে উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদনের জন্য ঘাটতি ব্যয় অপেক্ষা অধিকতর কর স্থাপন ও ঋণ (বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ)-গ্রহণ নীতির উপর নির্ভরশীল হওয়া সরকারের উচিত। ইহা অবশ্য স্বীকার করা হইয়াছে যে কিছু পরিমাণে ঘাটতি ব্যয় করিতে হইবে।

[চার] কর আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে কেহ কর ফাঁকি দিতে না পারে। উচ্চহারে আয়কর দেওয়ায় ব্যক্তির কর্মোদ্যোগ ব্যাহত হয় বলিয়া যে প্রচার করা হয় তাহা অতিরঞ্জিত। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভোগের মধ্যে যে বিরাট বৈষম্য রহিয়াছে তাহা হ্রাস করিতে হইবে এবং সেই কারণে নীট আয়ের সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। কর প্রদানের পর ব্যক্তির আয় যেন গড় পারিবারিক আয়ের ৩০ গুণের বেশী না হয়—কমিশন সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সুপারিশ করিয়াছেন।

[পাঁচ] কর সম্বন্ধে সাধারণ নীতি (General Principles of Tax Policy) নির্ধারণে কমিশন কতকগুলি উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন: যথা সমাজের বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক বনিয়াদের দৃঢ়তা আনয়ন, রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কার্যসূচীকে সহায়তা করা, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যকে সহায়তা করা। কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে, সকল শ্রেণীর ভোগ যথাসম্ভব কমাইয়া রাষ্ট্রীয় খাতে বিনিয়োগের জন্য অধিক অর্থ এরূপভাবে সংগ্রহ করিতে হইবে যাহাতে বে-সরকারী বিনিয়োগ-যোগ্য অর্থ হ্রাসের পরিমাণ কম হয়। আয়করের সংজ্ঞাকে ব্যাপকতর করা হইয়াছে এবং আকস্মিক আয়ের উপর আয়কর স্থাপন করা উচিত বলিয়া কমিশন

মত প্রকাশ করিয়াছেন। আয়করের (তৎকালীন) কর-অব্যাহতির সীমা ৪২০০ টাকা হইতে কমাইয়া ৩০০০ টাকা করিতে হইবে। আয়করের অধিক সংখ্যক স্লাব (slab) থাকা বাঞ্ছনীয় এবং পরিবারের জন্য রেয়াৎ দেওয়ার (Family allowance) ব্যবস্থা করিতে হইবে। আয়কর ফাঁকি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য আয়কর কমিশন (Income Tax Commission) নামে আয়কর বিভাগ হইতে একটি পৃথক সংস্থা স্থাপনের সুপারিশও এই কমিশন করিয়াছে। বিক্রয়কর এরূপভাবে ধার্য করিতে হইবে যাহাতে দরিদ্র ব্যক্তিগণও কিছু পরিমাণে এই কর দিতে বাধ্য হয়। ভারতের সকল রাজ্যেই যাহাতে বিক্রয়করের সমতা বজায় থাকে সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। সম্পত্তি করকে ব্যাপকতর করিতে হইবে। কমিশন কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়াছেন। কর ব্যতীত অন্যভাবে আয় বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত দাম নীতি (Price Policy) নির্ধারণ করিয়া মুনাফা অর্জনের ব্যবস্থা করিবার জন্য কমিশন নির্দেশ দেন। শিল্প প্রসারে সহায়তা করিবার জন্য কর অব্যাহতির (Tax concessions) ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া কমিশন বিশেষ বিশেষ কর সম্পর্কে আলোচনা করিয়া নানা ধরণের সুপারিশ করিয়াছেন।

কর সংস্কার সম্পর্কে ডাঃ ক্যালডরের প্রস্তাব (Dr. Kaldor's Proposal for Indian Tax Reform): কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ক্যালডর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভারতে আসিলে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌সটিটিউট (Indian Statistical Institute) তাঁহাকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক করিকল্পনার প্রয়োজনীয় রাজস্বের ভিত্তিতে ভারতীয় করব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ করিতে অনুরোধ করেন। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে ডাঃ ক্যালডর তাঁহার রিপোর্ট পেশ করেন। ডাঃ ক্যালডর বলেন যে ভারতীয় কর-ব্যবস্থার সংস্কার করা বিশেষ প্রয়োজন কারণ ইহা অন্যায্য এবং অযোগ্য (inequitable and inefficient).

অন্যায্য

ইহা অন্যায্য কারণ করধার্য করার জন্য আয়ের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা সংকীর্ণ এবং কর প্রবঞ্চনা খুবই সহজ। কর প্রদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ধনী ব্যক্তি ন্যায্য করভার এড়াইয়া যাইতে পারে, অপরপক্ষে পরোক্ষ কর এড়াইয়া যাওয়া সম্ভবপর নয়।

অযোগ্য

ইহা অযোগ্য কারণ পরিচালনাগত ত্রুটির জন্য কর প্রবঞ্চনা খুবই সহজসাধ্য। সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় সম্পর্কে সঠিক সংবাদ সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থাই নাই এবং করদাতা তাহার প্রকৃত আয় গোপন করিয়া অসম্পূর্ণ আয়ের হিসাব দাখিল করিতে পারে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে (১৯৫৬-৫৭—১৯৬০-৬১) ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়, ৪৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর ধার্য এবং ৪০০ কোটি টাকার ফাঁক থাকিবে। ডাঃ ক্যালডরের মতে পরিকল্পনাধীন পাঁচ বৎসরে ভারতীয়

অর্থনীতিক ব্যবস্থা ৮০০ কোটি টাকার অধিক ঘাটতি ব্যয়ভার বহন করিতে পারিবে না। ডাঃ ক্যালডরের হিসাবানুযায়ী পরিকল্পনাধীন পাঁচ বৎসরে অতিরিক্ত করের মাধ্যমে ১২৫০ কোটি টাকা (৪৫০+৪০০+৪০০ = ১২৫০) সংগ্রহ করিতে হইবে।

ঘাটতি ব্যয় বহনের ক্ষমতা

ডাঃ ক্যালডর করভিত্তিকে সম্প্রসারিত করিবার নির্দেশ দেন। তিনি চারটি নূতন কর প্রবর্তনের সুপারিশ করেন—(১) মূলধন লাভ কর (Capital Gains Tax) (২) ব্যয়কর (Expenditure Tax); (৩) সম্পদ কর (Annual Tax on Wealth) এবং (৪) দানকর (Tax on General Gift).

চারটি কর স্থাপনের সুপারিশ

আয়কর এবং এই চারিটি কর একসঙ্গে ধার্য করিয়া দেয় করের পরিমাণ হিসাব করিতে হইবে। এই করগুলি এমন এক ব্যবস্থার সৃষ্টি করিবে যাহার ফলে কর প্রবঞ্চনা কঠিন হইয়া পড়িবে।

ডাঃ ক্যালডরের মতে অধিক হারে কর বসাইয়া আদায় না হওয়া (কর ফাঁকির জন্য) অপেক্ষা অল্পহারে কর ধার্য করিয়া সাফল্যের সহিত তাহা আদায় করা অধিকতর কাম্য। ভারতে তদানীন্তন আয়করের সর্বোচ্চ হার ছিল শতকরা ৯১.৮ টাকা। অধিক হারে কর ধার্য করিয়া কর-ব্যবস্থাকে গতিশীল করিবার যে প্রচেষ্টা তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধোগতিশীলতার দুষ্টচক্রে আবর্তিত হয়। উচ্চহারে কর ধার্য করার ফলে কর ফাঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কর প্রবঞ্চনা যত বেশী হয় সরকারের রাজস্ব ততই কম হয়, আর রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য সরকারের আরো বেশী হারে কর ধার্য করে ফলে কর প্রবঞ্চনা আরও বাড়িয়া যায়; এইভাবে দুষ্টচক্রটি আবর্তিত হইতে থাকে। ডাঃ ক্যালডর সুপারিশ করেন যে আয়করের সর্বোচ্চ হার কমাইয়া শতকরা ৪৫ টাকা করিতে হইবে নতুবা উদ্যোগ ও মূলধন সঞ্চয় ব্যাহত হইবে এবং কর প্রবঞ্চনাকে ইহা উৎসাহিত করিবে।

সম্পদের উপর করের সর্বোচ্চ হার ১½%, (১৫ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তির উপরই এই কর ধার্য হইবে), ব্যক্তিগত ব্যয় করের সর্বোচ্চ হার শতকরা ৩০০ ভাগ এবং দান করের সর্বোচ্চ হার হইবে শতকরা ৮০ ভাগ (৪০ লক্ষ টাকার অধিক দানের ক্ষেত্রে), সকল প্রকার মূলধন লাভের উপরই আয়করের হারে করধার্য করিতে হইবে।

প্রশাসনিক ত্রুটির জন্য লোকে বৎসরে ২০০ কোটিরও অধিক টাকা আয়কর ফাঁকি দিতেছে বলিয়া ক্যালডর অভিমত প্রকাশ করেন। কর প্রবঞ্চনা বন্ধ করিবার জন্য ডাঃ ক্যালডর ব্যক্তি এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয় ৫০,০০০ টাকার অধিক হইলে বাধ্যতামূলকভাবে হিসাব পরীক্ষার সুপারিশ করেন।

ক্যালডরের সুপারিশগুলি কার্যকর করা হইলে পরিকল্পনাধীন ৫ বৎসরে ৬২৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করা যাইবে আর বাকী ৬২৫ কোটি টাকা ভূমিরাজস্ব, অন্তঃশুল্ক

এবং অন্যান্য পরোক্ষ কর হইতে সংগৃহীত হইবে। ভারত সরকার ডাঃ ক্যালডরের প্রস্তাবিত করগুলি একে একে গ্রহণ করেন।

কয়েকটি প্রধান প্রধান করের আলোচনা করা হইল :

[এক] আয়কর (Income Tax) :

ভূমিকা : কেন্দ্রীয় সরকার আয়কর ধার্য এবং সংগ্রহ করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের ফলে যে অর্থ-সংকট দেখা দেয় তাহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৬০ সালে প্রথম আয়কর স্থাপন করা হয় এবং বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহা বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

গুরুত্ব : আয়কর বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারত সরকারের রাজস্ব আয়ের উৎসগুলির মধ্যে আয়কর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত; বর্তমানে ইহা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের ৩৮ ভাগের মতো কর-রাজস্ব এই উৎস হইতে আদায় হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে আয়কর (কর্পোরেশন কর সমেত) হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৫৫৬ কোটি টাকা—মোট কর রাজস্বের উহা ৩৮·৩%।

বিবর্তন : ১৮৬০ সালের আইনে কৃষিগত এবং অকৃষিগত উভয় প্রকার আয়ের উপরই আয়কর ধার্য করা হয়। কিন্তু ১৮৮৬ সালে আয়কর আইনানুসারে কেবল মাত্র অকৃষিগত আয়ের উপরই আয়কর ধার্য করা হয়। ১৯১৭ সালে প্রথম একটি নির্দিষ্ট আয়ের উপর সুপার ট্যাক্স (Super Tax) বসানো হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে প্রশাসনিক উন্নতি হয় এবং আয়করকে অধিকতর গতিশীল করা হয়। ১৯৩৯ সালে আয়কর নির্ধারণে স্টেপ পদ্ধতির (Step system) পরিবর্তে স্ল্যাব-পদ্ধতির (Slab System) প্রবর্তন করা হয়। স্ল্যাব পদ্ধতি অনুসারে পৃথক পৃথক আয় পর্যায়ের উপর পৃথক পৃথক হারে কর হিসাব করা হয়। এই ব্যবস্থা স্টেপ পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক ভালো কারণ ইহাতে অধিক রাজস্ব লাভ হয়—ধনীর উপর করভার বেশী পড়ে। অপরপক্ষে স্টেপ পদ্ধতি অনুসারে আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী যে হার প্রয়োজ্য সেই হারে সমস্ত আয়ের উপর কর ধার্য করা হয়। ১৯৪০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় বাড়াইবার জন্য অতিরিক্ত কর (Surcharge) স্থাপন করা হয়। ১৯৪৫ সালে উপার্জিত আয় এবং অনুপার্জিত আয়ের মধ্যে পার্থক্য করিয়া অনুপার্জিত আয়ের ক্ষেত্রে বেশী হারে কর ধার্য করা হয়; ১৯৫১-৫২ সালে আয়কর ও সুপার করের উপর সারচার্জ (Surcharge) বসান হয়।

আয়করের বিবর্তন

বৈশিষ্ট্য : প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত কর ধার্য করে তাহার অধিকাংশই প্রকৃতিগত ভাবে পরোক্ষ (indirect) এবং দরিদ্র লোকের উপর তুলনামূলক ভাবে করের বোঝা অনেক বেশী পড়ে কিন্তু আয়করের ভার ধনী লোকের উপরই বেশী পড়ে। কর প্রদানের ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সামগ্রিক ত্যাগস্বীকার নীতির ভিত্তিতে এই কর ধার্য করা হয় (it is

ইহার বৈশিষ্ট্য

levied on the basis of ability to pay in conformity with the principle of least aggregate sacrifice)। ইহার অর্থ যাহাদের কর প্রদানের ক্ষমতা অধিক তুলনামূলকভাবে তাহারাই বেশী কর দিবে। দ্বিতীয়তঃ, এই করকে গতিশীল (Progressive) করিয়া তোলা সম্ভব। তৃতীয়তঃ, ইহা সংকোচন প্রসারণশীল (Elastic) রাজস্ব—জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির সহিত রাজস্ব বাড়িবে এবং আয় কমার সহিত উহা হ্রাস পাইবে। চতুর্থতঃ, আয়কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিকে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। চতুর্থ ফিনান্স কমিশনের নির্দেশানুসারে রাজ্যসরকারগুলি পাইবে ৭৫ ভাগ এবং কেন্দ্রীয় সরকার ২৫ ভাগ। এই কারণে ইহা কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ভারসাম্য (balance) আনয়নে প্রভাব বিস্তার করে। পঞ্চমতঃ, ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য যে আয় করিবার সময়ই কর দিতে হইবে (pay as you earn system).

আয়করের ব্যাপ্তি (Scope) ঃ ভারতীয় আয়করের চারিটি অংশ আছে—ব্যক্তিগত আয়কর (Personal Income Tax), সুপার ট্যাক্স (Super Tax), কর্পোরেশন কর (Corporation Tax) এবং সারচার্জ (Surcharge) আয়করের হার প্রয়োজনানুসারে বহুবার পরিবর্তন করা হইয়াছে। ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেট অনুসারে ব্যক্তির আয় বাৎসরিক ৩০০০ টাকার অধিক হইলে (যৌথ হিন্দুপরিবারের ক্ষেত্রে ৬০০০ টাকা) আয়কর দিতে হইবে। বর্তমানে উপার্জিত আয়ের ক্ষেত্রে একলক্ষ টাকা বা অধিক আয় হইলে এবং অনুপার্জিত আয়ের ক্ষেত্রে ১৫ হাজার টাকার অধিক আয় হইলে সারচার্জ দিতে হয়। যৌথকারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির বাৎসরিক আয়ের উপর যে আয়কর ধার্য করা হয় তাহাকে কর্পোরেশন কর বলা হয়। বর্তমানে সুপার ট্যাক্স ও কর্পোরেশন ট্যাক্সটি যুক্ত করিয়া কোম্পানী কর (Company Tax) করা হইয়াছে এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট ধরণের কোম্পানীকে উৎসাহ দিবার জন্য ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটে ট্যাক্স ক্রেডিট সার্টিফিকেট (Tax Credit Certificate) প্রবর্তন করা হইয়াছে।

আয়করের ত্রুটি ঃ প্রথমতঃ, ভারতীয় আয়কর ব্যবস্থার প্রশাসনিক ত্রুটির জন্য প্রতিবৎসর লোকে বহু টাকা আয়কর ফাঁকি দেয়। ডাঃ ক্যালডরের হিসাবানুযায়ী প্রতি বৎসর ২০০ হইতে ৩০০ কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, বৃটেন বা আমেরিকার তুলনায় উঁচু আয়করের হার ভারতে অনেক বেশী। তথাপি আয়কর হইতে যে পরিমাণ রাজস্ব পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। ভারতের আয়করের ভিত্তি প্রশস্ততর করা যাইতে পারে। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম আয় সম্পন্ন লোকের উপর কম হারে আয়কর ধার্য করিলেও আয়কর হইতে লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ প্রভূত বাড়িয়া যাইবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভারতে শতকরা মাত্র একজন লোক আয়কর দেয় অপরপক্ষে ইংলণ্ডে শতকরা ৭০ জন উহা দেয়। তৃতীয়তঃ, কর অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে গ্রাম অপেক্ষা নগরাঞ্চলের অধিবাসীগণ অধিক হারে কর দেয়। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে

যাহাদের আয় বেশী তাহাদের উপর আয়কর বৃদ্ধি করিবার অবকাশ রহিয়াছে। চতুর্থতঃ, কৃষি-আয় ও অন্য সকল আয়ের মধ্যে পার্থক্য দূর করা প্রয়োজন। এই

আয়করের ত্রুটি

সেদিন পর্যন্ত কৃষি-আয়ের উপর কর ধার্যের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমানে কয়েকটি রাজ্যে কৃষি আয়কর স্থাপিত হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, ডাঃ ক্যালডরের মতে আয়ের সংজ্ঞা সংকীর্ণ এবং আয়করের সর্বাধিক হার আয়ের ৪৫ ভাগের অধিক হওয়া উচিত নয়। বর্তমানের সর্বাধিক হার শতকরা ৯'১৮ টাকা যাহা কর্মোদ্যোকে ব্যাহত করে এবং কর ফাঁকি দিতে উৎসাহিত করে। আয়কর ফাঁকি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য কর-অনুসন্ধান কমিশন আয়কর কমিশন (Income Tax Commission) নামে সম্পূর্ণ একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা (Ceiling on Per Captia Income :] কর অনুসন্ধান কমিশন সুপারিশ করেন যে কর প্রদানের পর ব্যক্তির আয় যেন গড় পারিবারিক আয়ের ৩০ গুণের বেশী না হয়। ডাঃ জনমাথাই বলেন যে ভারতের বর্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থায় ব্যক্তিগত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। বৈপ্লবিক শক্তিসমূহকে পরাভূত করিয়া জাতীয় সরকারকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বর্তমানের ধনবৈষম্য হ্রাস করা একান্ত প্রয়োজন।

ডাঃ জনমাথাই-এর মতে ব্যক্তিগত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা হইবে মাসিক ৩৫০০ টাকা (কর প্রদানের পর)।

ব্যক্তিগত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের দুইটি প্রধান যুক্তি পার্লিয়ামেণ্টে উত্থাপন করা হয়। প্রথমতঃ, আয়ের সর্বোচ্চ সীমা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের

স্বপক্ষে যুক্তি

সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দ্বিতীয়তঃ, ধনবৈষম্য, এবং আয়বৈষম্য হ্রাস পাইলে তবেই জনসাধারণ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য সহযোগিতা করিবে।

ধনবৈষম্য গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী। পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে বর্তমানে যে ধনবৈষম্য এবং আয়বৈষম্য রহিয়াছে তাহা সংশোধন করা প্রয়োজন এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে উন্নয়নের সাথে সাথে যেন অসাম্য বৃদ্ধি না পায়। ধনবৈষম্য দুইভাবে হ্রাস করিতে হইবে। সমাজের দরিদ্র ব্যক্তিদিগের আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং একই সময়ে ধনবান ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে। প্রথম পদ্ধতিই অধিকতর প্রয়োজনীয় দিক কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কাজ করাও প্রয়োজন হইবে। *

---

* "There are existing inequalities of income and wealth, which need be corrected, and care has to be taken to secure that development does not create further inequalities and when the exisiting disparities. The process of reducing inequalities is a two-fold one. It must raise incomes at the lowest levels and it must simultaneously reduce incomes at the top. The former is basicaly the more important aspect, but purposeful action in regard to the second is also called for".

আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের বিপক্ষে যুক্তি দেখানো হয় যে ইহা ব্যক্তির কর্মোদ্যোগের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। ভারতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমূহে বেসরকারী উদ্যোগের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে এবং আয়ের সর্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দিলে উহা নিরুৎসাহিত হইবে। ধনবৈষম্য হ্রাস করা আমাদের লক্ষ্য কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় কারণ তাহা হইলে উন্নয়ন কর্মসূচী ব্যাহত হইবে। ব্যক্তিগত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের কোনো অর্থই হইবে না যদি সম্পত্তির উপরও সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়। সম্পত্তিজাত আয় অথবা ব্যবসায়ের আয় নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন ব্যাপার।

বিপক্ষে যুক্তি

ডাঃ ক্যালডরের,মতে আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নিধারণ একটি অর্থহীন প্রস্তাব। যদি আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয় তাহা হইলে ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সোবিয়েত রাশিয়া তাহার অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছে যে দেশের অর্থাবস্থায় incentive-এর প্রয়োজন রহিয়াছে। তবে ডাঃ ক্যালডর স্বীকার করেন যে ভারতে অর্থ নৈতিক বৈষম্য হ্রাস করা প্রয়োজন কিন্তু ইহা করব্যবস্থাকে প্রসারিত করিয়া এবং প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমেই করা যাইতে পারে।

ক্যালডরের অভিমত

শ্রীনেহেরু পার্লিয়ামেণ্টে বলিয়াছিলেন যে সমাজতন্ত্র বলিতে ইহা বুঝায় না যে যাহাদের মাথা বিশেষ উচ্চতার অধিক তাহা কাটিয়া ফেলা। নেহেরুর মতে ধনবৈষম্য হ্রাস করার উৎকৃষ্ট পন্থা হইল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দরিদ্রলোকের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা।

নেহেরুর অভিমত

ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হইয়াছে কিন্তু তথাপি ধনবৈষম্য হ্রাস পায় নাই বরং উহা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ শিল্পক্ষেত্র হইতে জাতীয় আয় যে হারে বাড়িয়াছে কৃষিক্ষেত্র হইতে সেই হারে বাড়ে নাই। মহলানবীশ কমিটির রিপোর্টেও চরম ধনবৈষম্যের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে। ধনবৈষম্য হ্রাস করার জন্য ব্যক্তিগত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের গুরুত্ব দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে।

উপসংহার

[দুই] **সম্পত্তিকর (Estate Duty) :** মৃত্যুকর এবং এস্টেট ডিউটির মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তাহার সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হইবার পূর্বে এই কর সরকারকে দিতে হয়। ১৯৫৩ সালে এই কর প্রথম ধার্য করা হয়। সংবিধান অনুসারে কৃষিজমি ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির উপর মৃত্যুকর কেন্দ্র কর্তৃক ধার্য এবং আদায় করা হয় এবং কেন্দ্রশাসিত অংশের জন্য শতকরা ২ ভাগ রাখিয়া বাকী অংশ অস্থাবর সম্পত্তি ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। মৃত্যুর অন্ততঃ দুই বৎসর পূর্বে যে সকল সম্পত্তি বা অর্থ দান করা হইয়াছে এবং মৃত্যুর অন্ততঃ ছয়মাস পূর্বে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে যাহা

দান করা হইয়াছে তাহার উপর কোনো মৃত্যুকর ধার্য করা হইবে না। এই কর স্ল্যাব পদ্ধতিতে ধার্য করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটে প্রথম পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্ধ্বে সকল সম্পত্তির উপর মৃত্যুকর ধার্য করা হইয়াছে। এই কর স্থাপনের উদ্দেশ্য আয় বৈষম্য হ্রাস করা, আয়করের কতকগুলি ত্রুটি সংশোধন করা এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হইবার পূর্বে কর প্রদান করা হইলে তাহাকে সম্পত্তি-কর বলে আর ওই সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হইবার পর কর দেওয়া হইলে উহাকে উত্তরাধিকারী-কর (Inheritance tax) বলে।

এই কর জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের সর্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। ইহা সম্পত্তির উপর স্ল্যাব পদ্ধতিতে গতিশীল হারে ধার্য করা হয়। বর্তমানে এই করের সর্বনিম্ন হার ৪% এবং সর্বোচ্চ হার হইল ৮৫%। ১৯৬৪-৬৫ সালে এই কর হইতে আদায়ের পরিমাণ ছিল ছয় কোটি টাকার মতো।

কয়েকটি ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির ব্যবস্থা রহিয়াছে : (১) মৃত্যুর অন্ততঃ ছয় মাস পূর্বে জনগণের সেবার উদ্দেশ্যে দান; (২) ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত জীবনবীমা; (৩) মৃতব্যক্তির উপর নির্ভরশীলা আত্মীয়ার বিবাহের জন্য ৫০০০ টাকা; (৪) মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বের দান ইত্যাদি।

বহুদিন হইতেই ভারতে মৃত্যুকর বসাইবার জন্য আন্দোলন চলিয়া আসিতেছিল। মৃত্যুকর স্থাপনের স্বপক্ষে এই সকল যুক্তিগুলি দেখানো হয়। প্রথমতঃ, ইহা আয় বৈষম্য হ্রাস করে। যে ব্যক্তি প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া মারা যায় মৃত্যুকর স্থাপন করিলে তাহার সম্পত্তির একটি অংশ সরকারের হাতে চলিয়া আসে, ফলে আর্থিক বৈষম্য হ্রাস পায়। দ্বিতীয়তঃ, অনুন্নত দেশে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। এই কর সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ করিয়া দেয়। তৃতীয়তঃ, আয়কর সহজে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু মৃত্যুকর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ কম। ইহা আয়কর অপেক্ষা কম পরিমাণে মানুষের উৎপাদন আকাঙ্ক্ষা (Production incentive) কমায়। চতুর্থতঃ, ইহা পূর্বপুরুষ উপার্জিত সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল না থাকিয়া নিজেদের কর্মকুশল করিতে উৎসাহিত করে ফলে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কর্মবিমুখতা রোধ হয়। পঞ্চমতঃ, কর-প্রদানের ক্ষমতার দিক দিয়া বিচার করিলে এই কর সমর্থন যোগ্য; কারণ যাহাদের কর বহনের ক্ষমতা বেশী তাহাদের উপরই এই করের চাপ বেশী পড়িবে। যাহাদের সম্পত্তির পরিমাণ বেশী নয় তাহারা এই করের আওতা হইতে বাদ পড়িবে। বৃটেনের কলউইন কমিটি স্বীকার করিয়াছেন যে আয়কর এবং মৃত্যুকর একই সঙ্গে স্থাপিত হইলে কর-বহন করিবার ক্ষমতার সঠিক পরিমাপ করিতে পারা যাইবে।

স্বপক্ষে যুক্তি

মৃত্যুকরের বিপক্ষে কতকগুলি যুক্তি দেখানো হয়। এই করের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি এই যে মৃত্যুকর স্থাপিত হইলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমিয়া যাইবে, দেশে মূলধন-গঠন ব্যাহত হইবে; ফলে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন পাওয়া যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, মৃত্যুকর এড়াইবার জন্য বিরাট বিরাট সম্পত্তি ও মালিকানা ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িবার আশংকা থাকে। যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ধ্বংসকে ইহা ত্বরান্বিত করিবে। কিন্তু সরকারী সঞ্চয় এবং মৃত্যুকর জনিত ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধির দরুণ মোট বিনিয়োগ হ্রাস না পাইয়া বাড়িয়া যাইতেও পারে। পশ্চিমী দেশগুলির অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে সঞ্চয়ের উপর মৃত্যুকরের প্রতিক্রিয়া যতখানি ক্ষতিকারক বলিয়া বর্ণনা করা হয়, আসলে উহা অনেক কম।

বিপক্ষে যুক্তি

১৯৫৩ সালে মৃত্যুকর স্থাপন করার সময় ইহার দুইটি প্রধান উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করা হয়। প্রথমতঃ, সমাজের অ-সম ধনবণ্টন নিয়ন্ত্রণ করা এবং দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যগুলির উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকরী করিয়া তোলার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা।

[তিন] **মূলধন-লাভ কর (Capital-Gains Tax) :** মূলধন লাভ কর ভারতে নূতন নয়। ১৯৪৭ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁ প্রথম এই কর স্থাপন করেন। কিন্তু এই কর হইতে আশানুরূপ রাজস্ব সংগৃহীত না হওয়ায় দুই বৎসর পর উহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে ডাঃ ক্যালডর তাঁহার রিপোর্টে এই কর স্থাপনের সুপারিশ করেন এবং ১৯৫৬ সালে অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী মূলধন লাভ কর পুনঃস্থাপন করেন।

যখন কোনো ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজের ব্যবসায়ের মূলধন বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়—অর্থাৎ যে দামে ক্রয় করা হইয়াছিল তদপেক্ষা অধিক দামে বিক্রয় করা হইলে মূলধন আয় (Capital-gains) হইবে এবং এই ধরণের আয়ের উপর ধার্য করকে মূলধন লাভ কর বলে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সহজে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাক একটি সম্পত্তি (যেমন জমি) ৫০,০০০ টাকায় ক্রয় করা হইয়াছিল এবং উহার বর্তমান মূল্য ১০০,০০০ টাকা। এই দুই অংকের পার্থক্যই মূলধন লাভ। মূলধন লাভ সৃষ্টি (accrued) হইলেই কর ধার্য করা হইবে না। বিক্রয় দ্বারা মূলধন-লাভ হাতে আসিলে (realised) তবেই কর ধার্য করা হইবে। মূলধন-লাভের উপর সর্বোচ্চ হার (ceiling rate) টাকায় সাত আনা করিতে ডাঃ ক্যালডর সুপারিশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমানে এই করের সর্বোচ্চ হার চার আনায় রাখা হইয়াছে। মূলধন লাভ মোট পাঁচ হাজারের বেশী হইলে প্রথম পাঁচ হাজার বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকার উপর চার আনা হারে মূলধন লাভ কর স্থাপন করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল বা তৎপরে যে মূলধন লাভ হইয়াছে তাহার উপর এই কর ধার্য করা হইবে। মূলধন-লাভ নির্ধারণ করিবার জন্য করদাতাকে দুইটি বিকল্প হিসাবের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে—সম্পত্তির মূল দাম (original cost) অথবা ১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের মূল্যের হিসাব।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই কর থাকিলেও ভারত ব্যতীত আর কোনো কমনওয়েলথভুক্ত দেশে এই কর নাই; ইহার কারণ "আয়" (income) সম্বন্ধে রক্ষণশীল দেশের (যথা বৃটেন) যে ধারণা, মূলধন-লাভ তাহার মধ্যে পড়ে না। রক্ষণশীল ধারণা যে আয় হইল কর দিবার ক্ষমতার মানদণ্ড এবং নিয়মিত ভাবে যাহা অর্জন করা হয় তাহাই আয়। কিন্তু মূলধন-লাভ সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং অর্থনীতিবিদ গ্রোভ্‌স (Harold Groves) বলেন যে, উৎস হইতে আয়-প্রবাহরূপে ইহার উদ্ভব নয়—স্বয়ং উৎসকে বিক্রয় করায় ইহার উদ্ভব হয় (It arises not as a flow of income from the fountain but from the sale of the fountain itself.) কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই স্বীকার করেন যে মূলধন বিক্রয় হইতে যে অনিয়মিত আয় হয় তাহাও ব্যক্তির ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করে ও কর-প্রদানের ক্ষমতাকে বাড়ায়।

এই করের স্বপক্ষে এই সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয়।

প্রথমতঃ, মূলধনীলাভ অন্যান্য আয়ের মতো ব্যক্তির ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অন্যান্য আয়ের মতো মূলধনীলাভও করের আওতায় আসিবে ইহাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, কর-অনুসন্ধান কমিশনের মতে মূলধনীলাভের উপর কর ধার্য করিলে কর প্রবঞ্চনা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ক্যালডর ইহার সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে মূলধনী লাভকে কর-বহির্ভূত রাখিলে ব্যক্তি তাহার আয়কে মূলধনী লাভ হিসাবে দেখাইয়া কর-প্রবঞ্চনা করিবে। তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রভূত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। মূলধনী লাভের উপর কর ধার্য করিয়া সরকার তাহার আয় বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে পারিবে। পরিশেষে, ডাঃ ক্যালডর যথার্থই বলিয়াছেন যে এই করকে স্বল্পকালীন আয়ের দৃষ্টিভংগী হইতে না দেখিয়া দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভংগী হইতে বিচার করিতে হইবে।

স্বপক্ষে যুক্তি

এই করের বিপক্ষেও নানাবিধ যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়। প্রথমতঃ, কর অনুসন্ধান কমিশনের মতে ইহা ব্যক্তির সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিবে। বে-সরকারী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হইলে দেশের দ্রুত শিল্পায়ন ব্যাহত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা ঋণপত্রের অবাধ গতিশীলতায় বাধার সৃষ্টি করিবে। ফলে মূলধন বাজারের সম্প্রসারণ ক্ষুণ্ণ হইবে। তৃতীয়তঃ, মূলধনী-লাভ কর কর-ফাঁকিকে উৎসাহিত করিবে। মূলধনী লাভের উপর আয়কর অপেক্ষা কম হারে কর ধার্য করিতে হইবে এবং তাহার ফলে ব্যক্তি আয়কে ওই প্রকার করের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখাইতে চাহিবে। চতুর্থতঃ, এই কর হইতে আয় সামান্য, অপরপক্ষে ইহা নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করিবে।

বিপক্ষে যুক্তি

কর-অনুসন্ধান কমিশন ভারতে মূলধন-লাভ কর পুনঃস্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কমিশন বলেন যে এই কর হইতে সম্ভাব্য আয় অতি সামান্য (এক কোটি টাকা) এবং অপরপক্ষে ব্যক্তির সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর ইহা বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে বে-সরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করিবার

অনুকূল আবহাওয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য মূলধন-লাভ কর পুনঃস্থাপন অপেক্ষা আয়-করের হার বৃদ্ধি করার সুপারিশ এই কমিশন করেন। দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য ঋণপত্রের অবাধ গতিশীলতার প্রয়োজন কিন্তু এই কর তাহাতে বাধা প্রধান করে। ইহা ছাড়া এই কর স্থাপন করিলে লোকে কর ফাঁকি দিবার অধিকতর সুযোগ পাইবে।* কিন্তু ডাঃ ক্যালডর ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতানুসারে ১৯৪৮ সালে মূলধন-লাভ কর তুলিয়া দিবার যে যুক্তি তাহা অতি দুর্বল। ডাঃ ক্যালডর ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে এই কর পুনঃস্থাপন করিতে সুপারিশ করেন। তিনি বলেন মূলধন-লাভকে আয়করের গণ্ডীর বাহিরে রাখা ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সমর্থন করা যায় না, কারণ ইহাতে এক বিশেষ শ্রেণীর কর-দাতাদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহার করা হয় ("the exclusion of capital gains from the scope of income taxation is quite indefensible on grounds of equity since it involves the privileged treatment of a particular class of taxpayers as against others").

এই কর স্থাপনের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছিল যে এই কর হইতে সম্ভাব্য আয় অতি সামান্য—মাত্র এক কোটি টাকা। কিন্তু বাস্তবে ১৯৪৭-৪৮ এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে এই কর হইতে ৬ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল। ডাঃ ক্যালডর স্বীকার করেন না যে বিনিয়োগের উপর এই কর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। স্বল্পকালে কি আয় হইবে এই ভিত্তিতে চিন্তা না করিয়া দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই করকে বিবেচনা করিতে হইবে। 1

১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত মূলধন লাভ করের সহিত ১৯৪৭ সালের করের কতকগুলি পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ, পূর্বতন করের অব্যাহতির পরিমাণ ছিল ১৫,০০০ টাকা বর্তমান করের অব্যাহতির পরিমাণ ৫০০০ টাকা। নূতন করে ইহাও বলা হইয়াছে যে অন্যান্য করযোগ্য আয় ও মূলধনী লাভ মিলিয়া মোট ১০,০০০ টাকার কম হইলে কর ধার্য করা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বতন মূলধন লাভ কর স্ল্যাব পদ্ধতিতে ধার্য করা হইত, ব্যক্তির অন্যান্য আয়ের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু বর্তমানে মূলধন-লাভ কর আয়করের অংশবিশেষ এবং উহার সহিত আরোপ ও

---

* "If a capital gains tax were to be introduced now—and is bound to be levied at rates lower than the ordinary income and super tax on account of its casual and irregular character—there is a danger of tax avoidance being stimulated by attempts to pass off as capital gains, what may otherwise have been treated as part of taxable income." Taxation Enquiry Commission.

1 "It would be a great mistake to treat the question of the taxation of capital gains mainly on short-term revenue consideration and to put the tax off and on recording as the immediate revenue expected was small and large. The full yield potential the tax should only become apparent after it had been in operations for 10-20 years."

আদায় হয়। কোনো ব্যক্তি কোনো বৎসরে যে পরিমাণ মূলধনী-লাভ করিবে তাহার ½ অংশ তাহার কর ধার্যোপযোগী আয়ের সহিত যুক্ত হইয়া সমগ্র আয়ের উপর আয় কর হারে কর ধার্য হইবে। তৃতীয়তঃ, পুরাতন মূলধন-লাভ কর অনুযায়ী সাত বৎসর বা তাহার বেশী ভোগ করা হইয়াছে এরূপ বসত বাড়া বিক্রয় হইতে যে মূলধন লাভ হয় তাহার উপর কর ধার্য করা হয় নাই। কিন্তু নূতন আইনে ইহাকে করের আওতায় আনা হইয়াছে।

[চার] দানকর (Gift Tax): ভারতীর কর ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কিত রিপোর্টে ডাঃ ক্যালডর কতকগুলি নূতন কর স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুপারিশগুলির মধ্যে দানকর অন্যতম। মৃত্যুকর, সম্পদকর প্রভৃতি ফাঁকি দিবার পথ হইল দান। এই কর-ফাঁকি বন্ধ করিবার জন্য দানকর স্থাপন করা প্রয়োজন। মৃত্যুকরের মতো দান করেরও উদ্দেশ্য ব্যক্তির অপরকে সম্পত্তি দিবার যে স্বাধীনতা তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করা।

কোনো ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় কোনো দান করিলে অথবা তাহার মৃত্যুর পর কোনো ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি বা অর্থ দান হিসাবে পাইলে এইরূপ দানের উপর কর স্থাপন করিতে হইবে। ডাঃ ক্যালডর মৃত্যুকর উঠাইয়া দিয়া সাধারণ দানকর স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছিলেন কিন্তু ভারত সরকার মৃত্যুকর না তুলিয়া অন্যান্য দানের উপর আলাদাভাবে দানকর স্থাপন করেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দানকর এবং মৃত্যুকর উভয়ই রহিয়াছে।

১৯৫৮-৫৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের কর প্রস্তাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল দানকর প্রবর্তন। আশা করা হইয়াছিল দানকর হইতে বৎসরে তিন কোটি টাকা আয় হইবে কিন্তু সংগ্রহের পরিমাণ এক কোটিও হয় নাই।

দানকর আইনানুসারে পূর্ববর্তী বৎসরের সকল দানের উপর দানকর ধার্য করা হইবে। ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিলের পূর্বে যাহা দান করা হইয়াছে তাহা এই আইনের আওতায় পড়িবে না। কর অব্যাহতির পরিমাণ হইল দশ হাজার টাকা। দানের পরিমাণ দশ হাজার টাকার বেশী হইলেই কর প্রদান করিতে হইবে। স্ল্যাব পদ্ধতিতে গতিশীল হারে এই কর ধার্য করা হইয়াছে। প্রথম ৫০,০০০ টাকায় ৪% হারে কর দিতে হইবে এবং এই করের সর্বোচ্চ হার ৪০%; কতকগুলি নির্দিষ্ট দানের ক্ষেত্রে এই কর প্রযোজ্য নয়; যেমন ভূদান এবং সম্পত্তিদান আন্দোলনে যাহা দান করা হইবে তাহা এই করের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। নির্ভরশীলা মহিলাদের বিবাহের জন্য ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত দানকর হইতে মুক্ত থাকিবে। শ্রমিক কর্মচারীদের বোনাস, ব্যবসাপরিচালনার জন্য দান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে দান এই করের আওতায় পড়িবে না।

দানকর স্থাপনের প্রধান যুক্তি এই যে মৃত্যুকর এড়াইবার এই বিরাট ফাঁক খোলা রাখা কোন মতেই সমীচীন নয়। মৃত্যুর পূর্বে বিনা বাধায় অপরকে সম্পত্তি দিয়া যাইবার অধিকার থাকিলে সকলেই মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি দান করিয়া মৃত্যুকর

এড়াইবার চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়তঃ, দানকর সামাজিক ধনবৈষম্য দূর করিয়া সমতা আনয়ন করিবে। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সমাজ গঠনের সহিত এই কর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই করের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে ইহা ভারতীয় ঐতিহ্য বিরুদ্ধ কাজ। কারণ ভারতবর্ষের লোকের মধ্যে দান ও ত্যাগের প্রতি একটা সহজাত এবং স্বাভাবিক মোহ আছে এবং এই কর আমাদের প্রাচীন ভাবধারাকে আঘাত করিবে। ১৯৬৫-৬৬ সালে এই কর হইতে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ তিনি কোটি টাকার মতো।

[পাঁচ] **সম্পদকর (Wealth Tax) :** ডাঃ ক্যালডরের সুপারিশক্রমে ১৯৫৭ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী সম্পদকর স্থাপন করেন। তাঁহার মতে এই কর ধার্যের ফলে ভারতীয় করব্যবস্থায় সমতা (equity) আসিবে এবং উহার দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। ডাঃ ক্যালডরের মতানুযায়ী আয়করে সমতা এবং দক্ষতা উভয়েরই অভাব রহিয়াছে। এই কর ন্যায্য নয় কারণ 'আয়ের' সংজ্ঞা সংকীর্ণ এবং ইহা দক্ষতাহীন কারণ করপ্রবঞ্চনা করা আদৌ কঠিন নয়।

ব্যক্তি, হিন্দু যৌথ পরিবারের এবং ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সকলের উপরই সম্পদকর ধার্য করা হইয়াছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা, হিন্দু যৌথ-পরিবারের ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ টাকা এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা কর-অব্যাহতির সীমা। ইহার পর গতিশীল হারে কর বাড়িবে। প্রথম দশ লক্ষের উপর ½% হারে, পরবর্তী আরো দশ লক্ষের উপর ১% হারে এবং বাকী সম্পত্তির উপর ১½% হারে সম্পদকর দিতে হইবে। কোম্পানীর ক্ষেত্রে যাবতীয় সম্পত্তির উপর ½% হারে কর দিতে হইবে। ১৯৬০ সাল হইতে কোম্পানীর উপর সম্পদকরের বিলোপ সাধন করা হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে কর অব্যাহতির সীমা হ্রাস করিয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক লক্ষ-টাকা এবং হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে দুই লক্ষ টাকা করা হয়।

নীট সম্পত্তির সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে যে ব্যক্তির, পরিবারের বা কোম্পানীর সকল সম্পদ হইতে ঋণের পরিমাণ বাদ দিয়া নীট সম্পত্তি পাওয়া যাইবে। চলতি বাজার দামের হিসাবে সম্পত্তির মূল্য হিসাব করিতে হইবে। কয়েকটি সম্পত্তিকে কর হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। যেমন আসবাবপত্র, পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যের অলংকার, নিজস্ব জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, পুস্তক ইত্যাদি। ব্যক্তির নীট সম্পত্তি হিসাব করিবার সময় তাহার স্ত্রী ও নাবালক পুত্রকন্যার সম্পদেরও হিসাব লইতে হইবে। ডাঃ ক্যালডর ন্যায় (equity), অর্থনৈতিক ফলাফল (economic effects) এবং প্রশাসনিক দক্ষতার (administrative efficiency) ভিত্তিতে এই করকে সমর্থন করেন।

এই কর স্থাপনের প্রধান যুক্তি যে ইহা সমতার (equity) প্রসার করে কিন্তু উদ্যোগ ব্যাহত করে না। সঞ্চিত সম্পত্তির হিসাব হইতে ব্যক্তির কর প্রদানের

ক্ষমতা অনুমান করা যায়। এক লক্ষ টাকা অলংকারের মালিক ও একজন নিঃস্ব-বিত্ত ব্যক্তি কখনোই আর্থিক দিক হইতে তুলনীয় নয়, যদিও আয়ের দিক হইতে বিচারে উভয়েরই কর প্রদানের ক্ষমতা শূন্য। সম্পদকর করপ্রদানের ক্ষমতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। গরীব লোকদের এই ধরণের কর দিতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, আয় করের হার বেশী হইলে উহা ব্যক্তির কর্মোদ্যোগ ব্যাহত করে, সম্পত্তির উপর কর ধার্য করিলে সেইরূপ কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না। তৃতীয়তঃ, আয়করের সহিত সম্পদকর ধার্য করিলে কর প্রবঞ্চনা করা কঠিন হইয়া পড়ে। শুধু মাত্র আয়কর থাকিলে লোকে অলংকার ইত্যাদির মধ্যে আয় আবদ্ধ রাখিয়া আয়কর ফাঁকি দেয়। আয় গোপন করা সহজ কিন্তু সম্পদ গোপন করা অসুবিধাজনক। অর্থনৈতিক ফলাফলের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় সম্পদকরের এমন একটা সুবিধা রহিয়াছে যাহা আয়করের নাই। আয়কর বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি গ্রহণের মনোভাবকে নিরুৎসাহ করে কিন্তু সম্পদকর তাহা করে না। ঝুঁকিপূর্ণ এবং ঝুঁকিবিহীন আয়ের উপর একই হারে আয়কর ধার্য করা হয় বলিয়া উহা ঝুঁকি গ্রহণের উৎসাহ নষ্ট করে, ফলে বিনিয়োগ ব্যাহত হয়। কিন্তু সম্পদকর সম্পত্তির মূল্যের উপর ধার্য করা হয় বলিয়া ইহা ঝুঁকি গ্রহণের উৎসাহ হ্রাস করে না। পরিশেষে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল সম্পত্তির মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তাহা ক্যালডর স্বীকার করেন না। তাহার মতে সকল প্রকার সম্পত্তিই উৎপাদনশীল। কোন সম্পত্তি হইতে আর্থিক আয় না হইলেও, "মানসিক আয়" অবশ্যই হয়। সুতরাং তথাকথিত অনুৎপাদনশীল সম্পত্তির উপর কর ধার্য নীতির দিক হইতে বাঞ্ছনীয়।

স্বপক্ষে যুক্তি

এই কর স্থাপনার বিরুদ্ধেও কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করা হয়। প্রথমতঃ, সম্পদকর নির্ধারণে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল সম্পদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করা হয় না বলিয়া ইহা ন্যায়সঙ্গত নয়। অনুৎপাদনশীল সম্পদের মালিক সম্পদ হইতে কোনরূপ আয় লাভ করে না বলিয়া কর দেওয়া তাহার পক্ষে অসুবিধাজনক। দ্বিতীয়তঃ, সম্পদকর দেশের মূলধন এবং সঞ্চয় গঠনের পথে বাধার সৃষ্টি করে বলিয়া ইহা দ্বারা শিল্পায়নের গতি ব্যাহত হয়। তৃতীয়তঃ, এই কর পরিচালনা করা বিশেষ অসুবিধাজনক। বিশেষ করিয়া সম্পদের প্রকৃত মালিককে খুঁজিয়া বাহির করা এবং সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা খুবই অসুবিধাজনক। চতুর্থতঃ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর এই কর ধার্য করিলে দুইবার কর (double taxation) প্রদানের আশংকা থাকে। কারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সম্পদের উপর একবার কর দিবে আবার অংশীদারগণ তাহাদের শেয়ারের উপর কর দিবে।

বিরুদ্ধে যুক্তি

১৯৫৭-৫৮ সালে সম্পদকর হইতে ৭ কোটি টাকা আয় হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে আয় হয় ১৬ কোটি টাকা। ১৯৬৫-৬৬ সালে এই কর হইতে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ

ছিল ১৩ কোটি টাকার কিছু বেশী। পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে টাকার প্রয়োজন; এই কর হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবে।

[ছয়] **ব্যয় কর (Expenditure Tax) :** অধ্যাপক ক্যালডর ব্যক্তিগত আয়ের (Personal Expenditure) উপর কর স্থাপনের সুপারিশ করেন। ১৯৫৫ সালে অধ্যাপক নিকোলাস ক্যালডর সমতা এবং অর্থনৈতিক সুবিধার (economic expediency) দিকে দিয়া ব্যয়করকে সমর্থন করিয়া তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'An Expenditure Tax' রচনা করেন। তিনি এই করকে গ্রেটবৃটেনে স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেন কিন্তু বৃটিশ সরকার উহা গ্রহণ করেন নাই। পরে তিনি এই করকে ভারতীয় কর সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেন। পূর্বতন অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে ব্যক্তি এবং অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের উপর এই কর স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তদনুসারে ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ সালে পার্লামেণ্ট ব্যয়কর আইন পাশ করে এবং ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই আইন কার্যকরী করা হয়। ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশে এই কর নাই, ঐতিহাসিক সমর্থনের অভাবে অতি সামান্যভাবে এই করের সূচনা করা হয়। ইহা একটি বৎসরিক কর এবং করমুক্তির বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে। ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেটে অর্থমন্ত্রী শচীন চৌধুরী এই করকে উঠাইয়া দিয়াছেন।

১৯৫৭ সালের আইনানুসারে যে সকল ব্যক্তি এবং অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের বাৎসরিক নীট আয় (সকল প্রকার কর প্রদানের পর) পূর্ববর্তী বৎসরে ৩৬ হাজার টাকার বেশী সেই সকল ব্যক্তি এবং হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের উপর ব্যয়কর ধার্য করা হয়। যেহেতু এই কর ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ব্যয়ের উপর ধার্যকরা হয়, সেই কারণে কতকগুলি ব্যয়কে এই কর হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, জীবন-বীমার প্রিমিয়াম, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে দেয় অর্থ প্রভৃতি ব্যয়কে এই কর হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ছাড়া শ্রাদ্ধ, বিবাহ, পিতা-মাতার ভরণপোষণ, চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য ব্যয়কে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত করমুক্ত করা হইয়াছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে করমুক্তির পরিমাণ ৩০ হাজার টাকা অর্থাৎ বৎসরে ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় করিলে ব্যক্তিকে কোনো ব্যয়কর দিতে হইত না। অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে করমুক্তির পরিমাণ ছিল ৬০ হাজার টাকা। এই কর স্ল্যাব পদ্ধতিতে (Slab system) প্রগতিশীল হারে ধার্য করা হইয়াছিল। করের হার এইরূপ ছিল :

প্রথম	১০,০০০ টাকার উপর	১০% হারে
	১০,০০০ টাকা হইতে ২০,০০০ টাকার উপর	২০% ,,
	২০,০০০ টাকা হইতে ৩০,০০০ টাকার উপর	৪০% ,,
	৩০,০০০ টাকা হইতে ৪০,০০০ টাকার উপর	৬০% ,,
	৪০,০০০ টাকা হইতে ৫০,০০০ টাকার উপর	৮০% ,,
	৫০,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব ব্যয়ের উপর	১০০% ,,

ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপর কর স্থাপনের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয়।

বিরুদ্ধে যুক্তি

প্রথমতঃ, বলা হয় যে, দেশে আয়কর রহিয়াছে, ইহার উপর আবার ব্যয়কর স্থাপন করিলে করভার অসহনীয় হইয়া উঠিবে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যয়কর পরিচালনা বেশ কঠিন। ইহা এক জটিল কর। ইহা আদায় করিতে নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।

তৃতীয়তঃ, মিসেস্ হিক্স বলিয়াছেন যে এই কর ন্যায় বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় কারণ বৃহৎ পরিবারের অধিক ব্যয় হইবে এবং তাহার উপর করের বোঝা বেশী হইবে। অবশ্য ইহার উত্তরে ডাঃ ক্যালডর বলেন যে পারিবারিক আয়তনের তারতম্য হিসাব করিয়া কর স্থাপন করা সম্ভবপর।

চতুর্থতঃ, ভারতের কৃষি-আয়কে এই কর হইতে মুক্তি দিতে হইবে (কারণ কৃষি আয়কর রাজ্যসরকার স্থাপন করিয়া থাকেন, ভারত সরকার কৃষকদের ব্যয়ের উপর কিরূপে কর ধার্য করিবেন?) ফলে লোকে স্বভাবতই দেখাইতে চেষ্টা করিবে যে তাহারা যে টাকা ব্যয় করিতেছে তাহার উৎস কৃষি-আয়।

পঞ্চমতঃ, যদি আয়করের পরিবর্তে ব্যয়কর ধার্য করা হয় তাহা হইলে সঞ্চয় করের আওতার বাহিরে পড়িবে, ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ধনীলোকের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করিবে। ইহার প্রতিকারকল্পে যদি সম্পত্তি-কর স্থাপন করা হয় তাহা হইলে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি কমিয়া যাইবে এবং ব্যয়করের আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যাইবে।

ষষ্ঠতঃ, ইহাও অনেকে বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবীর কোনো দেশে এই কর নাই। উন্নয়নের মুখে দাঁড়াইয়া এই ধরণের পরীক্ষানিরীক্ষা করা বিপজ্জনক এবং অনুচিত।

এই সকল বিরুদ্ধ যুক্তি অধ্যাপক ক্যালডর খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন

স্বপক্ষে যুক্তি

প্রথমতঃ, ব্যয়কর স্থাপনের প্রধান যুক্তি যে ব্যক্তির আয় তাহার কর প্রদান করিবার ক্ষমতার যথার্থ মানদণ্ড নয়—ব্যক্তির ব্যয়-ক্ষমতাই তাহার কর প্রদান ক্ষমতার মাপকাঠি।

দ্বিতীয়তঃ, ডাঃ লিট্‌ল (Dr. Little) ব্যয়কর সমর্থন করিয়া বলেন, কাজের আকারে লোকে সামাজিক ভাণ্ডারে যাহা দিতেছ তাহা অপেক্ষা ভোগের আকারে সে যাহা সামাজিক ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করিতেছে তাহাকেই কর প্রদানের ভিত্তি করা উচিত।*

তৃতীয়তঃ, ব্যয়কর স্থাপিত হইলে যথেষ্ট ব্যয় কমিয়া যাইবে, সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়িবে

"Let taxation be on the basis of what one takes out of the pool in the shape of consumption and not on the basis of what one puts into it in the shape of work." Dr. Little.

এবং দেশের মূলধন গঠনে উৎসাহিত হইবে। এই কর স্থাপন করিলে ব্যয়-সংকোচন হইবে এবং ফলে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাইবে।

চতুর্থতঃ, ব্যয়কর ধার্য করিলে লোকের অতিরিক্ত ব্যয় হ্রাস পাইবে ফলে মূলধন সঞ্চিত হইবে, অপরপক্ষে আয়কর ধার্য করিলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিবে না।

পঞ্চমতঃ, আয়কর অপেক্ষা ব্যয়কর শ্রেয় তাহার কারণ "আয়" কথাটির প্রকৃত অর্থ এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে কিন্তু 'ব্যয়' কথাটির ব্যাখ্যায় বিশেষ মতভেদ নাই।

ষষ্ঠতঃ, এই যুক্তিও দেখানো হয় যে বর্তমানে বহুলোক আয়কর ফাঁকি দিতেছে কিন্তু ব্যয়কর স্থাপিত হইলে সেইরূপ ফাঁকি দেওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে। রাজস্ব সংগ্রহের দিক হইতে ব্যয়কর উল্লেখযোগ্য নয় কারণ ইহা হইতে আয় কখনো এক কোটি টাকার বেশী হয় নাই। ১৯৬২-৬৩ সালে বাজেটে এই করকে তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে এই করকে পুনরায় প্রবর্তন করা হইয়াছে।

[সাত] বাণিজ্য শুল্ক (Customs) : বাণিজ্য শুল্ক বলিতে আমদানী ও রপ্তানীর উপর ধার্য শুল্ককে বুঝায়। ১৯৫১-৫২ সালে এই উৎস হইতে আয়ের পরিমাণ ছিল ১৩২ কোটি টাকা। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের $\frac{1}{5}$ অংশ এই উৎস হইতে পাওয়া যায়। ১৯২২ সালের পূর্বে বাণিজ্য শুল্ক ধার্য করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি করা। বর্তমানে রাজস্ব এবং সংরক্ষণ (protection) এই উভয় উদ্দেশ্যেই বাণিজ্য শুল্ক ধার্য করা হয়। ইহা ছাড়া মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থের মূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করার জন্যও বাণিজ্য শুল্কের সাহায্য লওয়া হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বৈদেশিক মুদ্রাসংরক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমদানী নীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে। রপ্তানীর ক্ষেত্রে সরকারী নীতি হইল রপ্তানী প্রসার আর সেই কারণে বহুদ্রব্যের ক্ষেত্রে রপ্তানী শুল্কের হার কমানো হইয়াছে।

মোটর গাড়ী, ঘড়ি, তামাক, সিগারেট, কেরোসিন, বিলাতী মদ প্রভৃতির উপর আমদানী শুল্ক ধার্য আছে। চা, পাট, কফি, চামড়া প্রভৃতির উপর রপ্তানী শুল্ক ধার্য আছে। দেশের শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে বাণিজ্য শুল্কের গুরুত্ব ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে এবং কর অনুসন্ধান কমিশনের মতে আমদানী শুল্কের হার বৃদ্ধি করিয়া সরকারের আয় বাড়ানোর সম্ভাবনা খুবই কম। ১৯৬৪-৬৫ সালে বাণিজ্য শুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩৯৩ কোটি টাকা।

বাণিজ্য-শুল্ক সাধারণতঃ ন্যায়নীতির বিরোধী। কারণ ইহার ফলে ধনী অপেক্ষা দরিদ্র জনগণের উপর অধিক চাপ পড়ে।

[আট] কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক (Central Excise Duties) : কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের একটি প্রধান উৎস হইল অন্তঃশুল্ক। ১৯৩৪ সালে কতকগুলি দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়ায় বাণিজ্য শুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের

পরিমাণ হ্রাস পায় এবং সেই কারণে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক আরোপের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অধিক অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সেই কারণে পুরাতন অন্তঃশুল্কের হার বৃদ্ধি করা হয় এবং নূতন নূতন দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর এই শুল্ক ধার্য করা হয়। ইহা একপ্রকার পরোক্ষ কর। স্বাধীনতা লাভের পর অন্তঃশুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়া যায়; ইহার কারণ শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এই শুল্কের বর্ধিত হার। চতুর্থ ফিনান্স কমিশন কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কগুলিকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে: (১) মূল অন্তঃশুল্ক; (২) সেস, (৩) চিনি, তামাক এবং শিল্পজাত বস্ত্রের উপর বিক্রয় করের পরিবর্তে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক, (৪) কেরোসিন, ডিজেল তেল, মোটর স্পিরিট ইত্যাদির উপর অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক, (৫) কতকগুলি দ্রব্যের উপর ধার্য বিশেষ অন্তঃশুল্ক এবং (৬) নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক।

চিনি, তামাক এবং বস্ত্রের উপর বিক্রয়করের পরিবর্তে ধার্য অতিরিক্ত অন্তঃশুল্কের সমস্ত অর্থই রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ইহার সামান্য অংশ অবশ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে দেওয়া হয়। নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্কের কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নাই। কারণ ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত এই খাতে কোনো অর্থ সংগৃহীত হয় নাই।

প্রথম ফিনান্স কমিশন মাত্র তিনটি দ্রব্যকে (তামাক, দিয়াশলাই এবং উদ্ভিজ্জ-দ্রব্য) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অধীনে আনিয়া উহা হইতে সংগৃহীত অর্থ রাজ্যসমূহ এবং কেন্দ্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অধীনে আটটি দ্রব্যকে আনিবার নির্দেশ দেন। তৃতীয় ফিনান্স কমিশন ৩৫টি দ্রব্যকে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অধীনে আনার সুপারিশ করেন। চতুর্থ ফিনান্স কমিশন সুপারিশ করেন যে, বর্তমানে যে সকল কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ধার্য আছে এবং আগামী পাঁচ বৎসরে যে সকল দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হইবে তাহা রাজ্যসমূহ এবং কেন্দ্রের মধ্যে বণ্টিত হইবে। রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের শতকরা ২০ ভাগ পাইবে। রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ৮০ ভাগ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে শতকরা ২০ ভাগ নির্ধারিত হইবে।

দেশ যত শিল্পোন্নত হইতে থাকিবে রাজস্বের উৎস হিসাবে বাণিজ্যশুল্কের গুরুত্ব ততই হ্রাস পাইবে। কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে। রাজস্বের উৎস হিসাবে অন্তঃশুল্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও মনে রাখা প্রয়োজন যে ইহা অধোগতিশীল অর্থাৎ দরিদ্র জনগণের উপর ইহার অধিক চাপ পড়ে।

ভারতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সুরু হইতেই সরকার অন্তঃশুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রসারে লাগাইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় খাদি এবং হস্তচালিত

তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মিলে তৈয়ারী কাপড়ের উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয়, কিন্তু খাদি ও তাঁতবস্ত্রকে শুল্ক হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন আর সেই কারণে অন্তঃশুল্কের উপর বিশেষভাবে নির্ভর না করিয়াও উপায় নাই। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণ ভোগ্যবস্তুর উপর এই শুল্ক আরোপ করিলে ইহার চাপ দরিদ্র লোকের উপরই অধিক পড়ে। অর্থাৎ এই শুল্ক গতিশীলতার নীতির পরিপন্থী (regressive)।

কর-অনুসন্ধান কমিটি চা, চিনি, কেরোসিন, কাপড, দিয়াশলাই-এর উপর অন্তঃশুল্ক হার বৃদ্ধির এবং উলবস্ত্র, বৈদ্যুতিক ল্যাম্প, কাগজ, সেলাইকল, বিস্কুট, কাঁচ, ভেষজ তৈল প্রভৃতির উপর নূতন শুল্ক ধার্য করার সুপারিশ করিয়াছেন। শুল্ক হার বৃদ্ধি এবং নূতন শুল্ক ধার্য করার ফলে অন্তঃশুল্ক হইতে রাজস্বের পরিমাণ ৪০% হইতে ৪৫% বাড়িবে। ১৯৫৫-৫৬ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেট কর অনুসন্ধানকারী কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশই কার্যকরী করা হয়। ১৯৫৭ সালে বস্ত্র, চিনি ও তামাকের উপর বিক্রয়করের পরিবর্তে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৭৬৯.৯০ কোটি—উহা মোট কর রাজস্বের শতকরা ৫৩.৪ ভাগ।

বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনা (Compulsory Deposit or Savings Scheme): ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্যতামূলক আমানত বা সঞ্চয় পরিকল্পনার প্রবর্তন করেন। ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেট ইহার বিলোপ সাধন করিয়া ১৫০০০ টাকার অধিক আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের উপর বার্ষিক আমানত পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য শুধুমাত্র কর ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিলেই চলিবে না—জনসাধারণের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের উপরও নির্ভর করিতে হইবে। করের মত বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ও চাহিদা হ্রাস করে কিন্তু করের তুলনায় ইহার দুইটি সুবিধা রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ইহার দ্বারা জনগণের আয় সৃষ্টিকারী সম্পদের সৃষ্টি হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ, ইহা দেশে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়িয়া তুলিবে।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা আমাদের দেশে নূতন হইলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের কয়েকটি দেশে ইহা প্রবর্তন করা হইয়াছিল। লর্ড কেনস্ ইংলণ্ডের জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনার সমর্থন করেন।

যাহারা ভূমিরাজস্ব দেয়, যাহারা শহরাঞ্চলে স্থাবর সম্পত্তির মালিক, ক্ষুদ্র দোকানদার যাঁহারা আয়কর দেন না (বাৎসরিক বিক্রয়ের পরিমাণ ১৫০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব) চাকুরীজীবী যাহারা আয়কর দেন না (বাৎসরিক আয় ১৫০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব) এবং যাহারা আয়কর দেন—সকলেই এই বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনার আওতায় পড়ে।

ভূমিরাজস্ব প্রদানকারী ব্যক্তিদিগকে ভূমি-রাজস্বের শতকরা ৪০% জমা রাখিতে হইবে। শহরাঞ্চলের স্থাবর সম্পত্তির মালিক সম্পত্তির ভাড়া বাবদ যে টাকা পাইবে তাহার ৩%, যে সকল ব্যবসায়ী আয়কর দেন না সেই সকল ক্ষেত্রে বাৎসরিক বিক্রয়ের পরিমাণ ১৫ হাজার টাকা বা অধিক হইলে ব্যবসায়ীদিগকে পূর্ববর্তী বৎসরের মোট বিক্রয়ের ১/২% আমানত রাখিতে হইবে। আয়কর প্রদানকারীর ক্ষেত্রে ৬০০০ টাকা অবশিষ্ট আয়বিশিষ্ট ব্যক্তি (resudial income) শতকরা ৩% এবং অবশিষ্ট আয় ৬০০০ টাকার বেশী হইলে প্রথম ৬০০০ টাকার উপর আমানতের হার হইবে শতকরা ৩% এবং অবশিষ্ট অংশের উপর আমানতের হার হইবে শতকরা ২%।

বাধ্যতামূলক আমানতের উপর শতকরা চার টাকা হারে সুদ দেওয়া হইবে। সুদ হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর আয়কর ধার্য করা হইবে না। বাধ্যতামূলক আমানতের জন্য যে অর্থ জমা দেওয়া হইবে পাঁচবৎসর পর সুদসহ তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে। অর্থমন্ত্রীর মতে ১৯৬৩-৬৪ সালে এই পরিকল্পনা বাবদ সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ হইবে ৫০।৬০ কোটি টাকা।

জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়নী পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য অর্থের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং সেই কারণে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই বলিয়াছিলেন যে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ভোগব্যয় কমাইয়া মুদ্রাস্ফীতি রোধে সহায়তা করিবে এবং জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়িয়া তুলিবে।

কিন্তু এই পরিকল্পনার ফলে দেশের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে কিনা তাহা বলা কঠিন। যাহাদের বাৎসরিক আয় ১৫০০ হইতে ৩০০০ টাকা তাহাদের পক্ষে কোনোরূপ সঞ্চয় করা সম্ভবপর হইত না। মুদ্রাস্ফীতির চাপে তাহাদের দৈনন্দিন নিম্নতম জীবনযাত্রার মান বজায় রাখাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পরিকল্পনার ফলে এই সকল ব্যক্তি সঞ্চয় করিতে বাধ্য হইলে তাহারা হয় ঋণ করিবে নতুবা জীবনযাত্রার মানের আরো পতন ঘটিবে। যাহাদের সঞ্চয়ের কোনো ক্ষমতাই নাই তাহাদের উপর এই পরিকল্পনা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে। সুতরাং নিম্ন আয় সম্পন্ন ব্যক্তির সঞ্চয় বৃদ্ধি করিতে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে না; তাহাদের কর্মদক্ষতা হ্রাস পাইবে। অপরপক্ষে ধনী ব্যক্তিগণ যাহারা স্বেচ্ছামূলকভাবে সঞ্চয় করিত এবং যাহা সরকারী ঋণপত্র এবং বেসরকারী শেয়ারে লগ্নী করা হইত তাহা হস্তান্তরিত হইয়া সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি করিবে। ফলে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিয়া যাইবে।

বাৎসরিক আমানত পরিকল্পনা (Annuity Deposit Scheme): ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনা তুলিয়া দিয়া পরিবর্তে বার্ষিক আমানত পরিকল্পনা প্রবর্তন করেন। যাহাদের বৎসরে ১৫,০০০-এর অধিক আয় শুধুমাত্র তাহারাই এই পরিকল্পনার আওতায় পড়িবে। বাৎসরিক আয় ১৫০০১-টাকা হইতে ২০,০০০ টাকা হইলে শতকরা

৫ টাকা হারে, বাৎসরিক আয় ২০,০০১ হইতে ৪০,০০০ হইলে ৭½% হারে, বাৎসরিক আয় ৪০,০০১ হইতে ৭০,০০০ হইলে ১০% হারে এবং বাৎসরিক আয় ৭০,০০১ টাকা বা অধিক হইলে ১২½% হারে আমানত রাখিতে হইবে। এক বৎসর জমা থাকিবার পর শতকরা ৪ টাকা সুদসহ দশটি কিস্তিতে জমা পরিশোধ করা হইবে।

বর্তমান পরিকল্পনাটি পূর্ববর্তী বৎসরে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা অপেক্ষা উত্তম। কারণ ইহাতে নিম্ন আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের আওতার বাহিরে রাখা হইয়াছে।

বিক্রয়কর (Sales Tax): পণ্যের উপর কর (Commodity Tax) দ্রব্যটির উৎপাদন হইতে আরম্ভ করিয়া ভোগ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের উপর আরোপ করা হয়। উৎপাদন-স্তরে যে কর ধার্য করা হয় তাহাকে উৎপাদন শুল্ক (Excise duty) বলে। আমদানী অথবা রপ্তানীর সময় যে কর ধার্য করা হয় তাহাকে আমদানী শুল্ক (Customs duty) বলে। দ্রব্যটির বিক্রয়ের সময় যে কর ধার্য করা হয় তাহাকে বিক্রয়কর বলে। মিউনিসিপ্যাল এলাকায় আনীত দ্রব্যের উপর পৌরপ্রতিষ্ঠান যে কর ধার্য করে তাহাকে চুংগী (Octroi or terminal) বলে।

বিক্রয়কর রাজ্যসরকার ধার্য এবং আদায় করিয়া থাকে। ১৯৩৫ সালের আইনে প্রদেশগুলিকে বিক্রয়কর অথবা ক্রয়কর ধার্য করিবার (Purchase tax) অনুমতি দেওয়া হয়। ভারতের অধিকাংশ রাজ্যই বিক্রয়কর ধার্য করিয়াছে। দ্রব্যটি বিক্রয় হওয়ার অর্থ যে কেহ উহা ক্রয় করিতেছে। কর ধার্য এবং আদায়ের ভিত্তিতে বিক্রয়কর এবং ক্রয়করের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যখন করটি বিক্রয়ের উপর ধার্য করা হয় এবং বিক্রেতার কাছ হইতে সংগ্রহ করা হয় তখন তাহাকে বিক্রয়কর বলে। অপরপক্ষে করটি যখন ক্রেতার কাছ হইতে সংগ্রহ করা হয় তখন তাহাকে ক্রয়কর বলে। ১৯৩৯ সালে মাদ্রাজ সরকার মাদ্রাজ সাধারণ বিক্রয়কর আইনানুসারে (Madras General Sales Tax Act, 1939) বাদাম, কাজুবাদাম এবং চামড়ার উপর টাকায় ৩ পাই হারে বিক্রয়কর ধার্য করে। যখন উৎপাদকের সংখ্যা কম, দ্রব্যটি সাধারণতঃ বাহিরে রপ্তানী করা হয় অথবা যখন কোনো বিক্রয়কর ধার্য করা যায় না, তখন ক্রয়কর ধার্য করাই সুবিধাজনক।

ইহা রাজ্যসরকারের কর

বিক্রয়করের ভার (incidence) নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের অবস্থার উপর। যখন ইহা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর ধার্য করা হয় আর যদি দ্রব্যটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে এই কর স্থানান্তর (shifting) করা যায়—বিশেষভাবে, যদি করের হার কম হয়। ভারতে বিক্রয়কর যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর যুগে প্রসার লাভ করে এবং সেই সময় দেশে বিক্রেতা বাজার (sellers' market) ছিল, সেই কারণে সাধারণতঃ এই করভার স্থানান্তর করা যাইত। সাধারণ অবস্থায় বিলাস দ্রব্যের উপর যে

বিক্রয় করের ভার ও স্থানান্তরন

বিক্রয়কর ধার্য করা হয় তাহার ভার পশ্চাৎপদ স্থানান্তরিত হইয়া (backward shifting) দ্রব্য উৎপাদকের উপর পড়িতে পারে।

সাধারণ বিক্রয়করের অর্থ ব্যয়ের উপর সমানুপাতিক কর। সেই কারণে ইহা সঞ্চয়ে উৎসাহ দান করে। প্রকৃতিতে ইহা উন্নতিশীল (progressive) নয়। প্রগতি-বিরোধী বা অধোগতিশীল (regressive) এবং ইহার এই প্রকৃতিগত ত্রুটি দূর করা যায় কিছু সংখ্যক প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে কর হইতে অব্যাহতি দিয়া এবং বিলাসদ্রব্যের উপর অধিক হারে কর ধার্য করিয়া। যে সকল দ্রব্য কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের আওতায় পড়ে তাহাদের উপর বিক্রয়কর ধার্য করার অর্থ দুইবার কর ধার্য করা। কিন্তু যেহেতু সকল বিক্রেতাই দুইবার কর প্রদান করে সেই কারণে কোনোরূপ বৈষম্য (inequity) থাকে না।

ইহা অধোগতিশীল

বিক্রয়কর দুই ধরণের হয়—একবিন্দু কর (Single Point Tax) এবং বহুবিন্দু কর (Multiple Point Tax)। উৎপাদকের নিকট হইতে ভোগকারীর হাতে দ্রব্যটি পৌঁছাইলে বহুস্তরের বিক্রেতার হাত ফেরৎ হইয়া যায়। বিভিন্ন বিক্রয়স্তরের মধ্যে মাত্র একবার কর আদায় করা হইলে তাহাকে একবিন্দু বিক্রয়কর বলে। এই কর সাধারণতঃ শেষ উৎপাদকের প্রথম বিক্রয় অথবা খুচরা বিক্রেতার চরম ভোগকারীর নিকট বিক্রয়ের উপর ধার্য করা হয়। যদি বিক্রয়ের প্রত্যেকটি স্তরেই করধার্য করা হয় তাহা হইলে তাহাকে বহুবিন্দু কর বলে। এই ব্যবস্থায় দ্রব্যটি চরম ভোগকারীর হাতে পৌঁছিবার পূর্বে বহুবার করের অওতায় পড়ে। বহুবিন্দু করের সুবিধা এই যে ইহা ফাঁকি দেওয়া কঠিন। ইহা ছাড়া বহুবিন্দু বিক্রয়কর ব্যবস্থায় হিসাব রাখাও অপেক্ষাকৃত সহজ। বহুবিন্দু কর ফড়িয়ার উচ্ছেদ করে এবং চরম ভোগকারীর নিকট দ্রব্যটি পৌঁছাইতে যে পরিমাণ হাত বদল হয় তাহার সংখ্যা হ্রাস হওয়ার ফলে ইহা ব্যবসায় সংগঠনে পরিবর্তন সাধন করে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরে বহুবিন্দু বিক্রয়কর ধার্য করা হয় এবং পশ্চিবংগ, পাঞ্জাব ও দিল্লীতে একবিন্দু কর ধার্য করা হয়। যুক্তপ্রদেশে বিক্রয়করা ধার্যের ব্যাপারে একবিন্দু ও বহুবিন্দু এই উভয়নীতিই অনুসরণ করা হয়।

দুই ধরণের বিক্রয়কার

১৯৩৯ সালে প্রথম মাদ্রাজ বিক্রয়কর ধার্য করে; ১৯৪১ সালে বাংলা এবং পাঞ্জাব, ১৯৪৪ সালে বিহার, ১৯২৬ সালে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা, ১৯৪৭ সালে আসাম এবং ১৯৪৮ সালে যুক্তপ্রদেশ বিক্রয়কর ধার্য করে।

নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান হইতে বিভিন্ন রাজ্যের বিক্রয়কর মোট আয়ের (Revenue) শতকরা কত অংশ তাহা দেখা যাইতে পারে: দিল্ল ৪০; মাদ্রাজ ৩৫; বোম্বাই ২৮: ত্রিবাংকুর কোচিন ২১; পশ্চিমাংশ ১৮; পূর্ব পাঞ্জাব ১৫; বিহার ১৪, যুক্তপ্রদেশ ১২; উড়িষ্যা ১১'৪ এবং আসাম ৬।

ভারতীয় সংবিধানের সংশোধিত ২৬৯ এবং ২৮৬ ধারা হিসাবে রাজ্যের বাহিরে ক্রয়বিক্রয় ঘটিলে, আন্তঃরাজ্য ক্রয়বিক্রয় ঘটিলে বা পার্লিয়ামেন্ট কর্তৃক কোনো

দ্রব্য অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া ঘোষিত হইলে সেই সব ক্ষেত্রে কোনো রাজ্য বিক্রয় কর ধার্য করিতে পারে না। এই সকল ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বিক্রয় কর ধার্য করিতে পারে। রাজ্যসরকার বর্তমানে চিনি, তামাক এবং বস্ত্রের উপর (সিল্ক সমেত) কোনরূপ বিক্রয় কর ধার্য করিতে পারে না। ইহাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকার বিক্রয় করের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ধার্য করে এবং ইহা বাবদ যে রাজস্ব সংগৃহীত হয় তাহা রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রয় কর স্থাপনে কোনো প্রকার একরূপতা দেখা যায় না। ইহার ফলে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিক্রয়কর সম্বন্ধে কর অনুসন্ধান কমিটির (Taxation Enquiry Commission) প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি এইরূপ (১) সেবামূলক কাজের উপর বিক্রয় কর ধার্য না করাই বাঞ্ছনীয় কারণ সেবামূলক কাজের উপর বিক্রয় কর ধার্য করিলে নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি হইবে; (২) সংবাদপত্রের উপর বিক্রয়কর ধার্য করা লাভজনক হইবে না; (৩) ক্রয় কর পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য এবং (৪) একবিন্দু বিক্রয়কর সাধারণভাবে গ্রহণীয় নয়।

বিক্রয় কর ও কর অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ

১৯৬৪-৬৫ সালের রাজ্যসমূহের বিক্রয় কর লব্ধ সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৮৭ কোটি টাকা।

• রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় (Public Finance):

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের বিশেষ গুরুত্ব স্বীকার করেন নাই। সেই যুগে পুলিশী রাষ্ট্রের আদর্শ গৃহীত হওয়ায় রাষ্ট্রের কার্যাবলী খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহাদের মতে ক্ষুদ্রায়তন বাজেটই হইল শ্রেষ্ঠ বাজেট (The best budget is that which is least in amount) রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়কে সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন করাই ছিল তাহাদের আদর্শ। কিন্তু বর্তমানে পুলিশী রাষ্ট্রের আদর্শ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। সম্প্রসারণশীল সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা আজ অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা হয়। ভারত একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও সরকার জনগণের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কাজ করিতেছে। সরকারী আয়-ব্যয়, বিনিয়োগ এবং ঋণগ্রহণ দেশের উৎপাদন, ধনবণ্টন, কর্মসংস্থান, মুদ্রাস্ফীতি, বাণিজ্যচক্র এবং জাতীয় আয়ের উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থা (System of Federal Finance in India):

শাসনক্ষমতা বণ্টনের বিচারে কোন রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রীয় বা এককেন্দ্রিক ধরণের হইতে পারে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে শাসন ক্ষমতার ন্যায় আয়-ব্যয়ের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারই রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় পরিচালনা করেন।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র এবং রাজ্য এই দুই ধরণের সরকার থাকে বলিয়া উহাদের আয়-ব্যয়কে পৃথক করা প্রয়োজন। প্রশাসনিক সুবিধা, ব্যয়সংকোচ ও দক্ষতা এই তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্বের উৎসগুলিকে বণ্টন করা হয়। রাজস্বের উৎসগুলি এরূপভাবে বণ্টন করা উচিত যাহাতে উভয়প্রকার সরকারই নিজ-নিজ রাজস্বের উপর নির্ভর করিয়া সামগ্রিক প্রয়োজন মিটাইতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানে রাজস্বের উৎসগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে—কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List) রাজ্য তালিকা (State List) এবং যুগ্ম তালিকা (Concurrent List).

রাজ্যসমূহের রাজস্বের উৎসগুলি হইতে যে রাজস্ব সংগৃহীত হয় তাহা তাহাদের প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য অনুদান (Grants-in-Aid) দিয়া থাকেন।

সংবিধানের ২৮০ (১) ধারায় বলা হইয়াছে যে সংবিধান চালু হইবার দুই বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি একটি ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত করিবেন এবং তাহার পর প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর একটি করিয়া ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত হইবে। ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে আয়কর, পাট-রপ্তানী শুল্ক প্রভৃতি পুনর্বণ্টন এবং কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে অনুদানের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

১৯১৯ সালের পূর্বে ভারতের রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রের উপর নির্ভর করিতে হইত। ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কারে রাজস্বের উৎসগুলিকে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে প্রথম স্পষ্টভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনানুসারে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। আয়কর, বাণিজ্যশুল্ক, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক প্রভৃতিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত। আর ভূমি-রাজস্ব, কৃষি আয়কর, বিক্রয়কর প্রভৃতি প্রাদেশিক তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহাও স্থির করা হয় যে স্ট্যাম্প ডিউটি, মৃত্যুকর প্রভৃতি কয়েকটি কর ধার্য এবং সংগ্রহ করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু উহা ভোগ করিবে প্রাদেশিক সরকার। তৃতীয়তঃ, কেন্দ্র এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে আর্থিক ভারসাম্য আনয়ন করিবার জন্য আয়কর, পাটের উপর রপ্তানী শুল্ক এবং আরোও কয়েকটি কর-রাজস্ব কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পরিশেষে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রাদেশিক সরকারগুলিকে সাহায্য করিবার নির্দেশও উহাতে দেওয়া হয়।

ভারতের নূতন সংবিধানে রাজস্ব বণ্টন সংক্রান্ত ব্যাপারে মোটামুটিভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের বিধানকেই অনুসরণ করা হইয়াছে।

ফিনান্স কমিশন (Finance Commission) :

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি প্রতিপাঁচ বৎসর অন্তর একটি করিয়া ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত করিবেন। ইহার উদ্দেশ্য হইল কেন্দ্রীয় কর হইতে সংগৃহীত রাজস্বের অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া এবং কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্যগুলিকে অনুদান সম্পর্কে নির্দেশ দান করা। অবশ্য ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তন বা বর্জন করিতে পারেন।

প্রথম ফিনান্স কমিশন (First Finance Commission)

১৯৫১ সালে শ্রী কে. সি. নিয়োগীর সভাপতিত্বে প্রথম ফিনান্স কমিশন গঠিত হয়। কমিশন ১৯৫২ সালে তাহার রিপোর্ট পেশ করেন এবং সরকার এই কমিশনের প্রত্যেকটি সুপারিশই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই কমিশনের মতো যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয় ব্যবস্থায় রাজস্ব বণ্টনের নীতি শুধুমাত্র রাজ্যগুলির ক্রমবর্ধমান রাজস্বের চহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিলেই চলিবে না, কেন্দ্রের অর্থপ্রদান ক্ষমতার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কমিশন নিম্নলিখিত তিনটি নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার সুপারিশ পেশ করেন। প্রথমতঃ, কেন্দ্র হইতে রাজ্যগুলিকে এরূপভাবে অতিরিক্ত অর্থ বণ্টন করিয়া দিতে হইবে যাহাতে কেন্দ্রের উপর খুব বেশী চাপ না পড়ে। দ্বিতীয়তঃ রাজ্যগুলিকে রাজস্ব বণ্টন এবং অনুদান দেওয়ার বিষয়ে এক সাধারণ নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, রাজস্ব বণ্টন নীতি রাজ্যসমূহের মধ্যে অসমতা দূরিকরণে সহায়তা করিবে।

আয়কর : এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আয়কর লব্ধ রাজস্বের শতকরা ৫৫ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বে রাজ্যগুলি আয়করের শতকরা ৫০ ভাগ পাইত। কমিশন রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধি করেন এই যুক্তিতে যে পূর্বে নয়টি রাজ্য কেন্দ্র হইতে আয়করের অংশ পাইত, কিন্তু বর্তমানে বণ্টনযোগ্য ভাণ্ডার (divisible pool) হইতে ষোলটি রাজ্য অর্থ পাইবে। রাজ্য সরকারগুলির প্রাপ্য অংশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ৮০ ভাগ এবং সংগ্রহের ভিত্তিতে শতকরা ২০ ভাগ নির্ধারণের নির্দেশ দেন কমিশন।

কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক : কমিশন রাজ্যগুলিকে তামাক, দিয়াশলাই এবং উদ্ভিজ্জ ঘি-এর উপর ধার্য কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বাবদ সংগৃহীত অর্থের শতকরা ৪০ ভাগ প্রদান করার নির্দেশ দেন। বিভিন্ন রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়।

পাট রপ্তানী শুল্কের পরিবর্তে অনুদান : ১৯৪৯ সালে দেশমুখ কমিটির সুপারিশ অনুসারে পাট রপ্তানী শুল্কের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য দিবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম কমিশনের সুপারিশ অনুসারে পাট উৎপাদক রাজ্যগুলি বণ্টনযোগ্য ভাণ্ডার হইতে এইরূপ অর্থসাহায্য পাইবে —পশ্চিমবাংলা ১৫০ লক্ষ টাকা, বিহার ৭৫ লক্ষ টাকা, আসাম ৭৫ লক্ষ টাকা এবং উড়িষ্যা ১৫ লক্ষ টাকা।

অনুদান (Grants-in-Aid): রাজ্য সরকারগুলির আদায়ীকৃত রাজস্ব প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে প্রতিবৎসর সাহায্য দান করিয়া থাকেন। রাজ্যের বিশেষ দায়িত্ব, সমস্যা, অনুন্নতি ইত্যাদি বিষয় বিচার করিয়া উহার অনুদানের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। প্রথম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ ৮০ লক্ষ টাকা, উড়িষ্যা ৭৫ লক্ষ টাকা, সৌরাষ্ট্র ৪০ লক্ষ টাকা, পাঞ্জাব ১২৫ লক্ষ টাকা, আসাম ১০০ লক্ষ টাকা, মহীশূর ৪০ লক্ষ টাকা এবং ত্রিবাংকুর কোচিন ৪৫ লক্ষ টাকা পায়। এই সাধারণ অনুদান ছাড়াও কয়েকটি রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

প্রথম ফিনান্স কমিশনের বণ্টননীতি সমালোচনার উর্ধ্বে নয়, আয়কর বণ্টনের ব্যাপার সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনসংখ্যার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিবার ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং বোম্বাই রাজ্যের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। আয়করের এক বৃহৎ অংশ এই দুই রাজ্য হইতে সংগৃহীত হয় কিন্তু জনসংখ্যার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ায় এই দুই রাজ্যের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ কম হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বণ্টনের ব্যাপারেও অন্য সকল নীতি বাদ দিয়া একমাত্র জনসংখ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত হয় নাই।

দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন (Second Finance Commission):

১৯৫৬ সালে শ্রী কে. সান্তনম্-এর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন গঠিত হয় এবং ১৯৫৭ সালে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

এই কমিশনের উপর আয়কর, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, মৃত্যুকর (Estate duty) এবং রেলমাশুলের উপর কর—এই চারটি কর বণ্টনের নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। ইহা ছাড়া কেন্দ্র হইতে রাজ্যগুলিকে অনুদানের নীতি ও পরিমাণ নির্ধারণের দায়িত্বও ইহার ছিল।

আয়কর: আয়কর-লব্ধ রাজস্বের (সারচার্জ বাদ) শতকরা ৬০ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত হারে বণ্টিত হইবে:

অন্ধ্র	8·12%	মাদ্রাজ	8·40%	যুক্তপ্রদেশ	16·36%
আসাম	2·44%	মহীশূর	5·14%	পঃবঙ্গ	10·08%
বিহার	9·94%	উড়িষ্যা	3·73%	জম্মু ও কাশ্মীর	1·13%
বোম্বাই	15·99%	পাঞ্জাব	4·24%	কেরালা	3·64%
রাজস্থান	4·09%	মধ্যপ্রদেশ	6·72%		

রাজ্যসরকারগুলির প্রাপ্য অর্থ শতকরা ৯০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং শতকরা ১০ ভাগ আদায়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে। প্রথম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্যগুলির মধ্যে আয়কর লব্ধ অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং বাকী শতকরা ২০ ভাগ আদায়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইত।

মৃত্যুকর: সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পত্তির উপর (কৃষিভূমি ব্যতীত) মৃত্যুকর ধার্য এবং আদায় করে এবং সমস্ত টাকাটাই রাজ্যসরকারদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। মৃত্যুকর বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাহার শতকরা এক ভাগ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের (Union Territories) জন্য রাখিয়া বাকী অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। মৃত্যুকর বাবদ প্রাপ্ত মোট রাজস্ব হইতে ১% বাদ দিয়া বাকী অংশকে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক রাজ্য স্থাবরসম্পত্তির অংশ রাজ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির মূল্যের অনুপাতে লাভ করিবে। দ্বিতীয় অর্থাৎ অস্থাবর অংশ জনসংখ্যার অনুপাতে রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হইবে।

কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক: প্রথম ফিনান্স কমিশন কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বাবদ সংগৃহীত অর্থের শতকরা ৪০% রাজ্যগুলিকে দিবার নির্দেশ দেন। দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন তামাক, দিয়াশলাই, উদ্ভিজ্জ ঘি ইত্যাদি বাবদ সংগৃহীত অর্থের শতকরা ২৫% রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। বিভিন্ন রাজ্যের প্রাপ্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ৯০% বণ্টন করা হইবে এবং বাকী শতকরা ১০ ভাগ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে বণ্টন করা হইবে।

রেলমাশুলের উপর কর: কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য ০·২৫% ভাগ রাখিয়া বাকী আদায়ীকৃত টাকাটা রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। রাজ্যে অবস্থিত রেলপথের দৈর্ঘ্যের উপর রাজ্যের প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত হইবে।

অনুদান: প্রতিটি রাজ্যের ঘাট্‌তি, রাজস্ব সংক্রান্ত প্রয়োজন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থসাহায্যের প্রয়োজনীয়তা—এই নীতিগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন রাজ্যের দেয় অনুদানের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং যুক্তপ্রদেশের বাজেটে কোনোরূপ ঘাটতি হয় নাই বলিয়া উহারা কোনোরূপ অনুদান পায় নাই। পশ্চিমবংগ সরকার এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ৩·২৫ কোটি টাকা সাহায্য পায়। পাট রপ্তানী শুল্কের পরিবর্তে পাট উৎপাদক রাজ্যগুলিকে যে অর্থসাহায্য করা হইত ১৯৬০ সালের পর হইতে উহা বন্ধ করিয়া সরকারী অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। ইহার ফলে পশ্চিমবংগের প্রাপ্য অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪·৭৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

এই কমিশনের সুপারিশ ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া নানাদিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। বণ্টননীতির ভিত্তি হিসাবে জনসংখ্যার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে পশ্চিমবংগ এবং বোম্বাই রাজ্যের প্রতি ন্যায়বিচার করা হয় নাই। এই কমিশনের মতে ঘন বসতিপূর্ণ রাজ্যের সহায়-সম্বলের প্রয়োজন জনবিরল কিন্তু বৃহদায়তন রাজ্যের সহায়-সম্বলের প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী হইবে।

সমালোচনা

কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কমিশন যুক্তি দেখাইয়াছেন যে শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্যগুলি অন্যান্য উৎস হইতে (যেমন বিক্রয়কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি) অধিকতর রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারিবে এবং এই কারণে আয়কর ও

কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কর লাভের ব্যাপারে তাহাদের কোনো বিশেষ দাবি থাকিতে পারে না. কিন্তু এই যুক্তিও অবান্তর। বিহার এবং যুক্তপ্রদেশ ভূমি রাজস্ব হইতে প্রচুর আয় করে সুতরাং আয়কর এবং কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বণ্টনের ক্ষেত্রে তাহারাও কোনো বিশেষ দাবি করিতে পারে না। পরিশেষে রেলপথের দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে রেলমাশুললব্ধ অর্থ বণ্টন না করিয়া সংগ্রহের ভিত্তিতেই করা উচিত ছিল। এই ব্যাপারেও পশ্চিমবংগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তৃতীয় ফিনান্স কমিশন (Third Finance Commission) :

১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রী এ. কে. চন্দের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রপতি তৃতীয় ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত করেন। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে ওই কমিশন তাহার রিপোর্ট পেশ করেন। ভারত সরকার এই কমিশনের সকল সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। সরকার এই কমিশনের সুপারিশগুলি পাঁচ বৎসরের পরিবর্তে চার বৎসর কার্যকরী রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই ব্যবস্থার ফলে চতুর্থ ফিনান্স কমিশন ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল একযোগে চলিতে থাকিবে। এই কমিশনের সুপারিশসমূহ ১৯৬৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

আয়কর : ব্যক্তিগত আয়কর হইতে লব্ধ রাজস্বের শতকরা ৬৬২/৩% রাজ্যগুলি এবং শতকরা ২১/২% কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি পাইবে। রাজ্য সরকারগুলির প্রাপ্ত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং শতকরা ২০ ভাগ সংগ্রহের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে। দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্য সরকারগুলি শতকরা ৬০ ভাগ এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি ১ ভাগ পাইত। দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং বাকী ১০ ভাগ সংগ্রহের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইত। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি পায় ১১/২ ভাগ।

কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক : তৃতীয় ফিনান্স কমিশন কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বাবদ সংগৃহীত অর্থের শতকরা ২০ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্যগুলি সংগৃহীত অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ পাইত। অবশ্য দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশে মাত্র আটটি দ্রব্যকে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের আওতায় আনা হইয়াছিল। তৃতীয় কমিশনের সুপারিশে অন্তঃশুল্কের অধীনস্থ দ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৩৫ করা হয়। ইহার ফলে শতকরা হার হ্রাস পাইলেও রাজ্যগুলির মোট প্রাপ্য অংশের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ নির্ধারণে রাজ্যের জনসংখ্যা, অনগ্রসরতা, আর্থিক দুর্বলতা ও পশ্চাৎপদ জনসংখ্যার কথা বিবেচনা করা হইয়াছে।

অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক : বিক্রয় করের পরিবর্তে চিনি, মিল-বস্ত্র এবং তামাকের উপর ধার্য অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব রাজ্যগুলিকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মৃত্যুকর : কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান অনুসারে সম্পত্তির উপর মৃত্যুকর ধার্য এবং আদায় করে এবং সমস্ত টাকাটাই রাজ্য সরকারদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। মৃত্যুকর বণ্টনের ব্যাপারে তৃতীয় ফিনান্স কমিশন কোনোরূপ নূতন সুপারিশ করেন নাই। দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের নীতিই অনুসরণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশ ছিল যে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য একভাগ রাখিয়া বাকী অংশ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ভিত্তিতে দুইভাগে বিভক্ত করা হইবে। অবশ্য তৃতীয় কমিশন এই সুপারিশ করেন যে অস্থাবর সম্পত্তির হিসাবের ব্যাপারে ১৯৬১ সালের লোকগণনার পরিসংখ্যান ব্যবহার করিতে হইবে।

রেলযাত্রী-মাশুলের করের পরিবর্তে অনুদান : রেলযাত্রী মাশুলের উপর প্রাপ্ত রাজস্বের নির্দিষ্ট অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের পরিবর্তে তৃতীয় ফিনান্স কমিশন এই বাবদ রাজ্যগুলিকে বাৎসরিক ১২½ কোটি টাকার অনুদানের সুপারিশ করিয়াছেন। এই সূত্রে পশ্চিমবংগ পাইত ·৭৯ লক্ষ টাকা।

সরকারী অনুদান (Grants in-Aid) : তৃতীয় ফিনান্স কমিশন সাধারণ অনুদান হিসাবে ১০টি রাজ্যকে মোট ১১০·২৫ কোটি টাকা দিবার নির্দেশ দেন। ইহার মধ্যে ৫২ কোটি টাকা উহাদের চলতি রাজস্বের ঘাটতি মিটাইবার জন্য বণ্টনের সুপারিশ করা হয়। দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সহ মোট ১১টি রাজ্য ৩৯½ কোটি অনুদান হিসাবে পাইত। অবশ্য সরকারী অনুদান সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ সরকার আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

পরিবহণ উন্নয়নের জন্য অনুদান : তৃতীয় কমিশন পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ ও অন্য কয়েকটি রাজ্য ব্যতীত অপর সকল রাজ্যের মধ্যে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বাৎসরিক ৯ কোটি টাকা অনুদানের সুপারিশ করেন।

সমালোচনা : কমিশনের অনুদান সংক্রান্ত একটি সুপারিশ ছাড়া সরকার অপর সকল সুপারিশই গ্রহণ করিয়াছেন। কমিশনের সব সুপারিশ সম্পর্কে উহার সদস্যগণ একমত ছিলেন না। আয়কর বাবদ এবং কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অধীনস্থ দ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িতে থাকিবে। কেন্দ্রীয় অনুদান প্রদানের ব্যাপারে কমিশন দুইটি নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছেন—(১) চলতি বাজেটের ঘাটতি যতদূর সম্ভব কর-হস্তান্তরের দ্বারা পূরণ করিতে হইবে এবং (২) বাজেট ঘাটতির অবশিষ্টাংশ পূরণের জন্যই শুধুমাত্র রাজ্যগুলিকে অনুদান দেওয়া হইবে। কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক হইতে সংগৃহীত রাজস্ব বণ্টনে কমিশন রাজ্যগুলির আর্থিক দুর্বলতা, পশ্চাৎপদ অবস্থা এবং অনুন্নত জনসংখ্যার কথা বিবেচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিবার জন্য তৃতীয় কমিশন অন্তঃশুল্ক বণ্টনকে উপায় হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। কেহ কেহ অবশ্য বলেন যে অন্তঃশুল্ক বণ্টনের পরিবর্তে অনুদানকে উপায় হিসাবে ব্যবহার করা উচিত ছিল।

চতুর্থ ফিনান্স কমিশন (Fourth Finance Commission): ১৯৬৪ সালের মে মাসে ডাঃ. পি. ভি. রাজামান্নারের (Dr. P. V. Rajamanner) সভাপতিত্বে চতুর্থ ফিনান্স কমিশন গঠন করা হয় এবং ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে এই কমিটি ভারত সরকারের নিকট তাহার রিপোর্ট পেশ করেন। ভারত সরকার এই কমিশনের সকল সুপারিশ মানিয়া লইয়াছেন; তবে কিছু সংশোধনও করিয়াছেন।

আয়কর: এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আয়কর লব্ধ রাজস্বের শতকরা ৭৫ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হইবে। তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পূর্বে রাজ্যগুলি আয়করের শতকরা ৬৬⅔ ভাগ পাইত। রাজ্যগুলি তাহাদের প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধি করিবার জন্য যুক্তি দেখায় এবং তাহারই ফলে কমিশন উহাদের প্রাপ্য অংশ ৬৬⅔% হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৭৫% করেন। বণ্টনযোগ্য ভাণ্ডার হইতে রাজ্য সরকারগুলির প্রাপ্য অংশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ৮০ ভাগ এবং সংগ্রহের ভিত্তিতে শতকরা ২০ ভাগ নির্ধারণের নির্দেশ কমিশন দিয়াছেন। তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের নির্দেশানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাপ্য অংশ ছিল শতকরা ১২·০৯ ভাগ। চতুর্থ ফিনান্স কমিশনের নির্দেশানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাপ্য অংশ বর্তমানে হ্রাস পাইয়া শতকরা ১০·১১ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক: কমিশন কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কগুলিকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) মূল অন্তঃশুল্ক (Basic excise duties); (২) সেস, (৩) চিনি, তামাক এবং মিলজাত বস্ত্রের উপর বিক্রয় করের পরিবর্তে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক, (৪) কেরোসিন, ডিজেল তেল, মোটর স্পিরিট ইত্যাদির উপর অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক, (৫) কতকগুলি দ্রব্যের উপর ধার্য বিশেষ অন্তঃশুল্ক (Special excise duties) এবং (৬) নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক (Regulatory duties).

চিনি, তামাক এবং বস্ত্রের উপর বিক্রয়করের পরিবর্তে ধার্য অতিরিক্ত অন্তঃশুল্কের সমস্ত অর্থই রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ইহার সামান্য অংশ অবশ্য কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলিকে দেওয়া হয়। নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্কের কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নাই কারণ ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত এই খাতে কোনো অর্থ সংগৃহীত হয় নাই।

প্রথম ফিনান্স কমিশন মাত্র তিনটি দ্রব্যকে (তামাক, দিয়াশলাই এবং উদ্ভিজ্জ দ্রব্য) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অধীনে আনিয়া উহা হইতে সংগৃহীত অর্থ রাজ্যগুলি এবং কেন্দ্রের মধ্যে বণ্টনের নির্দেশ দেন। দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অধীনে আটটি দ্রব্যকে আনিবার নির্দেশ দেন। তৃতীয় কমিশন ৩৫টি দ্রব্য কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অধীনে আনার সুপারিশ করেন। যে সকল দ্রব্যের উপর শুল্কবাবদ ১৯৬০-৬১ সালে ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল তাহাদেরই কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অধীনে আনয়ন করা হইয়াছিল। চতুর্থ ফিনান্স কমিশন সুপারিশ করেন যে বর্তমানে যে সকল কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ধার্য আছে এবং আগামী পাঁচ বৎসরে যে সকল দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হইবে তাহা রাজ্যসমূহ এবং কেন্দ্রের মধ্যে বণ্টিত হইবে।

এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের শতকরা ২০ ভাগ পাইবে। কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অধীন দ্রব্যের সংখ্যা পূর্বের মতো ৩৫ থাকিলে রাজ্যগুলি প্রাপ্য অন্তঃশুল্কের শতকরা ৩০ ভাগ হইত। তৃতীয় কমিশন রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ নির্ধারণে রাজ্যের জনসংখ্যা এবং আপেক্ষিক অনগ্রসরতার কথা বিবেচনা করিয়া উহার প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করিয়াছেন। চতুর্থ ফিনান্স কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ নির্ধারণে জনসংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ৮০ ভাগ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে শতকরা ২০ ভাগ নির্ধারিত হইবে।

বিক্রয়করের পরিবর্তে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক: ১৯৫৬ সাল হইতে রাজ্য-সরকারগুলি বস্ত্র, তামাক এবং চিনির উপর কোনোরূপ বিক্রয়কর ধার্য করে না। রাজ্যগুলিকে এই মর্মে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে ১৯৫৬-৫৭ সালে ওই তিনটি দ্রব্যের উপর বিক্রয়কর বাবদ তাহারা যে টাকা আদায় করিয়াছিল রাজ্যগুলিকে তাহা দেওয়া হইবে। ইহাকে গ্যারাণ্টি যুক্ত রাজস্ব (guaranteed amount) বলা হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত অংশ রাজ্যগুলিকে ভাগ করিয়া দিবার দায়িত্ব কমিশনের উপর দেওয়া হয়। চতুর্থ ফিনান্স কমিশনের মতে অতিরিক্ত রাজস্ব (excess over the total guaranteed amount) রাজ্য সংগৃহীত বিক্রয়কর মোট বিক্রয়করের শতকরা হার হিসাবে রাজ্যের অংশ নির্ধারিত হইবে। বিক্রয়করের পরিবর্তে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক বাবদ মোট সংগৃহীত অর্থের একভাগ কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির জন্য, ১$\frac{১}{২}$ ভাগ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জন্য এবং $\frac{১}{২০}$ অংশ নাগাল্যাণ্ডের জন্য প্রদত্ত হইবে।

মৃত্যুকর: কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান অনুসারে সম্পত্তির উপর মৃত্যুকর ধার্য এবং আদায় করে এবং সমস্ত টাকাটাই রাজ্যসরকারদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। মৃত্যুকর বণ্টনের ব্যাপারে চতুর্থ কমিশন কোনোরূপ নূতন সুপারিশ করেন নাই। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের নীতিই অনুসরণ করা হইয়াছে। চতুর্থ কমিশন শুধুমাত্র কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির প্রাপ্য অংশ একভাগ হইতে বৃদ্ধি করিয়া দুইভাগ করার সুপারিশ করিয়াছেন। কেন্দ্রশাসিত অংশের জন্য দুইভাগ রাখিয়া বাকী অংশ (৯৮ ভাগ) অস্থাবর সম্পত্তির এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

রেলযাত্রী মাশুলের করের পরিবর্তেঅনুদান: রেলযাত্রী মাশুলের উপর প্রাপ্ত রাজস্বের নির্দিষ্ট অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টনের পরিবর্তে তৃতীয় ফিনান্স কমিশন এই বাবদ রাজ্যগুলিকে বাৎসরিক ১২$\frac{১}{২}$ কোটি টাকা অনুদানের সুপারিশ করিয়াছিলেন। চতুর্থ ফিনান্স কমিশন কোনোরূপ নূতন সুপারিশ না করিয়া পূর্ব-ব্যবস্থাকেই চালু রাখিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।

সরকারী অনুদান: তৃতীয় ফিনান্স কমিশন রাজ্যগুলির চল্‌তি বাজেট-ঘাটতি মিটাইবার জন্য বাৎসরিক ৫২ কোটি টাকা এবং রাজ্যগুলির পরিকল্পনাগুলি

কার্যকরী করার জন্য ৫৮'২৫ কোটি টাকা অনুদানের সুপারিশ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় অনুদানের সুপারিশটি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। চতুর্থ কমিশন পরিকল্পনা-বহির্ভূত বাজেট ঘাটতি মিটাইবার মধ্যেই অনুদানকে সীমিত রাখিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যের পাঁচ বৎসরের (১৯৬৬-৬৭ হইতে ১৯৭০-৭১) রাজস্ব আয় ও পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয়ের হিসাব গ্রহণের পর নিম্নলিখিত ১০টি রাজ্যের মোট ৬০৯'৪৫ কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতির হিসাব পাওয়া যায়। কমিশন সংবিধানের ২৭৫ ধারা অনুসারে ওই রাজ্যগুলিকে বাৎসরিক ১২১'৮৯ কোটি টাকা অনুদান মঞ্জুরের সুপারিশ করেন। ইহা মোট ঘাটতির এক-পঞ্চমাংশ।

রাজ্যগুলির ঘাটতির পরিমাণ

রাজ্য		ঘাটতি (কোটি টাকার হিসাবে)
১। অন্ধ্র	...	৩৬'১০
২। আসাম	...	৮২'৬০
৩। জম্মু ও কাশ্মীর	...	৩২'৮৫
৪। কেরালা	...	১০৪'১০
৫। মধ্যপ্রদেশ	...	১৩'৫০
৬। মাদ্রাজ	...	৩৪'২০
৭। মহীশূর	...	৯১'২০
৮। নাগাল্যাণ্ড	...	৩৫'৩৫
৯। উড়িষ্যা	...	১৪৫'৯০
০। রাজস্থান	...	৩৩'৬৫
	মোট	৬০৯'৪৫

সমালোচনা: এই কমিশনের সকল সুপারিশ সম্পর্কে সকল সদস্য একমত ছিলেন না। গ্যারাণ্টিযুক্ত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ বণ্টনের নীতি সম্পর্কে কমিশনের একজন সদস্য শ্রীমোহনলাল গৌতম কমিশনের সহিত একমত হন নাই। ইহা ছাড়া ডাঃ রাজামান্নার (সভাপতি) ও অপর একজন সদস্য ডাঃ ভবতোষ দত্ত এই রিপোর্টে অতিরিক্ত নোট দিয়াছেন। ইহাতে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির আর্থিক সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং ফিনান্স কমিশনের ভূমিকায় প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনের কার্যের এলাকা এবং ফিনান্স কমিশনের কার্যের এলাকা নির্দিষ্টরূপে বিভক্ত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

আয়কর বাবদ এবং কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অধীনস্থ দ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ফলে কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ক্রমাগতই বাড়িতে থাকিবে।

কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে ঘাটতি রাজ্যগুলিকে যে অনুদানের নির্দেশ কমিশন দিয়াছেন তাহার ফলে রাজ্যগুলি নিজেদের রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকিবে;

নূতন নূতন উৎস হইতে কর নির্ধারণে এবং অন্যান্য উৎস হইতে দক্ষতা সহকারে কর আদায়ে শৈথিল্য দেখা যাইবে। পরিশেষে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক নির্ধারণের ব্যাপারে—জনসংখ্যা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসতার কথাই শুধু বিবেচনা করা হইয়াছে। কিন্তু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, সীমান্তরক্ষা এবং বেকারত্বের চাপ পশ্চিমবংগে খুবই বেশী। এই সকল সমস্যার প্রতি কোনোরূপ বিবেচনা না করার ফলে পশ্চিমবংগ চতুর্থ কমিশনের সুপারিশের ফলে বিশেষ সন্তুষ্ট হয় নাই।

ভারতের সরকারী ঋণ (India's Public Debt): ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইলে ঋণ করিতে হয়, সরকারেরও সেইরূপ ব্যয় অপেক্ষা আয় কম হইলে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। বর্তমানে সরকারী ঋণ কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য।

ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকাল হইতেই সরকারী ঋণের সুরু হয়। সাধারণতঃ যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করিবার উদ্দেশ্যেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঋণ গ্রহণ করে। ১৯৬০ সালের কোম্পানীর ঋণের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি পাউণ্ড। কোম্পানীর নিকট হইতে ইংলণ্ডের রাজার হাতে শাসনভার হস্তান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে কোম্পানীর সমস্ত ঋণের বোঝা ভারত সরকারের হাতে আসিয়া যায়। কোম্পানীর ঋণের সবটাই ছিল অনুৎপাদনশীল। ১৮৬৭ সাল হইতে উৎপাদনশীল কাজের জন্যও ঋণ গ্রহণ সুরু হয়। রেলপথের পত্তন এবং জলসেচ ব্যবস্থার প্রসারের জন্য সরকার ঋণ করিতে শুরু করে।

সরকারী ঋণ ভারতে সংগ্রহীত হইলেও ভারতে অবস্থিত বেসরকারী বিদেশীগণই এই ঋণ প্রদান করিত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সরকারী ঋণের অধিকাংশই লণ্ডনের বাজারে সংগৃহীত হয়। ১৯৩৯ সালের মার্চে ভারতের স্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৬৯ কোটি টাকা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের স্টার্লিং ঋণের অধিকাংশই পরিশোধ করা হয়।

১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১০১২৩ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে আভ্যন্তরীণ ঋণ ছিল ৪৯৮৭ কোটি টাকা, বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ২১৯২ কোটি টাকা এবং অন্যান্য দায়ের পরিমাণ ছিল ২৯৪৪ কোটি টাকা।

সরকারী ঋণকে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। সরকারী ঋণলব্ধ অর্থকে যদি এরূপভাবে ব্যয় করা হয় যে তাহার দ্বারা উৎপাদনশীল সম্পদের সৃষ্টি হয় তাহা হইলে তাহাকে উৎপাদনশীল ঋণ বলে। অপরপক্ষে ঋণ-লব্ধ অর্থ যদি এরূপভাবে ব্যয়িত হয় যে তাহার দ্বারা কোনো উৎপাদনশীল সম্পদের সৃষ্টি হয় না তবে তাহাকে অনুৎপাদনশীল ঋণ বলা হয়। ভারত সরকারের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ঋণ উৎপাদনশীল আর শতকরা মাত্র ১০ ভাগ অনুৎপাদনশীল অর্থাৎ ইহার বিরুদ্ধে কোনো পাওনা বা সম্পত্তি নাই।

সরকারী ঋণ আভ্যন্তরীণ অথবা বৈদেশিক হইতে পারে। দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ করা গ্রহণ করা হইলে তাহাকে আভ্যন্তরীণ ঋণ বলে। অপরপক্ষে বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করা হইলে তাহাকে বৈদেশিক ঋণ বলে। ভারত সরকারের মোট ঋণের শতকরা ৭৬ ভাগ আভ্যন্তরীণ ঋণ আর বাকী ২৪ ভাগ বৈদেশিক ঋণ। সমগ্র ঋণের ৭৬ ভাগ আভ্যন্তরীণ বলিয়া ইহার ভার তত অধিক নয়।

যে ঋণ পরিশোধের জন্য কোনো বিশেষ সময় নির্দিষ্ট থাকে না তাহাকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বলে। আর যে ঋণ স্বল্পকালের মধ্যেই পরিশোধ করিতে হয় তাহাকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ বলে। ভারত সরকারের ঋণের শতকরা ৬০ ভাগ হইল দীর্ঘমেয়াদী ঋণ।

ভারতের সরকারী ঋণকে আবার ভারত সরকারের ঋণ এবং রাজ্যসরকারের ঋণ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ১৯৬৫ সালের মার্চে রাজ্যসরকারগুলির মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৭৬০ কোটি টাকা।

ভারত সরকারের ঋণের বিবর্তন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে সরকারী ঋণের পরিমাণ ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনাকে কার্যকর করিতে সরকারী ঋণের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

Exercises

প্রথম অধ্যায়

1. What are the chief constituents of the Indian Money Market ?

2. Indicate the characteristics of the Indian Money Market and point out its defects and deficiencies.

3. Describe briefly the Indian Banking System and point out its weakness, if any.

4. Do you advocate the nationalisation of the Commercial Banks in India ?

5. Discuss the part played by the State Bank of India in providing credit to (*a*) Small industries and (*b*) agriculture.

6. Examine briefly the monetary policy of the Reserve Bank of India since 1956.

7. "The Reserve Bank of India's monetary policy has been a policy of controlled expansion during the Plan Period." Explain the main features of this policy.

8. Write a critical note on the working of the Reserve Bank of India.

9. Write a note on the Bill Market Scheme.

10. Indicate the main features of the scheme of insurance of Bank Deposits recently adopted in India. What are the aims and purpose of the scheme ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

11. Describe the present monetary standard of India.

12. Describe the present system of the issue and regulation of the paper currency in India.

13. Write a note on Sterling Balances.

14. Explain the circumstances that led to the devaluation of the Indian Rupee in September 1949. What have been the effects of the devaluation upon India' balance of payments ?

15. Explain the circumstances that led to the devaluation of the Indian rupee in June, 1966. What would be the effects of Devaluation ? [পৃষ্ঠা ২৩০-৩৬]

16. Examine the main causes explaining the continuous rise in prices in India. What steps would you suggest for checking this rise ?

17. Examine the trend of prices under Five Year Plans. [পৃষ্ঠা ২৩৮-৪১]

তৃতীয় অধ্যায়

18. What important changes have taken place in the nature, volume and direction of India's Foreign Trade since Independence ?

19. Discuss the export policy and export objectives of India during the Third Five Year Plan period. [পৃষ্ঠা ২৪৫-৪৭]

20. What is State Trading ? Write a note on the State Trading Corporation of India. [পৃষ্ঠা ২৪৭-]

21. Write short notes on : (*a*) Export Risk Insurance Corporation.

(*b*) Export Credit and Guarantee Corporation. [পৃষ্ঠা ২৫১-৫২]

(*c*) India and the European Common Market [পৃষ্ঠা ২৬১-৬৩]

22. Give a short account of India's balance of payments difficulties in recent years. How is it possible to improve per balance of paymets ?

23. "The balance of payments difficulties that the country is facing are, it must be stressed, not short term or temporary ; they will continue for several years to come." Elucidate the statement.

চতুর্থ অধ্যায়

24. Give a short description of India's Tax-structure.

25. "The Indian Tax System is regressive." Examine the statement.

26. Examine the recommendations of the Third Finance Commission in dealing with the problem of allocation of financial resources to the States in India

27. Examine the recommendations of the Fourth Finance Commission in dealing with the problem of allocation of financial resources to the States in India. [পৃষ্ঠা ৩৯৮-৪০১]

28. Examine critically Kaldor's proposals for tax reform in the context of the needs of India's developing economy.

29. State the case for and against the introduction of the Capital Gains Tax in India.

30. Examine the case for and aganist the imposition of the Expenditure Tax and Wealth Tax in India. Discuss the main features of the two taxes.

31. Discuuss the importance of (*a*) Income Tax and (*b*) Central Excise Duties in the financial system in India.

32. Write a note on the Public Debt of India.

There is no longer any believers in laissez faire except on the lunatic fringe; the central issue in the discussion of planning is not whether there shall be planning but what form it shall take.

—Prof. Lewis.

চতুর্থ খণ্ড

The irrational and planless character of society must be replaced by a planned economy.

—Erich Fromm

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা
(Economic Planning)

উনবিংশ শতকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মনে করিতেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে সমাজের সর্বাধিক জনসমষ্টির মঙ্গল হইবে। অবিমিশ্র ধনতন্ত্রবাদের সমর্থকগণ পরিকল্পনায় আস্থাশীল নয় কারণ পরিকল্পনা অবাধ প্রতিযোগিতার পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে। অধ্যাপক হ্যারিস যথার্থই বলিয়াছেন যে অবিমিশ্র ধনতন্ত্রে পরিকল্পনার কোনো স্থান নাই কারণ ক্রেতার সার্বভৌমত্ব, দাম ব্যবস্থার প্রভুত্ব এবং মুনাফার সন্ধান—ধনতন্ত্রের এই ত্রিবিধ নীতিকে পরিকল্পনা অস্বীকার করে।* অবশ্য বর্তমানে পৃথিবীর কোনো দেশেই অবিমিশ্র ধনতন্ত্র নাই। সর্বত্রই ধনতন্ত্রকে সংস্কার করিয়া মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy) গঠনের প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়।

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থনৈতিক কার্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপই হইল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। ডিকিনসনের মতে সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করিয়া কোনো নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কতখানি উৎপাদন হবে, কি উৎপাদন হবে এবং কার জন্য উৎপাদন হবে এ সম্পর্কে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই পরিকল্পনা।

পরিকল্পনার সংজ্ঞা

হেইক বলেন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হইল কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক অর্থনৈতিক কার্যাবলীর পরিচালনা ("the direction of productive activity by a central authority"—Hayek) অধ্যাপক রবিনসের সংজ্ঞানুসারে উৎপাদন এবং বিনিময় সংক্রান্ত বেসরকারী কার্যাবলীর উপর যৌথ নিয়ন্ত্রণই হইল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ("Collective control of private activities of production and exchange." Robbins) থিয়োডোর গ্রেগরীর মতে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্পদকে সংগঠিত করাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ("Planning may be defined as an attempt to organise resources for the attainment of a chosen end ; it is, in other words, purposeful action.")

জনগণ যখন পরিকল্পিত অর্থনীতির জন্য দাবী জানায় তখন মনে হইতে পারে যে বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো বুঝি অপরিকল্পিত। কিন্তু ইহা সত্য নয়। অধ্যাপক রবিনস্ এর মতে সকল অর্থনৈতিক জীবনেই পরিকল্পনা রহিয়াছে। অর্থনৈতিক কাজ বলিতে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের বিন্যাস সংক্রান্ত কাজ বুঝায় এবং এই সকল কাজকর্মে

---

* **"Planning has no place under pure capitalism, for it does not allow much room to the capitalist trinity—sovereignty of the consumer, the tyranny of the price system and the quest for profits."**

কিছু না কিছু পরিকল্পনা থাকেই। ক্রেতা তাহার অর্থব্যয় করিতেছে, উৎপাদক কি উৎপাদন ক'রিবে তাহা স্থির করিতেছে,—সকলই পরিকল্পনা। পরিকল্পনা করার অর্থ হইল উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করা, নির্বাচন করা আর নির্বাচনই হইল অর্থ নৈতিক কাজের কেন্দ্র। অবশ্য বর্তমানে পরিকল্পনা বলিতে সরকার কর্তৃক রচিত পরিকল্পনাকেই বুঝায়।

পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Economic Planning) বর্তমানযুগ পরিকল্পনার যুগ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করিয়া অর্ধোন্নত দেশসমূহ পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছে। অধ্যাপক লুইস যথার্থই বলিয়াছেন যে মুষ্টিমেয় উন্মাদ প্রকৃতির লোক ছাড়া আজ আর কেহই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে না। পরিকল্পনাসংক্রান্ত আলোচনায় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আজ আর আলোচ্য বিষয় নয়, উহা কি আকার গ্রহণ করিবে তাহাই আলোচনার মূল বিষয়।*

উনবিংশ শতকের অর্থ নৈতিক জগতের মূলনীতি ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। এই মতবাদের মূল কথা হইল যে রাষ্ট্র শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে এবং বহিঃশত্রুর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবে, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না, সর্বত্র অবাধ প্রতিযোগিতা চলিবে। প্রতিযোগিতার দরুণ চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাতে সকল কিছুই একটা আদর্শ ভারসাম্য অবস্থায় আসিবে এবং ওই অবস্থায় সমাজের সর্বাধিক জনসংখ্যার মহত্তম কল্যাণ সাধিত হইবে। ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসারে একদিকে ব্যক্তির কল্যাণ যেমন সাধিত হইবে অপরদিকে তেমনি সমাজেরও কল্যাণ সাধিত হইবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয় নাই। এই ব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য, সমাজকল্যাণ গৌণ। অপরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থার কুফল আজ সর্বজনবিদিত। এই ব্যবস্থায় একজন অপর একজনের উৎপাদন কর্মসূচীর সংবাদ রাখে না বলিয়া কোথাও প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন হয় আবার কোথাও প্রয়োজনের তুলনায় কম উৎপাদন হয়। ধনসম্পদ ধনী লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে বলিয়া বিলাসসামগ্রীর উৎপাদনে দেশের সম্পদ নিযুক্ত হয় এবং অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হইতে পারে না। বাণিজ্যচক্রের আবর্তনে অর্থনৈতিক বনিয়াদ বারবার বিপর্যস্ত হয়। পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজে ধনবৈষম্য হ্রাস করিয়া অর্থ নৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা যায়।

ইহার কুফল

বর্তমানে পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (central authority) থাকে; ইহাকে সাধারণতঃ পরিকল্পনা কমিশন নামে অভিহিত করা হয়। ইহা

* There are no longer any believers in laissez faire except on the lunatic fringe; the central issue in the discussion of planning is not whether there shall be planning but what form it shall take. Lewis.

উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং তদনুসারে কাজ করিবে। অ-পরিকল্পিত সমাজে উৎপাদনের প্রকৃতি এবং পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্রেতার চাহিদা। উৎপাদকও ক্রেতার চাহিদা অনুমান করিয়া উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং ক্রেতার সার্বভৌমত্ব এই সমাজের বৈশিষ্ট্য। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সম্পদের বণ্টন এবং উৎপাদনের প্রকৃতি রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হয় বলিয়া ক্রেতার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য। উৎপাদকের স্বাধীনতাও নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে। এইজন্য অধ্যাপক হেইক বলিয়াছেন যে পরিকল্পনা হইল দাসত্বের পথ (Planning is road to serfdom)। কিন্তু ইহা চরম মত বলিয়া মনে হয় এবং বর্তমানে পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নাই যেখানে কোনোরূপ পরিকল্পনা করা হয় নাই।

পরিকল্পনার বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, দেশের সামরিকশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ও অর্থ নৈতিক সম্পদ বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা করা হয়। নাৎসী জার্মানী, ফ্যাসিষ্ট ইতালী এবং ১৯৩৬—৪২ সালের জাপানের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল দেশের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি। সোভিয়েট রাশিয়ায় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অংশতঃ দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং অংশতঃ অর্থ নৈতিক উন্নয়ন। দ্বিতীয়তঃ, অনিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রের কুফল দূর করিবার উদ্দেশ্যেও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তৃতীয়তঃ, অর্ধোন্নত দেশগুলির অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যেও পরিকল্পনা করা হয়। এই সকল দেশে বেসরকারী উদ্যোগের হাতে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাম্য উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। অর্ধোন্নত দেশ, অনগ্রসর জাতি এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর উন্নতিই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

পরিকল্পনার মূল উপাদান (Essentials of Planning) : পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত সর্তগুলি পূরণ করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, দেশের সকল সম্পদের নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য হিসাব তৈয়ারী করিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশন দেশের কৃষিজ, খনিজ এবং অন্যান্য সম্পদের একটি হিসাব তৈয়ারী করিবে। ইহা আমাদের বর্তমান সম্বল নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক জরিপ প্রয়োজন। জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান এই ব্যাপার খুবই প্রয়োজনীয়। কাঁচামাল এবং মূলধনী দ্রব্যের পরিসংখ্যান বিশেষ দরকারী কারণ ইহার ভিত্তিতেই স্থির হইবে কি পরিমাণ মূলধন গঠন করিতে হইবে।

সম্পদের হিসাব

দ্বিতীয়তঃ, ইহার পর পরিকল্পনার প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে কোনোরূপ অস্পষ্টতা থাকিলে পরিকল্পনার সাফল্যের পথে উহা বাধার সৃষ্টি করিবে। কোন্ বস্তু উৎপাদনে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। সকল বস্তুর উৎপাদন একই সঙ্গে বাড়ানো যায় না বলিয়াই অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রশ্ন রহিয়াছে। অধিক পরিমাণে বন্দুক তৈয়ারী করিলে কম পরিমাণ মাখন উৎপাদিত

সঠিক লক্ষ্য

হইবে। পরিকল্পনা রচনার সময় শুধুমাত্র উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করিলেই চলিবে না, সময়ের সীমাও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ইহা যেন সম্ভাব্য উপকরণের দ্বারাই রূপায়িত করা যায়। আবার পরিকল্পনার লক্ষ্য খুব সীমাবদ্ধ রাখিলে উহাকে কাম্য পরিকল্পনা (optimal plan) বলা চলিবে না। অর্ধোন্নত দেশে অর্থ নৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করিতে হইলে পরিকল্পনার আয়তন বড়ই করিতে হইবে। অধ্যাপক ম্যালেনবমের মতে উত্তোলন পর্যায় (take-off period) দ্রুত অতিক্রম করিতে হইলে পরিকল্পনার আয়তন বিশাল হওয়াই প্রয়োজন।

ব্যাপকত্ব

তৃতীয়তঃ, পরিকল্পনা এরূপ হইবে যে সারা দেশ যেন উহার আওতায় আসে। খণ্ড এবং বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনা উত্তম পরিকল্পনার লক্ষণ নয়। পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে যেন ইহার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

অগ্রসরের নীতি

চতুর্থতঃ, একই সঙ্গে সকল দিকে অগ্রসর না হইতে পারিলে পরিকল্পনা সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়িবে। যেমন কাপড়ের কলের সংখ্যা বাড়াইবার নীতি গ্রহণ করিলে সাথে সাথে তুলার উৎপাদনও বৃদ্ধি করিতে হইবে।

নমনীয়তা

পঞ্চমতঃ, পরিকল্পনা রচনা করিবার জন্য প্রভূত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংগঠন থাকা প্রয়োজন।

পরিকল্পনা কমিশন

ষষ্ঠতঃ, পরিকল্পনাকে এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে দেশের অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে উহার পরিবর্তন করা চলে। পরিকল্পনা সাধারণতঃ চার বা পাঁচ বৎসরের কর্মসূচী লইয়া সুরু হয়। এখন এই সময়ের মধ্যে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রতিকূল পরিবর্তন ঘটিতে পারে। পরিকল্পনা এরূপ হইবে যেন উহা পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে।

উপযুক্ত ফিসক্যাল নীতি নির্ধারণ

সপ্তমতঃ, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে পরিকল্পনার দরুণ আয় বাড়িলে সেই বর্ধিত আয়ের সবটাই যেন ভোগ্যবস্তুর উপর ব্যয়িত না হয়। বর্ধিত উৎপাদনের সবটাই যদি ভোগ্যবস্তু ক্রয় করিতে ব্যয় হইয়া যায় তাহা হইলে সঞ্চয় মোটেই বাড়িবে না এবং সঞ্চয় না বাড়িলে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং এরূপ ফিসক্যাল নীতি গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে বর্ধিত উৎপাদনের প্রয়োজনীয় অংশ বিনিয়োগ করা সম্ভবপর হয়।

অষ্টমতঃ, পরিকল্পনার ফলে বিনিয়োগের পরিমাণ ও তৎসহ জাতীয় আয় বাড়িতে থাকিবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সহিত মূল্যস্তরও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। কারণ যে হারে বিনিয়োগ হয় সেই হারে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বাড়ে না। ফলে

মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মূল্যস্তর যাহাতে আয়ত্তের মধ্যে থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক, ফিসক্যাল এবং প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন হইতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে পরিকল্পনার ব্যয় বাড়িয়া যাইবে ফলে সমগ্র পরিকল্পনাই বানচাল হইয়া যাইতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

পরিশেষে পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা অপরিহার্য। এইকারণে পরিকল্পনা রচনার সময় সেই সকল প্রকল্পকে গুরুত্ব দিতে হইবে সেখানে অর্থ নৈতিক বনিয়াদের নিম্নস্তর হইতে পরিকল্পনা (Planning from below) সুরু করা হইয়াছে।

গণসহযোগিতা

পরিকল্পনার প্রকারভেদ (Types of Planning) : উন্নত এবং অর্ধোন্নত উভয় প্রকার দেশেই পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে কিন্তু উন্নত ও অর্ধোন্নত দেশে পরিকল্পনার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কতকগুলি ধনতান্ত্রিক দেশ রহিয়াছে যাহারা বর্তমানে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে, উৎপাদন ও জাতীয় আয় সেখানে চরমকাম্য রূপ ধারণ করিয়াছে। এই সকল দেশে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সংরক্ষণ (maintenance) = জাতীয় আয় ও উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা বজায় রাখা। আবার অর্ধোন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয় ও উৎপাদন কম, সেই কারণে এই সকল দেশে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য উন্নয়ন (development) জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধ করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। সুতরাং অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা দুই ধরণের হইতে পারে—সংরক্ষণ পরিকল্পনা (maintenance planning) এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা (development planning)

সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

পরিমাণভেদে (degrees of planning) পরিকল্পনা দুই ধরণের হইতে পারে —সামগ্রিক পরিকল্পনা ও আংশিক পরিকল্পনা। বেসরকারী উদ্যোগকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিয়া অর্থ নৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্র রাষ্ট্রের মালিকাধীনে আনিবার জন্য পরিকল্পনা করা হইলে তাহাকে সামগ্রিক পরিকল্পনা বলা হয়। এই ধরণের পরিকল্পনা সাধারণতঃ গণতান্ত্রিক দেশে সম্ভবপর হয় না, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই ধরণের পরিকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। সোভিয়েট রাশিয়া সামগ্রিক পরিকল্পনার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সকল দেশে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন সাধারণতঃ সরকারের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পনা রচনা করে।

সামগ্রিক ও আংশিক পরিকল্পনা

গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে বেসরকারী মালিকানা এবং উদ্যোগকে স্বীকার করা হয়। এখানে সরকারী উদ্যোগ ও বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি থাকে। এই সব দেশে সরকারী উদ্যোগকে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে সম্প্রসারিত করা হয়; অবশ্য সরকারী উদ্যোগের উপরও কিছু পরিমাণ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ আসিতে বাধ্য। এই ধরণের সমাজ ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থনীতি বলা হয়।

পরিকল্পনার টেক্‌নিক (Plan Technics): পরিকল্পনা রচনার প্রথম পদক্ষেপ হইল কতকগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা। দ্বিতীয়তঃ, লক্ষ্যগুলি অবশ্যই চরম কাম্য (Optimal) আকারের হইবে। পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারিত হইয়া গেলে ওই সকল লক্ষ্য পূরণের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। পরিকল্পনাকে দক্ষতার সহিত বাস্তবে রূপান্তরিত করিতে হইলে উহাতে দুই ধরণের ভারসাম্য থাকিবে—

বিভিন্ন প্রকারের ভারসাম্য

আড়াআড়ি ভারসাম্য (crosswise balance) এবং পশ্চাৎপদ ভারসাম্য (backward balance): উৎপাদন লক্ষ্য এবং সম্ভাব্য উপকরণের মধ্যে সমতা নির্ধারণ করাকে আড়াআড়ি ভারসাম্য বলে। ভারতের প্রথম পরিকল্পনার একটি ত্রুটি যে উৎপাদন লক্ষ্য এবং সম্ভাব্য শ্রমশক্তির মধ্যে সঠিক আড়াআড়ি ভারসাম্য সৃষ্টি করা হয় নাই। উৎপাদিত সামগ্রী এবং উহাদের উপাদানের ভারসাম্য সৃষ্টি করাকে পশ্চাৎপদ ভারসাম্য বলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে বাইসাইকেল ফ্রেম উৎপাদনের সংখ্যার সহিত সাইকেল টায়ার উৎপাদনের সঙ্গতি থাকা চাই। যদি টায়ার নির্মাণের সংখ্যা সাইকেল ফ্রেম নির্মাণের সংখ্যা অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে টায়ারের অভাবে সাইকেল ফ্রেম দ্বারা সম্পূর্ণ সাইকেল তৈয়ারী হইতে পারিবে না।

পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে উহাকে নিম্ন পর্যায় হইতে প্রণয়ন (Planning from below) করিতে হইবে। সকল অর্থনৈতিক কাজ কারবার পরস্পর নির্ভরশীল বলিয়া উৎপাদনের সর্বনিম্ন পর্যায় হইতে পরিকল্পনা সুরু না করিলে উহার উচ্চ পর্যায় সফল হইতে পারে না। ইহা ছাড়া পরিকল্পনা নিম্ন পর্যায় হইতে সুরু করিলে জনগণের সহযোগিতা পাওয়া যায়, পরিকল্পনা সফল করিতে জন-সমর্থন অবশ্য প্রয়োজনীয়। ভারতীয় পরিকল্পনায় এই নিম্ন পর্যায় হইতে পরিকল্পনা সুরু করার প্রবণতা দেখা যায়। সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা নিম্ন পর্যায়ের পরিকল্পনার উদাহরণ।

পরিশেষে উন্নয়নের গতির দৃষ্টিকোণ হইতে পরিকল্পনা টেকনিক দুই ধরণের হইতে পারে—ভারসাম্য পরিকল্পনা পদ্ধতি (Planning with Balanced Growth) এবং সমতাহীন পরিকল্পনা পদ্ধতি (Planning with Unbalanced Growth) ভারসাম্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ভোগ, বিনিয়োগ এবং আয় একই হারে বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে সমতাহীন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মূল এবং ভারী শিল্প যে হারে বৃদ্ধি পায় অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেই হারে বৃদ্ধি ঘটে না। ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমতাহীন সম্প্রসারণের টেক্‌নিক গ্রহণ করা হইয়াছে।

মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy): সরকারী মালিকানা এবং বেসরকারী

সংজ্ঞা

মালিকানা সরকারী উদ্যোগ এবং বেসরকারী উদ্যোগের সহ অবস্থিতিকেই মিশ্র অর্থনীতি বলে। অর্থনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও মালিকানা থাকিবে, অপর অংশে বেসরকারী উদ্যোগও মালিকানা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিবে। পূর্ণ সমাজ-

তান্ত্রিক দেশগুলিতে এই ধরণের অর্থনীতি থাকিতে পারে না কারণ সেখানে বেসরকারী মালিকানা ও উদ্যোগকে উৎখাত করিয়া সামগ্রিকভাবে সরকারী মালিকানা ও উদ্যোগকে প্রবর্তন করা হইয়াছে। অপরপক্ষে অবাধ ধনতান্ত্রিক (laissez faire capitalism) রাষ্ট্রেও এই ধরণের মিশ্র অর্থনীতি থাকিতে পারে না কারণ সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং উদ্যোগের কোনো স্থান নাই।

উনবিংশ শতকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই স্বীকৃত রাজনৈতিক মতবাদ ছিল। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদিগের মতে রাষ্ট্রের কার্যাবলী আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা এবং বহিঃ-শত্রুর হাত হইতে দেশ রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। অর্থনৈতিক জগতের সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং মালিকানা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করিবে। সমাজ জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কাম্য নয় কারণ ইহা ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া সামাজিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে। এই ধরণের সমাজ ব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাতে আদর্শ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং মুনাফার সুযোগ রহিয়াছে বলিয়াই উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাধিক হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার কুফল হইল যে সমাজে ধনী ব্যক্তি অধিকতর ধনী হইবার সুযোগ পাইবে আর দরিদ্রব্যক্তি অধিকতর দরিদ্র হইবে। সমাজে শ্রমিক এবং দরিদ্রব্যক্তির উপর অবাধ শোষণ চলিতে থাকিবে তাই অবাধ ধনতন্ত্রবাদ আজকের পৃথিবীতে কোনো দেশই মানিয়া লইতে রাজী নয়। সমাজতন্ত্রবাদীরা সকল উৎপাদন উপাদান রাষ্ট্রের মালিকানাধীনে আনিবার পক্ষপাতী। এই ধরণের সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা এবং উদ্যোগের কোনো স্থান নাই। কিন্তু এই ধরণের সমাজ ব্যবস্থাও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মুনাফার কোনো সুযোগ না থাকায় উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাধিক হয় না। রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যক্তিপ্রচেষ্টা হীনপ্রভ হয় এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা হ্রাস পায়। অবাধ ধনতন্ত্রের সমর্থকেরা ইহাকে দাসতন্ত্র (Serfdom) বলিয়া মনে করেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যেমন ব্যক্তিগত মালিকানা এবং উদ্যোগে বিশ্বাসী সমাজ-তন্ত্রবাদ সেইরূপ রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং উদ্যোগে বিশ্বাসী। মিশ্র অর্থনীতি হইল এই দুই পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যবর্তী পথ। মিশ্র অর্থনীতি হইল ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের দোষগুলি বর্জন ও গুণগুলি গ্রহণ করিয়া এক নূতন সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন। এই ধরণের সমাজে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়। মূল এবং প্রতিরক্ষা শিল্প ব্যতীত অন্য সকল প্রকার শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব বেসরকারী উদ্যোগের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবশ্য বেসরকারী মালিকানা এবং বিনিয়োগের উপর সবসময়ই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। রাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য নিজে উদ্যোগী হইবে। শ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরীর হার নির্ধারণ, কাজের সময় হ্রাস, সমাজিক বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বার্ধক্যে ভাতার ব্যবস্থা করিবে। সমাজের বৃহত্তম কল্যাণ সাধনই হইবে রাষ্ট্রের উদ্যোগ। এই

কারণে অনেকেই মিশ্র অর্থনীতিকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র (welfare state) বলিয়া অভিহিত করেন।

মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিতরূপ: (১) সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের সহ-অবস্থান ; (২) সরকারী ও বেসরকারীক্ষেত্রের সীমা নির্ধারণ ; (৩) বেসরকারী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, (৪) কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ; (৫) সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পিত অনুপাত ; (৬) প্রগতিশীল করব্যবস্থা ; (৭) সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপক প্রসার।

১৯৫৬ সালের বিঘোষিত শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে যে ১৭টি শিল্পকে রাখা হইয়াছে তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত থাকিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ১২টি শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী এবং বেসরকারী মালিকানা পাশাপাশি চলিবে কিন্তু ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রের মালিকানার প্রসার হইবে এবং সেই কারণে সাধারণতঃ রাষ্ট্রই নূতন শিল্পস্থাপন করিবে। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন বেসরকারী উদ্যোগও প্রচেষ্টার উপর ন্যস্ত থাকিবে কিন্তু এই ক্ষেত্রেও প্রয়োজনবোধে নূতন শিল্প স্থাপনের অধিকার রাষ্ট্রের থাকিবে।

১৯৫১ সালের শিল্পউন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ আইন (Industrial Development and Regulation Act) অনুসারে বেসরকারী শিল্পগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই আইনের তিনটি প্রধান বিষয় হইল, (১) এক লক্ষ টাকার অধিক মূলধন লইয়া গঠিত শিল্পগুলিকে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে ; (২) তালিকাভুক্ত কোনো শিল্পের জন্য সরকার উন্নয়ন পরিষদ (Development Council) গঠন করিতে পারিবেন এবং (৩) এই আইন দ্বারা কতকগুলি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হইয়াছে। যদি কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন অথবা মান হ্রাস পায় অথবা উহা পণ্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি করে তাহা হইলে সরকার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বা মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে নির্দেশ জারি করিতে পারেন। প্রয়োজন মনে করিলে সরকার উহার পরিচালনা ভারও গ্রহণ করিতে পারেন।

পরিকল্পনাকালে সরকারী ও বেসরকারীক্ষেত্রে বিনিয়োগের অনুপাত ক্রমশই পরিবর্তিত হইতেছে। প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগের অনুপাত ছিল ৫০ : ৫০ ; দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহার অনুপাত দাঁড়ায় ৫৬ : ৪৪ ; তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি পাইয়া এই অনুপাত ৫৯ : ৪১-এ আসিয়া দাঁড়ায়।

আয়বণ্টনের বৈষম্য দূরিকরণের জন্য করব্যবস্থাকে অধিকতর গতিশীল করা হইয়াছে। দানকর, সম্পত্তিকর, মূলধনী লাভ কর প্রভৃতি প্রবর্তন করা হইয়াছে।

বিভিন্ন শ্রম-কল্যাণকর আইন পাশ করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে নিরাপত্তা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে।

মিশ্র অর্থনীতির অপরিহার্য অঙ্গ হইল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা। সমাজের সর্বাধিক

কল্যাণের জন্য জাতীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এবং সমবণ্টন প্রয়োজন। দেশের বেসরকারী এবং সরকারী কার্যকলাপ যাহাতে এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তাহার জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা করা হয়। ইহার দ্বারা সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোয় ভারসাম্য সৃষ্টি করা যায়।

ভারতে ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির ভিত্তি হইল মিশ্র অর্থনীতি। অর্থাৎ এই শিল্পনীতিতে সুস্পষ্টভাবে ইহা ঘোষণা করা হইয়াছে যে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোয় সরকারী ও বে-সরকারী উভয়প্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্থান থাকিবে। এই ঘোষণায় শিল্পগুলিকে মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথমতঃ দেশরক্ষা ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারে রাখা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ভিত্তিমূলকও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি সরকারী মালিকানায় গড়িয়া উঠিবে এবং এই শ্রেণীতে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে জাতীয়করণের প্রশ্ন উঠিবে। তৃতীয় শ্রেণীতে যে সকল বে-সরকারী শিল্প থাকিবে তাহাদের উপর অল্পবিস্তর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী মালিকানার অধীনে থাকিবে।

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমষ্টিগত কল্যাণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে যাহাতে দুই বিরুদ্ধধর্মী সমাজব্যবস্থার কুফলগুলিকে বর্জন করিয়া এক সর্বগুণসম্পন্ন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তোলা যায়। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের সর্তই হইল বেসরকারী উদ্যোগ ও মালিকানার সংকোচন এবং সরকারী মালিকানা ও উদ্যোগের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ। সেই কারণে ১৯৫৬ সালের বিঘোষিত শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রকে অধিকতর সম্প্রসারণ করার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রথম শিল্পনীতিতে মাত্র ৯টি শিল্পকে রাষ্ট্রের একচেটিয়া মালিকানাধীনে রাখা হয় কিন্তু দ্বিতীয় শিল্প-নীতিতে ১৭টি শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে ব্যক্তিগত মুনাফা নয়—সামাজিক লাভের পরিমাণই হইবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির মানদণ্ড। অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাকে এরূপভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সাথে সাথে আয়বণ্টনের ক্ষেত্রে অধিকতর সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে আরো দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেগুলিকে পরিবর্তন করিতে হইবে নতুবা উৎখাত করিতে হইবে।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র—যাহা মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তি—গঠন করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানার সম্প্রসারণ প্রয়োজন :

প্রথমতঃ, যে সকল উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা ব্যতীত উহাদের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভবপর নয়। উন্নয়নের এই ব্যাপক কর্মসূচীকে রূপায়িত করিবার মতো ইচ্ছা বা অর্থ কোনটাই বেসরকারী উদ্যোগের নাই। পরিকল্পনাকে সফল করিতে রাষ্ট্রীয় ভূমিকার সম্প্রসারণ অপরিহার্য।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত উদ্যোগের মূল প্রেরণা হইল দ্রুত এবং সর্বাধিক মুনাফা অর্জন —সমাজকল্যাণ নয়। যে সকল ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ স্বল্প বা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ সাধারণতঃ সেই সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ অগ্রসর হইতে দ্বিধাবোধ করে। এই কারণে বৃটিশযুগে ভারতে ভোগ্যবস্তু শিল্পের কিছু বিকাশ ঘটিয়াছিল কিন্তু ভারী ও মূলধনী শিল্পের উন্নয়ন মোটেই ঘটে নাই। যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ আগাইয়া আসিতে চায় না সেই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে অগ্রসর হইতে হইবে তবেই দেশের সুষম উন্নয়ন সম্ভবপর হইবে।

তৃতীয়তঃ, ভারত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে তাহা বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে আয়ের ন্যায্য বণ্টন, অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং সামাজিক কল্যাণের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। ইহার জন্য রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার অপরিহার্য।

চতুর্থতঃ, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনায় প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ উৎপাদনে অগ্রাধিকার দিয়া কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। সমাজের মঙ্গল এবং অর্থ নৈতিক উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে এইভাবে কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয় না।

পঞ্চমতঃ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশ হইতে শিল্পজ্ঞান, ঋণ, বিনিয়োগ এবং সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। এই সকল কাজের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সম্প্রসারণ অপরিহার্য।

ঘাটতি ব্যয় (Deficit Financing): অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে আর্থিক সম্বল প্রয়োজন তাহা কিভাবে সংগ্রহ করা যাইতে পারে সে সম্পর্কে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।* বর্তমানে ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে মূলধন গঠনের নূতন এবং সর্বাধুনিক পদ্ধতি হইল ঘাটতি ব্যয়। মোট সরকারী ব্যয় মোট রাজস্ব অপেক্ষা অধিক হইলে বাজেট ঘাটতি হয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারকে ঋণগ্রহণ করিতে হইবে অথবা কাগজী নোট ছাপাইয়া অতিরিক্ত ব্যয় মিটাইতে হইবে। ইহাকে ঘাটতি ব্যয় বলে।

ঘাটতি ব্যয় কাহাকে বলে

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের মতে সরকার প্রতি বৎসরই আয়-ব্যয়ে সমতা রক্ষা করিয়া চলিবে অর্থাৎ সরকারের মোট রাজস্বের পরিমাণ মোট ব্যয়ের পরিমাণের সমান হইবে। ইহাদের মতে বেসরকারী উদ্যোগই দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠিত

* পৃষ্ঠা ১১—১৫

করিতে পারে। সরকার অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তর বৃদ্ধি করিতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সমাজে পূর্ণ নিয়োগ নাই, প্রচুর অব্যবহৃত জনসম্পদ রহিয়াছে। ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ অনুযায়ী ভোগ ও সঞ্চয় উভয়েই এক সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে পারে না; কারণ সমাজে পূর্ণ নিয়োগ (full employment) বিদ্যমান। কিন্তু আধুনিক অপূর্ণ নিয়োগতত্ত্ব অনুসারে ভোগ ও সঞ্চয় উভয় একই সাথে বৃদ্ধি পাইতে পারে। ক্ল্যাসিক্যাল মতানুসারে ঘাটতি ব্যয় করিলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে কিন্তু আধুনিক মতানুসারে উহা করিলে সমাজে পূর্ণ নিয়োগ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে না। দেশে যদি পূর্ণ নিয়োগ বহাল থাকে তাহা হইলে ঘাটতি ব্যয়ের দরুণ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে কিন্তু যদি অ-পূর্ণ নিয়োগ বহাল থাকে তাহা হইলে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে উৎপাদন, আয় এবং নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু মূল্যস্তর একই থাকিয়া যাইবে।

কেনসের মতে শুধুমাত্র বেসরকারী বিনিয়োগের ফলে পূর্ণ নিয়োগের অবস্থায় পৌছানো যায় না। সুতরাং অব্যবহৃত জনশক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগাইবার জন্য ঘাটতি ব্যয় সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। অধ্যাপক হ্যানসেন ও লার্ণারের মতে সমতাহীন বাজেট উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধির অন্যতম অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার বাণিজ্যচক্রের প্রতিবিধানের জন্য সমতাহীন বাজেট বিশেষ প্রয়োজনীয়। দেশে ব্যাপকভাবে বেকার সমস্যা দেখা দিলে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে সরকারকে ঘাটতি ব্যয় করিতে হইবে। কর ধার্য অপেক্ষা ঘাটতি ব্যয় শ্রেয় কারণ করের পরিমাণ সীমা ছাড়াইয়া গেলে উৎপাদন ব্যাহত হইতে পারে। অর্ধোন্নত দেশে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অভাব বলিয়া এই সকল দেশে দ্রুত উন্নয়নের জন্য ঘাটতি ব্যয় অপরিহার্য। কর ও ঋণের মাধ্যমে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয় বলিয়া এই সকল দেশে দ্রুত কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিয়া জাতীয় আয় বাড়াইতে হইলে ঘাটতি বাজেটের পথ অনুসরণ করা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় থাকে না।

ঘাটতি ব্যয়ের স্বপক্ষে এই সকল যুক্তি দেখানো হয়: প্রথমতঃ, কেন্সের মতে শুধুমাত্র সরকারী বিনিয়োগের ফলে পূর্ণ নিয়োগের অবস্থায় পৌছানো যায় না। অব্যবহৃত জনশক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগাইবার জন্য ঘাটতি ব্যয় সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। দেশে ব্যাপকভাবে বেকার সমস্যা দেখা দিলে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে সরকারকে ঘাটতি ব্যয় করিতে হইবে। কর ধার্য অপেক্ষা ঘাটতি ব্যয় শ্রেয় কারণ করের পরিমাণ অতিরিক্ত হইলে উৎপাদন ব্যাহত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের মতে ঘাটতি ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় কিন্তু সব সময় ইহা সত্য নয়। সমাজে পূর্ণ নিয়োগের অবস্থা না থাকিলে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে না। তৃতীয়তঃ, অর্ধোন্নত দেশে পর্যাপ্ত আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় নাই বলিয়া এই সকল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঘাটতি ব্যয় অপরিহার্য। অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত উন্নয়ন করিতে হইলে ঘাটতি বাজেটের পথ অনুসরণ করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। পরিশেষে ঘাটতি ব্যয় সরকারী বিনিয়োগের

স্বপক্ষে যুক্তি

উদ্দেশ্যে সুলভ এবং সহজে অর্থপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। ইহা সরকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থায় স্থিতিস্থাপকতা আনিয়াছে।

ঘাটতি ব্যয়ের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল মুদ্রাস্ফীতির যুক্তি। একবার ঘাটতি ব্যয়ের অভ্যাস হইয়া গেলে সরকার আর উহা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে না; ফলে সরকারী অমিতব্যয়িতা এবং পরিশেষে চরম মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা দেখা দিবে।

বিপক্ষে যুক্তি

একটু আধটু মদ্যপানের প্রভাব অসুস্থ শরীরের পক্ষে ভালো হইতে পারে কিন্তু যদি একবার সংকোচ কাটিয়া যায় তাহা হইলে উহা অভ্যাসে পরিণত হইয়া মারাত্মক পরিণতি ঘটাইতে পারে। সেই কারণে সাবধানতা সহকারে ঘাট্তি বাজেট করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, ঘাট্তি ব্যয়ের ফলে সমাজকে কিছু প্রকৃত ভার বহন করিতে হয়। ঋণ করিয়া ঘাটতি ব্যয় করা হইলে সুদ বাবদ অর্থ ধনীদের নিকট চলিয়া যায়। এই সুদের অর্থ যদি রাজস্ব হইতে আসে তাহা হইলে দরিদ্রের টাকা ধনীর নিকট হস্তান্তরিত হয় এবং ইহার দরুণ আয় বণ্টনে অসাম্য বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়তঃ, ঘাটতি ব্যয়ের ফলে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহার দরুণ যদি মুনাফা হ্রাসের আশংকায় ব্যক্তিগত বিনিয়োগের ইচ্ছা সংকুচিত হয় তাহা হইলে ঘাটতি ব্যয় না করাই বাঞ্ছনীয়।

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২৯০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার আয়তন খুব বৃহৎ ছিল না বলিয়া অর্থসংস্থানের জন্য অধিক পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় করার প্রয়োজন দেখা দেয় নাই; স্থির করা হইয়াছিল যে ২৯০ কোটি টাকার মতো ঘাটতি ব্যয় করা হইবে। যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল সেই পরিমাণ সাহায্য না পাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ৩৩৩ কোটি টাকা হয়। ইহার ফলে অর্থের যোগান অধিক বৃদ্ধি না পাওয়ায় ঘাটতি ব্যয় কোনো আর্থিক সংকটের সৃষ্টি করে নাই।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ঘাটতি ব্যয়

দ্বিতীয় পরিকল্পনার আয়তন বৃহৎ হওয়ায় এবং অন্যান্য উৎস হইতে অধিক অর্থ সংস্থানের সুবিধা না থাকায় ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের সিদ্ধান্ত করা হয়। পরিকল্পনার মোট আর্থিক সম্পদের এক চতুর্থাংশ ঘাটতি ব্যয় হইতে সংগ্রহ করা হয়। অধ্যাপক ক্যালডরের মতে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৭৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত (অর্থাৎ বৎসরে ১৫০ কোটি টাকা) ঘাটতি ব্যয়ের চাপ সহ্য করিতে পারিবে। অধ্যাপক সেনয়ের মতে এই বিরাট পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি চরম আকার ধারণ করিয়া অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে। সমালোচকগণের আশংকা যে ভিত্তিহীন নয় তাহা মূল্যস্তরের অবাধ উর্ধ্বগতি হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতির দরুণই পরিকল্পনা-ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং পরিকল্পনার দুই বৎসর পরে উহাকে কাটছাঁট করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অবশ্য প্রকৃত ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ হয় ৯৪৮ কোটি টাকা।

তৃতীয় পরিকল্পনার আয়তন দ্বিতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চাকাঙ্ক্ষী হইলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫৫০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় করা হয়। মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতি রোধের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় কোনোরূপ ঘাটতি ব্যয় করা হইবে না বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning in India): —বর্তমানযুগ পরিকল্পনার যুগ। এযুগের মূলমন্ত্র হইল "হয় পরিকল্পনা নয় ধ্বংস" (Plan or perish): পৃথিবীর বহুদেশই পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছে। আর্থিক সম্পদের দ্রুত উন্নয়নের জন্য বহুকাল হইতেই ভারতে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। ভারত অর্ধোন্নত দরিদ্র দেশ কিন্তু তাহার অর্থনৈতিক সম্পদের পরিমাণ অল্প নয়। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হইলে অব্যবহৃত সম্পদ কাজে লাগানো যাইবে এবং জনগণের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভবপর হইবে। পরিকল্পনা-পূর্ব যুগে সোভিয়েট রাশিয়ার যে অবস্থা ছিল বর্তমানে ভারতের ঠিক সেই অবস্থা। ১৯৩১ সালে স্যার আর্থার সলটার বলেন যে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে জনসাধারণের দুর্গতি ও দারিদ্র্য দূর করা সম্ভবপর হইবে। ১৯৩৫ সালে অধ্যাপক রবার্টসন ও ডাঃ বাওলে এই দেশের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন। ১৯৩৮ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন কিন্তু বহু কংগ্রেস নেতা এই সময় কারারুদ্ধ হওয়ায় এই কমিটির কাজ আর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতেই ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রচনার চেষ্টা দেখা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোম্বাই-এর আটজন শিল্পপতি মিলিয়া ১০,০০০ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা রচনা করেন। ইহাই বোম্বাই পরিকল্পনা (Bombay Plan) নামে অভিহিত। ইহার উদ্দেশ্য ছিল আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করা। ইহার পর ভারতীয় শ্রমিক ফেডারেশন এম,এন রায়ের পরিচালনায় জনগণের পরিকল্পনা (People's Plan) রচনা করা হয়। এই পরিকল্পনায় আগামী দশ বৎসরে ১৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের নির্দেশ ছিল। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল জনগণের খাদ্য, বস্ত্র এবং শিক্ষার অভাব পুরণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা রচনা করা। ইহার পর শ্রীএস. এন. আগারওয়াল ৩৫০০ কোটি টাকার গান্ধীবাদী পরিকল্পনা (Gandhian Plan) রচনা করেন। অবশেষে ১৯৫০ সালে জহরলালের সভাপতিত্বে ভারতে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং কমিশন ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করে। বর্তমানে দেশে চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকাল সুরু হইয়াছে।

বোম্বাই পরিকল্পনা

স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ (Gold Control): তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের ফলে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। তাহার ফলে আর্থিক

সম্বল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অর্থ সংস্থানের গতানুগতিক সূত্রগুলি হইতে অধিক পরিমাণ অর্থসংগ্রহের চেষ্টা ছাড়াও দুইটি নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়— স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনা (Compulsory Deposit Scheme)। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে; এখন স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

ভারত চীন কর্তৃক আক্রান্ত হইলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য সরকার জনসাধারণকে স্বেচ্ছায় স্বর্ণ দান করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ইহাতে জনসাধারণের নিকট হইতে উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া যায় নাই। সেইজন্য ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে স্বর্ণবণ্ড (Gold Bond) প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের প্রতি তোলায় মূল্য ৬২.৫০ টাকা ধার্য করা এবং ১৫-বৎসর মেয়াদী স্বর্ণবণ্ডের জন্য ৬½% সুদ ঘোষণা করা হয়। সরকার ইহার সহিত ঘোষণা করেন যে যাহারা স্বর্ণবণ্ডে স্বর্ণ বিনিয়োগ করিবে তাহারা কি ভাবে এই স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়াছে এ সম্পর্কে কোনোরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না। যাহারা "কালো টাকা" এতোকাল স্বর্ণের মধ্যে আটক করিয়া রাখিয়াছিল তাহারাও নির্ভয়ে উহা স্বর্ণবণ্ডে বিনিয়োগ করিতে পারিবে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলাফল সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৯৬৩ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে স্বর্ণ ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক ব্যাপক নিয়ম জারী করেন। ভারতরক্ষা আইন বলে এই স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ম জারী করা হইয়াছে।

স্বর্ণনিয়ন্ত্রণের বিধি

এই নিয়মটির প্রয়োজনীয় ধারাগুলি হইল এইরূপ:

বিবিধ-ধারা

(১) বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করে এমন স্বর্ণ শোধনাগার এবং অন্যান্য স্বর্ণ ব্যবসায়ীদিগকে নূতন করিয়া লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) ১৪ ক্যারেট বিশুদ্ধতার অধিক স্বর্ণ দ্বারা অলংকার তৈয়ারী এবং বিক্রয় করা বে-আইনী;

(৩) সাধারণভাবে অলংকার ছাড়া অন্য কোনো বস্তু স্বর্ণ দ্বারা নির্মাণ করা বে-আইনী।

(৪) প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সরকারের নিকট তাহাদের মজুত স্বর্ণের হিসাব দাখিল করিতে হইবে, অবশ্য অলংকার হিসাবে যে স্বর্ণ আছে তাহার কোনো হিসাব দিবার প্রয়োজন নাই। প্রতি ব্যক্তি ৫০ গ্রাম এবং প্রতি নাবালক ২০ গ্রাম পর্যন্ত অলংকারবিহীন স্বর্ণ রাখিতে পারিবে।

(৫) ঘোষণা করা হয় নাই এরূপ স্বর্ণ বন্ধক রাখিয়া ঋণ দেওয়া বে-আইনী।

(৬) স্বর্ণ সম্পর্কে এই সকল নিয়ম বলবৎ করিবার জন্য স্বর্ণ বোর্ড (Gold Board) গঠিত হইবে।

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়ন্ত্রণ বিধি বলবৎ করা হয়। প্রথমতঃ ভারতে স্বর্ণের চাহিদা এবং মূল্য আন্তর্জাতিক বাজার অপেক্ষা অনেক বেশী। নিয়ন্ত্রণ বিধি

চালু হওয়ার পূর্বে স্বর্ণের আন্তর্জাতিক মূল্য ছিল তোলা প্রতি ৬২·৫০ টাকা। কিন্তু ওই সময়ে ভারতে প্রতি তোলা স্বর্ণের মূল্য ছিল ১৩০/১৪০ টাকার মতো। ইহার ফলে চোরাপথে বিদেশ হইতে ভারতে প্রচুর স্বর্ণ আমদানী হইত। অনুমান করা হয় যে প্রতি বৎসর ৫০ কোটি টাকার স্বর্ণ চোরাই চালান হইয়া ভারতে আসিতেছে। এইরূপ স্বর্ণ আমদানীর ফলে ৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটিতেছে। তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই বলেন যে স্বর্ণের চোরা চালান বন্ধ না করিতে পারিলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সংকট দূর করা হইবে না।

উদ্দেশ্য

দ্বিতীয়তঃ, স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধিকে বলবৎ করিতে পারিলে আন্তর্জাতিক বেসরকারী বিনিময় বাজারে ভারতীয় টাকার মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবে এবং টাকার সরকারী বিনিময় মূল্যের সহিত বেসরকারী বিনিময় মূল্যের সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তি যে টাকা অসৎ উপায়ে অর্জন করে তাহা স্বর্ণে বিনিয়োগ করা নিরাপদ। কালো টাকা প্রকাশ্যে আনিলে ধরা পড়ার আশংকা থাকে। ইহা ছাড়া কালো টাকাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিতে পারিলে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু হইলে কালো টাকা লুকাইয়া রাখা এবং কর ফাঁকি দেওয়া কঠিন হইবে।

চতুর্থতঃ, পৃথিবীর সকল দেশেই স্বর্ণ একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হয়। এই জন্য প্রায় সকল দেশেই ব্যক্তির স্বর্ণ মজুত করার উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছাড়া আর কেহই স্বর্ণ মজুত করিতে পারে না। এই সকল দেশে সরকারের হাতেই অধিক স্বর্ণ মজুত থাকে, জনসাধারণের স্বর্ণ মজুতের পরিমাণ অতি নগণ্য। কিন্তু ভারতে এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ভারতে জনসাধারণের হাতে ১৮০০ কোটি টাকার মতো স্বর্ণ রহিয়াছে (স্বর্ণের আন্তর্জাতিক মূল্য অনুসারে), অপরপক্ষে সরকারের হাতে মজুত স্বর্ণের পরিমাণ মাত্র ১৩০ কোটি টাকা। ব্যক্তিগত মালিকানায় না থাকিয়া সরকারের হাতে ওই বিরাট পরিমাণ স্বর্ণ থাকিলে দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উহা বিনিয়োগ করা যাইত।

পঞ্চমতঃ, ভারতে সামাজিক এবং ধর্মীয় কারণের জন্য স্বর্ণের চাহিদা রহিয়াছে। এই "হলদে ধাতুটির" প্রতি মানুষের দুর্বলতা, আকর্ষণ এবং মোহ এতোই বেশী যে উহাকে অলসভাবে অকারণে ধরিয়া রাখিতে লোকে ইতস্ততঃ করে না। অবশ্য দুর্দিনের নিরাপত্তা হিসাবে এবং সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধির উপায় হিসাবে স্বর্ণ এক প্রয়োজনীয় ভূমিকা দখল করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু বর্তমানের পরিস্থিতিতে স্বর্ণ মজুত করিয়া রাখা একটি অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধির কিছু সংশোধন করা হয়। স্থির হইয়াছে যে স্বয়ং নিযুক্ত (self employed) স্বর্ণশিল্পীরা ১৪ ক্যারেট বিশুদ্ধতার অধিক স্বর্ণালংকার ভাঙ্গিয়া পূর্বের বিশুদ্ধতার অলংকার নির্মাণ করিতে পারিবে, বর্তমানে স্বর্ণ

নিয়ন্ত্রণ বিধিকে বলবৎ করিবার জন্য স্বর্ণ বোর্ডের পরিবর্তে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রশাসক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধিতে স্বর্ণালংকারকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিরা স্বর্ণপিণ্ডকে স্বর্ণালংকারে রূপান্তরিত করিয়া আইন ফাঁকি দিবে।

মূল্যায়ন

স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিধির প্রয়োজনীয়তা আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই কিন্তু সেই সঙ্গে ইহার ফলে সমাজে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিধি চালু হওয়ার ফলে কয়েক লক্ষ স্বর্ণকার বেকার হইয়া পড়িয়াছে। সরকারী নীতির দরুণ ইহারা বেকার হইয়াছে সুতরাং ইহাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার দায়িত্বও সরকারেরই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
(India's First and Second Five Year Plan)

[বিষয়বস্তু : প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—উদ্দেশ্য—ব্যয়বরাদ্দ—অর্থসংগ্রহ—উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা—প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—উদ্দেশ্য—ব্যয়-বরাদ্দ—অর্থসংগ্রহ—উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা—দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনর্বিচার—প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল—পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসর।]

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (The First Five Year Plan) : ১৯৫০ সালে জহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া রচনা করা হয় এবং ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ইহাকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়।

উদ্দেশ্য (Objective) : ভারতে পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইবে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা এবং তাহাদের সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সুযোগ করিয়া দেওয়া। সুতরাং পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হইবে মানবিক এবং পার্থিব সম্পদের যোগ্য ব্যবহার করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং ধনবৈষম্য হ্রাস করা। শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণ করা হইলে উহা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আয় বাড়াইবে কিন্তু জনসাধারণের দারিদ্র্যের কিছুমাত্র লাঘব হইবে না। ফলে বৃহত্তর সামাজিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। আবার উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো প্রচেষ্টা না করিয়া শুধুমাত্র সম্পদের পুনর্বণ্টন করিলে সকলের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা যাইবে না। সুতরাং পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইবে দ্বিমুখী—উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বৈষম্য হ্রাস।

প্রথম পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য দুইটি : (১) যুদ্ধ ও দেশ বিভাগের ফলে যে সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করা এবং (২) এমন একটি উন্নয়ন পদ্ধতির সৃষ্টি করা যাহা উত্তরকালে বৃহত্তর প্রচেষ্টার ভিত্তিভূমি হইতে পারিবে। বিনিয়োগ এরূপ করিতে হইবে যাহাতে আগামী ২৭ বৎসরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হইতে পারে।

ব্যয় বরাদ্দ (Outlay of the Plan) : প্রথম পরিকল্পনায় ভারতের সমগ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থাকে দুইটি এলাকায় বিভক্ত করা হয়—সরকারী উদ্যোগ ও বেসরকারী উদ্যোগ। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনায় ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল, পরবর্তীকালে বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ইহা বৃদ্ধি করিয়া ২৩৭৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধার্য হয়। এই ২৩৭৮ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ১৩৯০ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারগুলির ৯৮৮ কোটি টাকা ব্যয় করিবার কথা ছিল। কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ১৯৬০ কোটি টাকা। প্রাথমিক ব্যয়বরাদ্দ ২০৬৯ কোটি টাকা ও সংশোধিত ব্যয়বরাদ্দ ২৩৭৮ কোটি টাকা বিভিন্ন উন্নয়ন ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যয় করার কথা ছিল তাহা দেখান হইল।

যে সময় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল সেই সময় খাদ্য সমস্যাই দেশের বৃহত্তর সমস্যা ছিল এবং সেই কারণে কৃষি, সেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের

উন্নয়নক্ষেত্র	প্রাথমিক হিসাব পরিমাণ (কোটি টাকা)	মোট ব্যয়ের শতকরা হার	সংশোধিত হিসাব পরিমাণ (কোটি টাকা)	মোট ব্যয়ের শতকরা হার	প্রকৃত ব্যয় (কোটি টাকা)	মোট ব্যয়ের শতকরা হার
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৩৬১	১৭'৫	৩৫৪	১৪'৯	২৯১	১৫
২। সেচব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ	৫৬১	২৭'১	৬৪৭	২৫'২	৫৭০	২৯
৩। পরিবহণ	৪৯৭	২৪'০	৫৭১	২৪'০	৫২৩	২৭
৪। শিল্প ও খনি	১৭৩	৮'৪	১৮৮	৭'৯	১১৭	৬
৫। সমাজ সেবা	৭২৫	২০'৫	৫৩২	২২'৪	৪৫৯	২৩
৬। বিবিধ	৫২	২'৫	৮৬	৩'৬		
মোট	২০৬৯	১০০'০	২৩৭৮	১০০'০	১৯৬০	১০০

উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়—মোট ব্যয়ের ৪২ ভাগ ওই খাতে ব্যয় করা হয়। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং দেশের শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। তাহা ছাড়া কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না

হইলে দেশের অধিকাংশ লোকের আয় বাড়িতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কৃষির উন্নতি ব্যতিরেকে শিল্পের উন্নয়ন সম্ভবপর নয় কারণ কৃষির উন্নতি হইলেই শিল্পে কাঁচামালের যোগান বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়তঃ কৃষি উৎপাদন এদেশে অবিশ্বাস্য রকমের স্বল্প এবং কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে আয় শিল্পের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে জলসেচের সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন, জমিতে সার দেওয়া দরকার এবং কৃষকদিগকে অল্পমূল্যে বা ন্যায্যমূল্যে উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ করা প্রয়োজন। প্রথম পরিকল্পনায় এই সকল কৃষি সমস্যার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। পরিবহণ ব্যবস্থার উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃষি এবং কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পের উপর অধিক বিনিয়োগ সম্ভবপর হয় নাই। শিল্প উন্নয়নের ভার প্রধানতঃ বেসরকারী উদ্যোগের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

অর্থসংগ্রহ (Financing the Plan) : পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে অর্থের প্রয়োজন। পরিকল্পনায় প্রকৃত ব্যয় হয় ১৯৬০ কোটি টাকা। ওই টাকা নিম্নলিখিত সূত্রগুলি হইতে সংগ্রহ করা হয়।

আয়ের উৎস	পরিমাণ	মোট ব্যয়ের %হার
১। কর রাজস্ব ও রেলপথ হইতে উদ্বৃত্ত	৭৫২	৩৮
২। জনগণের নিকট হইতে ঋণ	৫০৯	২৬
৩। বৈদেশিক সাহায্য	১৮৮	১০
৪। ঘাটতি ব্যয়	৪২০	২১
৫। অন্যান্য উৎস	৯১	৫
মোট	১৯৬০	১০০

উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (Targets of Production) :

[এক] **কৃষিক্ষেত্র :** সংশোধিত হিসাবের মোট ব্যয়ের শতকরা ৪২ ভাগ কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ এবং সমাজোন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের উপর যে অগ্রাধিকার আরোপ করা হইয়াছিল তাহা ব্যয় বরাদ্দের ওই পরিমাণ হইতে জানা যায়। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির এইরূপ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য ছিল : খাদ্যশস্য শতকরা ১৪ ভাগ ; পাট শতকরা ৬৪ ভাগ ; তুলা শতকরা ১৪ ভাগ ; ইক্ষু শতকরা ১৩ ভাগ এবং তৈলবীজ শতকরা ৮ ভাগ। সেচব্যবস্থার উন্নতি, সমবায় পদ্ধতিতে চাষ, ভূমিক্ষয় নিবারণ, আবাদযোগ্য জমির পুনরুদ্ধার, বন সংরক্ষণ, ভূমিসংস্কার, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করিতে হইবে। জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা এবং সমাজোন্নয়ন প্রথম পরিকল্পনার অভিনব আবিষ্কার। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তায় এবং সমবায় পদ্ধতিতে আত্মনির্ভরশীল হইয়া গ্রামীণ জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করাই হইল সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। প্রথম পরিকল্পনায় ১৩ লক্ষ

কিলোওয়াটের মতো অতিরিক্ত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের এবং ৬ কোটি একর জমিকে জলসেচের অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

[দুই] শিল্পক্ষেত্র : প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ ব্যয় বরাদ্দ করার ফলে শিল্পের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। সংশোধিত হিসাবানুসারে মোট ব্যয়ের মাত্র শতকরা ৭·৯ ভাগ শিল্প ও খনির জন্য বরাদ্দ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব প্রধানতঃ বেসরকারী উদ্যোগের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি অনুসারে সরকার নিজেও কতকগুলি মূল শিল্প সম্প্রসারণের ভার গ্রহণ করে। সরকারী মালিকানায় সিন্ত্রীর সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানা, ইনটিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী, হিন্দুস্থান মেশিন টুলস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃহদায়তন শিল্প এবং খনিখাতে ১৩৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। বেসরকারী ক্ষেত্রে ২৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২টি শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা করা হয়। বৃহদায়তন শিল্প ছাড়াও গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিতে হয়, পরে সংশোধিত হিসাবে উহা বৃদ্ধি করিয়া ৪৯ কোটি টাকা ধার্য করা হয়।

[তিন] পরিবহণ ব্যবস্থা : প্রথম পরিকল্পনায় পরিবহণ খাতে সংশোধিত হিসাবানুসারে ৫৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়—উহা মোট ব্যয়ের শতকরা ২৪ ভাগ। ইহার মধ্যে রেলপথের জন্য ২৬৭ কোটি টাকা এবং রাজপথ ও পথ পরিবহণের জন্য ১৪৭ কোটি ধার্য করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রথম পরিকল্পনায় পরিবহণ ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

[চার] সমাজকল্যাণ : প্রথম পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজকল্যাণের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হয়। মোট ব্যয়ের শতকরা ২২·৪ ভাগ এই খাতে বরাদ্দ করা হয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয় সকল সম্প্রসারণের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় ছিল। ইহা ছাড়া কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষালয়গুলির উন্নতিকল্পে এবং জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাখাতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়। অবশ্য এই খাতে আরও অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন কিন্তু সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার দরুণ তাহা করা সম্ভব হয় নাই।

[পাঁচ] কর্মসংস্থান বৃদ্ধি : বেকার সমস্যা ভারতের এক বৃহত্তর অর্থনৈতিক সমস্যা। একদিকে রহিয়াছে বিপুল সংখ্যক পূর্ণ বেকার আর অপরদিকে কৃষিক্ষেত্রে রহিয়াছে লক্ষ লক্ষ অর্ধবেকার। প্রথম পরিকল্পনায় ৫৭·৫ লক্ষ লোকের অতিরিক্ত নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া ধরা হয়। ইহা ছাড়া কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে প্রায় ৩৬ লক্ষ লোকের পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা করা হয়। ইহা ছাড়া পরোক্ষভাবে এবং স্থানীয় কার্যের নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে আরও কিছু কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল (Achievements of the First Five Year Plan) : বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব

যে প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল সন্তোষজনক। পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয় শতকরা ১৮ ভাগ এবং মাথাপিছু আয় শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি করা। এই পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় শতকরা ১৮ ভাগ বাড়িয়াছে এবং মাথাপিছু আয় বাড়িয়াছে শতকরা ১১ ভাগ। ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয় ছিল ৮৮৫০ কোটি টাকা এবং মাথাপিছু আয় ছিল ২৪৬.৩ টাকা, ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১০৪৮০ কোটি টাকা ও ২৭৩.৬ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে সরকারী ও বেসরকারীক্ষেত্রে মিলিত ভাবে মোট ৩৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োজিত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল কিন্তু কার্যতঃ মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১০০ কোটি টাকা।* সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণ হইলেও বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই।

আয় বৃদ্ধি

প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এই পরিকল্পনার ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন পাঁচ কোটি টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬.৫ কোটি টনে আসিয়া দাঁড়ায়; অর্থাৎ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা ২৯.৬ ভাগ। বাণিজ্যিক শস্যের মধ্যে তুলা ও তৈল বীজের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াইয়া যাইলেও পাট ও ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাইতে পারে নাই। পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট এক কোটি ৬৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। ভূমি সংস্কারের কাজের যথেষ্ট অগ্রগতি হয় এবং ভারতের গ্রামবাসীদের শতকরা ২৫ ভাগ সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে আসে। পরিকল্পনাধীন সময়ে ২৩ লক্ষ একর পতিত জমিকে চাষের উপযোগী করা হয়। এই সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াট হয়।

কৃষির অগ্রগতি

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পক্ষেত্রেও কিছু অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা ৭০ ভাগ। সরকারী অর্থানুকূল্যে বে-সরকারী শিল্পেরও যথেষ্ট সম্প্রসারণ হয়। এই পরিকল্পনার শেষে সরকারী উদ্যোগে তিনটি বৃহদায়তন লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। বস্ত্র, চিনি, কাগজ, সাইকেল, সিমেণ্ট ইত্যাদির উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়। এই সময় জাহাজ নির্মাণ, তৈল শোধনাগার, বিমানপোত নির্মাণ, পেনিসিলিন উৎপাদন প্রভৃতি নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া ওঠে। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য ৪৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়।

শিল্পের অগ্রগতি

প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থারও উল্লেখযোগ্য

*বিনিয়োগের হার মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৪.৯ ভাগ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৭ ভাগে আসিয়া দাঁড়ায়।

অগ্রগতি হয়। ৩৮০ মাইল নূতন রেলপথের পত্তন, ৫০০ মাইল পুরাতন রেলপথের সংস্কার, ৬৩৬ মাইল নূতন রাস্তা এবং পুরাণো ৪০০০ মাইল রাস্তার সংস্কার—এই সবই প্রথম পরিকল্পনাকালে হয়। রেলপথ-গুলি এই সময় শতকরা ২৫ ভাগ অতিরিক্ত মালপত্র বহন করিতে সমর্থ হয়।

পরিবহণ

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণের অন্যান্য দিকেও অগ্রগতি মোটামুটি সন্তোষজনক।

এই পরিকল্পনায় কর্ম সংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ হইলেও উহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। কৃষি ও কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ায় গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যা বেশ কিছু হ্রাস পায় কিন্তু নগরাঞ্চলের বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে।

নিয়োগ

প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে ৩৩৩ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় নাই : বরং উহা শতকরা ১৩ ভাগ হ্রাস পায়।

প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটিভাবে সফল হইলেও ইহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি চোখে পড়ে। প্রথমতঃ, এই পরিকল্পনায় স্বল্পমেয়াদী অপেক্ষা দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দ হয় ২৩৭৮ কোটি টাকা কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় মাত্র ১৯৬০ কোটি টাকা, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে সকল নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণে পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করে নাই। আর একটি ত্রুটি এই যে এই পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী উদ্যোগের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবশ্য সকল দোষত্রুটি সত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে প্রথম পরিকল্পনা ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গতিবেগের সঞ্চার করিয়াছে।

মূল্যায়ন

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (Second Five Year Plan) : প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয় ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে। ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল আরম্ভ হয় এবং ১৯৬১ সালের ৩১ মার্চ তারিখে ইহার কার্যকাল শেষ হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা চলাকালীন অবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রা সংকট চরমে উঠায় এবং অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় হওয়ায় ১৯৫৮ সালে পরিকল্পনার কিছু কাটছাঁট এবং পরিবর্তন করা হয়।

উদ্দেশ্য (Objectives) : দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল চারটি : (১) জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ বাড়াইয়া জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা। প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটিভাবে সফল হইলেও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান মোটেই উন্নত হয় নাই বা তাহাদের দুর্দশার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। সেই কারণে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উপর দ্বিতীয় পরিকল্পনার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় ; (২) ভারী ও মূল শিল্পগুলির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া দ্রুততর গতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্প সম্প্রসারণ করিতে হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাই শিল্পোন্নয়নের উপর যথোচিত

গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভবপর হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের ভিত্তি ব্যাপকতর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। (৩) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা এই পরিকল্পনার একটি মূল লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই পরিকল্পনায় ৮০ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধির কথা বলা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ বৃদ্ধির কোনো লক্ষ্য ছিল না কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যতম মূল উদ্দেশ্যই হইতেছে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। (৪) আয় বৈষম্য হ্রাস করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শ এই পরিকল্পনার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ বলিতে বুঝায় যে, সমাজের কাঠামোকে এরূপভাবে পরিবর্তিত করিতে হইবে যাহাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে আয় ও সম্পদ বণ্টনে অধিকতর সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সকল অর্থ যাহাতে মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হইতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারী নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে হইবে এবং বেসরকারী উদ্যোগকে সমাজ-অনুমোদিত পথে পরিচালিত করিতে হইবে। ধনবৈষম্য সরাসরি দুইভাবে হ্রাস করা যাইতে পারে—যাহাদের আয় খুব বেশী তাহাদের আয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে আর যাহাদের আয়ের পরিমাণ খুব কম তাহাদের আয় বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রসার এবং ফিসক্যাল পদ্ধতির মাধ্যমে ধনবৈষম্য হ্রাস করা যাইতে পারে।

ব্যয়বরাদ্দ (Outlay of the Plan) : মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি টাকা এবং বে-সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ২৪০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে যে টাকা বরাদ্দ করা হয় তাহার দ্বিগুণেরও বেশী টাকা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে লগ্নী করা হয়। মোট সরকারী ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে ২৫৫৯ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের এবং ২২৪১ কোটি টাকা রাজ্যসরকারগুলির ব্যয় করিবার কথা ছিল। সরকারী ক্ষেত্রের ৪৮০০ কোটি টাকা বিভিন্ন উন্নয়নখাতে নিম্নলিখিতরূপে ব্যয় করা হইবে :

উন্নয়ন ক্ষেত্র	কোটি টাকা	মোট ব্যয়ের %হার
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৫৬৮	১২
২। সেচ ও বিদ্যুৎ	৯১৩	১৯
৩। শিল্প ও খনি	৮৯০	১৮
৪। পরিবহণ ব্যবস্থা	১৩৮৫	২৯
৫। সমাজসেবা	৯৪৫	২০
৬। বিবিধ	৯৯	২
মোট	৪৮০০	১০০

প্রথম পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের শতকরা ১৫ ভাগ কৃষি ও সমাজোন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হয় অপরপক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ওই খাতে ব্যয়বরাদ্দ ছিল মোট ব্যয়ের শতকরা ১২ ভাগ, খনি ও শিল্পখাতে প্রথম পরিকল্পনায় ব্যয়বরাদ্দ ছিল মোট ব্যয়ের শতকরা ৮ ভাগ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ওই খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ মোট ব্যয়ের শতকরা ১৮ ভাগ।

অর্থসংগ্রহ (Financing the Plan) : সরকারী ক্ষেত্রে যে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে তাহা নিম্নলিখিত সূত্রগুলি হইতে সংগ্রহ করা হইবে :

আয়ের উৎস	কোটি টাকা
১। আভ্যন্তরীণ ঋণ	১২০০
২। ঘাটতি ব্যয়	১২০০
৩। চল্‌তি রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত (নূতন ও পুরাতন কর)	৮০০
৪। বৈদেশিক সাহায্য	৮০০
৫। অন্যান্য আভ্যন্তরীণ উৎস (রেলওয়ে ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড)	৪০০
৬। ঘাটতি—হয় বৈদেশিক সাহায্য, নয় নূতন কর স্থাপন, নয় ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে	৪০০
	৪৮০০ কোটি টাকা

উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (Targets of Production) :

[এক] কৃষিক্ষেত্র : দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধিসাধন করার লক্ষ্য গৃহীত হয়। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৬.৫ কোটি টন হইতে বাড়িয়া ৭.৫ কোটি টনে পরিণত হইবে। ইহার ফলে দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ১৭.২ আউন্স হইতে বাড়িয়া ১৮.৩ আউন্সে আসিয়া দাঁড়াইবে। তুলার উৎপাদন ৩১%, তৈলবীজের উৎপাদন ২৭% এবং ইক্ষুর উৎপাদন ২২% বৃদ্ধি পাইবে। এই পরিকল্পনাকালে ২১০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ প্রসার এবং ৩৫ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য করা হয়।

[দুই] শিল্পক্ষেত্র : শিল্পোন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দায়িত্বপূর্ণ সাহসিকতা দেখা যায়। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহদায়তন শিল্প ও খনির জন্য ৬৯০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ বরাদ্দ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় ওই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৩৯ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের শতকরা ৫.৪%; বৃহদায়তন শিল্প ও খনি ছাড়া গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরও ২০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। শিল্প ও খনি খাতে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৭৫ কোটি টাকা হইবে বলিয়া হিসাব

করা হয়। সরকারী ক্ষেত্রের সমস্ত টাকাটাই লোহ ও ইস্পাত শিল্প, কয়লা, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রভৃতি মূলশিল্প বিকাশের জন্য ব্যয় করা হইবে। দুর্গাপুর, ভিলাই, রুরকেল্লা—এই তিনটি স্থানে বৈদেশিক সহযোগিতায় সরকারী ক্ষেত্রে তিনটি ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হয় এবং ইস্পাতের উৎপাদন ১৩ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২০ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কয়লার উৎপাদন শতকরা ৫৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা হয়। বেসরকারী ক্ষেত্রে ওই সময় ইস্পাত উৎপাদন ১২.৫ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২৩ লক্ষ টনে আনিবার লক্ষ্য ধার্য করা হয় (অর্থাৎ সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ইস্পাতের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ৪৩ লক্ষ টন) সিমেন্টের উৎপাদন ৫০ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া এক কোটি ৩০ লক্ষ টন হইবে বলিয়া হিসাব করা হয়। খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন পরিকল্পনাধীন সময়ে ৫৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। ভোগ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে তুলা বস্ত্রের উৎপাদন ২৪%, চিনির উৎপাদন ৩৫% এবং কাগজের উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প উন্নয়নের জন্য যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং ওই খাতে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় ওই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটি টাকা। তিনটি কারণের জন্য ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথমতঃ, এই শিল্পগুলি শ্রম-প্রগাঢ় বলিয়া কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করিবে। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের প্রসার ঘটিলে যে মূলধন গ্রামাঞ্চলে সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা ব্যবহার করার সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়তঃ, এই সকল শিল্পের সাহায্যে অর্থনীতিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং ধনবৈষম্য হ্রাস করা যাইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হয় যে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় ভারতীয় অর্থ-নীতিকে চালিতে হইবে। এই নীতি অনুসারে সরকার দেশের শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, বেসরকারী মালিকানাকে সংকুচিত এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজের সম্প্রসারণ করিয়া আয়-বৈষম্য হ্রাস করিতে হইবে।

[তিন] পরিবহণ ব্যবস্থা : দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট ১৩৮৫ কোটি টাকা পরিবহণ এবং যোগাযোগ খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়—উহা মোট ব্যয়ের প্রায় ২৯ ভাগ। অপরপক্ষে প্রথম পরিকল্পনায় পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ২৪.৪ ভাগ বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ১৩৮৫ কোটি টাকার মধ্যে ৯০০ কোটি টাকা রেল পরিবহণের জন্য বরাদ্দ করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে যাত্রী বহনের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ এবং মালপত্র বহনের পরিমাণ শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া হিসাব করা হয়। রেলপথ ছাড়াও পথ পরিবহণ, জাহাজ-চলাচল, বিমান চলাচল, ডাক ও তার প্রভৃতির উন্নয়নের জন্য কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়।

[চার] সমাজকল্যাণ : দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমাজসেবার জন্য ৯৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়—উহা মোট ব্যয়ের শতকরা ২০ ভাগ। প্রথম পরিকল্পনায় এই

খাতে মোট ব্যয়ের পরিকল্পনা ছিল ৫৩২ কোটি টাকা—উহা মোট ব্যয়ের ২২'৪%; দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে অধিক সংখ্যক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ডাক্তার, নার্স এবং হাঁসপাতালের শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার নীতি গৃহীত হয়। পরিবার পরিকল্পনার জন্য চার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং শ্রম কল্যাণ কার্যক্রম রূপায়নের জন্য ২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

[পাঁচ] **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :** দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের লক্ষ্য স্থির করা হয়। ইহা ছাড়া কৃষি ও গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতির ফলে গ্রামাঞ্চলের অর্ধনিয়োগের পরিমাণ বহু পরিমাণ হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ, এবং সঞ্চয় জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০ ভাগ হইবে বলিয়া হিসাব করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনর্বিচার (Reappraisal of the Second Plan) : ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রবর্তনের পর হইতেই বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয় এবং ক্রমে উহা সংকটের আকার ধারণ করে। ইহাকে পরিকল্পনা রচয়িতাদের "উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংকট" (Crisis of ambition) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে ভুল ভ্রান্তি এরূপ সুদূর প্রসারী হইয়াছিল যে পরিকল্পনার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের মে মাসে পরিকল্পনা কমিশন এবং জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল (National Development Council) দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে পুনর্বিচার করিতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছিল নিম্নলিখিত সর্তগুলির উপর—পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন, পর্যাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি, পর্যাপ্ত আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং মোটামুটি স্থিতিশীল মূল্যস্তর। হিসাব নিকাশ করিয়া দেখা যায় উল্লিখিত সর্তগুলির কোনটাই পূরণ হয় নাই।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশানুরূপ হয় নাই বলিয়া বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরেই খাদ্যশস্যের জন্য ১২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতে সঞ্চয় আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। হিসাব করা হইয়াছিল যে বৎসরে গড়ে ২৫০ কোটি টাকা সঞ্চিত হইবে, সুতরাং দুই বৎসরে ৫০০ কোটি টাকার মতো সঞ্চিত হইবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম দুই বৎসরে মোট সঞ্চিত হইয়াছিল মাত্র ৩২৭ কোটি টাকা।

বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণও আশানুরূপ হয় নাই। বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যা সংকটের আকার ধারণ করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই লেনদেন উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইতে আরম্ভ করে। হিসাব করা হইয়াছিল যে পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হইবে ১১০০ কোটি টাকা কিন্তু প্রথম দুই বৎসরেই ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৪৯ কোটি টাকা।

পরিশেষে, বিরাট পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়ের ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯৫৭ সালে মূল্যস্তর ১৪% বৃদ্ধি পায়। মূল্যস্তর ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইহার সমানুপাতে পরিকল্পনার ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময় সুয়েজ সংকটের জন্য আমদানীকৃত দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিকল্পনার যে লক্ষ্যমাত্রা ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পূরণ হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল, সেই লক্ষ্যমাত্রাই মুদ্রাস্ফীতির দরুণ পূরণ করিতে ৫৪০০ কোটি টাকা লাগিবে।

এই সকল কারণে ১৯৫৮ সালের মে মাসে মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনার কিছু কাটছাঁট করিয়া পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তনের ফলে পরিকল্পনাকে দুই অংশে বিভক্ত করা হয়—প্রথম অংশের জন্য ব্যয়বরাদ্দ হয় ৪৫০০ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় অংশের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হয় ৩০০ কোটি টাকা। মোট ব্যয়বরাদ্দ ৪৮০০ কোটিই রাখা হয়। প্রথম অংশে আছে জরুরী কার্যক্রম—যাহাদের কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এখন প্রথম অংশে বরাদ্দ টাকা ব্যয় করিয়া সম্ভবপর হইলে তবেই দ্বিতীয় অংশে হাত দেওয়া হইবে। প্রথম অংশের অন্তর্ভুক্ত পরিকল্পনাগুলিকে মূল পরিকল্পনা (Core projects) বলে। মূল পরিকল্পনার মধ্যে রহিয়াছে (১) দুর্গাপুর, ভিলাই ও রুরকেল্লার ইস্পাত কারখানা, (২) ১২টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচী, (৩) জাতীয় উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রস্তাবিত কয়লাখনিসমূহ, (৪) রেল ও বন্দর উন্নয়ন কর্মসূচী এবং (৫) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ। নানারূপ আলোচনার পর পরিশেষে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ ৪৫০০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৪৬০০ কোটি টাকা করা হয়। মূল বরাদ্দ ও পুনর্বিচারের পর বরাদ্দ নিম্নলিখিতরূপ হইবে:

উন্নয়ন ক্ষেত্র	মূল বরাদ্দ (কোটি টাকা)	পুনর্বিচারের পর বরাদ্দ (কোটি টাকা)
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৫৬৮	৫৩০
২। সেচ ও বিদ্যুৎ	৯১৩	৮৬৫
৩। শিল্প ও খনি	৮৯০	১০৭৫
৪। পরিবহণ	১৩৮৫	১৩০০
৫। সমাজসেবা	৯৪৫	} ৮৩০
৬। বিবিধ	৯৯	
মোট—	৪৮০০	৪৬০০

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা (A comparative study of the First Two Plans) : পটভূমিকা, উদ্দেশ্য, পরিধি এবং বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল যে আগামী ২৭ বৎসরে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করিয়া দ্বিগুণ করা। দ্বিতীয়তঃ ইহার লক্ষ্য ছিল এমন একটি উন্নয়ন পদ্ধতির সৃষ্টি করা যাহা পরবর্তীকালে বৃহত্তর পরিকল্পনার ভিত্তিভূমি হইতে পারিবে। তৃতীয়তঃ যুদ্ধ ও দেশ বিভাগের ফলে যে সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করা। অপরপক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল চারটি: জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা, দ্বিতীয়তঃ মূল ও ভারী শিল্পগুলির সম্প্রসারণ করা, তৃতীয়তঃ, দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ৮০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা এবং চতুর্থতঃ আয়বৈষম্য হ্রাস করিয়া সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় সমাজ গঠন করা।

গুরুত্ব আরোপের দৃষ্টিকোণ হইতেও পরিকল্পনা দুইটির মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের উপর এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। দুইটি কারণে প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়—প্রথম পরিকল্পনা যখন রচিত হইয়াছিল তখন খাদ্যসমস্যাই দেশের বৃহত্তম সমস্যা ছিল আর দ্বিতীয়তঃ শিল্পবিপ্লব কৃষিবিপ্লবের উপর নির্ভরশীল। দ্রুত শিল্পসম্প্রসারণ করিতে হইলে শিল্পে কাঁচামালের যোগান বাড়াইতে হইবে, কিন্তু কৃষির উন্নতি ব্যতিরেকে উহা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের জন্য দায়িত্বপূর্ণ সাহসিকতা দেখা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে কৃষিকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ও সমাজোন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৫৪ কোটি টাকা—দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ওই খাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৫৬৮ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়া ভারতীয় অর্থনীতির যে দৃঢ় ভিত্তি রচনা করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়া উহার উপর শিল্পসৌধ নির্মাণের চেষ্টা করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন প্রধানতঃ বেসরকারী উদ্যোগের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সরকারী উদ্যোগে শিল্পোন্নয়নের জন্য মোট ১৮৮ কোটি টাকা ও বেসরকারী উদ্যোগে শিল্পোন্নয়নের জন্য ৭০৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হয়। অবশ্য বেসরকারী উদ্যোগের লক্ষ্য পূরণের জন্য কিভাবে অর্থ সংগৃহীত হইবে সে বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন কোনো উল্লেখ করেন নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প বিপ্লব গড়িয়া তোলার পরিবেশ রচনা করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করিতে হইলে মূল ও ভারী শিল্পগুলিকে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। এই কারণে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে মূল ও ভারী শিল্পগুলিকে সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ও খনি খাতে সরকারী উদ্যোগে ৮৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহা ছাড়া সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণও ওই খাতে ৫৭৫ কোটি টাকার মতো হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার একটি সামাজিক উদ্দেশ্য রহিয়াছে—সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করা কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় ওই ধরণের কোনো নীতি গৃহীত হয় নাই।

সংস্কৃতিবান এবং মহত্তম জীবনের সোপান বলিয়াই উচ্চ জীবনযাত্রার মান কাম্য। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ বলিতে সেই সমাজব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে সামাজিক লাভই হইল প্রগতির মানদণ্ড এবং উন্নয়নের প্রকৃতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক এরূপভাবে পরিকল্পিত হইবে যে ইহার ফলে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সহিত ধনবৈষম্যও হ্রাস পাইতে থাকিবে।*

উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ এবং বিনিয়োগ এই সকল অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রেরই থাকিবে। উন্নয়নের দরুণ যাহাতে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণী অধিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারে এবং ধনসম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির উন্নতির জন্য পরিপূর্ণ সুযোগ সুবিধা থাকিবে। ধনবৈষম্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে এবং বেসরকারী উদ্যোগকে সমাজ-অনুমোদিত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সরকারই সামগ্রিকভাবে বিনিয়োগের প্রকৃতি নির্ধারণ করিবে। সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের চরিতার্থতায় বেসরকারী উদ্যোগকে বিচার করিতে হইবে।

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ বলিতে আমরা সেই সমাজ বুঝিব যেখানে এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণের নীতি গৃহীত হইয়াছে: জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সকল ব্যক্তির জন্য সুযোগের সম্প্রসারণ, অনগ্রসর জাতির মধ্যে উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এবং সমাজের সকল ব্যক্তির মনে অংশীদারী চেতনার সৃষ্টি করা। এই সকল উদ্দেশ্য পূরণই হইবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্ত। সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিগুলি মোটামুটি সামাজিক ও আর্থিক নীতি নির্দেশ করিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ওই নির্দিষ্ট সামাজিক লক্ষ্য পূরণ করার বাস্তবানুগ নীতি।

প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের খাতে ৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় (উহা মোট ব্যয়ের ২·১%) অপরপক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ওই খাতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় (উহা মোট ব্যয়ের ৪·১%)। প্রথম পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের খাতে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইলেও উহার গুরুত্বকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে এবং গ্রামের আর্থিক সংগঠনে অধিকতর ভারসাম্য দেখা দিবে। যেখানে বৃহদায়তন শিল্প কুটির

---

* Essentially 'socialist pattern of society' means that the basic criterion for determining the lines of advance must not be private profit but social gain, and that the pattern of development and the structure of socio-economic relations should be so planned that the result not only in appreciable increases in national income and employment but also in greater equality in incomes and wealth. Second Five Year Plan.

শিল্পের পাশাপাশি রহিয়াছে সেখানে বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে কুটির শিল্পকে রক্ষা করিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উপর অনেক বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাহা প্রধানত কার্ভে কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। তিনটি কারণের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়—(১) ইহা ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সমাধানের একটি উপায়; (২) অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণে ক্ষুদ্র এবং গ্রামীণ শিল্প সহায়তা করিবে এবং (৩) ইহার প্রসার ঘটিলে গ্রামীণ সঞ্চয় সদ্ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যতম মূল্য উদ্দেশ্য হইল কর্ম সংস্থানের প্রসার ঘটানো। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে ৪৫ লক্ষ লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। এই সময় গ্রামাঞ্চলে অর্ধ নিয়োগের সমস্যাও কিছু পরিমাণে হ্রাস পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮০ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের নীতি গ্রহণ করা হয়। ইহা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলের অর্ধ-বেকার সমস্যার তীব্রতাও কিছু কমিবে বলিয়া অনুমান করা হয়।

পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ৫৩২ কোটি টাকা অপরপক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ হইতেছে ৯৪৮ কোটি টাকা। অধ্যাপক ক্যালডরের মতে ভারত ৭৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঘাটতি ব্যয়ের ভার বহণ করিতে সক্ষম। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তর বৃদ্ধির অন্যতম কারণই হইতেছে এই বিশাল পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়। প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের অনুপাত বৃদ্ধি করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১৮৮ কোটি টাকা অপরপক্ষে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহার পরিমাণ ছিল ৮০০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা সুরু হইলে উহার সার্থক রূপায়নের পথে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেয়। আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য, মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রাসংকট এবং কৃষিজ উৎপাদনের আশানুরূপ বৃদ্ধির অভাব বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে প্রথম পরিকল্পনাকালে এই ধরণের কোনো অসুবিধা দেখা দেই নাই।

পরিশেষে বলা যায়, প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা দ্বিতীয় পরিকল্পনা অধিকতর উচ্চাভিলাষী। প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য সীমাবদ্ধ কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উদ্দেশ্য ব্যাপকতর। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা লগ্নী অনেক বেশী, দায়িত্বও অধিক। প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে সংশোধিত হিসাবানুসারে ২৩৭৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় অপর পক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূল বরাদ্দের পরিমাণ ৪৮০০ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনাকালে দেশ

পরিকল্পনার ব্যাপারে ছিল অনভিজ্ঞ কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রথম পরিকল্পনার পাঁচবৎসরের অভিজ্ঞতার পুঁজি লইয়া যাত্রা সুরু করে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমালোচনা (Criticism of the Second Plan) : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে সমালোচনা করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, বলা হয় যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ডাঃ জনমাথাই বলিয়াছিলেন যে জনসাধারণের প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যকে খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ত বলা চলে না কিন্তু প্রশাসনিক ও আর্থিক সম্পদের পরিমাণের দিক হইতে ইহা অবশ্যই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রী কে. সি. নিয়োগীও মনে করেন যে পরিকল্পনা অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

অবশ্য অর্থনীতিবদ হিগিনস্-এর মতে ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি আয়োজনের দিক হইতে উচ্চাকাঙ্খী হইলেও দেশের প্রয়োজনের দিক হইতে উহা খুবই যুক্তি-সঙ্গত। অধ্যাপক ম্যালেনবমের মতেও "উত্তোলন পর্যায়" (take-off period) দ্রুত অতিক্রম করিতে হইলে পরিকল্পনার আয়তন বৃহৎ হওয়াই প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, বিপুল পরিমাণ অর্থসংগ্রহের জন্য বৈদেশিক সাহায্য ও ঘাটতি ব্যয়ের উপর নির্ভর করা মোটেই বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয়। প্রয়োজনীয় মোট আর্থিক সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ বিদেশ হইতে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। এই ভাবে পরিকল্পনার সাফল্যকে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করায় অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণও মাত্রাতিরিক্ত হইয়াছে। পরিকল্পনার মোট আর্থিক সম্পদের এক-চতুর্থাংশ ঘাটতি ব্যয় হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে—ইহাতে ভারতের আর্থিক অবস্থা দুঃসহ হইয়া উঠিবে। অধ্যাপক ক্যালডরের মতে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৭৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত (অর্থাৎ বৎসরে ১৫০ কোটি টাকা) ঘাটতি ব্যয়ের চাপ সহ্য করিতে পারিবে। অধ্যাপক সেনয়ের মতে এই বিরাট পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি চরম আকার ধারণ করিয়া অর্থ নৈতিক বিপর্যের সৃষ্টি করিবে। সমালোচকগণের আশংকা যে অমূলক নয় মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতি হইতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালে পাইকারী মূল্যস্তর ১২৭.৫-এ আসিয়া দাঁড়ায় (১৯৫২-৫৩=১০০) অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের মূল্যস্তর শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪০০ কোটি টাকার ঘাটতি রহিয়া গিয়াছে। বলা হইয়াছে উহা বৈদেশিক সাহায্য, নতুবা কর স্থাপন নতুবা ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে। ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ই মাত্রাতিরিক্ত, ইহার উপর আবার যদি নূতন করিয়া ঘাটতি ব্যয় করা হয় তাহা হইলে অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠিবে। আবার যদি নূতন কর স্থাপন করিয়া ওই অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাহা হইলে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ব্যাহত হইবে সুতরাং উহাও বাস্তবানুগ নয়।

তৃতীয়তঃ, অনেকে আশংকা করেন যে পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ঘোষণার দরুণ ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। সরকারী

উদ্যোগ সম্প্রসারিত হইলে বেসরকারী উদ্যোগ আতংকিত হইবে এবং উহার বিনিয়োগ হ্রাস পাইবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা এবং অর্থ নৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সরকারী উদ্যোগকে অবশ্যই সম্প্রসারিত করিতে হইবে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করা হইলে উহা জনগণের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার করিবে বলিয়াই উহা কাম্য। সরকারী উদ্যোগের সম্প্রসারণ ব্যতীত পরিকল্পনার সাফল্য সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রীয় এলাকার সম্প্রসারণ সমীচীনই হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করিবার জন্য বৃহদায়তন ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের উপর বাধানিষেধ আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। আশানুরূপ উন্নতি হইলেও এই শিল্পগুলি প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এই সকল শিল্পগুলির উন্নতিতে সহায়তা করার অর্থই হইতেছে যে পুরাতন এবং অদক্ষ উৎপাদন পদ্ধতিকে পুনরুজ্জীবিত করা। আশানুরূপ সম্প্রসারণ হইলেও এই শিল্পগুলি প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। আর যদিও ইহার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি হয় তথাপি উহার সম্প্রসারণ সমীচীন নয় কারণ অর্থ নৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য সর্বাধিক সম্পদ সৃষ্টি করা, শুধুমাত্র কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা নয়। অদক্ষ উৎপাদন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীলতার অর্থই হইতেছে উৎপাদনের মাত্রা সীমিত রাখা। ডাঃ জে. পি. নিয়োগী বলেন যে নিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মান্ধাতা আমলের অযোগ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করিলে বিপজ্জনক মুদ্রাস্ফীতি অনিবার্য।

পঞ্চমতঃ, পরিকল্পনার কর্মসংস্থান নীতিও উৎসাহজনক নয়। পরিকল্পনা কমিশনের মতে পরিকল্পনাধীন পাঁচ বৎসরে বড় জোর এক একটি লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে। এই পাঁচ বৎসরে নূতন বেকারের সংখ্যা হইবে এক কোটি—সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষ হইবার পরও পরিকল্পনার সুরুতে যে পরিমাণ বেকার ছিল তাহাই থাকিবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে পরিকল্পনার শেষেও ৯০ লক্ষ লোক বেকার থাকিয়া যায়।

পরিশেষে, বলা যায় যে পরিকল্পনা রচনায় সামান্য ভুল ভ্রান্তি থাকিতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার হিসাবে ভুল ভ্রান্তি এরূপ মারাত্মক হইয়াছিল যে দুই বৎসর পরে পরিকল্পনা কমিশনকে উহা পুনর্বিবেচনা করিতে হয়। সরকার মূল্যস্তরকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে নাই। পরিকল্পনায় যে উৎপাদন লক্ষ্য পূরণ করিতে ৪৮০০ কোটি টাকা লাগিবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল মুদ্রাস্ফীতির দরুণ উহা পূরণ করিতে ৫৪০০ কোটির মতো টাকা লাগিবে বলিয়া হিসাব করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচীকে কার্যকারী করার জন্য যে পরিমাণ আমদানীর প্রয়োজন হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল তাহা ত্রুটিপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট চরম আকার ধারণ করে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রপ্তানী সম্প্রসারণের কোনো উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করা হয় নাই।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল (Achievements of the Second Five Year Plan) : উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অগ্রগতির আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল খুব সন্তোষজনক হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা কিন্তু ঐই লক্ষ্য পূরণ হয় নাই, জাতীয় আয় মাত্র শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ১০,৪৮০ কোটি টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১২,৭৫০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ২৬৭'৮ টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে উহা ২৯৩'৭ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণ আশানুরূপ হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের লক্ষ্যমাত্রা ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টনে ধার্য ছিল কিন্তু কার্যতঃ উৎপাদন হয় মোট ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সমবায়ের উন্নতি বেশ সন্তোষজনক। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ২,১০,০০০ ; ইহা ছাড়া এই সময় ১৮৭০টি সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩৫ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় কিন্তু উহা মাত্র ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬০-৬১ সালে ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াটে আসিয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১০০০টি ক্ষুদ্র কারখানা লইয়া ৬০টি শিল্প-তালুকের প্রতিষ্ঠা হয়। কয়লার উৎপাদন লক্ষ্য ছিল ৬ কোটি টন কিন্তু উৎপাদন হয় মাত্র ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টন। ইস্পাত পিণ্ডের উৎপাদন ধার্য ছিল ৪৫ লক্ষ টন কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হয় মাত্র ৩৫ লক্ষ টন।

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এক কোটি লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার কথা বলা হইয়াছিল পরে অবশ্য উহাকে হ্রাস করিয়া ৮০ লক্ষ করা হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রে ৬৫ লক্ষ এবং কৃষিক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ এই মোট ৯০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে এই নূতন কর্মসংস্থানের কতোখানি স্থায়ী নিয়োগ (sedimentary) আর কতোখানি অস্থায়ী (revolving) তাহা হিসাব করিয়া দেখানো হয় নাই।

পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসর : অগ্রগতি (First Ten Years of Planning : Progress) : ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে প্রথম পরিকল্পনার কাজ সুরু হয় এবং ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়। এই দশ বৎসরে আমরা উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতখানি অগ্রসর হইয়াছি তাহার একটি হিসাব নিকাশ করা যাইতে পারে।

প্রথম পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৬০ কোটি টাকা ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিমাণ ৪৬০০ কোটি টাকা। সুতরাং এই দশ বৎসরে (১৯৫১-১৯৬১)

সরকারী উদ্যোগে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইল ৬৫৬০ কোটি টাকা। এই টাকা উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইভাবে ব্যয় করা হয়।

উন্নয়ন ক্ষেত্র	প্রথম পরিকল্পনা (কোটি টাকা)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (কোটি টাকা)	দশ বৎসরে মোট ব্যয় (কোটি টাকা)
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	২৯১	৫৩০	৮২১
২। সেচ ও বিদ্যুৎ	৫৭০	৮৬৫	[illegible]৩৫
৩। পরিবহণ	৫২৩	১৩০০	১৮২৩
৪। শিল্প ও খনি	১১৭	১০৭৫	১১৯২
৫। সমাজসেবা ৬। বিবিধ	৪৫৯	৮৩০	১২৮৯
মোট—	১৯৬০	৪৬০০	৬৫৬০

পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে সরকারী ও বেসরকারী উভয়প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১০,১১০ কোটি টাকা।

প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট বাৎসরিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫০০ কোটি টাকা—দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৬০০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

পরিকল্পনাধীন দশ বৎসরে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ বৎসরে ২০০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৮০০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

প্রথম দুইটি পরিকল্পনায় বিভিন্ন সূত্র হইতে নিম্নলিখিত অনুপাতে অর্থ সংগ্রহ করা হয়:

আয়ের উৎস	প্রথম পরিকল্পনা পরিমাণ (কোটি টাকা)	প্রথম পরিকল্পনা মোট ব্যয়ের শতকরা হার	দ্বিতীয় পরিকল্পনা পরিমাণ (কোটি টাকা)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা মোট ব্যয়ের শতকরা হার
১। কররাজস্ব ও রেলপথ হইতে উদ্বৃত্ত	৭৫২	৩৮	১২০০	২৫
২। জনগণের নিকট হইতে ঋণ	৫০৯	২৬	১২০০	২৫
৩। বৈদেশিক সাহায্য	১৮৮	১০	৮০০	১৬·৭
৪। ঘাটতি ব্যয়	৪২০	২১	১২০০	২৫
৫। অন্যান্য উৎস	৯১	৫	৪০০	৮·৩
মোট—	১৯৬০	১০০	৪৮০০	১০০

দুইটি পরিকল্পনায় নিম্নলিখিতভাবে উন্নয়নের বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়।

বিভিন্ন উন্নয়ন ক্ষেত্র	প্রথম পরিকল্পনা		দ্বিতীয় পরিকল্পনা	
	ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)	মোট ব্যয়ের শতকরা হার	ব্যয়েরপরিমাণ (কোটি টাকা)	মোট ব্যয়ের শতকরা হার
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	২৯১	১৫	৫৬৮	১২
২। সেচ ও বিদ্যুৎ	৫৭০	২৯	৯১৩	১৯
৩। শিল্প ও খনি	১১৭	৬	৮৯০	১৮
৪। পরিবহণ	৫২৩	২৭	১৩৮৫	২৯
৫। সমাজসেবা ৬। বিবিধ	৪৫৯	২৩	১০৪৪	২২
মোট—	১৯৬০	১০০	৪৮০০	১০০

[এক] **জাতীয় আয় :** প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয় শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি করা কিন্তু কৃষি উৎপাদন আশাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় আয় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি; কিন্তু উহা মাত্র শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার দশ বৎসরে মোট জাতীয় আয় শতকরা ৪২ ভাগ বৃদ্ধি পাইলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ মাথাপিছু আয় শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

[দুই] **কৃষি ও সমাজোন্নয়ন :** প্রথম পরিকল্পনার ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন পাঁচ কোটি টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬.৫ কোটি টনে আসিয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়। পরিকল্পনাধীন দশ বৎসরে কৃষিজ উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ, খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ৪৬ ভাগ এবং সেচের অন্তর্ভুক্ত জমির পরিমাণ শতকরা ৪৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এই দশ বৎসরে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপক প্রসার হয় এবং ৩৭০,০০০ গ্রাম সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে আসে। এই সময় সমবায় আন্দোলনেরও যথেষ্ট প্রসার ঘটে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ২,১০,০০০; ইহা ব্যতীত এই সময় ১৮৭০টি সমবায় বিক্রয় সমিতি এবং ৪১টি সমবায় চিনি কারখানাও স্থাপিত হয়। এই সময় ভূমি-সংস্কারের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। এই সময় জমিদারী প্রথার উচ্ছেদসাধন, জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ, জোতের সংহতি সাধন এবং উপযুক্ত ভূমি-নীতি গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনাধীন দশ বৎসরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াটে আসিয়া দাঁড়ায়। অবশ্য দুই পরিকল্পনায় শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৬৯ লক্ষ কিলোওয়াটে ধার্য ছিল।

[তিন] **শিল্প ও খনি :** পরিকল্পনাধীন দশ বৎসরে খনি ও শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। এই সময় মূলশিল্প ও খনি খাতে সরকারী বিনিয়োগের

পরিমাণ ছিল ৯৭৪ কোটি টাকা। এই সময় সরকারী উদ্যোগে তিনটি বৃহদায়তন লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। এই দশ বৎসরে সংগঠিত শিল্পের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। মূল ও ভারী শিল্প ছাড়াও ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য মোট ২১৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এই সময় প্রত্যেক রাজ্যে ক্ষুদ্রশিল্প সেবা প্রতিষ্ঠান (Small Industries Service Institutes) স্থাপিত হয় এবং ১০০০টি ক্ষুদ্র কারখানা লইয়া ৬০টি শিল্পতালুক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আরও ৬০টি শিল্প-তালুকের গোড়াপত্তন করা হয়। এই দশ বৎসরে ইস্পাত পিণ্ডের উৎপাদন ১৪ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫ লক্ষ টন ও কয়লার উৎপাদন ৩ কোটি ২৩ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ৭৪ কোটি গজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯০ কোটি গজে এবং সিল্কের উৎপাদন ২৫ লক্ষ পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭ লক্ষ পাউণ্ডে আসিয়া দাঁড়ায়। এই সময় খাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৬৬০ লক্ষ গজের মতো।

[চার] পরিবহণ ও যোগাযোগ: পরিকল্পনাধীন দশ বৎসরে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সরকারী উদ্যোগে মোট ১৮২৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এই দশ বৎসরে প্রায় ১২০০ মাইলের মতো নূতন রেলপথ স্থাপন, ১৩০০ মাইল রেলপথে একটির পরিবর্তে দুইটি করিয়া লাইন বসানো এবং ৮০০ মাইল রেলপথ বৈদ্যুতিকরণ করা হয়। এই সময় প্রায় ৪৬,০০০ মাইল রাস্তা নির্মাণ করা হয় এবং ২৯,০০০ নূতন বাণিজ্যিক যান নির্মাণ করা হয় এবং বৃহদায়তন বন্দরগুলির কার্যক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

[পাঁচ] সমাজসেবা: পরিকল্পনাধীন দশবৎসরে সমাজসেবার ক্ষেত্রে অগ্রগতি মোটামুটি সন্তোষজনক। সমাজসেবা ও বিবিধ খাতে ওই সময়ে মোট ১২৮৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এই সময় বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২,১০,০০০ হইতে ৩,৫২,০০০, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭,৩০০ হইতে ১৭,০০০ এবং কলেজের সংখ্যা ৫৪২ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০৫০-এ আসিয়া দাঁড়ায়। বিদ্যালয়ে পাঠরত ৬-১১ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের সংখ্যা শতকরা ৪২ ভাগ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৬১ ভাগে আসিয়া দাঁড়ায়। এই সময় কয়েকটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয়, কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বহুসংখ্যক পলিটেকনিক স্থাপিত হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কারিগরী বিদ্যালয়গুলিতে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য ১০,০০০ ছাত্র গ্রহণের সুযোগ ছিল; ১৯৬০-৬১ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭,০০০ এ আসিয়া দাঁড়ায়। এই সময় চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। এই সময় বহু সংখ্যক হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ঔষধালয়, মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০-৫১ সালে দেশে হাসপাতালের মোট সংখ্যা ছিল ৮৬০০, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১২,৬০০ এ আসিয়া দাঁড়ায়। ওই সময় ডাক্তারের সংখ্যা ৫৯০০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৮৪,০০০ হয়। এই সময়

লোকের আয়ুষ্কাল প্রায় দশ বৎসর বৃদ্ধি পায়। এই সময় বেশ কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

[ছয়] **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:** প্রথম পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষভাবে ৪৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে ৬৫ লক্ষ এবং কৃষিক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ অর্থাৎ মোট ৯০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। এছাড়া সেচব্যবস্থার প্রসারের ফলে অর্ধনিয়োগের সমস্যার তীব্রতা কিছু পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। পরিকল্পনাদ্বয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রয়াস প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এই দশ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রায় আট কোটি। জনসংখ্যা বৃদ্ধিই বেকার সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

[সাত] **মূল্যস্তরের প্রবণতা:** প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে মূল্যস্তর নিম্নমুখী হয়। ১৯৫০-৫১ সালে পাইকারী মূল্যস্তর ৪১০ হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৫৫-৫৬ সালে ৩৬০-এ আসিয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ ঐই সময়ে মূল্যস্তর ২২% হ্রাস পায়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত উহা অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে সাধারণ মূল্যস্তর ৩০% বৃদ্ধি পায়, খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর ২৭%, শিল্পের কাঁচামালের মূল্যস্তর ৪৫% এবং শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যস্তর ২৫% বৃদ্ধি পায়।

উপসংহার: উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হইলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অগ্রগতি আশানুরূপ হয় নাই। খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হয় মাত্র ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন। শিল্প ও খনির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার নিজস্ব লক্ষ্য পূরণ হয় নাই। ১৯৬০-৬১ সালে ৮৮ মিলিয়ন একর জমিতে সেচব্যবস্থা প্রসারিত করিবার লক্ষ্য গৃহীত হয়; কিন্তু কার্যতঃ ৭০ মিলিয়ন জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়। কয়লার উৎপাদন লক্ষ্য ছিল ৬ কোটি টন কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হয় ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টন। ইস্পাত পিণ্ডের ক্ষেত্রেও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। বাসস্থান সমস্যার তীব্রতা মোটেই হ্রাস পায় নাই। বেকার সমস্যার তীব্রতা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় মূল্যস্তর স্থিতিশীল ছিল কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার ফলে জনসাধারণের প্রকৃত আয় এবং জীবনযাত্রার মান হ্রাস পায়। মাথাপিছু ভোগব্যয়ের পরিমাণ মোটেই বাড়ে নাই এবং ভারতের অর্ধেক জনগণের ভোগ্য বস্তুর উপর মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ১৩ টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নীতি গৃহীত হইলেও কার্যতঃ আয় বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসাধারণ এই বিরাট পরিমাণ উন্নয়নমূলক অর্থ ব্যয় হইতে অতি সামান্য উপকার পাইয়াছে ফলে পরিকল্পনা দেশে গণউদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ধন-বৈষম্য বৃদ্ধি পাইলে সাধারণতঃ সঞ্চয়ের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ভারতে এই দশ বৎসরে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ স্বল্প হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
(Third Five Year Plan of India)

[**বিষয়বস্তু :** তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—উদ্দেশ্য—বৈশিষ্ট্য—ব্যয়বরাদ্দ—অর্থসংস্থান—উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা—সমালোচকের বাঁকাচোখে তৃতীয় পরিকল্পনা—তিনটি পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা—তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যকালীন অগ্রগতির পর্যালোচনা।)

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (Third Five Year Plan) : পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ও তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দ ১৯৬১ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে তৃতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল আরম্ভ হয় এবং ১৯৬৬ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ইহার কাযকাল শেষ হয়।

উদ্দেশ্য (Objectives) : যুদ্ধোত্তর দেশবিভাগের সংকটে অর্থনৈতিক অবস্থায় যে অসমতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করিয়া জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করাই ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের (growth) গতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করাই হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। তৃতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য স্বয়ংনির্ভরশীল সম্প্রসারণের (self-sustaining growth) সৃষ্টি করা। স্বয়ংনির্ভরশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা ৪৪ কোটি নরনারীর সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের সুযোগ দানই তৃতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। তৃতীয় পরিকল্পনা রচনাকালে পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ পাঁচটি উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ, পরিকল্পনাকালে বৎসরে ৫% হারে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিসাধন করা এবং সেই পরিমাণ বিনিয়োগ করা যাহাতে পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতেও উন্নয়নের এই হার বজায় থাকে। দ্বিতীয়তঃ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এবং শিল্প ও রপ্তানীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার মতো কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। তৃতীয়তঃ, ইস্পাত, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি মূল শিল্পগুলির সম্প্রসারণ করিয়া যন্ত্রপাতি উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইতে হইবে যাহাতে আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই নিজ শক্তিতে শিল্পায়ন সম্ভবপর হয়। চতুর্থতঃ, দেশের জনশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করিয়া সর্বাধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পঞ্চমতঃ, সুযোগসুবিধাভোগের ব্যাপারে ক্রমান্বয়ে অধিকতর সমতা আনয়ন করিতে হইবে ও আয় বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন হ্রাস করিয়া সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

পাঁচটি মূল উদ্দেশ্য

তৃতীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য (Features of the Third Five Year Plan) : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় :

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল স্বয়ংনির্ভরশীল সম্প্রসারণ। স্বয়ংনির্ভরশীল অর্থনীতি বলিতে আমরা সেই অর্থনীতিকে বুঝিব যেখানে প্রয়োজনীয় উন্নয়নের হার নিজস্ব সম্পদের দ্বারাই সম্ভবপর হইবে।

স্বয়ংনির্ভরশীল সম্প্রসারণের জন্য উৎপাদনের হার বৃদ্ধি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং মূল শিল্প সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

স্বয়ংনির্ভরশীল সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে জাতীয় আয় দ্রুত হারে বৃদ্ধি করিতে হইবে। গত দশ বৎসরে জাতীয় আয় (তথা জাতীয় উৎপাদন) বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ৪%-এর মতো। এই বৃদ্ধির হার আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ২.৫%। স্পেংলারের মতে (J. J. Spengler) শতকরা ১ ভাগ জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি প্রয়োজন, তবেই অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ সম্ভব; সুতরাং ২.৫% জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বার্ষিক শতকরা ১০ ভাগ জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তৃতীয় পরিকল্পনায় বার্ষিক শতকরা ৫ ভাগ জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিনিয়োগের হারকে জাতীয় আয়ের ১১.৫% হইতে বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় আয়ের ১৪% করিতে হইবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

স্বয়ংনির্ভরশীল সম্প্রসারণের দ্বিতীয় সর্ত হইল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৎসরে শতকরা ৪ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু ইহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম বলিয়া তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দ্বিগুণ করিবার নীতি গৃহীত হইয়াছে। খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন, কারণ শিল্পের কাঁচামালের যোগান এবং রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য উহা প্রয়োজন। স্বয়ংনির্ভরশীল সম্প্রসারণের তৃতীয় সর্ত হইল মূল ও ভারী শিল্পের সম্প্রসারণ। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমাইতে হইলে ইস্পাত, জ্বালানি, বিদ্যুৎশক্তি, রসায়ন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি মূল ও ভারী শিল্পগুলিকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে কৃষিজ উৎপাদনের হার কম বলিয়াই দেশের ব্যাপক উন্নতি হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি ও সমাজোন্নয়ন খাতে মোট সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ ১০৬৮ কোটি টাকা—উহা মোট বিনিয়োগের শতকরা ১৪ ভাগ। খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বলিয়া বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইতেছে। ইহার দরুণ যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হইতেছে তাহার দ্বারা যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে পারিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর হইতে পারিত। কৃষির উন্নতিসাধন করিয়া গ্রামীণ

অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনিতে হইবে এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, তৃতীয় পরিকল্পনা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গঠনের একটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সমাজব্যবস্থা গড়িবার পথে প্রথম প্রয়োজন হইল প্রগতিশীল অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার প্রসার করা। ইহা ছাড়া সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করিতে হইবে। তবে প্রথমেই খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসগৃহ, কর্মসংস্থান এবং সর্বনিম্ন আয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পরিশেষে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করা ছাড়াও দেখিতে হইবে যে দ্রুত অর্থ নৈতিক সম্প্রসারণের ফলে সকল অর্থনৈতিক ক্ষমতা যেন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে গিয়া না পড়ে। এই উদ্দেশ্যে মূলধনলাভ, ফটকাবাজী প্রভৃতি সীমিত করিয়া রাষ্ট্রকে তাহার প্রাপ্য অংশ গ্রহণে উদ্যোগী হইতে হইবে। কর ফাঁকি কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে। অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যের দাম যাহাতে স্থিতিশীল এবং দরিদ্র জনগণের আয়ত্তে থাকে তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বেকারদিগের যতদূর সম্ভব কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে গ্রাম ও নগরাঞ্চলের লোকের মধ্যে আয়ের পার্থক্য বাড়িতে থাকে। গ্রামে কুটিরশিল্প প্রসার এবং কৃষিউন্নয়নের মাধ্যমে এই আয় বৈষম্য হ্রাস করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, পরবর্তী তিনটি, অর্থাৎ চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তৃতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে। পরবর্তী তিনটি পরিকল্পনার মধ্যেই দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ব্যাপকতর ভিত্তি রচনা করিয়া অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে যাহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশ স্বাবলম্বী এবং স্বয়ংনির্ভরশীল হইয়া ওঠে।

ভারতীয় অর্থ নৈতিক উন্নয়নের গতিধারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে জাতীয় আয় ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৪,৫০০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে; চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৫,০০০ কোটি টাকা এবং পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়াইবে, ৩৩,০০০ হইতে ৩৪,০০০ কোটি টাকা। বৎসরে শতকরা ২ ভাগ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। ইহাকে ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালের শেষে ৩৩০ টাকা হইতে বাড়িয়া ১৯৬৬ সালে ৩৮৫ টাকা, ১৯৭১ সালে ৪৫০ টাকা এবং ১৯৭৬ সালে ৫৩০ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে। ইহার জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগ হইতে বৃদ্ধি করিয়া তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে যথাক্রমে ১৫ ভাগ, ১৮ ভাগ এবং ২০ ভাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনায় যেখানে বিনিয়োগের পরিমাণ ১০,৫০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে সেখানে চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায়

বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ১৭,০০০ কোটি টাকা এবং ২৫০০০ কোটি টাকা হইবে। সঞ্চয়ের পরিমাণও সেই অনুপাতে বর্তমান জাতীয় আয়ের ৮.৫% হার হইতে বৃদ্ধি করিয়া তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে যথাক্রমে ১১.৫%, ১৬% এবং ১৯% করিতে হইবে। পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে ভারতের অর্থনীতি বৈদেশিক সাহায্য, মূলধন ও বিনিয়োগের উপর নির্ভর না করিয়াই সন্তোষজনক গতিতে উন্নয়নের পথে চলিতে থাকিবে।

পঞ্চমতঃ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ভারতে পরিকল্পনার অন্যতম মূল লক্ষ্য। বেশ খানিকটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরই দেশের জনশক্তির পূর্ণ ব্যবহার সম্ভবপর। যাহা হউক, কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি তৃতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করাই হইবে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। পল্লী-অঞ্চলে বেকার ও আধাবেকার পাশাপাশি রহিয়াছে; অপরদিকে, নগরাঞ্চলে বেকার সমস্যার তীব্রতা শিল্প, বাণিজ্য এবং পরিবহণ ব্যবস্থার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। বেকারের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক হিসাব পাওয়া না যাইলেও ইহা অনুমান করা হইয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রায় ৯০ লক্ষের মতো লোক বেকার থাকিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া আধা-বেকারের সংখ্যা হইবে ১৫০ হইতে ১৮০ লক্ষের মতো। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নূতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হইবে ১ কোটি ৭০ লক্ষের মতো। ইহার এক-তৃতীয়াংশ নগরাঞ্চলের কর্মপ্রার্থী। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে—ইহার মধ্যে ১ কোটি ৫ লক্ষ লোকের কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রে এবং ৩৫ লক্ষ লোকের কৃষি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হইবে।

ষষ্ঠতঃ, তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষা ও অন্যান্য সমাজ কল্যাণমূলক কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সমাজসেবা ও অন্যান্য খাতে ১৩০০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট বিনিয়োগের শতকরা ১৭ ভাগ বরাদ্দ করা হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠনের আদর্শ রূপায়নের জন্য সমাজ কল্যাণমূলক ব্যয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

পরিশেষে, তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সমতা আনয়নের চেষ্টা করা হইয়াছে। পরিকল্পনা কর্মসূচীকে এরূপভাবে রচনা করা হইয়াছে যাহাতে পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলির অগ্রগতি দ্রুততর হয়। পরিকল্পনার ফলাফল যাহাতে সকলেই সমানভাবে ভোগ করিতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

রাজ্য পরিকল্পনা: জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়নের পক্ষে রাজ্য পরিকল্পনাগুলির গুরুত্ব খুবই বেশী। কৃষি, শিক্ষা, সমাজসেবা এবং পল্লীর জনশক্তি ব্যবহারের যে লক্ষ্য ধার্য করা হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ রাজ্যপরিকল্পনাগুলির সফল রূপায়নের উপর নির্ভর করিবে। বৃহৎ ও মূল শিল্পায়নের জন্য রাজ্যগুলিকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া, বাসগৃহ নির্মাণ, শহর ও পল্লী উন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচীও রাজ্যসরকারগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার দশ বৎসরে জাতির যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরেই সেই পরিমাণ উন্নয়ন সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই বিরাট কর্মসূচী রূপায়িত করিতে হইলে প্রশাসনিক যোগ্যতাও বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত,' তৃতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্যয়বরাদ্দ (Outlay of the Plan) : তৃতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নের যে কর্মসূচী প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ করিতে সরকারী ক্ষেত্রে ৮০০০ কোটি টাকার অধিক এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ৪১০০ কোটি টাকা লাগিবে। (সরকারী ক্ষেত্র হইতে বেসরকারী ক্ষেত্রে যে ২০০ কোটি টাকা হস্তান্তরিত করা হইয়াছে তাহা বাদ দিয়া ৪১০০ কোটি টাকা হিসাব করা হইয়াছে)। কিন্তু বর্তমানের আর্থিক সম্বল অনুযায়ী সরকারী ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হইয়াছে ৭৫০০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার একটি বৈশিষ্ট্য যে পরিকল্পনার মোট অনুমিত ব্যয় এবং বরাদ্দের মধ্যে ৫০০ কোটি টাকার মতো ফাঁক রাখা হইয়াছে। পূর্ববর্তী পরিকল্পনা দুটিতে এরূপ করা হয় নাই। ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে পরিকল্পনা চালু হইবার পর অর্থ সংগ্রহের নূতন নূতন সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে আর সকল কর্মসূচী তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সম্পূর্ণ নাও হইতে পারে। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে যে ৭৫০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ হইবে ৬৩০০ কোটি টাকা এবং চলতি ব্যয়ের (current outlay) পরিমাণ হইবে ১২০০ কোটি টাকা।

সরকারী খাতে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইভাবে ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে :

উন্নয়নক্ষেত্র	পরিমাণ (কোটি টাকা)	মোট ব্যয়ের % হার
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	১০৬৮	১৪
২। সেচ ও বিদ্যুৎ	১৬৬২	২২
৩। শিল্প ও খনি	১৭৮৪	২৪
৪। পরিবহণ	১৪৮৬	২০
৫। সমাজসেবা	১৩০০	১৭
৬। বিবিধ	২০০	৩
মোট	৭৫০০	১০০

সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র হইতে ২০০ কোটি টাকা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হইবে; ইহার দরুণ বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪১০০ কোটি টাকা+২০০ কোটি টাকা=৪৩০০ কোটি টাকা। বেসরকারী উদ্যোগের সমস্তটাই হইল বিনিয়োগ ব্যয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় বেসরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৩০০ কোটি টাকার মতো হইবে। বেসরকারী উদ্যোগে কৃষি ও সেচখাতে ৮৫০ কোটি টাকা,

খনি ও শিল্পখাতে ১১০০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎশক্তি খাতে, ৫০ কোটি টাকা, পরিবহণ খাতে ২৫০ কোটি টাকা, গৃহ নির্মাণ খাতে ১১২৫ কোটি টাকা এবং ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের খাতে ৩২৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। বেসরকারী-উদ্যোগে ৩০০ কোটি টাকার মতো বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে।

বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যয়বণ্টন এইরূপ হইবে।

১।	কৃষি ও সেচ	৮৫০	কোটি টাকা
২।	শক্তি	৫০	” ”
৩।	পরিবহণ	২৫০	” ”
৪।	ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প	৩২৫	” ”
৫।	শিল্প ও খনি	১১০০	” ”
৬।	গৃহনির্মাণ ইত্যাদি	১১২৫	” ”
৭।	অন্যান্য	৬০০	” ”
	মোট	৪৩০০	কোটি টাকা

তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থসংস্থান (Financing the Plan): তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ৭৫০০ কোটি টাকা নিম্নলিখিত সূত্রগুলি হইতে সংগ্রহ করা হইবে:

	দ্বিতীয় পরিকল্পনা		তৃতীয় পরিকল্পনা			
	প্রাথমিক হিসাব (কোটি টাকা)	সংশোধিত হিসাব (কোটি টাকা)	মোট কোটি টাকা	কেন্দ্র কোটি টাকা	রাজ্য কোটি টাকা	চূড়ান্ত হিসাব কোটি টাকা
১। কর রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত	৩২০	৫০	৫৫০	৪১০	১৪০	৪৭০
২। রেলপথ প্রদত্ত অর্থ	১৫০	১৫০	১০০	১০০	—	৮০
৩। অন্যান্য সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মুনাফা	—	—	৪৫০	৩০০	১৫০	৩৯৫
৪। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ	৭০০	৭৮০	৮০০	৪৭৫	৩২৫	৯১৫
৫। স্বল্প সঞ্চয়	৫০০	৪০০	৬০০	২১৩	৩৮৭	৫৮৫
৬। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, ইস্পাত সমীকরণ তহবিল (Steel equalisation fund) ইত্যাদি	২৫০	২৩০	৫৪০	৫১৬	১৭৬	৬৪০
		১০৫২	১৭১০	১১০০		
৭। অতিরিক্ত কর	৪৫০				৬১০	২৮৮০
৮। বৈদেশিক সাহায্য	৮০০	১০৯০	২২০০	২২০০	—	২৪৫৫
৯। ঘাটতি ব্যয়	১২০০	৯৪৮	৫৫০	৫২৪	২৬	১১৫০
মোট—	৪,৮০০	৪,৬০০	৭,৫০০	৬,০৩৮	১,৪৬২	৮৬৩০

তৃতীয় পরিকল্পনায় ১০,৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইবে; ইহার দরুণ বিনিয়োগের হারকে জাতীয় আয়ের ১১% হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১৪% করিতে হইবে। এই বিনিয়োগের কিছু অংশ বৈদেশিক সাহায্যের দ্বারা মিটানো হইবে। আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার বর্তমানে জাতীয় আয়ের শতকরা ৮'৫ ভাগ; উহাকে বৃদ্ধি করিয়া তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয়ের শতকরা ১১'৫ ভাগ করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় অতিরিক্ত করের মাধ্যমে ১৭১০ কোটি টাকা আয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেন্দ্রের অংশ ১১০০ কোটি টাকা এবং রাজ্যগুলির অংশ ৬১০ কোটি টাকা। ইহার দরুণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫৫০ কোটি টাকার মতো ঘাটতি ব্যয় করা হইবে; অপরপক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহার পরিমাণ ছিল ৯৪৮ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পায়; মূল্যস্তরকে স্থিতিশীল রাখিবার উদ্দেশ্যেই ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে। অবশ্য প্রকৃত খাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ১১৫০ কোটি টাকা।

আভ্যন্তরীণ অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে কিছু ঘাটতি দেখা দিলে অতিরিক্ত প্রচেষ্টার দ্বারা তাহা পূরণ করা যায় কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতি পূরণ করা অত সহজ নয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বাণিজ্য ব্যালান্সের মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২১০০ কোটি টাকা—মূল হিসাবের প্রায় দ্বিগুণ। এই ঘাটতি পূরণ করিতেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এই কারণে তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন তাহা সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক সাহায্য ও রপ্তানী সম্প্রসারণ করিয়া মিটাইতে হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে ১৯০০ কোটি টাকার মতো বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে। যন্ত্রাংশ ও আধা-উৎপন্ন দ্রব্য আমদানী করিতে ২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা লাগিবে; অন্যান্য খাতে আমদানীর প্রয়োজন হইবে ৩৬৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আর মূলধনখাতে ৫৫০ কোটি টাকা বাহিরে চলিয়া যাইবে। সুতরাং পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট ৬৩০০ (১৯০০+২০০+৩৬৫০ +৫৫০=৬৩০০) কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হইবে। আশা করা যাইতেছে যে রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া ৩৭০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা যাইবে; বাকী ২৬০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য হইতে মিটাইতে হইবে।

পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে দেশে ভোগের পরিমাণ ন্যায়সঙ্গত ভাবে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে।

বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুবই আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্যোগে রাষ্ট্রসংঘে যে বৈঠক হইয়া গিয়াছে তাহাতে ভারতকে মোট ১০৮৯ কোটি টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট হইতে ২৩৮ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড এবং সুইজারল্যাণ্ডের নিকট হইতেও

মোট ৬৭ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মার্কিন পি. এল ৪৮০ হইতে ৬০০ কোটি টাকার মতো সাহায্য পাওয়া যাইবে।

উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্র (Targets of Production): প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে বাৎসরিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহা বাড়িয়া ১৬০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। প্রথম পরিকল্পনাকালে প্রধানতঃ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিহেতু জাতীয় আয় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য ২৫% ধার্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা ২০% বৃদ্ধি পায়। এই সময় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৪০% এবং শিল্পোৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৃতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হইয়াছে। কৃষি অর্থনীতিকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলা, শিল্প সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বর্ধিত কর্ম-প্রার্থীর নিয়োগের ব্যবস্থা করাই তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই উন্নয়নের ভার সমগ্রজাতিকে সমানভাবে বহন করিতে হইবে।

[এক] **কৃষিক্ষেত্র:** তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৭.৯৭ কোটি টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০ কোটি টনে আসিয়া দাঁড়াইবে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ৩২ ভাগ, তুলার উৎপাদন শতকরা ৩৭ ভাগ, ইক্ষুর উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ, তৈলবীজের উৎপাদন শতকরা ৩৮ ভাগ এবং পাটের উৎপাদন শতকরা ৫৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ছাড়া চা, তামাক, কফি, নারিকেল, বাদাম ও রবারের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এইরূপ হইবে:

দ্রব্য	একক	১৯৬০-৬১ সালের উৎপাদন	১৯৬৫-৬৬ সালের উৎপাদন	শতকরা বৃদ্ধি
১। খাদ্যশস্য	মিলিয়ন টন	৭৬.০	১০০.০	৩১.৬
২। তৈলবীজ	" "	৭.১	৯.৮	৩৮.৬
৩। ইক্ষু	" "	৮.০	১০.০	২৫.০
৪। তুলা	মিলিয়ন গাঁট	৫.১	৭.০	৩৭.২
৫। পাট	" "	৪০	৬.২	৫৫.০
৬। লাক্ষা	হাজার টন	৫০	৬২	২৪.০
৭। তামাক	" "	৩০০	৩২৫	৮.৩
৮। চা	মিলিয়ন পাউণ্ড	৭২৫	৯০০	২৪.১
৯। কফি	হাজার টন	৪৮	৮০	৬৭.৭
১০। রবার	" "	২৬.৪	৪৫	৭০.৫

তৃতীয় পরিকল্পনা কৃষি ও সমাজোন্নয়নখাতে সরকারী উদ্যোগে মোট ১২৮১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ওইখাতে ৬৬৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। অর্থের অভাবে যাহাতে কৃষিকার্য ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কৃষি উৎপাদনের কর্মসূচী নির্ধারিত হইয়াছে এবং কৃষি খাতে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। তদুপরি এই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে কাজ অগ্রসর হইতে থাকিলে যদি দেখা যায় যে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করিতে আরও অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা হইলে তাহারও ব্যবস্থা হইবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনের জন্য ব্যয়বরাদ্দ নিম্নলিখিতরূপ :

		কোটি টাকার হিসাব	
		দ্বিতীয় পরিকল্পনা	তৃতীয় পরিকল্পনা
১।	কৃষি উৎপাদন	৯৮·১০	২২৬·০৭
২।	ক্ষুদ্র সেচ	৯৪·৯৪	১৭৬·৭৬
৩।	ভূমি সংরক্ষণ	১৭·৬১	৭২·৭৩
৪।	সমবায়	৩৩·৮৩	৮০·১০
৫।	সমাজোন্নয়ন কার্যসূচী	৫০·০০	১২৬·০০
৬।	মাঝারি ও বৃহৎ সেচ	৩৭২·১৭	৫৯৯·৩৪
		৬৬৬·৬৫	১২৮১·০০

তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে জলসেচভুক্ত জমির পরিমাণ শতকরা ২৯ ভাগ বৃদ্ধি করিয়া ৯ কোটি একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ওই সময় ১১ মিলিয়ন একর কৃষিজমিতে ভূমি সংরক্ষণ এবং ২২ মিলিয়ন একর জমিতে শুষ্ক চাষের (dry farming) প্রবর্তন করা হইবে। এই সময় ৩·৬ মিলিয়ন পতিত জমিকে পুনরুদ্ধার করা হইবে। যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে আশা করা যাইতেছে যে কৃষি উৎপাদন সূচক ১৯৬০-৬১ সালে ১৩৫ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৭৬-এ আসিয়া দাঁড়াইবে। অর্থাৎ এই সময়ে মোট উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৬০-৬১ সালে মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ছিল ১৬ আউন্স; ১৯৬৫-৬৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৭·৫ আউন্সে আসিয়া দাঁড়াইবে। এই সময়ে দৈনিক ভক্ষণীয় তেল গ্রহণের পরিমাণ ০·৪ আউন্স হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ০·৫ আউন্স হইবে।

বর্তমানে দেশে ২৫০০ বাজার রহিয়াছে; ইহাদের মধ্যে ৭২৫টি নিয়ন্ত্রিত বাজার। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে বাকী বাজারগুলিকে নিয়ন্ত্রিত বাজারে পরিণত করিতে হইবে। বর্তমানে কৃষি-কলেজের সংখ্যা ৫৩, উহাকে বাড়াইয়া ৫৭ করিতে হইবে। বর্তমানে ৫৬০০ ছাত্র কৃষিকলেজে পড়িবার সুযোগ পায়; তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা বাড়িয়া ৬২০০ হইবে। ইহা ছাড়া নূতন নূতন কৃষি-গবেষণাগার এবং কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় চিন্তা করা হইতেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতে পশুচিকিৎসালয় ও ডিসপেনসরির সংখ্যা দাঁড়াইবে ৮০০০; এক লক্ষ অধিবাসীসমন্বিত শহরগুলিতে এবং নূতন নূতন শিল্পনগরীগুলিতে ৫৫টি দুগ্ধ সরবরাহের কর্মসূচী রূপায়িত করা হইবে। ইহা ব্যতীত, ঘৃত মাখনের আটটি কারখানা, গুঁড়াদুধের চারটি কারখানা ও দুইটি পনিরের কারখানা স্থাপন করা হইবে। ডেয়ারি শিল্পউন্নয়নের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। দেশে বর্তমানে ২১০০ মৎস্য সমবায় সমিতি রহিয়াছে। ইহাদের সদস্যসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মৎস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধির জন্য এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬৩ কিলোওয়াট; তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি ২৭ লক্ষ কিলোওয়াটে আসিয়া দাঁড়াইবে। বোম্বাই-এর নিকট তারাপুরে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয় হইবে ১০৮·৯ কোটি টাকা।

বর্তমানে সমাজোন্নয়ন কর্মসূচী ৩১০০-টি উন্নয়ন ব্লকে সম্প্রসারিত। প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার গ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যেই দেশের সমগ্র পল্লী অঞ্চলে এই কর্মসূচী সম্প্রসারিত হইবে। প্রথম দুইটি পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন খাতে ২৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ওই খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে ২৯৪ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া পঞ্চায়েতের জন্য ২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সমবায় সমিতির মারফৎ কৃষকদিগকে দেয় ঋণের পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালে ছিল ২০০ কোটি টাকা; উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে ৫৩০ কোটি টাকা হইবে।

[দুই] শিল্পক্ষেত্র: তৃতীয় পরিকল্পনার শিল্পনীতি হইতেছে যে আগামী পনেরো বৎসরে যাহাতে দ্রুত শিল্পায়ন হয় তাহার উপযুক্ত বনিয়াদ রচনা করা। সেইজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে মূল ও ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল তৃতীয় পরিকল্পনায় তাহা অব্যাহত রহিয়াছে। বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের কথা স্মরণ রাখিয়া নূতন শিল্প স্থাপন অথবা চালুশিল্প সম্প্রসারণ অপেক্ষা পুরাতন কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইহার পর নূতন শিল্প স্থাপন অপেক্ষা চালু শিল্পগুলির সম্প্রসারণকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে কারণ ইহার দরুণ প্রতি ইউনিট উৎপাদন বাবদ বিনিয়োগ ব্যয় কম হইবে। নূতন শিল্প স্থাপনের সময় সেই সকল শিল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে যাহারা রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে অথবা আমদানী হ্রাস করিতে সহায়তা করিবে।

শিল্প ও খনিখাতে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার জন্য সরকারী উদ্যোগে প্রায় ১৭৮৪ কোটি টাকার মত ব্যয় হইবে। ৭৫০০ কোটি টাকার পরিকল্পনায় ইহার জন্য ১৫২০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে প্রধানতঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, যন্ত্রপাতি, ভারি

বৈদ্যুতিক যন্ত্র, সার উৎপাদন মূল রাসায়নিক দ্রব্য, পেট্রোলিয়াম ও অত্যাবশ্যক ঔষধের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। শিল্পক্ষেত্রে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ১১%।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধি এইরূপ হইবে :

		১৯৬০—৬১	১৯৬৪—৬৬	শতকরা বৃদ্ধি
১। ইস্পাত পিণ্ড	লক্ষ টন	৩৫	৯২	১৬৩
২। লৌহ আকরিক	” ”	১০৭	৩০০	১৮০
৩। কয়লা	” ”	৫৪৬	৯৭০	৭৬
৪। সিমেন্ট	” ”	৮৫	১৩০	৫০
৫। বিদ্যুৎ	” কিলোওয়াট	৫৭	১২৭	১২৩
৬। চিনি	” টন	৩০	৩৫	১৭
৭। মিল বস্ত্র	” গজ	৫১,২৭০	৫৮,০০০	১৩
৮। তাঁত বস্ত্র	” ”	২৩,৪৯০	৩৫,০০০	৪৯

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে দুর্গাপুর, ভিলাই এবং রুরকেল্লার ইস্পাত কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ছাড়া বোকারোতে একটি নূতন ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হইতেছে। নেভেলিতে লিগনাইট কয়লা ব্যবহার করিয়া কাঁচা লোহা উৎপাদনের জন্য আর একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হইবে। ১৯৬৫-৬৬ সালে এ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন ৮৭,৫০০ টন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ঘাটশিলার কারখানাটি চালু হইলে ভারতে ইলেকট্রনাইট্রিক তাম্র উৎপাদিত হইবে। উদয়পুরে একটি দস্তার কারখানা স্থাপন করা হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে রাঁচীর নিকটে একটি ভারী যন্ত্রপাতি এবং দুর্গাপুরে একটি খনিযন্ত্রপাতি কারখানা ও একটি ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি কারখানা স্থাপন করা হইবে। হিন্দুস্থান যন্ত্রপাতি কারখানার সম্প্রসারণ করা হইবে এবং পাঞ্জাবে অনুরূপ আকারের আর একটি যন্ত্রপাতি কারখানা স্থাপন করা হইবে। বিশাখাপত্তমে জাহাজ নির্মাণ কারখানার সম্প্রসারণ করা হইবে এবং কোচিনে দ্বিতীয় জাহাজ কারখানা স্থাপন করা হইবে। সরকারী উদ্যোগে সার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়া ৭ লক্ষ ৩০ হাজার টনে আসিয়া দাঁড়াইবে। এই সময় বেসরকারী উদ্যোগে পাঁচটি নূতন সারের কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ভোগ্যপণ্যশিল্প : তৃতীয় পরিকল্পনায় মূল এবং ভারী শিল্পের উপর জোর দিলেও ভোগ্যপণ্য শিল্পকে উপেক্ষা করা হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া ৯৩০ কোটি গজে আসিয়া দাঁড়াইবে। ইহার মধ্যে ৮৫ কোটি গজ

রপ্তানী হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। তাঁত ও খাদির মাধ্যমে ৩৫০ কোটি গজ এবং মিলের মাধ্যমে ৫৮০ কোটি গজ উৎপাদিত হইবে।

১৯৬৫-৬৬ সালে কাগজের চাহিদা বাড়িয়া সাত লক্ষ টন হইবে। এই সময় কাগজ শিল্পের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা ৪২০,০০০ টন হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৮২০,০০০ টন করা হইবে। নিউজপ্রিণ্ট উৎপাদনের ক্ষমতা বর্তমানে ৩০,০০০ টন; উহা বৃদ্ধি করিয়া পরিকল্পনার শেষে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় চিনি উৎপাদনের বাৎসরিক লক্ষ্য হইল ৩৫ লক্ষ টন। এই সময় সমবায়ের ভিত্তিতে চিনি উৎপাদন ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত হইবে এবং মোট উৎপাদনে তাহাদের অংশ ২৫% হইবে। দেশের চাহিদা মিটাইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা রপ্তানী করা হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশে কয়লার চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াইবে ৯৭ মিলিয়ন টন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কয়লার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৬০ মিলিয়ন টনে ধার্য ছিল। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য অপেক্ষা কয়লার উৎপাদন ৩৭ মিলিয়ন টন বাড়াইতে হইবে। সরকারী উদ্যোগে ২০ মিলিয়ন টন এবং বেসরকারী উদ্যোগে ১৭ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপন্ন হইবে।

খনিজ তৈলের ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালে তৈল ও গ্যাস কমিশন অধিকতর তৎপরতার সহিত কাজ চালাইয়া যাইবে। বারাউনি ও গৌহাটীর তৈল শোধনাগার দুইটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হইবে। গুজরাটে ২০ লক্ষ টন উৎপাদনক্ষম নূতন একটি শোধনাগার স্থাপন করা হইবে। বেসরকারী উদ্যোগে শিল্পোন্নয়নের যে কর্মসূচী তৈয়ারী করা হইয়াছে তাহাতে মূলধন দ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য উভয়ই রহিয়াছে।

ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প: তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সমবণ্টন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য সাধনে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের অবদান উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় পরিকল্পনায় ওই সকল উদ্দেশ্যের পরিধি ব্যাপক হওয়ায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাইবে। প্রথম পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের খাতে ৪৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় হয় ১৮০ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ওই খাতে ব্যয় বরাদ্দ হইল ২৬৪ কোটি টাকা।

ওই টাকা এইভাবে ব্যয় করা হইবে:

	শিল্প	রাজ্যগুলির ব্যয়	কেন্দ্রের ব্যয়	মোট ব্যয়
১।	হস্তচালিত তাঁত	৩১·০	৩·০	৩৪·০
২।	শক্তিচালিত তাঁত	—	৪·০	৪·০
৩।	খাদি ও গ্রাম শিল্প	৩·৪	৮৯·০	৯২·৪
৪।	রেশম	৫·৫	১·৫	৭·০
৫।	নারিকেল কাতা	২·৪	০·৮	৩·২

শিল্প	রাজ্যগুলির ব্যয়	কেন্দ্রের ব্যয়	মোট ব্যয়
৬। হস্ত শিল্প	৬'১	২'৫	৮'৬
৭। ক্ষুদ্র শিল্প	৬২'৬	২২'০	৮৪'৬
৮। শিল্পতালুক	৩২'২	—	৩০'২
	১৪১'৩	১২২'৭	২৬৪'০

[illegible]

রহিয়াছে। বেসরকারী বিনিয়োগ ২৭৫ কোটির মতো হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের কার্যসূচী রূপায়ণের ব্যাপারে নিম্নলিখিত পাঁচটি নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে (১) কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিতে হইবে; (২) অর্থ সাহায্য, বিক্রয় রেয়াৎ এবং সংরক্ষিত বাজারের উপর নির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে কমাইয়া আনিতে হইবে। (৩) ছোট ছোট শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে শিল্পের বিকাশ সাধন করিতে হইবে; (৪) বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক হিসাবে ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশ সাধন করিতে হইবে এবং (৫) কর্ম ও কারিগরদিগকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করিতে হইবে। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প হইতে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৯ লক্ষ লোকের পূর্ণ এবং ৮০ লক্ষ লোকের আংশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৩০০টি নূতন শিল্পতালুক গঠন করা হইবে।

[তিন] পরিবহণ ও যোগাযোগ: তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে সরকারী উদ্যোগে মোট ১৪৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। বিভিন্ন পরিবহণ কর্মসূচীর মধ্যে উহা এইভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে:

কর্মসূচী	কোটি টাকা
১। রেলপথ	৮৯০
২। রাস্তা ও রাস্তা পরিবহণ	২৯৭
৩। জাহাজ, জলপরিবহণ, বন্দর ও লাইট হাউস	১৫৩
৪। বে-সামরিক আকাশ পথ	৫৫
৫। ডাক ও তার	৬৮
৬। ভ্রমণ	৮
৭। সংবাদ প্রচার (Broadcasting)	৭
৮। অন্যান্য পরিবহণ ও যোগাযোগ	৮
মোট	১৪৮৬

১৯৬৫-৬৬ সালে ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টন মাল বহনের ক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় রেলপথ উন্নয়নের কর্মসূচী রচনা করা হইয়াছে। এই সময় ১২০০ মাইল নূতন রেলপথ স্থাপন করা হইবে। কয়লা শিল্পের উন্নয়নের জন্য ২০০ মাইল নূতন রেলপথ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ২০ বৎসরের রাস্তা উন্নয়ন পরিকল্পনার (১৯৬১-৮১) সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া রাস্তা পরিবহন উন্নতির কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ২৫,০০০ মাইল পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হইবে। কলিকাতার নিকটে বিবেকানন্দ ব্রীজের অতিরিক্ত একটি পথ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। উত্তর সালামারা হইতে ব্রহ্মপুত্র ব্রীজ পর্যন্ত ১০০ মাইল রাস্তা নির্মাণ করা হইবে। পল্লী অঞ্চলে রাস্তা উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাস্তা পরিবহনের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক গাড়ীর সংখ্যা দুই লক্ষ (১৯৬০-৬১) হইতে বাড়িয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে ৩৬৫,০০০ হাজার হইবে অর্থাৎ এই সময়ে উহা ৮২% বৃদ্ধি পাইবে। এই সময় মালবাহী গাড়ীর সংখ্যা ১৬০,০০০ বৃদ্ধি পাইয়া ২৮৫,০০০ হইবে।

আভ্যন্তরীণ নদী পরিবহনের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় জাহাজী শিল্পের উন্নয়নের জন্য ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া জাহাজী উন্নয়ন তহবিল হইতে ৪ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে এবং জাহাজী প্রতিষ্ঠানগুলিও তাহাদের নিজস্ব সম্পদ হইতে ৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ৩৭৫,০০০ টনের ৫৭টি জাহাজের প্রয়োজন হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বৃহৎ বন্দরগুলির ক্ষমতা বাড়িয়া ৪ কোটি ৯০ লক্ষ টনের উপযোগী হইবে। কলিকাতা বন্দরের সংরক্ষণের জন্য হলদিয়ার নিকট একটি পরিপূরক বন্দর নির্মাণ করা হইবে। ইহা ছাড়া ফারাক্কার নিকটে গঙ্গার উপরে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে। কলিকাতা বন্দরের বালারী খাল উন্নয়নের ব্যবস্থাও করা হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কলিকাতা, বোম্বাই এবং দিল্লীর বিমান বন্দর সম্প্রসারণের যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছিল তৃতীয় পরিকল্পনায় ওইগুলি সম্পূর্ণ হইবে। ইহা ছাড়া কতকগুলি নূতন বিমান বন্দর স্থাপন করা হইবে। এই পরিকল্পনাধীন সময়ে চারটি জেটপ্লেন, চারটি ভিসকাউন্ট এবং ২৫টি আধুনিক ধরণের বিমান ক্রয় করা হইবে।

[চার] **জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান :** তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ভারতে বৎসরে ৫% হারে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি সাধন হইবে। ১৯৬০-৬১ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ১৪,৫০০ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬৫-৬৬ সালে উহা ১৯,০০০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে।

উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ হইবে। পল্লী অঞ্চলে বেকার ও আধা বেকার পাশাপাশি রহিয়াছে। অপরদিকে নগরাঞ্চলে বেকার সমস্যার তীব্রতা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৯০ লক্ষের মতো বেকার থাকিয়া যাইবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নূতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হইবে ১ কোটি ৭০ লক্ষের মতো। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার পরও দেশে

১ কোটি ২০ লক্ষ বেকার থাকিয়া যাইবে। আধা বেকারদের জন্য বিশেষ কার্য প্রকল্প (Special works projects) গ্রহণ করা হইবে এবং ইহার ফলে ২৫ লক্ষ লোক বৎসরে ১০০ দিনের কাজ পাইবে।

বর্তমানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দশ লক্ষ হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আরও নূতন শিক্ষিত কর্মপ্রার্থী সংখ্যা হইবে ত্রিশ লক্ষ। দ্রুত শিল্পায়নের সহিত শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে।

[পাঁচ] **সমাজকল্যাণ**: তৃতীয় পরিকল্পনায় সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা বিস্তারের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই সময় ৬-১১ বৎসর বয়স্ক সকল শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। কলেজ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং উন্নতি করা হইবে; শিক্ষকদের ট্রেণিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং কারিগরী ও পেশাগত শিক্ষার উন্নতি বিধান করা হইবে। অধিক পরিমাণে স্কলারশিপ, ফ্রিশিপ এবং অন্যান্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইবে। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। তিনটি পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ নিম্নলিখিতরূপ:

বিভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্র	প্রথম পরিকল্পনা কোটি টাকা	শতকরা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা কোটি টাকা	শতকরা	তৃতীয় পরিকল্পনা কোটি টাকা	শতকরা
১। প্রাথমিক শিক্ষা	৮৫	৬৩.৯	৮৭	৪১.৯	২০৯	৫০.০
২। মাধ্যমিক শিক্ষা	২০	১৫.১	৪৮	২৩.১	৮৮	২১.১
৩। কলেজ শিক্ষা	১৪	১০.৫	৭৫	২১.৬	৮২	১৯.৬
৪। সমাজ শিক্ষা, দৈহিক শিক্ষা ইত্যাদি	১৪	১০.৫	২৪	১১.৫	২৯	৬.৯
৫। সাংস্কৃতিক কর্মসূচী	—		৪	১.৯	১০	২.৫
মোট	১৩৩	১০০	২০৮	১০০.০	৪১৮	১০০.০

তৃতীয়তঃ পরিকল্পনাকালে বিদ্যালয়গমনকারী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দুই কোটি চার লক্ষ হইবে। ওই সময় বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতকরা ২৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে বাণিজ্য, বিজ্ঞান এবং আর্টস-এর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৬০,০০; ১৯৬০-৬১ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৯০০,০০০-এ আসিয়া দাঁড়ায়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা ১৩,০০০০০-এ আসিয়া দাঁড়াইবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, গৃহ নির্মাণ, অনগ্রসর জাতির উন্নতি, সমাজ কল্যাণ এবং বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ৭০৬ কোটি টাকা

বরাদ্দ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ওই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪৭৪ কোটি টাকা।

সমালোচকের বাঁকাচোখে তৃতীয় পরিকল্পনা (Criticism of the Third Plan): তৃতীয় পরিকল্পনাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে যদি 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী' বলিয়া অভিহিত করা হয় তৃতীয় পরিকল্পনাকে তাহা হইলে অধিকতর উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলিতে হইবে। অনেকে মনে করেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এই ধরণের অধিকতর উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা কেন গ্রহণ করা হইল তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন। কিন্তু আমাদের মনে হয় না এই ধরণের সমালোচনার বিশেষ কোনো মূল্য আছে। সহায় সম্বলের দৃষ্টিকোণ হইতে পরিকল্পনাটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হইলেও দেশের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা খুব উচ্চাভিলাষী নয়। অধ্যাপক ম্যালেনবম যথার্থই বলিয়াছেন যে উন্নয়নের "উত্তোলন-পর্যায়" (take-off period) দ্রুত অতিক্রম করিতে হইলে পরিকল্পনা বৃহদায়তন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যসূচীকে রূপায়িত করিতে যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে সে সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা ত্রুটিপূর্ণ। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভারতের সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্তি দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিবে: রপ্তানীর পরিমাণ ও বৈদেশিক সাহায্য। ১৯৫০ হইতে '৬০ সালের মধ্যে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের ২.১% হইতে হ্রাস পাইয়া ১.১%-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—এই অবস্থায় ৩৭০০ কোটি টাকার মতো রপ্তানী আশা করা যায় না। বর্তমানে ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল সুতরাং চলতি হিসাবে ঘাটতি রহিয়াছে। অতএব শিল্পায়নের সমগ্র কর্মসূচীই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সাহায্য প্রাপ্তি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ব্যাপার, সুতরাং পরিকল্পনার এক বৃহৎ অংশকে পরিকল্পনা না বলিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলাই উচিত ("The entire industrial programme depends on the amiability of foreign powers granting loans and gifts. Therefore infact a large part of this plan—and its most hopeful part—is not a plan at all but an aspiration." R. M. Godwin).

তৃতীয়তঃ আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতে অর্থসংগ্রহের নীতিরও তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেই করের বোঝা বেশ ভারী বলিয়া মনে হইয়াছে, ইহার পর আবার ১৭১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর স্থাপনের প্রস্তাবে সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। দেশের লোকের এই পরিমাণ করভার বহন করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে হয় না। পরোক্ষ কর অধিক পরিমাণে ধার্য করিলে সমাজের দরিদ্রজনগণের প্রকৃত আয় হ্রাস পাইবে এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শ ব্যাহত হইবে। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ "মুনাফাও নয়, ক্ষতিও নয়"

(No Profit no loss) নীতি গ্রহণ করিলে ইহারা কোনোরূপ অর্থসংস্থান করিতে পারিবে না বলিয়াই মনে হয়।

চতুর্থতঃ মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারী উদ্যোগ ও বে-সরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি থাকায় পরিকল্পনা রচনার সময় বে-সরকারী উদ্যোগের কর্মসূচী পরিপূর্ণভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কিন্তু কোথাও ইহা করা হয় নাই।

পঞ্চমতঃ, তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে ৮০০০ কোটি টাকার কর্মসূচীর জন্য ৭৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে অর্থাৎ ৫০০ কোটি টাকার মতো ফাঁক রাখা হইয়াছে। বলা হইয়াছে পরিকল্পনা চালু হইবার পর অর্থসংস্থানের নূতন নূতন সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে। অনেকের মতে প্রাপ্তব্য অর্থের ভিত্তিতেই পরিকল্পনা রচনা করা উচিত এবং তৃতীয় পরিকল্পনা এই দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ।

ষষ্ঠতঃ, তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহার ফলে সরকারী উদ্যোগের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটিবে। পরিকল্পনার কার্যসূচীকে রূপায়িত করিবার জন্য বহু সংখ্যক দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কর্মচারীর প্রয়োজন। ভারতে এই পরিমাণ দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারীর অভাব রহিয়াছে। ইহার ফলে প্রশাসনিক জটিলতাই বৃদ্ধি পাইবে।*

সপ্তমতঃ, তৃতীয় পরিকল্পনায় সাধারণ মূল্যনীতি গ্রহণ করা হইলেও মূল্যস্তরে স্থায়িত্ব আনার জন্য কোনো বিশেষ নীতি গ্রহণ করা হয় নাই। মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতি যদি সমানেই চলিতে থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মতো তৃতীয় পরিকল্পনায়ও পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য মৃদু মুদ্রাস্ফীতি প্রয়োজন হইতে পারে অনেক অর্থনীতিবিদ্ এই ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু অর্থনীতিবিদ কলিনক্লার্ক উহা স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন না অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্ত হইল ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তর। সুচিন্তিত মূল্যনীতি গ্রহণ করিলে উন্নয়নশীল অর্থনীতিতেও মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা যায়।

অষ্টমতঃ, তৃতীয় পরিকল্পনায় অন্যতম মূল লক্ষ্য হইল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়া। বলা হইয়াছে, যে সকল প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সহিত সামঞ্জস্যবিহীন সেগুলিকে হয় রূপান্তরিত নতুবা উৎখাত করিতে হইবে। কিন্তু এই আদর্শের বাস্তব রূপায়নে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সাফল্য দেখা গিয়াছে বণ্টনের ক্ষেত্র তাহা মোটেই দেখা যায় নাই। মহালানবীশ কমিটির রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে পরিকল্পনাধীন সময়ে সমাজে ধনবৈষম্য ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা অধিকতর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং সাধারণ লোকের অবস্থার ক্রমাগত অবনতি ঘটিতেছে। সুতরাং আদর্শের সহিত বাস্তবের সামঞ্জস্য কোথায়?

---

* "The government has embarked upon 'big plans' without the capacity to execute them and without the necessary administrative and technical equipment needed for their successful implementation." J. B, Kripalani.

নবমতঃ তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসংস্থান নীতি আদৌ উৎসাহজনক নয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এক কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মোট বেকারের সংখ্যা হইবে দুই কোটি ৬০ লক্ষ সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হইয়া যাইবার পরও দেশে এক কোটি ২০ লক্ষ বেকার থাকিয়া যাইবে।

পরিশেষে বলা চলে যে পরিকল্পনার পরিসংখ্যানগত ভিত্তি অতি দুর্বল। পরিকল্পনার বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখা হইয়াছে কিন্তু প্রকল্পগুলিকে এক করিয়া একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা রচনার কোনো প্রয়াস দেখা যায় না।

পূর্ববর্তী পরিকল্পনায় যাহা স্পষ্ট হইয়া দেখা গিয়াছে এই পরিকল্পনায় শুধু তাহাকে সমর্থন জানানো হইয়াছে: শিল্পক্ষেত্রে বেকার সমস্যা সমাধানের কোনো সম্ভাবনা নাই। কৃষিতে কিছু পরিমাণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হইবে। কৃষি দেশের মূল অর্থনৈতিক বিষয় হইলেও সরকারের কোনোদিনই সুনির্দিষ্ট কৃষি-নীতি ছিল না। কৃষি-প্রধান দেশকে যে বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইতেছে তাহাতেই সরকারের কৃষি-নীতির ব্যর্থতা প্রকাশিত হইয়াছে।*

অধ্যাপক কে. সি. লালওয়ানী যোজনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এইভাবে সমালোচনা করিয়াছেন: আমাদের অর্থনৈতিক যোজনা প্রথম ও দ্বিতীয় অতিক্রম করে তৃতীয়ে পা দিয়েছে; ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে উঠেছে। দেশে না আছে টাকা, না আছে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আর না আছে বিদেশী মুদ্রার

---

* The plan has no solid statistical and operational basis. There are a series of unrelated essays on different aspects of the plan with no quantative indications of how they fit into a proper plan nor indeed whether they fit at all. Not only are we not shown (let alone convinced) that the estimates are consistent, we are never given any hint that it is an optimal plan in the sense that it could not be larger. We are given a percent per year growth rate in real output, with no indication as to how or why this figure was arrived at. Most quantities are stated in money terms, hence prices are forecast to be level throughout the plan. But it is a mere hope—and not backed up by a policy.

The plan confirms what had already become apparent in the previous plan: industry gives no hope of solving the unemployment problem for quite some time. Only in rural activity by hand can employment be found and this means agriculture. Congress has never had an agricultural policy, inspite of the fact that agriculture is the dominant economic factor. The magnitude of the failure can be judged by the fact that during the plan, a great deal of food will still have to be imported—this in an agricultural nation with excessively low yields per acre and plenty of surplus manpower. Rural India has not evidently been effectively brought into the struggle to overcome poverty, idleness and economic backwardness.

—R. *M. Godwin.*

সম্বল। এই নিয়ে ফাঁদা হয়েছে এক বিরাট কাল্পনিক যোজনা যা কোনদিনই রামরাজ্যের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবে না। রাতারাতি বড় একটা কিছু গড়ে ওঠেনা। অর্থনৈতিক জীবনের গতি উপলব্ধি না করে যারা রাতারাতি বড় কিছু করতে যায় তাদের চেষ্টা অপচেষ্টায় পর্যবসিত হয়। সারা অর্থনৈতিক জীবনে একই কালে পরিবর্তন করতে গেলে যে পরিবর্তন সম্ভব নয়, তার উজ্জ্বল প্রমাণ রয়েছে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে। সম্বল আমাদের অল্প, সমস্যা অনেক কিন্তু তাই বলে এক সঙ্গে সবগুলোতে হাত দিলে কোনোটাই এগোয় না। গত দশ বৎসরে খাদ্য সমস্যা একতিলও কমেনি; দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য দিনদিনই বেড়ে চলেছে। এদিকে বেকার সমস্যা বেড়েই চলেছে দিন দিন। অশিক্ষিত লোক বেকার হলে জমির উপর চাপ পড়ে; আর শিক্ষিতলোক বেকার হলে রাষ্ট্রনায়কদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়। ব্যক্তি প্রচেষ্টাকে সঞ্জীবিত করলে বেকারত্বের সমাধান হয়। কিন্তু এদেশে সমাজবাদী অর্থব্যবস্থার জয়যাত্রার সম্মুখে ব্যক্তিপ্রচেষ্টা ক্রমেই হীনপ্রভ হয়ে পড়েছে। তাই বেকার সমস্যার সমাধান দিতে আমাদের যোজনা-বিশারদরা অসমর্থ। প্রথম যোজনার সময় থেকেই একটা ডামাডোল অবস্থা চলেছে। সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার বা গোঁজামিল দেবার চেষ্টা হচ্ছে। এতে সমাধান হচ্ছে না বরং জটিলতা বাড়ছে। আমাদের অর্থনৈতিক যোজনাতে প্রত্যেকটি বিষয়কেই পৃথক সত্তা হিসাবে দেখা হচ্ছে বলে মনে হয়, সবগুলো এক করে শিব হচ্ছে না বানর সে দেখার সামর্থ্য যোজনা বিশারদদের আছে বলে মনে হয় না।

আসল কথাটা আমাদের যোজনাবিশারদেরা ভুলে যান তাই ত বিভ্রাট। দেশটা গরীব, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জরাজীর্ণ। পশ্চিম ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদেশ নয় তাই তাঁরা ওখানে যা দেখেন এখানে তারই প্রয়োগ করেন। ফলে অপপ্রয়োগই হয়। পণ্ডিতে শেখে দেখে, মূর্খে শেখে ঠেকে। ঠেকেও যাদের চোখ খোলে নি তাদের জন্য অভিধানে নূতন শব্দ সংযোগ করার দায়িত্ব থাকল শব্দবিশারদদের।

তিনটি পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা (A Comparative Study of the Three Plans): পটভূমি, উদ্দেশ্য, পরিধি এবং উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতের তিনটি পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, প্রথম পরিকল্পনা আদৌ উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়, দ্বিতীয় পরিকল্পনা উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং তৃতীয় পরিকল্পনা অধিকতর উচ্চাকাঙ্ক্ষী। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মিলিতভাবে সরকারী খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে শুধুমাত্র তৃতীয় পরিকল্পনায় তদপেক্ষা বেশী টাকা বিনিয়োগ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সম্ভাব্য অর্থসংস্থানের ভিত্তিতেই কর্ম্মসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে; অপরপক্ষে তৃতীয় পরিকল্পনায় কার্যসূচীর ব্যয় এবং বরাদ্দের মধ্যে ৫০০ কোটি টাকার ফাঁক রাখা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ হইতে তিনটি পরিকল্পনায় কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল যে আগামী ২৭ বৎসরে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করিয়া দ্বিগুণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার লক্ষ্য ছিল এরূপ এক বনিয়াদের সৃষ্টি করা যাহা পরবর্তীকালে বৃহত্তর পরিকল্পনার ভিত্তিভূমি হইতে পারিবে; তৃতীয়তঃ যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে যে সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল চারিটি: পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা, মূলত ভারী শিল্পগুলির সম্প্রসারণ করা, পরিকল্পনাধীন সময়ে ৮০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং আয়বৈষম্য হ্রাস করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করা। তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পাঁচটি: পরিকল্পনাধীন পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা, মূল ও ভারী শিল্পগুলির সম্প্রসারণ করা, জনশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করিয়া সর্বাধিক পরিমাণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং পরিশেষে আয় বৈষম্য হ্রাস করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠনের পথে এক ধাপ অগ্রসর হওয়া। তৃতীয় পরিকল্পনার এই সকল উদ্দেশ্যের মূল লক্ষ্য হইল স্বয়ং-নির্ভরশীল সম্প্রসারণের সৃষ্টি করা।

চতুর্থতঃ, তিনটি পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দানের ব্যাপারেও কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিকে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পকে এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পকে সমান অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। প্রথম ও তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকে কয়েকটি কারণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। প্রথমতঃ খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যাপারে ভারতকে স্বয়ং-নির্ভরশীল হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ কৃষির উন্নতি ব্যতীত শিল্পের উন্নতি হইতে পারে না; কৃষির উন্নতি হইলে তবেই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়তঃ উদ্বৃত্ত কৃষিজ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিজ উৎপাদনের বেশ সন্তোষজনক অগ্রগতি হওয়ায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেওয়ায় তৃতীয় পরিকল্পনায় পুনরায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

পঞ্চমতঃ, তিনটি পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারীক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ এইরূপ ছিল:

	সরকারীক্ষেত্র	বেসরকারীক্ষেত্র
প্রথম পরিকল্পনা—	১৯৬০ কোটি টাকা	১৮০০ কোটি টাকা
দ্বিতীয় পরিকল্পনা—	৪৬০০ „ „	৩১০০ „ „
তৃতীয় পরিকল্পনা—	৭৫০০ „ „	৪৩০০ „ „

তিনটি পরিকল্পনায় বিভিন্ন উন্নয়নখাতে ব্যয়বরাদ্দ এইরূপ ছিল :

	প্রথম পরিকল্পনা		দ্বিতীয় পরিকল্পনা		তৃতীয় পরিকল্পনা	
	কোটি টাকা	শতকরা	কোটি টাকা	শতকরা	কোটি টাকা	শতকরা
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	২৯১	১৫	৫৬৮	১২	[illegible]০৬৮	১৪
২। সেচ ও শক্তি	৫৭০	২৯	৯১৩	১৯	[illegible]	২২
৩। খনি ও শিল্প	১১৭	৬	৮৯০	১৮	১৭৮[illegible]	২৪
৪। পরিবহন	৫২৩	২৭	১৩৮৫	২৯	১৪৮৬	২০
৫। সমাজসেবা }	৪৫৯	২৩	৯৪৫	২০	১৩০০	১৭
৬। বিবিধ }			৯৯	২	২০০	৩
মোট—				১০০		১০০

অর্থসংস্থানের দিক হইতেই তিনটি পরিকল্পনায় পার্থক্য দেখা যায়। প্রথম পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১৮৮ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮০০ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় উহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ২২০০ কোটি টাকায়। আভ্যন্তরীণ সম্পদের স্বল্পতার দরুণ ক্রমশই আমাদের পরিকল্পনার কর্মসূচী রূপায়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর অধিকমাত্রায় নির্ভর করিতে হইতেছে। ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৩৩ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহার পরিমাণ ছিল ৯৩৮ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১৫০ কোটি টাকা।

প্রথম পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কোনো লক্ষ্য ছিল না। অপরপক্ষে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় উহা পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় ৪৫ লক্ষ লোকের, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮০ লক্ষ লোকের এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পরিশেষে জাতীয় আয়ও মাথাপিছু আয় প্রথম পরিকল্পনাকাল হইতে দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ১০,২৪০ কোটি টাকা, ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা ১২,১৩০ কোটি টাকা হয় এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে উহা ১৯,০০০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে। মাথাপিছু আয় প্রথম পরিকল্পনা-কালে ছিল ২৮৪ টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উহা ৩০০ টাকা হয়, তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে উহা ৩৮৫ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে। বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের হারও ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার শেষে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা, ৭ ভাগ, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগ হয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৪ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইবে। প্রথম পরিকল্পনার শেষে সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের

৮·১%, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা জাতীয় আয়ের ৮·৫% হয়, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা জাতীয় আয়ের ১১·৫%এ আসিয়া দাঁড়াইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যকালীন অগ্রগতির পর্যালোচনা (Mid Term Appraisal of the Third Plan) : ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে তৃতীয় পরিকল্পনার তিন বৎসরের অগ্রগতির একটি সরকারী হিসাব প্রকাশিত হয়। এই সমীক্ষার হিসাবানুযায়ী পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরের ব্যয় হয় যথাক্রমে ১১৩০ কোটি টাকা, ১৪[illegible] কোটি টাকা এবং ১৬৫৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রথম তিন বৎসরে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪১৯৮ কোটি টাকা। পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসর এবং পঞ্চম বৎসরে যথাক্রমে ১৯৮৪ কোটি টাকা এবং ২২২৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইতেছে ৮৪০৭ কোটি টাকা (৪১৯৮+১৯৮৪+২২২৫)

জাতীয় আয় : তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে জাতীয় আয়বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে জাতীয় আয় ২·৫% হারে বৃদ্ধি পায়। কৃষিক্ষেত্রে আশানুরূপ উৎপাদন না হওয়ার দরুণ জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কম হয়। অবশ্য পরবর্তী দুইবৎসরে জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার অধিক ছিল—যথাক্রমে ৪·৫% ও ৭·৩% হারে। তৃতীয় পরিকল্পনার সর্বশেষ প্রকাশিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে পরিকল্পনাধীন সময়ে জাতীয় আয় শতকরা ১৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল এই সময়ে জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা। মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির হার আরও নৈরাশ্যজনক—পরিকল্পনার প্রথম চার বৎসরে বাৎসরিক ১·৮% হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ৭৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্য ধার্য করা হয় কিন্তু কার্যতঃ মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৪০৭ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইলেও জাতীয় আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই।

কৃষি : তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে, বিশেষ করিয়া শেষ দুই বৎসরে কৃষিক্ষেত্রে শোচনীয় ব্যর্থতা দেখা যায়। কৃষি উৎপাদনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়।' কৃষি-উৎপাদনের ব্যর্থতার দরুণ দেশে খাদ্যসংকট মারাত্মক হইয়া দেখা দেয়। ১৯৬১-৬২ সালে কৃষি উৎপাদনের সূচক-সংখ্যা ছিল ১৪১·৪. (১৯৪৯-৫০ = ১০০). ১৯৬২-'৬৩ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ১৩৬·৮ হয় ; ১৯৬৩-৬৪ সালে কিছু বৃদ্ধি পাইয়া ১৪০·৫-এ আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯৬৪-৬৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০-এ আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে পুনরায় কৃষি উৎপাদনসূচী হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।·

১৯৬১-৬২ সালে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭·৯৭ কোটি টন। ১৯৬২-৬৩ সালে মোট খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ হয় ৭·৭৫ কোটি টন। ১৯৬৩-৬৪ সালে কৃষি উৎপাদনের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৭·৯৪ কোটি টনে। ১৯৬৪-৬৫ সালেই শুধুমাত্র খাদ্যশস্যের উৎপাদন সন্তোষজনক হয় কিন্তু পর বৎসর (অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালে) উহা হ্রাস পাইয়া ৭·২ কোটি টনে আসিয়া দাঁড়ায়। আশা করা হইয়াছিল

যে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১০ কোটি টন হইবে কিন্তু অনুমিত লক্ষ্যমাত্রা পুরণ হয় নাই। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি অপরিহার্য। তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যবর্তী সময় হইতে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক এবং বিশেষ কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয়।

সেচ

কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ-ব্যবস্থার প্রসার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে ২৬ লক্ষ একর, দ্বিতীয় বৎসরে ৩২ লক্ষ একর এবং তৃতীয় বৎসরে ৫৫ লক্ষ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হইয়াছে।

শিল্প: শিল্পউৎপাদনের সূচক সংখ্যা হইতে দেখা যায় যে ১৯৬১ সালে মোট শিল্প উৎপাদন শতকরা ৭ ভাগ, ১৯৬২ সালে শতকরা ৮·৭ ভাগ, ১৯৬৩ সালে শতকরা ৬·৩ ভাগ, ১৯৬৪ সালে শতকরা ৮·৭ ভাগ এবং ১৯৬৫ সালে শতকরা ৭·৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। (১৯৫৬=১০০). ইস্পাতের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনটি সরকারী বৃহদায়তন ইস্পাত কারখানায় প্রকৃত উৎপাদন পূর্ণ-উৎপাদন ক্ষমতার সমান হইয়াছে। ইস্পাত, সিমেণ্ট, কয়লা, যন্ত্রপাতি ও সারের উৎপাদন বৃদ্ধি সন্তোষজনক। শিল্প উৎপাদনের সূচকে শিল্পক্ষেত্রে যে সামগ্রিক অগ্রগতি দেখা গিয়াছে, মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন তদপেক্ষা অধিকহারে হইয়াছে কিন্তু ভোগ্যপণ্য দ্রব্য উৎপাদন তদপেক্ষা কম হারে হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা (installed capacity) বিশেষ বৃদ্ধি পায়।

পরিবহন: পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রেও উন্নয়ন বেশ সন্তোষজনক। রেলের ওয়াগন নির্মাণ সংখ্যা বৎসরে ১৯ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৫ হাজারেরও অধিক হইয়াছে। রেলপথে মালপত্র বহনের পরিমাণ ১৫৪ মিলিয়ন টন (১৯৬০-৬১) হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৭৩ মিলিয়ন টনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ৫২৪ মাইল রেলপথ বৈদ্যুতিকরণ করা হইয়াছে। পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে রেলপথসমূহ উন্নয়ণের জন্য ৮৬৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। পথ পরিবহনের জন্য এই সময় ১৮৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

বিদ্যুৎ: পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসর বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে ৭৯০০-র মতো নূতন শহর ও গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ করা যাইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর, দ্বিতীয় বৎসর এবং তৃতীয় বৎসরে যথাক্রমে ১৩৬ কোটি টাকা, ১৯১ কোটি টাকা এবং ২৪৭ কোটি টাকা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যয় করা হইয়াছে।

শিক্ষা: এই সময়ে সাধারণ শিক্ষা এবং স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হয়। এই সময় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডিপ্লোমা এবং স্নাতক স্তরের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বিশেষভাবে বাড়ানো হয়। স্বাস্থ্যের জন্য যে ৩৪২

কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয় প্রথম দুই বৎসরেই উহা হইতে ১৩৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

জরুরী ব্যবস্থা ঃ তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে চীনা আক্রমণের জন্য দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। ফলে আমাদের কর্ম প্রচেষ্টার কিছু অংশ প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে নিযুক্ত হয়। অনেকেই অবশ্য এই সময় তৃতীয় পরিকল্পনা বাতিল করিয়া দিবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু যাই হোক পরিকল্পনা বাতিল করার প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। মোট ব্যয়ও কোনোরূপ হ্রাস করা হয় নাই। জরুরী অবস্থা ঘোষণায় পরিকল্পিত কর্মপ্রচেষ্টার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনোরূপ অসুবিধা দেখা দেয় নাই। অবশ্য প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে পরিকল্পনার ব্যয়বণ্টনের পুনর্বিন্যাস করা হয়। জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে পরিকল্পনার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পুনর্বিন্যাসের পরও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনার মোট ব্যয় ৮০০০ কোটি টাকা অপেক্ষাও বেশী হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
(Fourth Five Year Plan of India)

[**বিষয়বস্তু :** চতুর্থ পরিকল্পনার রূপরেখা : চতুর্থ পরিকল্পনার বিস্তারিত আলোচনা : উদ্দেশ্য : রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সম্পর্ক : ব্যয়বরাদ্দ : চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থসংস্থান : উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা : কৃষি ও শিল্প : স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা : শিক্ষা : দামনীতি : কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা : বৈদেশিক বাণিজ্য : পরিকল্পনার পরিক্রমা : সমালোচকের বাঁকাচোখে চতুর্থ পরিকল্পনা]

আয়বৃদ্ধি

চতুর্থ পরিকল্পনার রূপরেখা (Draft Outline of the Fourth Five Year Plan) : ১৯৬৬ সালের ২৮শে আগষ্ট তারিখে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহেতা পার্লিয়ামেণ্টে ২৩,৭৫০ কোটি টাকার চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া পেশ করেন। এই পরিকল্পনার খসড়া জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক পূর্বেই অনুমোদিত হইয়াছিল। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বৎসরে ৫·৫% হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং ৩% হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে।

খাদ্য ও বস্ত্র

জনগণের দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য ও বস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। এদিক হইতে বিচারে চতুর্থ পরিকল্পনা যথেষ্ট আশাবহ। হিসাব করা হইয়াছে যে পাঁচ বৎসর পরে জনগণ প্রত্যহ মাথাপিছু তিন আউন্স অতিরিক্ত খাদ্যশস্য এবং বার্ষিক দুই মিটার অতিরিক্ত কাপড় পাইবে।

খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও ১৯৭১ সালে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিবে। ইহার জন্য খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য ১২ কোটি টনে ধার্য করা হইয়াছে। পরিকল্পনার খসড়া অনুযায়ী PL 480 অনুসারে খাদ্য আমদানীর পরিমাণ আগামী পাঁচ বৎসরে হ্রাস করিয়া ১৯ মিলিয়ন টনে আনিতে হইবে।

আত্মনির্ভরশীলতা

সমাজতন্ত্র ও মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব

স্বয়ম্ভরতা অর্জন করাই চতুর্থ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালের মধ্যে বৈদেশিক সাহায্য ব্যতিরেকেই যাহাতে দেশ অগ্রগতির পথে চলিতে পারে তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অবশ্য সাধারণ বৈদেশিক বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা হইবে। স্বয়ম্ভরতা ছাড়াও চতুর্থ পরিকল্পনার আরও দুইটি মূল লক্ষ্য রহিয়াছে— মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব রক্ষা করা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য হ্রাস করা। মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে চতুর্থ পরিকল্পনায় কোনোরূপ ঘাটতি ব্যয় করা হইবে না। চতুর্থ পরিকল্পনাই প্রথম পরিকল্পনা যেখানে কোনোরূপ ঘাটতি ব্যয় করা হইবে না।

এই ত্রিবিধ মূল উদ্দেশ্য সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন ছাড়াও সার, কীটনাশক দ্রব্য এবং কৃষি

সরঞ্জাম নির্মাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইবে। সমষ্টি উন্নয়ন, সমবায়, কৃষি ঋণ, গ্রাম্য পথ নির্মাণ এবং বৈদ্যুতিকরণের জন্যও কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে। বর্তমানে যে পরিমাণে গ্রামে বিদ্যুৎসরবরাহের ব্যবস্থা আছে, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করা হইবে।

কৃষি

কৃষির পরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে পরিবার পরিকল্পনার উপর। জন্মহার প্রতি হাজারে ৪০ হইতে হ্রাস করিয়া ২৫ করিতে হইবে। পরিবার পরিকল্পনার কার্যসূচীকে প্রসারিত করিতে হইবে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য নবাবিষ্কৃত লুপ ব্যবহারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইবে। পরিবার পরিকল্পনার জন্য খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় যে ৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা নিঃশেষিত হইলে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগকে অতিরিক্ত ১৪৪ কোটি টাকা দিবার কথা বিবেচিত হইবে।

পরিবার পরিকল্পনা

চতুর্থ পরিকল্পনার অপরাপর প্রধান লক্ষ্যসমূহ হইল শক্তি উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি করিয়া দ্বিগুণ করা, জলসেচব্যবস্থা একতৃতীয়াংশ বৃদ্ধি করা, রেলপথের মালবহন ক্ষমতা অর্ধেক বৃদ্ধি করা, ৫০,০০০ কিলোমিটার নূতন রাস্তা নির্মাণ করা, জাহাজী শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দ্বিগুণ করা এবং শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত বৃদ্ধি সাধন করা।

ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ১৪ মিলিয়ন টন করা হইবে। লৌহ আকরিকের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক করিতে হইবে। কয়লার উৎপাদন অর্ধেক বৃদ্ধি করিতে হইবে। নিউজপ্রিন্টের উৎপাদন পাঁচগুণ এবং ট্রাক্টর উৎপাদন সাতগুণ বৃদ্ধি পাইবে। কেরোসিনের উৎপাদন ১০ মিলিয়ন টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০ মিলিয়ন টন হইবে। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১৯৭১ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি দেশের প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প হইবে।

চতুর্থ পরিকল্পনার মোট ব্যয় হইবে ২৩,৭৫০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সরকারী খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ হইল ১৬,০০০ কোটি এবং বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ হইল ৭,৭৫০ কোটি টাকা।

মোট ব্যয়

বেসরকারী বিনিয়োগের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ সুসংগঠিত শিল্প এবং খনি খাতে ব্যয় হইবে এবং শতকরা ১৫ ভাগ গৃহনির্মাণ খাতে ব্যয় হইবে। কৃষি এবং যানবাহন ও যোগাযোগ খাতে শতকরা ১৫ ভাগ ব্যয় করা হইবে। বে-সরকারী বিনিয়োগের বাকী ৪০ ভাগ অন্যান্য শিল্পে ব্যয় করা হইবে।

সরকারী খাতে যে ১৬,০০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে তাহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৮৫৩২ কোটি টাকা, রাজ্যসমূহ ৭০৭৭ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ৩৯১ কোটি টাকা ব্যয় করিবে।

কেন্দ্র ও রাজ্যের ব্যয় বণ্টন সম্পর্কে ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে রাজ্যসমূহের মুখ্য মন্ত্রীদের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং এই কমিটি কেন্দ্র ও রাজ্য পরিকল্পনাগুলির শ্রেণীবিভাগ পর্যালোচনা করিয়া দেখিতেছে। এই কমিটি রিপোর্ট

দাখিল করিলে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের বিনিয়োগের পরিমাণের পরিবর্তন হইতে পারে।

মোট বিনিয়োগের মধ্যে কৃষিখাতে বিনিয়োগের পরিমাণ তৃতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে আর শিল্প, বিদ্যুৎ এবং পরিবহন খাতে বিনিয়োগ ৬১.৮% হইতে হ্রাস পাইয়া ৫৮.৪% হইয়াছে।

সমাজসেবা

সমাজসেবা ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ২০ ভাগ করা হইয়াছে। অনুন্নত এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় উন্নতির জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করায় এই খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পুনর্বাসন

পুনর্বাসন খাতে ব্যয় ৪৮ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া উহার দ্বিগুণ করা হইয়াছে। দুই কারণে এই খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ৪০,০০০ উদ্বাস্তু পরিবার অস্থায়ী শিবিরে (transit camp) বাস করিতেছে, ইহাদের স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশে বসবাসকারী বহু ভারতীয়ের স্বদেশে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সরকারী খাতে যে পরিমাণ ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা এইভাবে সংগ্রহ করা হইবে: সরকারী ব্যবসায়বাবদ লাভ, আভ্যন্তরীণ উৎস হইতে ১৮০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, ইহার মধ্যে রাজ্যসমূহ ৭০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিবে এবং ৩৩৫ কোটি টাকা পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয় সংকোচ।

বৈদেশিক সাহায্যের (PL 480 আমদানী ব্যতীত) পরিমাণ হইবে ৪৩৪০ কোটি টাকা বা ৮.৪ মিলিয়ন ডলার। ইহা ছাড়া বেসরকারী বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ হইবে ৯০০ মিলিয়ন ডলার।

চতুর্থ পরিকল্পনায় রপ্তানী বৃদ্ধির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। রপ্তানী মূল্য বৃদ্ধি করিয়া ৫১০০ কোটি টাকা করিতে হইবে। (প্রাক-মুদ্রামান হ্রাস টাকার অংকে) অর্থাৎ রপ্তানী মূল্য ৮২৫ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১৯৭০ সালে বার্ষিক ১২২৫ কোটি টাকা করিতে হইবে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় বর্তমান প্রকল্পগুলিকে দ্রুত সম্পূর্ণ করা, উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার করা এবং বিনিয়োগ সম্প্রসারণের পরিবর্তে বিনিয়োগ বিনির্দিষ্টতার (selectivity in investment) উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।

কর্মসংস্থান

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কৃষিক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ নূতন কর্মসংস্থান এবং অ-কৃষিগত ক্ষেত্রে এক কোটি ৪০ লক্ষ নূতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। সুতরাং মোট এক কোটি ৯০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা চতুর্থ পরিকল্পনায় হইবে। অবশ্য কর্মসংস্থান অপেক্ষা কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশী হইবে (৩ কোটি ৫০ লক্ষ) সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান হইবে না।

ভূমি-সংস্কারের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা রচয়িতারা চাহিয়াছেন, যে সকল ভূমিসংক্রান্ত আইন পাশ হইয়াছে তাহাদের কার্যে পরিণত করা।

চতুর্থ পরিকল্পনার বিস্তারিত আলোচনা (Details of the Fourth Plan) : কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহতা ১৯৬৬ সালের ২৯শে আগষ্ট তারিখে পার্লিয়ামেন্টে চতুর্থ পরিকল্পনার খস্ড়া রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৬৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকাল সুরু হয় এবং ১৯৭১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ইহার কার্যকাল শেষ হইবে।

চতুর্থ পরিকল্পনার খস্ড়া ২৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত ৪২২ পাতার এক দীর্ঘ রিপোর্ট। এই রিপোর্ট দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে পরিকল্পনাসংক্রান্ত নীতির আলোচনা রহিয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে উন্নয়ন পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে।

উদ্দেশ্য (Objectives) : চতুর্থ পরিকল্পনায় কতকগুলি মূল উদ্দেশ্য সাধনের কথা বলা হইয়াছে। মোটামুটি তিনটি মূল উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে—

তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য

আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, দেশের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের হার বৃদ্ধি এবং দ্রুত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা—এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যসূচী নির্ধারিত হইয়াছে।

[১] **খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন** চতুর্থ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। চতুর্থ পরিকল্পনায় খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য ১২ কোটি টনে ধার্য করা হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে ১৯৭১ সালে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১০ কোটি টনে ধার্য ছিল। মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ দৈনিক তিন আউন্স করিয়া বৃদ্ধি পাইলেও খাদ্যোৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য আছে তাহা পূরণ হইলে দেশ ১৯৭১ সালে খাদ্যে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে।

[২] জীবনযাত্রার মানোন্নয়ণের জন্য **জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি** সন্তোষজনক হওয়া প্রয়োজন। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বৎসরে ৫·৫% হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং ৩% হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বৎসরে ৫% হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধির নীতি গৃহীত হয়।

[৩] **সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের** নীতি গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হয়। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠা বলিতে বুঝায় যে সমাজের কাঠামোকে এরূপভাবে পরিবর্তিত করিতে হইবে যাহাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে আয় ও সম্পদ বণ্টনে অধিকতর সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সকল অর্থ যাহাতে কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হইতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারী নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ইহার জন্য প্রয়োজন সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা এবং বেসরকারী উদ্যোগকে সমাজ-অনুমোদিত পথে পরিচালিত করা। সমাজের অনুন্নত সম্প্রদায়ের আয় বৃদ্ধি এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রসারের মাধ্যমে ধন-বৈষম্য হ্রাস করিয়া সমাজতান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

[৪] **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব** আরোপ চতুর্থ পরিকল্পনার অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। চতুর্থ পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা পূর্ববর্তী কোনো পরিকল্পনায়ই দেওয়া হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনায় পরিবার-পরিকল্পনার জন্য মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার জন্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় খসড়া পরিকল্পনায় পরিবার নিয়ন্ত্রণের জন্য ২৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়; পরে উহাকে বাড়াইয়া ৫০ কোটি টাকা করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ খসড়া পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার জন্য ৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে, উহা নিঃশেষিত হইলে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ আরও ১৪৪ কোটি টাকা পাইবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় জন্মহার প্রতি হাজারে ৪০ হইতে হ্রাস করিয়া ২৫ করিতে হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য লুপ ব্যবহারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

[৫] **আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের** জন্য রপ্তানী বৃদ্ধির উপর চতুর্থ পরিকল্পনায় সমুচিত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। যে সকল কৃষিজ ও শিল্প দ্রব্য রপ্তানী বৃদ্ধি ও আমদানী হ্রাস করিতে সহায়তা করিবে তাহাদের উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। রপ্তানীমূল্য বৃদ্ধি করিয়া বার্ষিক ১২২৫ কোটি টাকা করিতে হইবে।

[৬] **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা** চতুর্থ পরিকল্পনার অন্যতম মূল লক্ষ্য। চতুর্থ পরিকল্পনায় এক কোটি ৯০ লক্ষ নূতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। ইহার মধ্যে কৃষি-নিয়োগের পরিমাণ হইবে ৫০ লক্ষ আর অ-কৃষি নিয়োগের পরিমাণ হইবে এক কোটি ৪০ লক্ষ।

প্রথম পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষভাবে ৪৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে ৬৫ লক্ষ এবং কৃষিক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ অর্থাৎ মোট ৯০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এক কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়—ইহার মধ্যে এক কোটি ৫ লক্ষ লোকের কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে এবং ৩৫ লক্ষ লোকের কৃষির ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় এক কোটি ৯০ লক্ষ নূতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। অবশ্য চতুর্থ পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এই সময় মোট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হইবে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ।

[৭] **দ্রব্যমূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করা** চতুর্থ পরিকল্পনার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। প্রথম পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তর স্থিতিশীল ছিল কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল হইতে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার ফলে জনসাধারণের প্রকৃত আয় এবং জীবন-যাত্রার মান হ্রাস পায়। তৃতীয় পরিকল্পনায় সর্বপ্রথম সক্রিয় দাম নীতি গ্রহণ করা হয়। মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতি রোধের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় ঘাটতি বর্জন এবং মুদ্রাস্ফীতি-রোধের জন্য উপযুক্ত আর্থিক ও ফিসক্যাল নীতি গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

[৮] চতুর্থ পরিকল্পনায় **শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক** কাজের উপর পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলি অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ব্যয়বরাদ্দ ছিল মোট বিনিয়োগের ১৭ ভাগ। চতুর্থ পরিকল্পনায় উহা বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ২০ ভাগ করা হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শ রূপায়ণের জন্য সমাজকল্যাণমূলক ব্যয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সম্পর্ক (Central-State Shares) : চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ১৬০০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৮৫৩২ টাকা এবং রাজ্যসমূহ ৭০৭৭ কোটি টাকা ব্যয় করিবে, কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ৩৯১ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার যে ৮৫৩২ টাকা ব্যয় করিবে তাহার মধ্যে কেন্দ্র-প্রবর্তিত প্রকল্পের জন্য ৯৭৬ কোটি টাকা, রাজ্য সরকারের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের জন্য ৩৪৮ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জন্য ৭২১২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

কেন্দ্র প্রবর্তিত (Centrally sponsored) এবং রাজ্য প্রকল্পগুলির চূড়ান্ত শ্রেণীবিভাগ এখনও হয় নাই। যদি রাজ্যসমূহ অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে তাহা হইলে জলসেচ, বিদ্যুৎ, ক্ষুদ্র ও গ্রামীন শিল্প, কারিগরী শিক্ষা প্রভৃতির অতিরিক্ত কার্যসূচী রাজ্য পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। খসড়া পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কেন্দ্র ও রাজ্য খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় নাই। পরিকল্পনা কমিশনের মতে পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরের অগ্রগতি লক্ষ্য করিয়া পরবর্তী তিন বৎসরের আর্থিক সম্পদের পর্যালোচনা করা হইবে এবং প্রয়োজনানুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের ব্যয়বরাদ্দের পুনর্বিন্যাস করা হইবে।

ব্যয়বরাদ্দ (Outlay of the Plan) : চতুর্থ পরিকল্পনায় যে কর্মসূচী প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়নী ক্ষেত্রে এইভাবে ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার সহিত তৃতীয় পরিকল্পনার সরকারী ক্ষেত্রে অনুমিত ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইল।

উন্নয়ন ক্ষেত্র	তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে অনুমিত ব্যয়	চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ব্যয়	চতুর্থ পরিকল্পনায় বেসরকারী খাতে ব্যয়	মোট ব্যয়বরাদ্দ
১। কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায়	১১০৩	২৪১০	৯০০	৩৩১০
২। সেচ	৬৫৭	৯৬৪	—	৯৬৪
৩। বিদ্যুৎ	১২৬২	২০৩০	৫০	২০৮০
৪। ক্ষুদ্রশিল্প	২২৪	৩৭০	৩২০	৬৯০
৫। সংগঠিত শিল্প ও খনি	১৭৬৫	৩৯৩৬	২৩৫০	৬২৮৬

উন্নয়ন ক্ষেত্র	তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে অনুমিত ব্যয়	চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ব্যয়	চতুর্থ পরিকল্পনায় বেসরকারী খাতে ব্যয়	মোট ব্যয়বরাদ্দ
৬। পরিবহন ও যানবাহন	২১১৫	৩০১০	৬৩০	৩৬৪০
৭। শিক্ষা	৫৯৬	১২১০	৯০	১৩০০
৮। বৈজ্ঞানিক গবেষণা	৭৫	১৪০		১৪০
৯। স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও জল সরবরাহ	৩৫৭	৯৬০	—	৯৬০
১০। গৃহনির্মাণ	১১০	২৮০	১৫০০	১৭৮০
১১। অনগ্রসর জাতির কল্যাণ	১০২	১৮০	—	১৮০
১২। সমাজ কল্যাণ	১৯	৫০	১০	৬০
১৩। কারিগরী ট্রেনিং ও শ্রমিক কল্যাণ	৭২	১৪৫	—	১৪৫
১৪। জন সমবায়	২	১০	—	১০
১৫। গ্রামীণ কর্মসূচী	৪১	৯৫	—	৯৫
১৬। পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন	—	৫০	—	৫০
১৭। পুনর্বাসন	৪৮	৯০	—	৯০
১৮। অন্যান্য কর্মসূচী	১১	৭০	—	৭০
১৯। মজুত মাল (inventories)	—	—	১৯০০	১৯০০
				২৩,৭৫০

চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থসংস্থান (Financing the Plan): চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে প্রস্তাবিত ১৬০০০ কোটি টাকা নিম্নলিখিত সূত্র হইতে সংগ্রহ করা হবে:

উৎসসমূহ	কোটি টাকার হিসাবে
১। চলতি রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত	৩০১০
২। রেলপথ প্রদত্ত অর্থ	২৬০
৩। অন্যান্য সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মুনাফা	১০৮৫
৪। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ	১৫০০
৫। স্বল্প সঞ্চয়	১০০০
৬। অন্যান্য মূলধনীসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ	১৩৮০
৭। বৈদেশিক সাহায্য	৪৭০০
৮। পরিকল্পনা-বর্হিভূত ব্যয় হইতে ব্যয় সংকোচজনিত প্রাপ্ত অর্থ	৩৩৫
৯। অতিরিক্ত আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ	২৭৩০
	১৬,০০০

১৯৬৬-৬৭ সালে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা করিতে ৯০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। পরিকল্পনার বাকী চার বৎসরে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার মিলিতভাবে বাকী ১৮০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিবে।

অতিরিক্ত আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের জন্য মোটামুটি ছয়প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ. বিদ্যুৎ ও সরকারী অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হইতে বিনিয়োজিত মূলধনের উপর বাৎসরিক ১১% আয় করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের মধ্যে এরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে যাহাতে দেশীয় উৎপাদকগণ অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করিতে না পারে এবং যোগানের এক বৃহৎ অংশ যেন রপ্তানী হইতে পারে। স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের (durable consumers' goods) উপর অধিক হারে কর ধার্য করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, দেশের অর্থনীতির সম্প্রসারণ এবং বিকেন্দ্রিকরণের সাথে সাথে নূতন নূতন দ্রব্যসামগ্রী বাজারে আসিবে, ফলে অন্তঃশুল্ক হইতে আয়বৃদ্ধি পাইবে। চতুর্থতঃ কৃষি-আয়কর, ভূমি-রাজস্ব এবং সেচকরের সংশোধন করিয়া আয়বৃদ্ধি করিতে হইবে। পঞ্চমতঃ সম্পদকরের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে। পরিশেষে আয়বৃদ্ধি এবং ভোগ্যবস্তুর উপর ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে আয়করকে অধিকতর প্রসারিত করিতে হইবে।

ছয় ধরণের ব্যবস্থা

উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (Targets of Production) কৃষিক্ষেত্র :—দেশে খাদ্যাভাব চরম হওয়ায় চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১২ কোটি টনে আসিয়া দাঁড়াইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১০ কোটি টনে ধার্য ছিল। চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির হার হইল ৫.৫৯%—খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার হইল ৫.৯২% এবং অন্যান্য কৃষিদ্রব্যের (non-foodgrains) উৎপাদন বৃদ্ধির হার হইল ৫.০১%

চতুর্থ পরিকল্পনায় কয়েকটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে কৃষিজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এইরূপ হইবে :

দ্রব্য	একক	১৯৬৫-৬৬ সালের উৎপাদন	অতিরিক্ত উৎপাদন-চতুর্থ পরিকল্পনা	চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে উৎপাদন	১৯৬৫-৬৬ সালের তুলনা শতকরা বৃদ্ধি
১। খাদ্যশস্য	মিলিয়ন টন	৯০.০	৩০.০	১২০.০	৩৩
২। আখ	" "	১১.০	২.৫	১৩.৫	২৩
৩। তৈলবীজ	" গাঁট	৭.৫	৩.২	১০.৭	৪৩
৪। তুলা	" "	৬.৩	২.৩	৮.৬	৩৭
৫। পাট	" "	৬.২	২.৮	৯.০	৪৫
৬। তামাক	" টন	৪০০	৭৫	৪৭৫	১৯
৭। লাক্ষা	হাজার "		২০	৫০	৬৭

আশা করা যাইতেছে একর প্রতি উৎপাদন খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে শতকরা ২৬ ভাগ, তৈলবীজের ক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগ, আখের ক্ষেত্রে শতকরা ১৪ ভাগ, তুলার ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ ভাগ এবং পাটের ক্ষেত্রে শতকরা ১৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

সারের উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি পাইবে। ভূমি সংরক্ষণ এবং উন্নত বীজ উৎপাদনের কর্মসূচী দ্বিগুণ বাড়িবে। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকর্মের উপর জোর দেওয়া হইবে। ভূমি-সংস্কার চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষিউন্নয়ন পরিকল্পনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। উৎপাদন বৃদ্ধির পথে কৃষি কাঠামোয় যে ত্রুটি রহিয়াছে তাহা দূর করাই ভূমি-সংস্কার নীতির লক্ষ্য হইবে। উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করিয়া কৃষককে ঋণ মঞ্জুর করা হইবে।

কৃষি-পরিকল্পনাসূচীকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে গ্রাম, ব্লক এবং জিলা পরিকল্পনার উপর অধিকতর দৃষ্টি দিতে হইবে। সমষ্টি উন্নয়ন এবং পঞ্চায়েতিরাজ পরিকল্পনার মধ্যে সম্পর্ক আরও নিবিড় করিতে হইবে। কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমবায় ঋণ, সমবায় বিক্রয়, সমবায় পদ্ধতিতে পশু পালন, মাছের চাষ, ডেয়ারী শিল্প প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

কৃষি-পরিকল্পনা ছাড়াও অন্যান্য পরিকল্পনা হইতে কৃষি উৎপাদন সহায়তা পাইবে, সেই কারণে কৃষিবাবদ প্রকৃত ব্যয় অধিক হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে প্রধান ও মাঝারি জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর জন্য যে ৯৬৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে কৃষি কর্মসূচীকে সহায়তা করিবে। গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের জন্য ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সার কারখানা, ট্রাক্টর তৈয়ারীর কারখানা ও কীটনাশক ঔষধ উৎপাদন কারখানা নির্মাণের জন্য সরকারী খাতে ২৭৮ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য আনুমানিক ৭০ কোটি টাকা এবং গ্রামীন কার্যসূচীর জন্য ৯৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

শিল্প-ক্ষেত্র (Industries) : চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্পক্ষেত্রে যে উন্নয়ণী কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে সার, কীটনাশক ঔষধ, কৃষিসরঞ্জাম, ধাতু-শিল্প, মেশিন-তৈয়ারীর কারখানা, পেট্রোলিয়াম, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, সিমেণ্ট, চিনি, বস্ত্র এবং কেরোসিনের মতো অতি প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কয়েকটি শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কি হইবে তাহা দেখান হইল :

শিল্প	একক	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৭০-৭১ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা
১। লৌহ আকরিক	মিলিয়ন টন	১১·০	২৩·০	৫৪·০
২। কয়লা	,, ,,	৫৫·৭	৭০·০	৯৬·০

	শিল্প	একক	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৭০-৭১ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা
৩।	পেট্রোলিয়াম শোধন	,, ,,	৫.৮	৯.৮৬	২০.০
৪।	ইস্পাত পিণ্ড	,, ,,	৩.৪	৬.২	১১.৭
৫।	মেশিন টুল	,, টাকা	—	২৩০.০	১০৫০.০
৬।	এ্যালুমিনিয়াম	০০০ সংখ্যা	১৮.৩	৬৫.০	৩৩০.০
৭।	ট্রাক্টর	,, ,,	—	৫.৬	৩৫.০
৮।	ডিজেল ইঞ্জিন	,, ,,	৪৩.২	৮৫.০	২০০.০
৯।	নাইট্রোজেনিয়স সার	০০০টন	৯৯.০	২৩৩.০	২০০০.০
১০।	ফসফেটিক সার	০০০ টন	৫৪.০	১১.০	১০০০.০
১১।	ঔষধ	মিলিয়ন টাকা	—	১৫০০.০	২৫০০.০
১২।	কাগজ ও কাগজ বোর্ড	০০০টন	৩৫০.০	৫৫০.০	৯০০.০
১৩।	নিউজ প্রিন্ট	,, ,,	২৩.৩	৩০.০	১৫০.০
১৪।	সিমেন্ট	মিলিয়ন টন	৮.০	১০.৮	২০.০
১৫।	মিল বস্ত্র	মিলিয়ন মিটার	৪৬৪৯.০	৪৪৩৪.০	৫৪৮৬.০
১৬।	চিনি	মিলিয়ন টন	৩.০৩	৩.৬	৪.৫
১৭।	বাণিজ্যিক যান	০০০ সংখ্যা	২৮.৪	৩৪.৪	৮০.০০
১৮।	মোটর সাইকেল ও স্কুটার	০০০ সংখ্যা	১৭.৬	৫০.০	১২০.০
১৯।	বাইসাইকেল	মিলিয়ন	১.১	১.৭	৩.৫
২০।	বৈদ্যুতিক পাখা	মিলিয়ন	১.১	১.৭	৩.৫

গ্রামীন ও ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এইরূপ: ৪৫৭২ মিলিয়ন মিটার বস্ত্র, ৩১.০ লক্ষ কিলোগ্রাম কাঁচা সিল্ক এবং ২৫০টি নূতন শিল্পতালুক স্থাপনা। এই সকল ক্ষেত্রে ১৯৬৫-৬৬ সালের উৎপাদন ছিল এইরূপ : ৩১৪৬ মিলিয়ন মিটার বস্ত্র, ২১.৫ লক্ষ কিলোগ্রাম কাঁচা সিল্ক এবং ৩০০টি নূতন শিল্প-তালুক স্থাপনা।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (Health and Family Planning) : স্বাস্থ্যখাতে পরিবার পরিকল্পনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ছিল ৮৭টি, উহা বৃদ্ধি করিয়া চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ১১২টি করা হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ডাক্তারদের সংখ্যা হইবে ৮৬,০০০ ইহা ব্যতীত চতুর্থ পরিকল্পনায় অতিরিক্ত ৪৫,০০০ ডাক্তার পাওয়া যাইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ডাক্তার-জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ১ : ৫৮০০ ; চতুর্থ পরিকল্পনায় এই অনুপাত বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইবে ১ : ৪৬০০ ; নার্স এবং ধাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করিয়া ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে।

পরিবার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইল যতশীঘ্র সম্ভব জন্মহার প্রতি হাজারে ৪০ হইতে নামাইয়া ২৫ করিতে হইবে। দেশের শতকরা ৯০ ভাগ বিবাহিত জনগণকে পরিবার পরিকল্পনার সুবিধা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত জ্ঞান, ছোট পরিবারের সুবিধা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দ্রব্যাদির সরবরাহ এবং চিকিৎসকের পরামর্শ—ইহাদের মাধ্যমেই পরিবার পরিকল্পনার আদর্শে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় সারা দেশে ৫৫০০ গ্রামীন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, ১৮০০ পৌর পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র এবং ৪১,০০০ সাব-সেণ্টার খোলা হইবে। জন্মনিয়ন্ত্রণের সকল পদ্ধতি ব্যবহার করা হইলেও লুপ ব্যবহারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে লুপ ব্যবহারের পরিমাণ ৬ মিলিয়ন, ১৯৭০-৭১ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১০·৫ মিলিয়ন হইবে।

জন্মহার ২৫ করিতে হইবে

শিক্ষা (Education) : চতুর্থ পরিকল্পনাকালে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকমাত্রায় দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার সহিত সুসম্বদ্ধ করা হইবে। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের প্রতিও যথোচিত দৃষ্টি দিতে হইবে। সামাজিক প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়া শিক্ষাব্যবস্থার অন্যান্য পর্যায়কে তদনুসারে গড়িতে হইবে।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বিদ্যালয়গামী ৬-১১ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকার সংখ্যা ৭৮·৫% হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৯২·২% হইবে; ১১-১৪ বৎসর বয়স্ক বিদ্যালয় গমনকারী বালক বালিকার সংখ্যা ৩২·২% হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৭·৪% হইবে। ১৪-১৭ বৎসর বয়স্ক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ১৭·৮ ভাগ হইতে বাড়িয়া শতকরা ২২·১ ভাগ হইবে এবং ১৭-২২ বৎসর বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা শতকরা ১·৯ ভাগ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ২·৪ ভাগ হইবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমাধারী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ১৯৬৫-৬৬ সালে যথাক্রমে ৪৯,৯০০ এবং ২৪,৭০০ ছিল; ১৯৭০-৭১ সালে উহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৬৮,০০০ এবং ৩০,০০০ হইবে।

দামনীতি (Price Policy) : দামনীতির দুইটি মূল উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রথমত: দেখিতে হইবে যে কৃষকগণ তাহাদের কৃষিউৎপন্নের যেন উপযুক্ত দাম পায়। ইহা উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হইবে। অপরদিকে খাদ্যশস্য, বস্ত্র, তৈল প্রভৃতির দাম যেন স্থিতিশীল থাকে। অনুরূপভাবে, শিল্পে ব্যবহৃত একাধিক ব্যবহার সম্পন্ন কাঁচামালের দাম যাহাতে স্থিতিশীল থাকে তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম স্থিতিশীল রাখিবার জন্য ষ্টেটট্রেডিং এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দিবে।

পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয় হইতে ব্যয়সংকোচের উপর গুরুত্ব আরোপ চতুর্থ পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অনুমান করা হইয়াছে ব্যয়সংকোচের ফলে ৩৩৫ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। এইজন্য কেন্দ্র এবং রাজ্যে কঠোর মিতব্যয়িতার নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।

ঘাটতি ব্যয় করা হইবে না

চতুর্থ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যে এই পরিকল্পনাকালে কোনোরূপ ঘাটতি ব্যয় করা হইবে না। আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে এই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার জন্য অন্যবিধ কার্যসূচীও গ্রহণ করা হইবে।

কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ও চতুর্থ পরিকল্পনা (Employment Under Fourth Plan): চতুর্থ পরিকল্পনাকালে নিয়োগের তুলনায় কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা তৃতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষাও অধিক হইবে।

খসড়া পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে এই সময় অতিরিক্ত ২ কোটি ৩০ লক্ষ কর্মপ্রার্থী হইবে (তৃতীয় পরিকল্পনায় ওই সংখ্যা ছিল এক কোটি ৭০ লক্ষ) কিন্তু অতিরিক্ত এক কোটি ৯০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। সুতরাং ৪০ লক্ষ লোক বেকার থাকিয়া যাইবে।

শহর এবং গ্রামে অর্ধ-বেকারী আজ এক বৃহত্তম সমস্যার আকার ধারণ করিয়াছে। (এক কোটি ৬০ লক্ষ)। অবিশ্বাস্য রকমের স্বল্প-মজুরী এবং স্বল্প উৎপাদনশীলতা অর্ধনিয়োগ সমস্যার পরিচায়ক।

চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ হিসাবে "গ্রামীন কার্য প্রকল্পের" (Rural works programme) উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং এই কার্যসূচী বাবদ ৯৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। অনুমান করা যাইতেছে যে পরিকল্পনার শেষে ১৫ লক্ষ লোককে বৎসরে ১০০ দিনের জন্য কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইবে।

ইহা ছাড়া ১৫ হইতে ২৫ বৎসর বয়স্ক গ্রাম্য বালকদের নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়া কার্য বাহিনী (task-force) গঠনের কথাও পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে। এই খাতে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় ৮৬,০০০ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট এবং ১৪০,০০০ টেকনিক্যাল ডিপ্লোমাধারীর প্রয়োজন হইবে। দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কারিগরী শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ণের উপর জোর দিতে হইবে।

২৫টি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন

দেশে চিকিৎসকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম সেই কারণে বৎসরে যাহাতে ১৯,০০০ ছাত্রছাত্রী চিকিৎসাবিদ্যার (১৯৬৫-৬৬ সালে ১০,৬২৫) সুযোগলাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ২৫টি নূতন কলেজ স্থাপন এবং পুরাতন কলেজগুলির আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই সকল ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে আশা করা যাইতেছে যে ১৯৭৬ সালে প্রতি ৩৫০০ লোকের ভাগে একজন করিয়া চিকিৎসক পড়িবে। দেশে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

দেশের চাহিদার কথা স্মরণ রাখিয়া বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৫০ ভাগ করিতে হইবে (১৯৬৫ সালে উহা ছিল শতকরা ৪০ ভাগ); গবেষক বৈজ্ঞানিকদের প্রশিক্ষণের জন্য এক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে

বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি

বৈদেশিক বাণিজ্য ও চতুর্থ পরিকল্পনা (Foreign Trade and Fourth Plan): চতুর্থ পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করিবার কথা বলা হইয়াছে। ১৯৫০-৬০ এই দশ বৎসরে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসর কিছু উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছিল।

এই সময়ে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রকৃতিগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যদিও চা, পাট এবং বস্ত্র এই তিনটি দ্রব্যই সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী দ্রব্য কিন্তু মোট রপ্তানী মূল্যে তাহাদের অংশ শতকরা ৪৮ ভাগ (১৯৬০-৬১) হইতে হ্রাস পাইয়া শতকরা ৪৩ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে (১৯৬৫-৬৬)।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে লৌহ আকরিক, চিনি, লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য প্রভৃতি নূতন দ্রব্য রপ্তানী করা হয়।

ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে ভৌগলিক বণ্টনগত পরিবর্তনও লক্ষ্যণীয়। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে রপ্তানী কিছু হ্রাস পায় কিন্তু আমেরিকায় রপ্তানী বেশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে (সোভিয়েট রাশিয়া সমেত) ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য প্রভূত বৃদ্ধি পায়। ১৯৬০-৬১ সালে ওই দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের অংশ ছিল ৭·৭%, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা দাঁড়ায় ১৯·৩% এ আসিয়া।

পূর্ব ইউরোপীর দেশগুলির সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধি

চতুর্থ পরিকল্পনায় রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে ৫১০০ কোটি টাকা। (মুল্যমান হ্রাসের পর উহা দাঁড়াইবে ৮০৩০ কোটি টাকা) পরিকল্পনায় কৃষি, খনিজ এবং শিল্প উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে তাহা পূরণ হইলে তবেই রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইবে। যে সকল দ্রব্যের রপ্তানী বাজার রহিয়াছে তাহাদের আভ্যন্তরীণ ভোগ যতদূর সম্ভব কমাইতে হইবে।

রপ্তানী

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী করা হইবে। ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের ব্যয় এবং মান যাহাতে তুলনীয় বৈদেশিক দ্রব্যের সমতুল্য হয় তাহা দেখিতে হইবে। ভারতীয় শিল্পের প্রতিযোগী ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জাতীয়করণ, সুযোগ্য পরিচালনা এবং উন্নত কারিগরী জ্ঞানের সহায়তা লওয়া হইবে।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে (PL 480 আমদানী ছাড়া) আমদানী মূল্যের পরিমাণ হইবে ৭৬৫০ কোটি টাকা। মুদ্রামান হ্রাসের পর উহার মূল্য হইবে ১২,০৪৯ কোটি টাকা।

আমদানী

পরিকল্পনার পরিক্রমা (A Survey of Plans): ১৯৬২ সালে চীনের হামলা, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানী চড়াও, চরম খাদ্যসংকট প্রভৃতি প্রতিকূল শক্তিকে

অগ্রাহ্য করিয়া দেশ এক ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিগত ১৫ বছরের পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা এবং ব্যর্থতা আমাদের দৃষ্টিকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে সহায়তা করিবে।

আমাদের পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য স্বয়ংনির্ভরশীলতার পথে অগ্রসর হওয়া। ইহার অর্থ এই যে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ এমনভাবে গড়িয়া তুলিব যাহাতে আমাদের প্রতিরক্ষা এবং ভোগ্য চাহিদা মিটাবার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো আমরা নিজেরাই উৎপাদন করিতে পারি। ১৯৫১ সাল থেকে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি ঠিক এইসব উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হচ্ছে।

পরিকল্পনার সূচনা থেকে, জাতীয় আয় ৮৮৫০ কোটি টাকা (১৯৫১) থেকে প্রায় ১৫,০০৯ কোটি টাকায় (১৯৬৫) বৃদ্ধি পেয়েছে। ঠিক এই সময়ে কৃষি উৎপাদন ৫৪.৯ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ৮৭.২ মিলিয়ন টন হয়েছে। শিল্প-উৎপাদনের সূচক ৭৩.৫ থেকে লাফ দিয়ে ১৭৯.৫-এ উঠেছে। ইস্পাত, সিমেণ্ট এবং চিনির উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৩০০ ভাগ। শিল্পের বনিয়াদ প্রসারিত হয়েছে এবং সেলাই কলের মতো সূক্ষ্ম ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী পর্যন্ত নির্মিত হচ্ছে এবং শিল্পোন্নত দেশগুলিতে রপ্তানী হচ্ছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যাপ্ত না হলেও সন্তোষজনক। ১৯৬৬ সালের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে যথাক্রমে ৫১.৫ মিলিয়ন এবং ১.১ মিলিয়ন ছাত্রছাত্রী দাঁড়াবে অর্থাৎ প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইবে।

কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটের কবলে পড়িয়া সাধারণ মানুষ আজ দিশাহারা। রিজার্ভ ব্যাংকের "মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থ—১৯৬৪-৬৫" সম্পর্কিত রিপোর্টে বলা হয়েছে আমাদের অর্থনীতির সম্মুখে তিনটি প্রধান সমস্যা: (১) মূল্যবৃদ্ধির (বিশেষ করে খাদ্যশস্যের) সমস্যা (২) বিনিয়োগ বাজারে সমস্যা, (৩) বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যা।

প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে পাইকারী মূল্যসূচী ছিল ১১১.৮, উহা ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে ১৬৬তে আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯৬১ সালে তৃতীয় পরিকল্পনা প্রবর্তনের পর থেকে টাকার দাম ⅙ অংশেরও বেশী হ্রাস পেয়েছে।

খাদ্যের ক্ষেত্রে যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা চরম নৈরাশ্যজনক। ১৯৫১ সালে সূচক সংখ্যা ছিল ১১২.৫, ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে উহা ১৭০.৫-এ আসিয়া দাঁড়ায়।

মূলধন বাজারেও একটা এলোমেলো ভাব দেখা যায়। ইউনিট ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার মূল্য পুঁথিলিখিত দামের উপর বাজার দরে শতকরা ১.৬ ভাগ হ্রাস পেয়েছে, ১৯৬৫-৫৬ সালে ২৭০ কোটি টাকা ঋণ কেন্দ্রীয় সরকার বাজার থেকে তোলার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেন কিন্তু প্রকৃত ঋণসংগ্রহের পরিমাণ ছিল মাত্র ৯৭.৩২ কোটি টাকা।

দেশের শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে উন্নয়নমূলক আমদানী ছাড়াও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত আমদানীর চাহিদাও বেড়ে গেছে। যদিও আমরা ৯৫১ কোটি টাকার মজুত বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা শুরু করেছিলাম, তবুও আজ আমরা শেষ প্রান্তে এসে গেছি। ফলে অর্থনীতির গঠন এবং গতিবেগ মন্থর হয়ে

এসেছে এবং বহুশিল্প তাহাদের পূর্ণ উৎপাদনক্ষমতার অনেক কম উৎপাদন নিয়ে চালু আছে। আমদানীকৃত কাঁচামালের অভাবেই এই দুরবস্থা ঘটেছে।

আমাদের অর্থনৈতিক সংকটের সূত্র পাওয়া যাবে আমাদের পরিকল্পনার প্রয়োগ কৌশলের মধ্যে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাগুলি জোর দিয়াছিল "ইনফ্রা- ষ্ট্রাকচার শিল্পগুলি" অর্থাৎ ভারী শিল্পগুলির উপর এবং কৃষি ও ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলিকে উপেক্ষা করা হইয়াছিল। ইনফ্রা-ষ্ট্রাকচার শিল্পগুলি হইল মূলধন-প্রগাঢ় (Capital-intensive) এবং বিনিয়োগ ও উৎপাদনের মধ্যে সময়ের ব্যবধানও দীর্ঘ।

ইহার ফলে কৃষি এবং ভোগ্যপণ্য শিল্পে মূলধনের ঘাটতি দেখা দিল এবং জনগণের এই সকল প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির উৎপাদন চাহিদার চেয়ে অনেক পিছিয়ে রইল। ইতিমধ্যে ভারীশিল্পের ক্ষেত্রে যে বিশাল ব্যয় করা হল তা মানুষের হাতে ক্রয়ক্ষমতারূপে ফিরে এলো। ভোগ্য পণ্যদ্রব্যের, বিশেষ করে খাদ্যশস্যের উপর চাপ বেড়ে গেল। এর ফলে দামস্তর রকেটের মতো ঊর্ধ্বগামী হতে থাকল।

পরিকল্পনার একটি দিক যা পরিবর্তনযোগ্য তা হল উন্নয়নকৌশল হিসাবে মুদ্রাস্ফীতির প্রয়োগ। দ্রব্যমূল্যের বর্তমান বৃদ্ধি সম্পর্কে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই কারণ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনার কলাকৌশলের এটি অংগবিশেষ। এইসব পরিকল্পনায় যে শুধু ভারী শিল্পের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে তাই নয়, নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সংগ্রহযোগ্য সম্পদের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় ২৭৩০ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ উৎস অর্থাৎ কর ইত্যাদি হইতে সংগ্রহ করা হইবে। জনসাধারণের মাথায় করের ভার প্রায় দুঃসহ। এন. এ. পালকিওয়ালার মতে ভারত "সর্বাধিক করপ্রপীড়িত জাতি।" কম্পট্রোলার এবং অডিটার জেনারেলের হিসাবানুযায়ী ১৯৬৩-৬৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারী উদ্যোগসমূহে নিয়োজিত ১৫৭৩·৫৯ কোটি টাকা মূলধনের উপর লোকসান হয়েছে নীট ৫৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। জনসাধারণের হাতে থাকলে যে টাকা উৎপাদনশীল হইতে পারিত তাহাকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে নিয়োজিত করায় ফল খারাপে দাঁড়ায়। মনে রাখা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিলেই সমাজতন্ত্র আসিবে না।

সমালোচকের বাঁকাচোখে চতুর্থ পরিকল্পনা (Criticism of the Fourth Five Year Plan): চতুর্থ পরিকল্পনাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। চতুর্থ-পরিকল্পনা তৃতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চাকাংখী। দ্বিতীয় পরিকল্পনার তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এই ধরণের উচ্চাকাংখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা অনেকেই অ-কাম্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় না এই ধরণের সমালোচনার বিশেষ কোনো মূল্য আছে। সহায়সম্বলের দৃষ্টিকোণ হইতে পরিকল্পনাটি উচ্চাকাংখী হইলেও দেশের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা খুব উচ্চাভিলাষী নয়। অধ্যাপক ম্যালেনবম্ যথার্থই বলিয়াছেন যে উন্নয়নের "উত্তোলন-পর্যায়" (take-off period) দ্রুত অতিক্রম করিতে হইলে পরিকল্পনা বৃহদায়তন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১ উচ্চাকাংখী

ফেডারেশন অব চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রির এক কমিটি সমালোচনা করিয়া বলিয়াছে যে চতুর্থ পরিকল্পনা "অতিমাত্রায় দুঃসাহসী" (too presumptuous); এই কমিটির মতে ৮·৪ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে না। আভ্যন্তরীণ উৎস হইতেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা কষ্টকর হইবে। সেইজন্য এই কমিটি সুপারিশ করিয়াছে যে পরিকল্পনার আয়তন ২৩৭৫০ কোটি টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ১৮,০০০ কোটি টাকা করা উচিত।

২। দুঃসাহসী

শ্রী জে আর. ডি. টাটা কেন্দ্রীয় শিল্প-উপদেষ্টা পরিষদের একজন প্রখ্যাত প্রতিনিধি। তাঁহার মতে, পরিকল্পনা হিসাব প্রহেলিকা এবং হেঁয়ালীতে পরিপূর্ণ। দুঃসাধ্য করভার, অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ, মুনাফা আত্মসাৎ, আর দুষ্প্রাপ্য অর্থ—ইহাই হইল দেশের বর্তমান আর্থিকনীতি। এই অবস্থায় অতিরিক্ত ২৭৩০ কোটি টাকা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? স্বভাবতই মনে হয় পরিকল্পনা রচয়িতাগণ মূলধন বাজারের সংকট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন, অথবা ওয়াকিবহাল হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। পুনরায় অতিরিক্ত করধার্য করিয়া বিনিয়োগযোগ্য মূলধন সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। এই অবস্থায় মূলধন বাজার প্রগাঢ়ভাবে ব্যবহার করার কথা স্থিরভাবে গ্রহণ করা কঠিন।*

আমাদের পরিকল্পনা রচয়িতাগণ বাস্তবানুগ প্রকৃত পরিকল্পনার (Real Plan). দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উন্নয়নী প্রয়াসকে দেখিয়াছেন। আমাদের পরিকল্পনা ক্রমান্বয়ে উচ্চাকাংখী হইতেছে এবং টাকার অংকে প্রতিটি পরিকল্পনার আয়তন পূর্ববর্তী পরিকল্পনা হইতে বৃহত্তর হইতেছে। যদি প্রকৃত উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে টাকার অংকে পরিকল্পনার আয়তন বৃদ্ধি হইলে গর্বিত হইবার কিছু নাই।

৩। প্রকৃত পরিকল্পনা নয়

পরিকল্পনায় উৎপাদনের হিসাব প্রথমে দ্রব্যসামগ্রীর অংকে করিয়া তারপর উহাকে টাকার অংকে প্রকাশ করা উচিত। পরিকল্পনা রচনার পূর্বে দেশের মোট সম্পদের একটি হিসাব প্রস্তুত করা ও উহা একত্রিকরণের উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। আমাদের পরিকল্পনাসমূহের অন্যতম মূল ত্রুটি যে টাকার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব এবং দ্রব্যসামগ্রীর উপর কম গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় তাহা পূর্ণ হয় না। যদি পরিকল্পনায় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

---

*"Plan estimates are rich in enigmas and riddles. With the continuation of the present economic policy of crushing taxation, excessive controls, profit squeezes and dear and scarce money, where will the additional Rs 2730 crores be found? It would seem that the planners are ignorant or disdainful of the present crisis in the investment market which, both in depth and duration, has no parallel in India's economic history. With the threat of further heavy taxation, the chances of raising large investible funds in India are virtually non existent. Under these conditions, to be told that we should exploit the capital market more intensively is a bit hard to bear with equanimity.' (Mr. J. R. D. Tata.)

পূর্ণ করিতে হয় তাহা হইলে শুধুমাত্র আর্থিক সম্পদ একত্রিকরণ করিলেই চলিবে না, প্রকৃত সম্পদও একত্র করিতে হইবে।*

জাতীয় পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য স্বয়ংনির্ভরশীল অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা। স্বয়ং নির্ভরশীলতার পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে ত্রুটিপূর্ণ বিনিয়োগ পরিকল্পনা (wrong investment planning); কৃষি-উন্নয়ন সম্পূর্ণ না করিয়াই আমরা ভারী শিল্প উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি। আমরা জানি যে ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং উৎপাদনের মধ্যে এক দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান (long gestation lag) থাকে। সেই কারণে কৃষি বিপ্লব না করিয়া শিল্প-বিপ্লব করিলে মুদ্রাস্ফীতির বিপদ অনিবার্য। আমাদের দেশেও এই বিপদ দেখা দিয়াছে। মুদ্রাস্ফীতির দরুণ পরিকল্পনা ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবে অথবা উহার আকার ছোট হইবে। সুতরাং মূল্যমানের স্থিতিশীলতা পরিকল্পনার সাফল্যের অন্যতম প্রধান সর্ত।

৪। ত্রুটিপূর্ণ বিনিয়োগ নীতি

আমাদের পরিকল্পনাগুলির অন্যতম প্রধান ত্রুটি যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। ভারতে প্রতিদিন নীট জন্মহার ৩৫,০০০ এবং বৎসরে এক কোটি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই খাদ্যসমস্যা এত সংকটজনক আকার ধারণ করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি উৎপাদন, বণ্টন, মূল্যমান এবং কর্মসংস্থান প্রভৃতির উপর প্রতিক্রিয়া করে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য শুধুমাত্র নেতিবাচক পদ্ধতিই যথেষ্ট নয়, সমস্যার মূলে আঘাত করা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে কঠোর ব্যবস্থাও গ্রহণ করা প্রয়োজন। চতুর্থ পরিকল্পনায়ই সর্বপ্রথম পরিবার পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু ওই বাবদ ব্যয়-বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।

২। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অবহেলা

চতুর্থ পরিকল্পনার কর্মসংস্থাননীতি আদৌ উৎসাহজনক নয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ১ কোটি ৯০ লক্ষ নূতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। এইসময় নূতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হইবে ২ কোটি ৩০ লক্ষ। ইহা ছাড়া তৃতীয় পরিকল্পনার পরও দেশে ১ কোটি ২০ লক্ষ বেকার থাকিতেছে। সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মোট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াইতেছে ১ কোটি ২০ লক্ষ+২ কোটি ৩০ লক্ষ=৩ কোটি ৫০ লক্ষ। ইহার মধ্যে এই পরিকল্পনাকালে ১ কোটি ৯০ লক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। অর্থাৎ ১ কোটি ৬০ লক্ষ বেকার থাকিয়াই যাইবে। সুতরাং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নয়।

৬। কর্মসংস্থান নীতি সন্তোষজনক নয়

পরিকল্পনা রচয়িতাদের দৃষ্টিভঙ্গী অধিকতর বাস্তবোচিত হওয়া প্রয়োজন। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশ্নটি ক্রমশই বৃহত্তর সমস্যার আকার ধারণ করছে।

---

* "The basic defect in our planning is that too much inportance is attached to the money aspect of the problem and physical aspect is only secondarily considered'. (Mrs. Usha Andrews.)

পরিকল্পনা-কৌশল (Plan techniques) বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বর্তমানে সর্বব্যাপক কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার পরিবর্তে ফরাসী দেশের মতো বাস্তবসম্মত এবং সূচনামূলক (indicative) পরিকল্পনা খুবই বাঞ্ছনীয়।

৭। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে ব্যবধান

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সঞ্চয়ের হার জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগ-এ এসে দাঁড়িয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়ের ১৭% হারে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে যে ব্যবধান রয়ে যাচ্ছে তাহা কিভাবে পূরণ হবে বুঝা যায় না। শুধুমাত্র বৈদেশিক সাহায্য দিয়াই ওই ফাঁক পূরণ করা যাইতে পারে। এইরূপ পরিপ্রেক্ষিতে আত্মনির্ভরশীলতার কথা বলা হাস্যকর শোনায়

।। পরিশিষ্ট ।।

মনোপলি অনুসন্ধান কমিশন, ১৯৬৫-র রিপোর্ট
(Monopolies Inquiry Commission, 1965)
সংক্ষিপ্তসার

১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে মিঃ কে, সি, দাসগুপ্তের সভাপতিত্বে মনোপলি অনুসন্ধান কমিশন গঠিত হয়। ১৯৬৫ সালে ডিসেম্বর মাসে ওই কমিশন তাহার রিপোর্ট পেশ করে। ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের স্বরূপ সম্পর্কে অনুসন্ধান করাই এই কমিশনের উদ্দেশ্য।

এই কমিশনের রিপোর্টটি সুদীর্ঘ—প্রায় সাড়ে চারশো পাতার মতো। ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন সংকুচিত করিবার আইনগত নির্দেশও এই কমিশন দিয়াছে।

এই রিপোর্টে দুই ধরনের অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবনের কথা বলা হইয়াছে—দ্রব্যভিত্তিক কেন্দ্রীভবন (product-wise concentration) এবং দেশভিত্তিক কেন্দ্রীভবন (country-wise concentration); কোনো বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন বা বণ্টন ক্ষমতা কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের হাতে আসিয়া যখন কেন্দ্রীভূত হয় তখন তাহাকে দ্রব্য-ভিত্তিক কেন্দ্রীভবন বলে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে মাত্র তিনটি উৎপাদনকারী শিশুদের প্রতিষ্ঠান দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদনের প্রায় সবটাই যোগান দেয়। আবার যখন কোনো ব্যক্তি বা আর্থিকগোষ্ঠী অধীনস্থ বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দ্রব্যউৎপাদন বা বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে তখন তাহাকে দেশভিত্তিক কেন্দ্রীভবন বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বিড়লা গোষ্ঠীর অধীনে ১৫১টি প্রতিষ্ঠান আছে এবং উহারা বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করে।

দুই ধরণের কেন্দ্রীভবন

এই কমিশন চা, চিনি, টায়ার, শিশুদের দুগ্ধজাতদ্রব্য, মোটরগাড়ী প্রভৃতি ১০০টি নির্বাচিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন নির্ধারণ করিয়াছে। নির্দিষ্ট ১০০ দ্রব্যের মধ্যে ৬৫ দ্রব্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভবনের মাত্রা অত্যধিক। ওই ৬৫টি দ্রব্যের প্রতিটির ক্ষেত্রে তিনজন নেতৃস্থানীয় উৎপাদনকারী মোট উৎপাদনের শতকরা ৭৫ ভাগ যোগান দেয়। কমিশন ২২৫৯ টি কোম্পানীর ক্ষেত্রে দেশভিত্তিক কেন্দ্রীভবনের মাত্রা নির্ধারণ করিয়াছে। ওই ২২৫৯ টি কোম্পানী ৭৫টি ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর কোন একটির অন্তর্ভুক্ত। ৭৫টি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর যে তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাতে টাটা-গোষ্ঠী সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে বিড়লাগোষ্ঠী। টাটাগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে ৫৩টি কোম্পানী আছে এবং উহার সম্পদের মূল্য ৪১৭ কোটি টাকা। বিড়লাগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে ১৫১টি কোম্পানী আছে এবং উহাদের মোট সম্পদের মূল্য ২৯২ কোটি টাকা।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে একচেটিয়া এবং সংকোচনমূলক (monopolistic and restrictive practices) প্রথার প্রচলন রহিয়াছে। উৎপাদনকারীদের মধ্যে ...সের বাজার বিভাগ, ব্যবসায়চুক্তি, নূতন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ে প্রবেশে বাধার সৃষ্টি, চুক্তি দ্বারা দাম নির্ধারণ, মজুত করিয়া কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি প্রভৃতি একচেটিয়া এবং সংকোচন মূলক পদ্ধতির ব্যবহার ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে।

একচেটিয়া এবং সংকোচনমূলক প্রথা

কমিশন অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের কতকগুলি কারণ নির্দেশ করিয়াছে। প্রথমতঃ, যৌথ মূলধনী কারবারের প্রসারের ফলেই ভারতে অর্থ নৈতিক ক্ষমতার চরম কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে বহু ব্রিটিশ ব্যবসায়ী তাহাদের প্রতিষ্ঠান বিক্রয় করিয়া স্বদেশে চলিয়া যায় এবং ইহার ফলে কতিপয় মুষ্টিমেয় দেশীয় শিল্পপতিদের হাতে ওই সব ব্যবসাগুলি চলিয়া আসে। তৃতীয়ত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শিল্পপতিগণ প্রচুর মুনাফা অর্জন করে এবং পরবর্তীকালে শিল্পায়ন সুরু হইলে তাহার ওই অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পায়। ইহার দরুণ বহু ব্যবসা ও শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাহাদের হাতে আসিয়া পড়ে। চতুর্থতঃ ভারতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার প্রসারও অর্থ নৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের জন্য দায়ী। স্বাধীনতার পর পরিকল্পিত পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য সরকার আমদানী ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ও লাইসেন্স প্রথার প্রবর্তন করেন। বড় বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ ওই সকল ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ব্যবসায় করিতে সমর্থ হয় কিন্তু ছোট ছোট ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর পক্ষে ওই সকল বিধিনিষেধের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ব্যবসায় প্রসার করা সম্ভবপর হয় নাই। ইহার দরুণ ব্যবসায় বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা গুটিকয়েক বৃহৎ ব্যবসায়ীদের হাতে চলিয়া আসে।

কারণসমূহ :

অর্থ নৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের ফলে জনসাধারণের মনে বৃহদায়তন ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে মনোভাব খুব অনুকূল নয়। ধনী ব্যবসায়ীগণ দেশের রাজনৈতিক জীবনে অনুপ্রবেশ করিয়া গণতান্ত্রিকতার প্রসারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেছে। নির্বাচনের পূর্বে শিল্পপতিগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলকে অর্থ প্রদান করে এবং সরকারী কর্মচারীদের টাকার প্রলোভন দেখাইয়া অনেক অন্যায় কাজ করিয়া থাকে। ধনী শিল্পপতিগণ বিলাসবহুল জীবন যাপন করে; উহার প্রভাবে যুবগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক মূল্যমান নিম্নগামী হওয়ার বিপজ্জনক সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত অর্থ নৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় প্রতিযোগিতামূলক বাজার অপেক্ষা দ্রব্যের দাম বেশী হয় এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যবসায়ীগণ বাজার হইতে বিতাড়িত হয়। অবশ্য অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের ফলে কোনো সুবিধা হয়নি একথা বলা চলে না। ইহার ফলে শিল্পায়নের পথ কিছুটা সুগম হইয়াছে। অবশ্য কুফলের তুলনায় এই সুবিধা নগণ্য।

ফলাফল

অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায়ের কুফল বন্ধ করিবার জন্য কমিশন একটি বিধিবদ্ধ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যাপারে মোটামুটি চারটি মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, আইন দ্বারা সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন খর্ব করা হইবে না। অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন যখন ন্যায্য উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থার পরিপন্থী হইবে তখনই উহাকে প্রতিরোধ করা হইবে।

প্রতিকার : বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা

দ্বিতীয়তঃ, সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে যাহার উদ্দেশ্য হইবে বৃহৎ শিল্পপতিদের উপর লক্ষ্য রাখা। একচেটিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার যাহাতে না হয় উহা লক্ষ্য রাখাই ইহার কাজ। তৃতীয়তঃ, শিল্পে যতদূর সম্ভব একচেটিয়া অবস্থাকে নিরুৎসাহিত করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, যে সকল ক্ষেত্রে একচেটিয়া এবং সংকোচনমূলক পদ্ধতির ব্যবহার জনগণের মঙ্গল বৃদ্ধি করিতে পারে সেই সকল ক্ষেত্রে ইহাদের সমর্থন করা হইবে; অন্যান্য ক্ষেত্রে উহাদের প্রতিরোধ করা হইবে। এই চারিটি নীতিকে ভিত্তি করিয়া বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে।

এই সকল বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা ছাড়াও কমিশন কতকগুলি বিধি-বহির্ভূত (non-legislative) ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছে। প্রথমতঃ অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের জন্য যাহাতে গণতান্ত্রিক আদর্শ বিপন্ন না হয় তাহার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি যেন নির্বাচনের পূর্বে ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কোনরূপ অর্থ সাহায্য গ্রহণ না করে তাহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি সরল করিতে হইবে যাহাতে অধিক অর্থব্যয় না করিয়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ লাইসেন্স গ্রহণ করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে যাহাতে বেসরকারী উদ্যোগে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন সংকুচিত হয়। চতুর্থতঃ, ভোগকারীদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমদানী লাইসেন্স দিতে হইবে; পঞ্চমতঃ, ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার এবং ভোগকারীদের সমবায় সংস্থা স্থাপন করিয়া বিক্রেতার শোষণ প্রতিরোধ করিতে হইবে।

বিধি বহির্ভূত ব্যবস্থা

কমিশনের একজন সদস্য মিঃ আর. সি. দত্ত কমিশনের অধিকাংশ সদস্যদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথাটি ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের জন্য দায়ী। অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবনের ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং ধনবৈষম্য ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। মিঃ দত্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন সমূলে উৎপাটনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের মতে যখন অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ন্যায্য উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থার পরিপন্থী হইবে তখনই উহাকে প্রতিরোধ করা হইবে।

ভারত সরকার এখনো পর্যন্ত কমিশনের সুপারিশগুলি পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী একটি বিধিবদ্ধ স্থায়ী কমিশন গঠনের কথা চিন্তা করিতেছেন।

মনোপলি কমিশন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শিল্পের ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন অনুসন্ধান করিয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পদের ক্ষেত্রে এবং ভারতীয় মুদ্রণযন্ত্রের ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবন রহিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করা হয় নাই। মনে রাখা প্রয়োজন যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। উহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং সামাজিক কল্যাণের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের ব্যাপারে ব্যর্থতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

উপসংহার

তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি (Progress of the Third Plan) : তৃতীয় পরিকল্পনার সুরুতে ভারত চীন কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হয় এবং পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে পাক ভারত সংঘর্ষ দেখা দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচী ব্যাহত হয়। পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করেন উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া কৃষি, জলসেচ, বিদ্যুৎ, সংগঠিত শিল্প এবং গৃহনির্মাণ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। অবশ্য সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট ব্যয় অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। সরকারী ক্ষেত্রে মোট ৭,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃত ব্যয় ৮৬৩০ কোটি টাকা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর ১১৩০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় বৎসর ১৪১৪ কোটি টাকা, তৃতীয় বৎসর ১৬৫৪ কোটি টাকা এবং শেষ দুই বৎসরে ৪৪৩২ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ফলে সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৮৬৩০ কোটি টাকা।

জাতীয় আয় : তৃতীয় পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় নাই। পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে জাতীয় আয় ২.২% বৃদ্ধি পায়। কৃষিক্ষেত্রে আশানুরূপ উৎপাদন না হওয়ার দরুণ জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কম হয়। অবশ্য পরবর্তী দুই বৎসরে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার অধিক ছিল—যথাক্রমে ৪.৫% এবং ৭.৩%। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় শতকরা ১৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল এই সময়ে জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার আরও নৈরাশ্যজনক—পরিকল্পনার প্রথম চার বৎসরে বার্ষিক ১.৮% হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারীখাতে ৭,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্য ধার্য করা হইলেও কার্যতঃ মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হয় ৮৬৩০ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইলেও জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই।

কৃষিক্ষেত্রে : তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে, বিশেষ করিয়া শেষ দুই বৎসরে কৃষিক্ষেত্রে শোচনীয় ব্যর্থতা দেখা যায়। কৃষি উৎপাদনের ব্যর্থতার কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। কৃষি উৎপাদনের ব্যর্থতার দরুণ দেশে চরম খাদ্যসংকট দেখা দেয়। ১৯৬১-৬২ সালে কৃষি উৎপাদনের সূচক-সংখ্যা ছিল ১৪১'৪ (১৯৪৯-৫০ = ১০০) ১৯৬২-৬৩ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ১৩৬'৮ হয়, ১৯৬৩-৬৪ সালে কিছু বৃদ্ধি পাইয়া ১৪০'৫-এ আসিয়া দাঁড়ায়, ১৯৬৪-৬৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০-এ আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে পুনরায় কৃষি উৎপাদনসূচী হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

১৯৬১-৬২ সালে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭'৯৭ কোটি টন। ১৯৬২-৬৩ সালে মোট খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ হয় ৭'৭৫ কোটি টন। ১৯৬৩-৬৪ সালে কৃষি উৎপাদনের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৭'৯৪ কোটি টনে। ১৯৬৪-৬৫ সালে উহা বেশ সন্তোষজনক হয়—৮'৮৪ কোটি টন কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ৭'৩ কোটি টনে আসিয়া দাঁড়ায়। অনুমান করা হইয়াছিল যে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১০ কোটি টন হইবে কিন্তু দেখা যাইতেছে যে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। পরিকল্পনার শেষ বৎসরে তৈলবীজের উৎপাদন হয় ৬১ লক্ষ টন কিন্তু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য ছিল ৯৮ লক্ষ টনে। পাটের উৎপাদন মাত্রা ধার্য ছিল ৬২ লক্ষ গাঁটে কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হয় ৪৫ লক্ষ গাঁট। তুলার ক্ষেত্রেও উৎপাদন পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা ৭১ লক্ষ গাঁট অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছিল—মাত্র ৪৭ লক্ষ গাঁট।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ ব্যবস্থার প্রসার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। অতিরিক্ত এক কোটি ২৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা প্রসারের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাত্র ৬০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা প্রসারিত হইয়াছিল।

শিল্প : শিল্প উৎপাদনের সূচকসংখ্যা হইতে দেখা যায় যে ১৯৬১-৬২ সালে শিল্প উৎপাদন শতকরা ৭ ভাগ, ১৯৬২-৬৩ সালে শতকরা ৭'৭ ভাগ ১৯৬৩-৬৪-সালে শতকরা ৮'৫ ভাগ, ১৯৬৪-৬৫ সালে শতকরা ৭ ভাগ এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। শিল্প উৎপাদন গড়ে শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে সুতরাং দেখা যাইতেছে শিল্পক্ষেত্রেও উৎপাদন আশানুরূপ হয় নাই। ইস্পাতের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনটি সরকারী বৃহদায়তন ইস্পাত কারখানায় প্রকৃত উৎপাদন পূর্ণ-উৎপাদন ক্ষমতার সমান হইয়াছে। এ্যালুমিনিয়ম, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বস্ত্রবয়ন যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ চালিত পাম্প এবং চিনি শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি সন্তোষজনক। কিন্তু সিমেণ্ট, কয়লা এবং লৌহ আকরিকের উৎপাদন আশানুরূপ হয় নাই। শিল্প উৎপাদনের সূচকে শিল্পক্ষেত্রে যে সামগ্রিক অগ্রগতি দেখা গিয়াছে, মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন তদপেক্ষা অধিক হারে হইয়াছে কিন্তু ভোগ্য পণ্য উৎপাদন তদপেক্ষা কম হারে হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা (installed capacity) বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পরিবহন : পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে অগ্রগতি সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক হইয়াছে। রাস্তা নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, বন্দর সম্প্রসারণ, বেসামরিক বিমান চলাচল এবং ডাক ও তার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা পূরিত হইয়াছে।

রেলের ওয়াগন নির্মাণ সংখ্যা বৎসরে ১৯ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৫ হাজারেরও অধিক হইয়াছে। রেলপথে মালপত্র বহনের পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালে ১৫৪ মিলিয়ন টন ছিল, উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৭৩ মিলিয়ন টনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ৫২৪ মাইল রেলপথ বৈদ্যুতিকরণ করা হইয়াছে। পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে রেলপথ সমূহের উন্নয়নের জন্য ৮৬৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। পথ পরিবহনের জন্য এই সময়ে ১৮৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

বিদ্যুৎ : বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। পরিকল্পনায় এক কোটি ২৭ লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য ছিল কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছিল মাত্র ১ কোটি ২ লক্ষ কিলোওয়াট।

শিক্ষা : তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়ন বিশেষ সন্তোষজনক। শিক্ষার সকল পর্যায়ের লক্ষ্যমাত্রাই পূরণ হইয়াছে। এই সময়ে স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডিপ্লোমা এবং স্নাতকস্তরের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা হয়। নার্স এবং ধাত্রী ছাড়া স্বাস্থ্যক্ষেত্রের অন্যান্য সকল লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইয়াছে। গৃহ নির্মাণ ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনা মোটেই সাফল্য লাভ করে নাই। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ৪ লক্ষ গৃহ নির্মাণের লক্ষ্য ধার্য ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাত্র ২ লক্ষ গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

মূল্যস্তর : তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ফলে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবন ধারণ করা দুঃসহ হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে : (ক) কৃষি উৎপাদনের ব্যর্থতা (খ) ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের স্বল্পতা, (গ) অতিরিক্ত ঘাটতি ব্যয় ; তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫৫০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইলেও প্রকৃত ঘাটতি ব্যয় অনেক বেশী হয়—১১৫০ কোটি টাকা, এবং (ঘ) ১৯৬৬ সালের মুদ্রামান হ্রাস।

জরুরী অবস্থা : তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে চীনা আক্রমণের জন্য দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। ফলে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টার কিছু অংশ প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে নিযুক্ত হয়। অনেকেই অবশ্য এই সময়ে তৃতীয় পরিকল্পনা বাতিল করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু যাই হোক, পরিকল্পনা বাতিল করার প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। মোট ব্যয়েও কোনোরূপ হ্রাস করা হয় নাই। জরুরী অবস্থা ঘোষণায় পরিকল্পিত কর্মপ্রচেষ্টার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনোরূপ অসুবিধা দেখা দেয় নাই। অবশ্য প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে পরিকল্পনার ব্যয় বণ্টনের পুনর্বিন্যাস করা হয়। জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে পরিকল্পনার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পুনর্বিন্যাসের পরও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনার মোট ব্যয় ৮৬৩০ কোটি টাকা হইয়াছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control of Commercial Banks) : ১৯৬৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে উপ-প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই পার্লিয়ামেণ্টে ঘোষণা করেন যে শীঘ্রই তিনি বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিল উপস্থাপিত করিবেন। এই বিলে রিজার্ভ ব্যাংকের উপর অতিরিক্ত আইনগত ক্ষমতা দেওয়া হইবে। ইহার উদ্দেশ্য হইল কতকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যাংকের যে সম্পর্ক আছে তাহা ছিন্ন করা। এই আইনের দরুণ সরকার দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ বণ্টন ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিবার ক্ষমতা লাভ করিবে। মোরারজী দেশাই বলেন যে, প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার কোনো ব্যাংকের কার্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে ইতঃস্তত করিবেন না। যদি কোনো ব্যাংক ক্রমাগত রিজার্ভ ব্যাংকের নূতন নির্দেশাত্মক নীতি অগ্রাহ্য করিতে থাকে অথবা যদি মনে করা হয় যে বিশেষ ক্ষেত্রে অথবা এলাকায় ব্যাংকব্যবসায়ের অধিকতর সুবিধার জন্য কোনো বিশেষ ব্যাংকের কার্যভার সরকারের নিজ হাতে গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহা হইলে সরকার তাহা করিতে ইতস্তত: করিবেন না।

উদ্দেশ্য

শ্রী দেশাই স্বীকার করেন যে ব্যাংকসমূহের উপর বৃহৎ শিল্পপতিগণের নিয়ন্ত্রণ থাকায় ব্যাংকের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকতর অনুপাত শিল্পে প্রবাহিত হইয়াছে। ঋণ যোগান নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের বিরুদ্ধেও মিঃ দেশাই সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। ব্যাংকের ঋণদান নীতিতে ধীরগতিতে পরিবর্তন আনিতে হইবে। আকস্মিক পরিবর্তন সুস্থ অর্থনৈতিক কাঠামোয় বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতে পারে। রাতারাতি কোনো অলৌকিক পরিবর্তন আশা করা অনুচিত।

মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যাংক প্রধানতঃ শিল্পে কার্যকরী মূলধন যোগান দেয়। কোনো শিল্পসংস্থা একবার গড়িয়া উঠিলে যদি কার্যকরী মূলধনের অভাবে উহার প্রসার রুদ্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে উহা ভারতের মতো মূলধন-স্বল্প অর্ধোন্নত দেশে জাতীয় অপচয়রূপে গণ্য হইবে।

শ্রী দেশাই ব্যাংক ব্যবস্থার একটি ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিগত কয়েক বৎসরে ঋণের চাহিদা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু আমানতের পরিমাণ অতি ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় পরিপূর্ণভাবে সংগ্রহ করা হয় নাই বলিয়া উহা একত্রিকরণ করিবার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াসের প্রয়োজন।

ব্যাংকের কার্যকরী দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং তাহাদের কর্মপদ্ধতি আধুনিকীকরণ করিতে হইবে। যাহাতে ব্যাংকশিল্প সঠিক পথে পরিচালিত হয় তাহার জন্য একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ব্যাংক-অফিসারদের ব্যাংক-সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার জন্য একটি শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান (training insittute) গঠনের কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

ব্যাংক কর্তৃক ঋণদান সম্পর্কিত ব্যাপারে অন্যায় আচরণ দূর করিবার জন্য যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া শ্রী দেশাই বলেন যে প্রস্তাবিত

জাতীয় ঋণ পরিষদ

জাতীয় ঋণ পরিষদ (National Credit Council) সরকারকে সামগ্রিক ঋণ পরিকল্পনার ব্যাপারে পরামর্শ দিবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জাতীয় ঋণ পরিষদের চেয়ারম্যান এবং রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্ণর ইহার ডেপুটি চেয়ারম্যান হইবেন। ইহার সদস্যদের মধ্যে ঋণগ্রহণকারী সকল ক্ষেত্রেরই প্রতিনিধি থাকিবে।

ঋণ নিয়ন্ত্রণ

শিল্পপতিগণ যে ব্যাংকের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্-এ থাকিবে সেই ব্যাংকের নিকট হইতে তাহারা ঋণ পাইবে না।

এই বিলে ডাইরেক্টরগণ অথবা তাহারা যে প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর, অংশীদার, ম্যানেজার, কর্মচারী, ম্যানেজিং এজেন্ট অথবা শেয়ারহোল্ডার সেই সকল প্রতিষ্ঠান কোনোরূপ দাদন পাইবে না।

ব্যাংক হইতে ঋণগ্রহণকারীগণ ইহার স্থানীয় কমিটি অথবা উপদেষ্টা কমিটিতে (local or advisory committee) প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবে না। এই নীতি কার্যকর করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক একটি নির্দেশনামা জারি করিবে।

প্রত্যেক ব্যাংকের পূর্ণসময়ের (full time) জন্য একজন চেয়ারম্যান থাকিবে। চেয়ারম্যান হইবেন একজন ব্যাংকার, কোনো শিল্পপতি ব্যাংকের চেয়ারম্যান হইতে পারিবেন না এবং ব্যাংকের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস-এর অধিকাংশ সদস্যই হইবেন অ-শিল্পপতি ব্যক্তি (Non-industrialists).

নূতন আইন কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক কাজ করিবে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে যেসকল ব্যাংকের আমানত ২৫ কোটি টাকার অধিক তাহাদের ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ প্রযোজ্য হইবে এবং ধীরে ধীরে সকল ব্যাংকের উপর উহা প্রসারিত হইবে।

পুরা সময়ের জন্য একজন চেয়ারম্যান এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের পুনর্গঠনের যে ব্যবস্থা তাহা বৈদেশিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কারণ ভারতে ইহাদের কাজ

বৈদেশিক ব্যাংক

কারবার দেখিবার জন্য একজন মুখ্য কার্যনির্বাহক (Chief Executive) থাকে। অন্যান্য ভারতীয় ব্যাংকের মতো প্রত্যেক বৈদেশিক ব্যাংকগুলিও ভারতীয়দের লইয়া একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিবে। ইহারা উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শক্রমে তাহাদের ঋণদাননীতি পরিচালনা করিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। শ্রী দেশাই বৈদেশিক ব্যাংকারদিগের সহিত আলোচনা করিয়া জানিয়াছেন যে উহারা সরকারের নীতি মানিয়া লইতে সম্মত আছে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সমাজের সাধারণ সুবিধার জন্য এবং বিশেষভাবে অর্থনীতির অবহেলিত ক্ষেত্রে (অর্থাৎ কৃষি) সুবিধার জন্য অতিরিক্ত কর্মসূচী ছাড়া আর কিছুই নয় বলিয়া ইহা সাদরে গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা (Detailed Discussions of the Social Control of Commercial Banks). বাণিজ্যব্যাংক জাতীয়করণের পরিবর্তে উহার উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা সরকারী নীতির লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

সাম্প্রতিককালে সরকারের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যব্যাংকের ভূমিকা লইয়া যথেষ্ট উদ্বেগ দেখা গিয়াছে। সরকারের মূল লক্ষ্য হইতেছে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে চরমকাম্য সম্প্রসারণ হার বজায় রাখা যায় এবং সেইসঙ্গে একচেটিয়া প্রবণতা, অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন এবং সম্পদের অপব্যবহার রোধ করা যায়।

ব্যাংকব্যবস্থার মাধ্যমে দেশবাসীর সঞ্চয় বিনিয়োগের পথে প্রবাহিত হয় এবং ব্যাংকব্যবস্থা আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের একটি মৌল উপাদান। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে ইহার নীতি এবং কার্যপদ্ধতি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূল হওয়া উচিত। ব্যাংকব্যবস্থার উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সরকার ব্যাংকগুলির কার্যাবলী পরীক্ষা করিয়াছেন। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে ব্যাংক জাতীয়করণের কথাও সরকার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু উহা সামাজিক নীতির অনুকূল বলিয়া মনে না হওয়ায় সরকার অন্য কতকগুলি কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অভিযোগ করা হয় যে কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প এবং রপ্তানী প্রয়োজনীয় ব্যাংক-ঋণ পাইতেছে না আর ব্যাংক-ঋণের অধিকাংশই পাইতেছে শিল্প, বিশেষ করিয়া বৃহদায়তন এবং মাঝারি শিল্প। ইহা সত্য যে বিগত কয়েক বৎসরে ব্যাংকের অতিরিক্ত মূলধনের অধিকতর অনুপাত শিল্পে প্রবাহিত হইয়াছে অবশ্য এই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ব্যাংক প্রধানতঃ শিল্পে কার্যকরী মূলধন যোগান দেয়। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান একবার গড়িয়া উঠিলে কাযকরী মূলধনের অভাবে যদি উহার প্রসার রুদ্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে উহা ভারতের মতো মূলধন-স্বল্প অর্ধোন্নত দেশে জাতীয় অপচয়রূপে গণ্য হইবে। তথাপি কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প এবং রপ্তানীর ভূমিকা কোনোমতেই উপেক্ষা করা যাইবে না। জাতীয় আয় সৃষ্টি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যাপারে কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প এবং রপ্তানীর বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। এই জন্যই পরিকল্পিত অর্থনীতির সকল উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে।

বিগত কয়েক বৎসরে উৎপাদনশীল সকল ক্ষেত্র হইতে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আরো বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু ব্যাংক আমানতের পরিমাণ অতি ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জনগণের দারিদ্র্যের জন্য আমাদের দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ খুবই অল্প। সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে এবং উহাকে ব্যাংকের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য যেমন দীর্ঘ-

কালীন কর্মসূচী প্রয়োজন। সেইরূপ অদূর ভবিষ্যতেও উন্নয়নের জন্য আপেক্ষিক অগ্রাধিকারের প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়া প্রাপ্ত মূলধন সমতাপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে বণ্টন করা প্রয়োজন।

ব্যাংকব্যবস্থা বর্তমানে যেভাবে সংগঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত তাহাতে ইহাকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা যায় না।

আমাদের দেশে শিল্প এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিই ব্যাংক স্থাপন করিয়াছে বলিয়া ব্যাংকের সহিত উহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস সাধারণতঃ শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের লইয়া গঠিত হয়। ব্যাংক কর্তৃক ঋণ প্রদানের ব্যাপারে ক্ষুদ্রশিল্প, কৃষি এবং অর্থনৈতিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। দাদনের এক বৃহৎ অংশ ডিরেক্টরগণ এবং তাঁহারা যে প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত তাহারা পাইয়া থাকে।

সরকারের সুচিন্তিত অভিমত যে কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যাংকের যে যোগসূত্র তাহা ছিন্ন করিতে হইবে অথবা অন্ততঃপক্ষে উহাকে নিষ্ফল করিতে হইবে, ব্যাংকের শিল্প ও ব্যবসায়মুখিতার পরিবর্তন করিতে হইবে এবং ঋণদানের ব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নীতিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুকূল করিতে হইবে।

জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে অনেকেই ব্যাংকব্যবস্থার জাতীয়করণের নীতি সমর্থন করিয়া থাকেন। যুক্তি দেখানো হয় যে সরকারী মালিকানা ব্যতিরেকে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ প্রদান এবং বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় পুনর্গঠন করা সম্ভবপর হইবে না। মূল সমস্যা হইল ব্যাংক পরিচালনায় যথার্থ নিয়ন্ত্রণরেখা বিকাশ করা এবং উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ করিয়া উহাকে কার্যকর করা। সরকারের সুচিন্তিত অভিমত হইল যে শুধুমাত্র ব্যাংকগুলিকে গ্রহণ করা হইলে সরকারের প্রশাসনিক সম্পদের উপর অত্যধিক চাপ বাড়িবে এবং মূল-সমস্যায় কোনোরূপ স্পর্শ করাই হইবে না।

ইহা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে ঋণ-বণ্টনের ব্যাপারে কোনো বিশেষ মক্কেল বা বিশেষ শ্রেণীর মক্কেল কোনো বিশেষ সুবিধা পাইবেন না এবং শেয়ার গ্রহণের যে প্রকৃতিই হউক না কেন বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের উপর অথবা ঋণ দানের ব্যাপারে ইহার কোন প্রভাব থাকিবে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রধান প্রয়োজন হইল নির্দিষ্ট সময় পর পর ব্যাংক ঋণের চাহিদা নির্ণয় করা এবং ঋণ বণ্টন ও বিনিয়োগ ব্যাপারে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প এবং রপ্তানীকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্রশিল্প, ব্যাংক, ব্যবসায় প্রভৃতির প্রতিনিধি এবং অর্থনীতিবিদ্ ও চাটার্ড একাউণ্টেণ্ট লইয়া সর্বভারতীয় পর্যায়ে জাতীয় ঋণ পরিষদ (National Credit Council) গঠন করা হইবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ইহার চেয়ারম্যান এবং রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্ণর ইহার ভাইস-চেয়ারম্যান। এই পরিষদ একটি পরামর্শদান সংক্রান্ত সংস্থা এবং ইহা ঋণ বণ্টন পরিকল্পনায় সরকারও রিজার্ভ ব্যাংককে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করিবে। ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে

যে আর্থিক এবং ঋণসংক্রান্ত ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংকের নীতি যেন বাণিজ্য ব্যাংক কর্তৃক কার্যকর করা হয়। রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে অতিরিক্ত আইনগত ক্ষমতা দিবার জন্য শীঘ্রই আইন পাশ করা হইতেছে। অতীতে বিভিন্ন সময়ে রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহার উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ আমানতকারীর স্বার্থ রক্ষা করা। রিজার্ভ ব্যাংকের উপর যে নূতন ক্ষমতা প্রদান করা হইবে তাহা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ এবং কার্যকরী।

নূতন আইনানুসারে বাণিজ্যব্যাংক পরিচালনায় মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হইবে। প্রত্যেক ব্যাংকের একজন করিয়া পুরাসময়ের জন্য চেয়ারম্যান নিয়োগ করিতে হইবে। কোনো পেশাগত ব্যাংকারই চেয়ারম্যান হইতে পারিবে, কোনো শিল্পপতি নয়। যদি ব্যাংকের মনোনীত প্রার্থী রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য না হয় তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাংকের নিজ মনোনীত প্রার্থী নিয়োগ করিবার এবং প্রয়োজন বোধ করিলে চেয়ারম্যানকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংকের থাকিবে।

ব্যাংকের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্ পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং বোর্ডের অধিকাংশ ডাইরেক্টরস´ অ-শিল্পপতি হইবেন এবং ইহারা সাধারণতঃ কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, সমবায় প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে আসিবেন। এই সকল ব্যক্তির জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ব্যাংকের কাজে লাগিবে।

বাণিজ্যব্যাংকের বোর্ডে একজন ডাইরেক্টর অথবা পর্যবেক্ষক (observer) নিয়োগ করিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংকের থাকিবে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতা শুধুমাত্র সেই সকল ব্যাংকের উপর প্রযোজ্য হইবে যাহাদের আমানত ২৫ কোটি টাকার অধিক এবং কালক্রমে ধীরে ধীরে অন্য ব্যাংকের উপর উহা প্রসারিত হইবে।

এই আইনের একটি প্রধান বিষয় হইল যে ডাইরেক্টরগণ অথবা তাহারা যে প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর, অংশীদার, ম্যানেজার, কর্মচারী, ম্যানেজিং এজেণ্ট অথবা শেয়ারহোল্ডার সেই সকল প্রতিষ্ঠান কোনোরূপ ঋণ পাইবে না। সুতরাং কোনো ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গ কোনো ব্যাংকের বোর্ড অফ ডারেক্টরসে´ থাকার দরুণ নিজেদের জন্য অথবা তাহাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনোরূপ ঋণ পাইবে না।

বহুবার এই মর্মে অভিযোগ শোনা গিয়াছে যে ব্যাংকের ডাইরেক্টরগণ নিজেদের জন্য অথবা তাহারা যে প্রতিষ্ঠানের সহিত স্বার্থযুক্ত তাহার জন্য ঋণ পাইবার ব্যাপারে তাহাদের প্রভাবকে কাজে লাগায়। বর্তমান আইনের ফলে ঋণদানের ব্যাপারে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের প্রভাব দূর হইবে।

ঋণগ্রহণের জন্য আবেদনপত্র পরীক্ষা এবং ঋণদানের ব্যাপারে বোর্ডকে সুপারিশ করিবার ব্যাপারে কোনো কোনো ব্যাংক স্থানীয় অথবা উপদেষ্টা কমিটি (local or advisory committee) গঠন করিয়া থাকে। সরকারের উদ্দেশ্য হইল যে ব্যাংক হইতে ঋণগ্রহণকারী ওই ধরণের উপদেষ্টা পরিষদেও প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন না। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংক একটি নির্দেশনামা জারি করিবে।

বৈদেশিক ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হইবে। এই ব্যাংকগুলি ভারতের বাহিরে সুনির্দিষ্ট এবং ভারতে তাহাদের কাজকারবার দেখিবার জন্য একজন প্রধান কার্যনির্বাহক হিসাবে একজন ব্যাংকার থাকেন। পুরাসময়ের জন্য চেয়ারম্যান এবং বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস এর পুনর্গঠন বিদেশী ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। কিন্তু প্রত্যেক বৈদেশিক ব্যাংককে ভারতীয় ব্যক্তিদিগকে লইয়া উপদেষ্টা বোর্ড (advisory board) গঠন করিতে হইবে। উপদেষ্টা বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে এই ব্যাংকগুলি তাহাদের ঋণদাননীতি এবং পদ্ধতি পরিচালনা করিবে। বৈদেশিক ব্যাংকগুলি সরকারের নূতন নীতি মানিয়া লইতে সম্মত আছে।

যদি কোনো ব্যাংক অবাধ্যতা করে তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ব্যবস্থাও এই আইনে থাকিবে। যদি কোনো ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশাত্মক নীতি অগ্রাহ্য করে অথবা যদি মনে করা হয় যে কোনো ক্ষেত্রে অথবা অঞ্চলে অধিকতর ব্যাংকিং সুবিধার জন্য কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় সরকারের গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহা হইলে সরকার তাহা করিতে ইতস্তত করিবেন না। জাতীয় ঋণ পরিষদ (National Credit Council) গঠনের মাধ্যমে ভালভাবে ঋণ পরিকল্পনার ব্যবস্থা করিয়া এবং ব্যাংক-সিদ্ধান্তের উপর অধিকতর প্রতিষ্ঠানগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিয়া সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য বাস্তবে পরিণত হইবে। ব্যাংকের ঋণদান নীতিতে ধীরগতিতে পরিবর্তন আনিতে হইবে। আকস্মিক পরিবর্তন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় আনিতে পারে। এই কারণে রাতারাতি কোনোরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয় নাই।

এইগুলি ব্যাংকব্যবস্থা পুনর্গঠনের স্বল্পকালীন কর্মসূচী। দীর্ঘকালীন কর্মসূচীও এই পরিকল্পনা হইতে বাদ পড়ে নাই।

দেশের সঞ্চয়ের পরিমাণ এতই স্বল্প যে উহা উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামাঞ্চল হইতে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করিতে হইবে। ইহা সত্য যে বাণিজ্য ব্যাংকগুলি, বিশেষ করিয়া স্টেট ব্যাংক গ্রামাঞ্চলে শাখা প্রসারিত করিতেছে। এই ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী প্রয়াস প্রয়োজন। দীর্ঘকালীন উদ্দেশ্য হইবে আঞ্চলিক ভিত্তিতে ব্যাংকব্যবস্থা প্রসার করা, উহা শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলে আমানত একত্রীকরণ করিবে তাহাই নয়, উহা কৃষক এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে।

আরো অন্যান্য ক্ষেত্র আছে যেখানে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ব্যাংক ব্যবস্থার কার্যকরী দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং উহাদের কার্যপদ্ধতি আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন।

কমিশন — ব্যাংক শিল্পের যাহাতে সঠিক পথে অগ্রগতি হয় সেই উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান — ব্যাংকের অফিসারদিগকে ব্যাংকশিল্পসংক্রান্ত শিক্ষা দিবার জন্য একটি শিক্ষণপ্রতিষ্ঠান গঠনের কথা সরকার চিন্তা করিতেছেন।

সমালোচনা (Criticism) : প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ আর. কে. হাজারী (Dr. R. K. Hazari) ব্যাংকের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ব্যাংকের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবে না। তাঁহার মতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা জাতীয়করণ করা অপেক্ষা অধিকতর দুরূহ। তিনি প্রস্তাবিত জাতীয় ঋণ পরিষদের (National Credit Council) কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন এবং ইহাকে দেশের ব্যাংকব্যবস্থার একটি অপ্রয়োজনীয় সংস্থা বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন যে বর্তমান নীতি অনুসরণ করা হইলে ইহা হইতে কোনোরূপ সুফল পাওয়া যাইবে না।

ডাঃ হাজারি বলেন যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং ডাইরেক্টরগণ কাহার নিকট দায়ী থাকিবেন তাহা সম্পর্কে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলা হয় নাই। আমরা আশা করিতে পারি না যে রাতারাতি তাহারা ব্যাংকের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে।

ডাঃ হাজারী ব্যাংক জাতীয়করণের একজন সমর্থক। তিনি বলেন যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যাংকঋণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন এবং ঋণদানের মানদণ্ড হইবে নিরাপত্তা (safety) নয়—সম্ভাবনা (prospects)। ব্যাংক জাতীয়করণের উদ্দেশ্য হইল একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকিবে যাহা বিনিয়োগ স্থির করিবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অতিরিক্ত কেন্দ্রীভবন প্রতিহত করিবে।

শ্রী সি. এইচ. ভাবার (C. H. Bhabha) মতে ব্যাংকের উপর "সামাজিক নিয়ন্ত্রণ" সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের মতো একটি অস্পষ্ট নীহারিকাচ্ছন্ন ধারণা। কোথাও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা পাওয়া যায় নাই।

বাণিজ্য ব্যাংকের পক্ষ সমর্থন করিয়া ভাবা বলেন যে ভারতের জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ১৬ ভাগ ব্যাংকের মাধ্যমে একত্রিত হইয়া থাকে। জাতীয় উৎপাদনের এই সামান্য সংগৃহীত অংশের দ্বারাই সরকারী এবং আধা-সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগ করিয়া ব্যাংক উন্নয়নমূলক কর্মসূচীকে সহায়তা করিয়াছে।

ব্যাংকব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি নাই একথা তিনি বলেন না। কিন্তু সরকারী ক্ষেত্রে যে ধরণের ভুলভ্রান্তি তাহার তুলনায় ইহা নগণ্য। রিজার্ভ ব্যাংক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী আশানুরূপ হয় নাই। জাতীয়করণের শ্লোগান অথবা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার জন্য কোনো হটকারী পরিবর্তন ভারতের অর্থনীতিতে অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করিতে পারে।

বর্তমানের বিশৃংখল অর্থব্যবস্থা এবং কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতি উপেক্ষার জন্য দায়ী সরকারের ত্রুটিপূর্ণ ফিসক্যাল এবং আর্থিক নীতি এবং রিজার্ভ ব্যাংকের ব্যর্থতা।

কৃষির প্রতি দৃষ্টি দিবার জন্য বাণিজ্য ব্যাংকগুলিকে কোনোরূপ নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। সরকারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সাহায্য লইয়া কৃষিকে অর্থসাহায্য করিবার দায়িত্ব সমবায় ব্যাংকগুলির। রাষ্ট্রীয় ব্যাংক কৃষি ঋণ দিবার জন্য রহিয়াছে কিন্তু কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্পকে অর্থসাহায্য করিবার জন্য ইহাকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা

গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই। আর এখন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দোহাই দিয়া বাণিজ্য ব্যাংকগুলিকে আমানতকারীর টাকা ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে লগ্নী করিতে নির্দেশ দেওয়া হইবে, ইহার দরুণ প্রাথমিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, মুনাফা, বোনাস, লভ্যাংশ হ্রাস পাইবে আর ইহার দরুণ অংশীদার ও কর্মচারীদের স্বার্থ বিপন্ন হইবে। প্রস্তাবিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ভারতীয় ব্যাংকব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সামাজিকরণের দোহাই দিয়া যাহাতে ব্যাংক "রাজনীতিকরণ" করা না হয় অথবা যাহারা মূলধন দিয়া ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া ব্যাংকব্যবস্থার উন্নয়নের সহায়তা করিয়াছে তাহাদের অধিকার যেন অন্যায়ভাবে সংকুচিত করা না হয় ইহা দেখিতে হইবে। যাহারা ব্যাংক জাতীয়করণের জন্য চিৎকার করিতেছে তাহারা শুধুমাত্র স্বার্থসাধনের চাতুরী খেলিতেছে—তাহাদের ব্যাংকে হয় কোনো ঝুঁকি নাই নতুবা এই শিল্প সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নাই। এমন কি কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক অর্থনীতির গতিও প্রবণতা ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং প্রতিযোগিতার স্বপক্ষে।

শ্রীভাবা বলেন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে ব্যাংকব্যবসায়ের দক্ষতা এবং মক্কেলদের প্রতি সাধারণ ভদ্রতা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে যাহার দরুণ দক্ষতার মান উন্নত হইবে, আমানতকারীর প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি ও সেবা দিয়া অধিকাংশ ব্যক্তিকে আমানত রাখিতে আকৃষ্ট করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা যায়। *

* Slogans of nationalization or hasty changes in the structure to ensure some sort of social control can cause irreparable damage to the nation's economy ......Our experience has shown that the efficiency of the banking service as well as the common courtesy shown to customers have been going down at a very fast pace. Perhaps the most urgently needed measures of social control are these which would ensure high standards of efficiency, proper service and attention to the special needs of the large number of depositors so as to attract more of them and promote the growth of our economy.

It can be said that the future profitability of banking business is bound to be adversely affected jeopardizing the interests of both the share holders and the employees of banking institutions. Also an ever increasing number of unremunerative advances to a growing number of borrowers may entail a bigger incidence of bad debts with consequent ill effects on public confidence in Indian banking and on the future growth of deposits. Along with the proposed "social control" some sort of safeguards should be provided to protect the interests of the groups directly connected with Indian commercial banks.

Finally the biggest danger to be safeguarded against would be politicalization of banking, in the name of socialization or usurpation of the rights of those who have risked their capital and fostered the growth of this important service for our economy. The few who are today crying for nationalization of banks are merely playing an ideological game for short sighted and selfish ends without having any direct stake in banking or without making efforts to acquire a deeper insight into the intricacies of this highly specialized service. Even in rigidly controlled economies, the present trends in thinking favour freer play to personal initiative and competition. —C. H. Bhabha.

Exercises

প্রথম অধ্যায়

1. What is Economic Planning ? Discuss its aims and objects. [পৃষ্ঠা ৪১৫-১৭]

2. Write a note on the importance of planning in a country like India. [পৃষ্ঠা ৪১৬-২৭]

3. Indicate the conditions for the success of planning. [পৃষ্ঠা ৪১৭-১৯]

4. Write a note on Mixed Economy in India. [পৃষ্ঠা ৪২০-২৪]

5. What do you mean by Deficit Financing ? Discuss the arguments for and against Deficit Financing. [পৃষ্ঠা ৪২৪-২৭]

6. Comment on the technique of Deficit Financing as adopted in India. [পৃষ্ঠা ৪২৪-২৭]

7. Discuss the objectives of the Gold Policy of the Government of India. [পৃষ্ঠা ৪২৭-৩০]

দ্বিতীয় অধ্যায়

8. Discuss the objectives, targets and achievements of the First Five Year Plan. [পৃষ্ঠা ৪৩১-৩৪]

9. "The Indian Economy has made remarkable progress under the First Five Year Plan." Examine the statement noting the progress of the First Five Year Plan. (C. U. B. Com. 1956, B. A. 1957) [পৃষ্ঠা ৪৩৪-৩৬]

10. Describe the main experiences of the Second Five Year Plan of India. What are the main lessons would you draw from these experiences ?

11. Discuss the main features of India's Second Five Year Plan. In what important respects does the Second Plan differ from the First Plan ? [পৃষ্ঠা ৪৩৬, ৪৪১-৪৫]

12. Examine the justification for the relatively greater emphasis placed in the Second Five Year Plan on small industries on the one hand and heavy basic industries on the other, than on the large scale consumer's good industries. (C. U. B. A. 1951) [পৃষ্ঠা ৪৪৫-৪৭]

13. Analyse the main differences between Indias First and Second Five Year Plans and explain why the Second Plan is facing difficulties what did not appear during the First Plan period. (C. U. B. Com. 1959) [পৃষ্ঠা ৪৪১-৪৫]

14. Give a brief estimate of the achievements of the Second Five Year Plan in India. [পৃষ্ঠা ৪৪৭-৫১]

15. Give a critical estimate of the achievements of India's First and Second Five Year Plans. [পৃষ্ঠা ৪৪৭-৫১]

16. Give a critical estimate of the progress of Industrialisation in India since the introduction of the First Five Year Plan [পৃষ্ঠা ৪৪৭-৫১]

তৃতীয় অধ্যায়

17. Examine the objectives of the Third Five Year Plan of India. [পৃষ্ঠা ৪৫২-৫৬]

18. Discuss the main objectives of the Third Five Year Plan. In what respects do these objectives differ from those of the Second Plan ? [পৃষ্ঠা ৪৫২-৫৬]

19. Write a note on the methods adopted to finance India's Third Plan. [পৃষ্ঠা ৪৫৭-৫৯]

20. Examine the pattern of investment allocation in the Third Five Year Plan. [পৃষ্ঠা ৪৫৬-৫৭]

21. Discuss the principal objectives of the Third Five Year Plan and show how the resources required to fulfil these objectives may be found. [পৃষ্ঠা ৪৫২-৫৫, ৪৫৭-৫৯]

22. Indicate the main features and objectives of India's Third Five Year Plan. In what respects, if any does the Third Plan differ from the two previous Plans ? [পৃষ্ঠা ৪৫২-৫৫]

23. Describe the main features of the Third Five Year Plan. What in you opinion are the main conditions on which the success of the plan will depend ? [পৃষ্ঠা ৪৫২-৫৫]

চতুর্থ অধ্যায়

24. Give an outline of the Fourth Five Year Plan of India. [পৃষ্ঠা ৪৭৬—৮১]

25. Give an outline of the Social Control scheme on commercial banks. [পৃষ্ঠা ৪৭৬-৮১]

26. What are the features of the proposed Social Control of Banks ? Do you think that it would achieve the desired purpose ? [পৃষ্ঠা ৫০০-৭]

27. Give an idea of the concentration of economic powers in India. What measures would you suggest to prevent monopolistic trends and concentration of economic powers ? [পৃষ্ঠা ৪৮৪-৯৭]

28. Give an estimate of the achievements of the Third Five Year Plan of India. [পৃষ্ঠা—৪৯৭-৯৯]